ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার

ষোড়শ শতাব্দীর

পদাবলী-সাহিত্য

[নরহরি সরকার হইতে নরোত্তম ঠাকুর পর্যন্ত]

শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার

কলিকাতা-২৯ ॥ জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা-৯
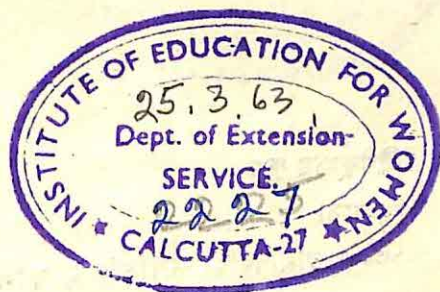
প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৮
জুন, ১৯৬১

প্রচ্ছদশিল্পী : রমেন্দ্রকুমার কুণ্ড
কপিরাইট : গ্রন্থকার

প্রকাশক : শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
মুদ্রাকর : শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

উৎসর্গ

পদাবলী সাহিত্যের রসিক
পণ্ডিতাগ্রগণ্য
ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের
করকমলে
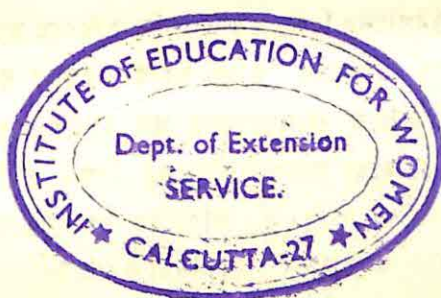
মুখবন্ধ

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়, সংকীর্ত্তনামৃত, কীর্ত্তনানন্দ, পদকল্পতরু প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর পদসঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে কালানুযায়ী পদসন্নিবেশ করা হয় নাই, রস বা পালা অনুসারে পদ সাজানো হইয়াছে। তাহার ফলে বিশেষ কোন যুগের রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য আকাদেমি প্রভৃতি হইতে প্রকাশিত নব্য পদসংগ্রহগ্রন্থগুলিতে রস বা পালা অনুসারে কোন পদ সাজানো হয় নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থের তৃতীয়খণ্ডে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক নরহরি সরকার হইতে লোকনাথের শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর পর্য্যন্ত সময়ের শ্রেষ্ঠ পদগুলি পালা অনুসারে সাজাইয়া সংক্ষিপ্ত টীকা সহ প্রকাশ করা হইল। ইহাতে একদিকে যেমন পদাবলী সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পরিচয়লাভেচ্ছু পাঠকদিগের বুঝিবার সুবিধা হইবে, তেমনি অন্যদিকে কীর্ত্তনগানের বিশুদ্ধ রস উপলব্ধি করিবার জন্য যে সব গায়ক ও শ্রোতৃবৃন্দ উৎসুক তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সহায়তা হইবে বলিয়া আশা করি—কেননা ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে এক শত বৎসরের মধ্যে পদাবলীকীর্ত্তনের বিশুদ্ধ রূপটি প্রকট হইয়াছিল। নির্ব্বাচিত পদগুলির কবি ও তাঁহাদের যুগ সম্বন্ধে গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়খণ্ডে প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের রচনাবলীর সহিত চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য রাধাকৃষ্ণলীলার বর্ণনামূলক সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করা হইয়াছে। আমার কন্যা শ্রীমতী মালবিকা চাকী এম. এ. নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে।

শ্রীমাধব মন্দির
রাণীর চড়া
নবদ্বীপ (নদীয়া)
আষাঢ়-পূর্ণিমা ১৩৬৮ সাল

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ : ষোড়শ শতাব্দীর মহাজন পদকর্ত্তৃগণ

দ্বিতীয় ভাগ : ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

তৃতীয় ভাগ : পদাবলী

——
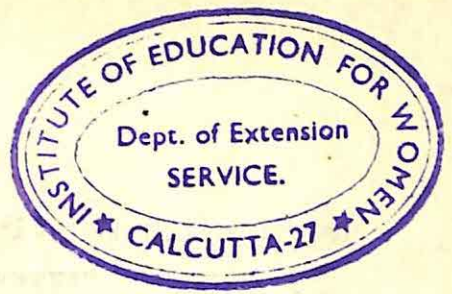
প্রথম ভাগ

ষোড়শ শতাব্দীর মহাজন পদকর্তৃগণ

প্রথম অধ্যায়

নিমাই পণ্ডিতের সহচর কবিকুল

ইতিহাসের বিধাতাপুরুষ শতক-দশকের গণ্ডী মানিয়া চলেন না। তাই কোন আন্দোলন বা ভাব-জগতের আলোড়নকে কোন দশক বা শতকের সীমার মধ্যে বাঁধা যায় না। তাহাদের উদ্ভব হয়তো দশক-শতকের গণ্ডীর দুই-চার বছর আগেই দেখা দেয়; আবার বিকাশ ও পরিণতি ঘটিতে ঐ গণ্ডীর পনের-বিশ বছর অতীত হইয়া যায়। বহু সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করিয়াছেন।[১] খ্যাতনামা ইংরাজ লেখক সিড্‌নি লী তাঁহার Great Englishmen of the Sixteenth Century গ্রন্থে অন্যান্য সাহিত্যিকদের মধ্যে সেক্সপীয়র ও বেকনের কথা লিখিয়াছেন—যদিও সেক্সপীয়রের হ্যামলেট (১৬০২ খ্রীঃ), কিং লিয়র (১৬০৮ খ্রীঃ) ও টেম্‌পেস্ট (সম্ভবতঃ ১৬১১ খ্রীঃ) এবং বেকনের Advancement of Learning (১৬০৫ খ্রীঃ) ও New Atlantis (১৬২৪ খ্রীঃ) সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। সেক্সপীয়র ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ও বেকন্ ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন।

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে নরহরি সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া নরোত্তম ঠাকুরের সমসাময়িক কয়েকজন শিষ্য পর্য্যন্ত মহাজনগণের পদাবলীর কথা আলোচনা করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন নরহরি সরকার ষোড়শ

---

(১) যথা—
H. Plumb—England in the Eighteenth Century (1714–1815)

শতাব্দীর আরম্ভের পূর্ব্বেই দুই-চারিটি পদ রচনা করিয়াছিলেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় 'পাপিয়া শেখরে'র ভণিতাযুক্ত একটি পদে পাইয়াছিলেন—

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিনী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গ পাঞা পহুঁ শ্রীগৌরাঙ্গ
বড় সুখে জুড়াইলা প্রাণ॥

(গৌরপদতরঙ্গিনী, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৪৫৬)

এই পদটি যদি অকৃত্রিম হয়, তাহা হইলে নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা অন্ততঃ ১৫।২০ বছরের বড় হন ; কেননা ঐ বয়সের কমে কাহারও পক্ষে ব্রজরস গান করা সম্ভব হয় না। তিনি যদি শ্রীচৈতন্যের চেয়ে বয়সে এত বেশী বড় হইতেন তাহা হইলে কবিকর্ণপূর তাঁহাকে শ্রীরাধার প্রাণসখী মধুমতীর তত্ত্বরূপে নির্ণয় করিতেন না।[২] অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত যে "রায় শেখরের পদাবলী" সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে এই পদটি নাই। যতীন্দ্রবাবুর ন্যায় নিপুণ গবেষক যখন কোন পুঁথিতে এই পদটি পান নাই, তখন ইহার অকৃত্রিমতায় সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোভাবের বেশ কিছুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (২৪৪৫ সংখ্যক পুঁথি), দক্ষিণ খণ্ডের সত্যানন্দ ঠাকুরের নিকট ও শ্রীবৃন্দাবনে ঐ গ্রন্থের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী সাধন-দীপিকার নবম কক্ষায় (পৃঃ ২৫৭) প্রামাণ্য গ্রন্থের মধ্যে ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নরহরি সরকার শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভু আত্মসঙ্গোপন করিলে দেবনিগ্রহ ও রাজনিগ্রহ ঘটিবে এবং বহু বৈষ্ণবও ঈশ্বরের নিকট

(২) পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১৭৭

পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডের ৪৩ অধ্যায়ে একজন গোপীর নাম মধুমতী। এই নামটি অন্য কোন পুরাণে, কৃষ্ণযামল তন্ত্রে অথবা শ্রীরূপের কোন সখীদের নামের মধ্যে পাওয়া যায় না।

গমন করিবেন। যে সব বৈষ্ণব পৃথিবীতে থাকিবেন তাঁহারাও বাহিরে ভাব প্রকাশ না করিয়া মাঝে মাঝে অন্তরের প্রীতি এবং নিগূঢ় প্রেম প্রকাশ করিবেন। হরিকীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ ও ঈশ্বর সেবা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইবে। খুব সম্ভব ১৫৫৯ হইতে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নরহরি সরকার ঐরূপ লিখিয়াছিলেন—কেননা ঐ সময়েই একদিকে পর্ত্তুগীজদের আক্রমণে, অন্যদিকে কালাপাহাড়ের অত্যাচারে বাঙ্গালীর জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি রাজা পরমানন্দ রায়ের সঙ্গে যে সন্ধি করেন তাহাতে দেখা যায় যে পর্ত্তুগীজদের নিকট হইতে ছাড়পত্র না পাইলে কেহ নির্ব্বিঘ্নে নৌ-পথে বাণিজ্য করিতে পারিত না (H. B. II, পৃঃ ৩৫৮)। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমান কররাণি উড়িষ্যা অধিকার করেন এবং রাজু বা কালাপাহাড় বহু মন্দির ও দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস করেন (H.B. II, Ch. IX)। নরহরি সরকার যদি শ্রীচৈতন্যের মতন ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮২ বৎসর। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, কেননা প্রেমবিলাস, অনুরাগবল্লী, ভক্তি রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থের মতে শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থ আনিবার পর সরকার ঠাকুর তাঁহাকে বিবাহ করিতে আদেশ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ দুইটি পদের ভণিতায় প্রথমে প্রতাপাদিত্যের নাম উল্লেখ করিয়া পরে ঐস্থানে রায় চম্পতি ও রায় বসন্তের নাম বসাইয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর তিনি রাজরোষ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের একটি প্রার্থনার পদ আছে—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যেহোঁ কৈল চৈতন্য-চরিত।
গৌর-গোবিন্দলীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥

(সাহিত্য পরিষদের ৪৯৫ এবং ৪৩৭ সংখ্যক পুথির দ্বিতীয় এবং ১৩৫৯ সংখ্যক পুথির দশম প্রার্থনা)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১৬১২ অথবা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় চরিতামৃত রচনার কিছু পরে ঐ প্রার্থনা লিখিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি হইতে ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত ৪১ জন কবির পদাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। কয়েকজন কবির কোন কোন রচনা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে লিখিত হইলেও উহা মূলতঃ ষোড়শ শতকেরই ভাবধারার অংশ।

আলোচ্য যুগের পদাবলী সাহিত্যকে কাল ও ভাব অনুসারে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। নিমাই পণ্ডিতের গয়াতে ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে দুইজন মাত্র কবির এক একটি মাত্র পদ পাওয়া যায়। তাঁহারা হইতেছেন যশোরাজ খান ও রায় রামানন্দ। উভয়েই ভণিতায় নিজ নিজ অধিপতির গুণগান করিয়াছেন। যশোরাজ খান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় উদ্গ্রীব শ্রীরাধার ভাব লইয়া পদ লিখিলেও, বিদ্যাপতির প্রথম বয়সের পদের রীতি অনুসরণ করিয়া ভণিতায় সুলতান হুসেন শাহের গুণগান করিয়াছেন—

শ্রীযুত হুসন জগত-ভূষণ
সেই ইহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান্॥

মালাধর বসুর উপাধি যেমন গুণরাজ খান্ ছিল, সেইরূপ এই অজ্ঞাতনামা কবির উপাধি যশোরাজ খান্ ছিল। মৈথিল কবি লোচন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার রাগতরঙ্গিনীতে (পৃঃ ৬৭) যশোধর নামে এক কবির একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার ভণিতায় আছে—

ভনই জসোধর নব কবিশেখর
পুহবী তেসর কাঁহা।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গসমনাগর
মালতি সেনিক তাঁহা॥

উভয় পদেই হুসেন শাহের নাম আছে, উভয় কবিরই নাম বা উপাধিতে "যশ" শব্দ আছে। তথাপি ইহারা একই লোক কি না তাহা বলা কঠিন।

রামানন্দ রায় উৎকলের অধিবাসী হইলেও ব্রজ-বুলিতে ‘পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল’ পদটি রচনা করেন। ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে এই সুপ্রসিদ্ধ পদটি রামানন্দ রায়ের নিকট শুনিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—“স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল” (চৈঃ চঃ ২।৮)। জগন্নাথবল্লভ নাটকের প্রত্যেক পদের শেষে যেমন ‘সুখয়তু গজপতি রুদ্রনরেশং’ ইত্যাদি বাক্যে প্রতাপ-রুদ্রের সন্তোষ কামনা করা হইয়াছে, তেমনি এই পদটিতেও কবি সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন যে প্রতাপরুদ্র তাঁহার মান বর্দ্ধন করিয়াছেন—

বর্দ্ধনরুদ্র-নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

শ্রীচৈতন্যের বা তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যের নিকট অনুপ্রেরণ পাইয়া যাঁহারা পদ রচনা করিয়াছেন তাঁহারা কেহ দেশের সুলতান-বাদশাহ বা রাজরাজড়ার চাটুকারিতা করেন নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিমাই পণ্ডিতের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে একটি বর্গে স্থাপন করা যায়। ইঁহারা প্রভুর নবদ্বীপলীলার সহচর। মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ আচার্য্য, রামানন্দ বসু, শিবানন্দ সেন, গৌরীদাস, মুকুন্দ দত্ত, পরমানন্দ গুপ্ত, বংশীবদন, যদুনাথ কবিচন্দ্র, বলরাম দাস ও শঙ্কর ঘোষ এই পনের জন কবি এই বর্গের অন্তর্গত।

প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তৃতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন শ্রীরূপ গোস্বামী, রঘুনাথদাস গোস্বামী, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য, কানাই খুঁটিয়া, অনন্ত আচার্য্য, দেবকীনন্দন, নয়নানন্দ মিশ্র ও কানুরাম দাস এই আটজন কবি।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর অথচ শ্রীনিবাস-নরোত্তমের যুগের পূর্ব্বে যাঁহারা কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আমরা চতুর্থ বর্গে স্থাপন করিতেছি। ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি হইতেছেন জ্ঞানদাস। শ্রীচৈতন্যের তিনজন সুপ্রসিদ্ধ চরিতাখ্যায়ক—বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস

ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই বিভাগের উজ্জ্বল রত্ন। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা মাধব আচার্য্য ও কৃষ্ণদাসকেও এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, বীর হাম্বীর, নৃসিংহদেব এবং মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলার অনুচর লোকনাথের শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্য বসন্ত রায় ও বল্লভ দাস; গোবিন্দ দাস কবিরাজের বন্ধু চম্পতি এবং নরোত্তম ঠাকুরের বন্ধু শ্যামানন্দকে লইয়া পঞ্চম বর্গ। নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য শেখর রায়কেও এই বর্গের ভিতর স্থাপন করা যায়।

প্রথম বর্গের যশোরাজ খান্ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বেই জগন্নাথবল্লভ নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ঐ নাটকে কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রীচৈতন্যের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। শ্রীরূপ গোস্বামী মধুমঙ্গল নামক বয়স্য চরিত্র সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে রায় রামানন্দ বয়স্যের নাম দিয়াছেন রতিকন্দল। রায় রামানন্দ মদনিকার দ্বারা রাধাকৃষ্ণের মিলন সংসাধন করিয়াছেন; শ্রীরূপের নাটকে ঐ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন যোগমায়া-রূপিণী পৌর্ণমাসী দেবী। জগন্নাথবল্লভ নাটকে সখী নাই। শশিমুখী ও অশোকমঞ্জরী নামে সখী হইলেও কার্য্যতঃ দূতী ও পরিচারিকা মাত্র। সখীর অনুগত হইয়া রাধাকৃষ্ণের ভজন করিবার রীতির সহিত রামানন্দ রায় পরিচিত ছিলেন না— ঐ রীতি শ্রীরূপেরই সৃষ্টি। শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩৬) অরিষ্টাসুর বধের পটভূমিকায় এই নাটক রচিত। শ্রীচৈতন্যের অনুচর সাহিত্যিকগণ শ্রীকৃষ্ণলীলার মাধুর্য্যরসই আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব পরিবেশন করেন নাই। রামানন্দ রায় ঐশ্বর্য্যভাবের লীলা অরিষ্টাসুর বধের নেপথ্যে সংঘটনের বর্ণনা দিয়া নাটকের সমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। অরিষ্টাসুর বধে পরিশ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা বাতাস করিতেছেন এই দৃশ্যটি অতি মনোরম। জগন্নাথবল্লভের অপর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের রূপে মোহিত হইয়া প্রথমে তাঁহার নিকট পত্র লেখেন। মেয়েরা প্রথমে অগ্রসর হইয়া প্রেমনিবেদন করিতেছে এরূপ আলেখ্য ভারতীয় সাহিত্যে বিরল। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ

যেমন গোপীদিগকে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছিলেন, তেমনি জগন্নাথ-বল্লভে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পত্রের উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন—

কুলবনিতানামিচ্ছমাচরিতম্
পরপুরুষাধিগমে গুরুদুরিতম্॥ (দ্বিতীয় অঙ্ক)

তৃতীয় অঙ্কে দেখি শশিমুখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন 'অস্থানে অনুরাগ করিও না, তোমার পক্ষে কৃষ্ণের ধ্যান, উৎকলিকা-কুসুম-বিগলিত-মধুমিশ্রিত বিষ।' কিন্তু শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা ত্যাগ করা অসম্ভব। চতুর্থ অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন।

জগন্নাথবল্লভের কয়েকটি পদ কীর্ত্তনীয়ারা আজকালও গাহিয়া থাকেন। শ্রীরাধার অভিসারের এই পদটি সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়—

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্
পঙ্কজমিব মৃদু মারুত চলিতম্
কেলি বিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ সুমুদিত মনসিজ বাধা॥
বিনিদধতী মৃদু মন্থর পাদং
রচয়তি কুঞ্জর গতিমনুবাদং।
জনয়তুরুদ্র গজাধিপ মুদিতং
রামানন্দ রায় কবি গদিতম্॥ ১।৩৭

জয়দেবের রচনার ঝঙ্কার ইহার মধ্যে অনুভূত হয়। লোচন এই পদটির ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া একটি হৃদয়গ্রাহী কথাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—

চলিল ব্রজমোহিনী ধনী কুঞ্জরবর-গমনী।
কেলি-বিপিনে সাজলি রঙ্গে সঙ্গে বরজ-রমণী॥
মদন আতঙ্গে পুলক অঙ্গ, নব অনুরাগে প্রেম-তরঙ্গ চঞ্চল মৃগনয়নী।
কবরী-মণ্ডিত মালতী-মাল, নবজলধরে তড়িত-জাল, স্থকিত চকিত অমনি।
বদনমণ্ডল শারদচন্দ্র, মদনের মনে লাগল ধন্দ, নিখিল-ভুবন-মোহিনী॥
নীলবসন রতনভূষণ, মণিময় হার দোলয়ে সঘন, কটিতটে বাজে কিঙ্কিনী।
চরণকমলে মাতলভৃঙ্গ, মধুপান করি না ছাড়ে সঙ্গ, সদা করে
গুন্ গুন্ ধ্বনি॥

চকিত যুগল-নয়ন-পদ্ম, খঞ্জন-মনে লাগল ধন্দ, চম্পক-কাঞ্চন-বরণী।
হেলিয়া দুলিয়া চলিল রঙ্গে, নব নব নব নাগরী সঙ্গে,

লোচন-মন-রঞ্জনী॥

(ক) নবদ্বীপ-লীলার পরিকরদের পদ

(১) নরহরি সরকার ঠাকুর

নরহরি সরকারের নাম বৃন্দাবনদাস সযত্নে পরিহার করিলেও তিনি যে নবদ্বীপেই প্রভুর প্রিয় পরিকরদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন তাহার বহু প্রমাণ সমসাময়িক পদাবলী সাহিত্যে আছে (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান —দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩০, ৫২-৫৬)। বর্ত্তমান সঙ্কলনের সপ্তম পদে দেখা যায় যে শিবানন্দ সেন বলিতেছেন—

"ব্রজরস গায়ত নরহরি সঙ্গে"

গোবিন্দ ঘোষের একটি পদে (৯) আছে—

বাসু ঘোষ রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পহু নরহরি সঙ্গ।

এখানে রামানন্দ বলিতে বসু রামানন্দকে বুঝাইতেছে।

নরহরি সরকার একজন বড় কবি। তাঁহার বহু পদ প্রাচীন পুথির মধ্যে নিহিত আছে—এখনও প্রকাশিত হয় নাই। কয়েকটি পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিতেছে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে খণ্ডিতার "ছুঁও না ছুঁও না বধূ ঐখানে থাক" (চণ্ডীদাস-পদাবলী পৃঃ ১৭৯), "বন্ধু হে কহ না রসের কথা শুনি" (ঐ পৃঃ ১৮৩), "কি না জ্বালা হৈল মোর কানুর পিরীতি" (ঐ পৃঃ ২০০) এবং "পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সায়র মাঝে" (ঐ পৃঃ ২১০-১১) পদ কয়টি কোথাও চণ্ডীদাস ভণিতায়, কোথাও নরহরি ভণিতায় পাওয়া যায়। ঐরূপ ভণিতা-বিভ্রাটের আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৫ সংখ্যক পুথিতে নরহরি ভণিতায় এই সুন্দর পদটি পাইয়াছি—

সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে বলিব কি।
অন্তর বাহির যে জন জানয়ে
তাহারে পরাণ দি॥ ১
সোনার গাগরি তাথে বিষ ভরি
দুধে পুরি তার মুখ
বিচার করিয়া যে জন না খায়
পরিণামে পায় দুখ॥ ২
ধরণি জিনিঞা ভাবের ভার
বহিতে সকতি কার
এ কথা কহিব তাহার আগে
শ্যামধন যার হিয়ায় জাগে॥ ৩
পুলক আকুল যাকর চিত।
সুখের সায়রে সিনায় নিত॥
কহএ নরহরি পিরিতি রিত।
সদাই উভয়ে চমকি চিত॥ ৪

এই পদের প্রথম দুইটি কলির সহিত চণ্ডীদাস-ভণিতায় নীলরতনবাবুর ২৮৮ সংখ্যক পদের প্রথম ও চতুর্থ কলির মিল আছে। অন্য কোন অংশের মিল নাই। পদকল্পতরুর ৯৫৭ সংখ্যক পদটিতে কবির নাম নাই; তাহার দ্বিতীয় কলিটির সঙ্গে এই পদের প্রথম কলির মিল আছে। নরহরি সরকারের আর একটি পদরত্ন সাহিত্য-পরিষদের ৯৬৮ সংখ্যক পুথিতে পাইয়াছি—

কি বল বিধির বিধানে নাঞি।
না দিলে বসিতে ব্রহ্মাণ্ডে ঠাঞি॥
এত বিড়ম্বনা বিধির কেনে।
না দিলে রজনি বিরল স্থানে॥
বসিতাম রসিক সুজন সনে।
কতেক আনন্দ হইত মনে॥

বিধি যদি রসের রসিক হত্য।
এসব কথন করিতে দিত ॥
অতেব বিধির বিধান কোথা।
জানে না মরম ধরম কোথা ॥
কহে নরহরি অবধি সার।
বিধি অগোচর করল তার ॥

পদকল্পতরুতে নরহরি ভণিতায় ৩৬টি পদ ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে জয়দেব (১৩) ও চণ্ডীদাসের (১৪) বন্দনা, গোপালভট্ট (২৩৬৯) ও লোকনাথের সূচক (২৩৭১), ঝুলনের পাঁচটি পদ (১৫৫৯, ১৫৬০, ১৫৬৩, ১৫৬৪ এবং ১৫৬৬), একটি খণ্ডিতার (৩৮২), একটি নবদ্বীপবাসীর ভাবোল্লাসের (১৯৭০) ও একটি শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যের পদ (২০৯৭) নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচনা। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় উল্লিখিত ১২টি পদের মধ্যে ১১টিকে (১৯৭০ সংখ্যক পদটী ছাড়া) নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া পৃথক করিয়া দিয়া বাকী ২৫টি পদ নরহরি সরকারের রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (পদকল্পতরুর ভূমিকা পৃঃ ১৩৩)। নরহরি সরকারের রচনার দুইটি নমুনা ক্ষণদা গীত-চিন্তামণিতে আছে—ঐ দুইটি পদ নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচনা হইতে পারে না—কেননা নরহরি চক্রবর্ত্তীর পিতার গুরু ছিলেন ক্ষণদার সঙ্কলয়িতা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। পদ দুইটির একটি নীচে দিতেছি—অপর পদটি এই সঙ্কলনের ১৯৯ সংখ্যায় পাওয়া যাইবে।

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে।
সুরধুনি হেরি গোরা যমুনা ভাণে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে ॥
ভাবের ভরমে গোরা ত্রিভঙ্গিম রহে।
পীতবসন আর মুরলী চাহে ॥
প্রিয় গদাধর করিয়া কোলে।
কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদগদ বোলে ॥

ভাব বুঝি পণ্ডিত রহে বাম পাশে।
না বুঝয়ে এই রঙ্গ নরহরি দাসে॥

ক্ষণদা ২৭।৪১

নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে এই পদটিই কিছু পাঠান্তর সহ উদ্ধৃত করিয়া নীচে লিখিয়াছেন—"শ্রীনরহরি সরকার ঠক্কুরস্য গীতমিদং" (পৃঃ ৯২৪)। তাঁহার ধৃত পাঠ এই সঙ্কলনের প্রথম পদে মিলিবে। আমরা নরহরি সরকারের গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যে পদগুলি ধরিয়াছি, তাহার ভাব ও ভাষা ঠিক এই পদের অনুরূপ।

নরহরি চক্রবর্ত্তী ওরফে ঘনশ্যামের ১৪৪২টি পদ পাওয়া গিয়াছে। আমার কনিষ্ঠপুত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ভগবান-প্রসাদ মজুমদার নরহরি চক্রবর্ত্তীর সমস্ত পদের পদসূচী তৈয়ারী করিয়াছে। তাহাতে সে এক এক করিয়া গণনা করিয়া ভক্তি-রত্নাকরে ২৪৩টি, গীতচন্দ্রোদয়ে ৮২৮টি ও গৌরচরিত্র চিন্তামণিতে ৩৭২টি পদ পাইয়াছে। দীন চণ্ডীদাস ছাড়া অন্য কোন বৈষ্ণব কবি এত বেশী পদ লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। গৌরচরিত্র-চিন্তামণির ভূমিকায় হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীমন্নরহরি ঘনশ্যামের রচনা সাধাসিধা, গদ্যের ন্যায় আড়ম্বরবিহীন।...ইঁহার পদাবলী সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল ও সরল নহে; শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক নাগরীগণের ভাববিতর্কমূলক পদগুলি শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের ধামালির অনুকরণে রচিত। এই সব পদে কবিতা-সুলভ ব্যঞ্জনা বা ভাবোৎকর্ষ (suggestiveness) নাই; কাজেই কবি-হিসাবে ইনি তত সমাদৃত না হইলেও ইনি যে সঙ্গীতজ্ঞ ও ছন্দোবিৎ ছিলেন— এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।" গৌরপদতরঙ্গিণীতে নরহরি ভণিতায় গৌর-নাগরীর ভাবমূলক যে সব পদ ধৃত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি গৌর-চরিত্রচিন্তামণিতে পাওয়া যায়। নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচনার নমুনারূপে দুইটি পদ নীচে দিতেছি—

নিত্যানন্দ বন্দনা—

ভাইক ভাবে মত্ত গতি—বিরহিত পদ্মাবতী—সুত অতিশয় ধীর।
ঘন ঘন কম্পিত জনু শম্পাবলী লসত পুলক কুল ললিত শরীর॥

ছুটি পড়ত উর-হার চারু কচ ভূষণ বসন ন সম্বরু তায়।
গৌর-বরণ-বর-তস্কর অলখিত বুঝি তুরিত হি সব লেত চুরায়॥
উপজত কত আনন্দ চিত্তমধি ঝরঝর ঝরত সুলোচনলোর।
ও মুখচন্দ-সুধা তি পান করি বমন করত বুঝি লুবধচকোর॥
অঙ্গুরি পদভর করি রহু ঠাড়হি উর্দ্ধ করত করযুগ অনুপাম।
কনক-ধরাধর ধরণী ত্যজি বুঝি গগন গমন করু ভণ ঘনশ্যাম॥

(গৌরচরিত্র-চিন্তামণি পৃঃ ৫০)

পদটিতে রেখাঙ্কিত অংশগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। ঐ গ্রন্থেই (পৃঃ ১৭) দ্বিপদী ছন্দে তিনি নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহার ভাষা আরও অদ্ভুত—

নিজ পরিচয় কত দেঅব শ্রীমৎ গৌড় দেশ সুরসরিত তটে
বিনিবাস বিপ্রকুল-জাত সুজনক জগন্নাথ প্রিয় বৈষ্ণবদত্ত নাম—
যুগ নরহরি ঘনশ্যাম ইতি প্রথিত কিন্তু মম বন্ধুবর্গ উপদেশ
নিত্য ব্রজভূমি কৃতাশ্রয় পূর্ণ-কপটকুট ছুট ন কদা।
অরু কি কহব কুট হৃদয় কাষ্ঠসম হিংসা-ক্লিষ্ট পুষ্ট মতি সৌষ্ঠব
অগুণ সুষ্ট পষ্টপটু ধৃষ্ট অপরাধনিষ্ট পাপিষ্ঠ নষ্ট শঠ সুষ্ঠু প্রকৃষ্ট—
ভ্রষ্ট চেষ্টাতি লঘিষ্ঠ নিকৃষ্ট হৃষ্ট রিপু ষষ্ঠ রসাধিক
শিষ্ট-কষ্টপ্রদ-নিষ্ঠুর দুষ্ট সুবিষয়াবিষ্ট সদা॥

অবশ্য নরহরি চক্রবর্ত্তী সাদা বাংলাতেও কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচিত পদগুলি সাধারণতঃ আকারে বড়, আর নরহরি সরকার ঠাকুর ১২।১৪ চরণের বেশী কোন পদ লেখেন নাই। চক্রবর্ত্তীর ভাষায় ব্রজবুলির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, সরকার ঠাকুর সাধারণতঃ খাঁটি বাংলায় পদ লিখিয়াছেন—এই সঙ্কলনে ধৃত ১৯৯ সংখ্যক পদটি উহার একটু ব্যতিক্রম। উভয় কবির ভাব ও ভাষার মধ্যে এত বেশী পার্থক্য দেখা যায় যে একের রচনা হইতে অন্যের রচনা পৃথক্ করা দুঃসাধ্য মনে হয় না।

নরহরি সরকার ব্রজলীলা সম্বন্ধেও অনেকগুলি পদ লিখিয়াছিলেন। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিপি করা সংকীর্ত্তনামৃতে (২২৬) তাঁহার "তরুমূলে মেঘবরণিয়াকে" ইত্যাদি পদটির ভণিতায় আছে—

নাম নাহি জানি মনে অনুমাণি
নরহরি-চিত-চোর

এখানে তিনি শ্রীরাধার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া বলিতেছেন যে ঐ মেঘবরণিয়া শুধু গোকুলনগরের কামিনীদের নহে, নরহরিরও চিত্ত চুরি করিয়াছেন। ১৯৯ সংখ্যক পদে দেখি তাঁহার হৃদয়-দর্পণে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলনের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—

নরহরি হৃদি মাঝে অপরূপ জাগল
জলধরে বিধুবর ঝাঁপ।

নরহরি সরকার ঠাকুরের গৌর-লীলার পদগুলি ভাবমাধুর্য্যে অতুলনীয়। এগুলির ছত্রে ছত্রে কবির প্রত্যক্ষ অনুভূতির সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের লীলা-আস্বাদনের জন্য ঐ পদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অসীম। নরহরি সরকার সুবিখ্যাত কবি লোচনের গুরু ও সাধনার এক বিশেষ ধারার প্রবর্ত্তক বলিয়াও চিরস্মরণীয়। শ্রীগৌরাঙ্গকেই তিনি পরম ঈশ্বর রূপে সানুরাগ পূজা করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলার নাগরত্ব তাঁহাতে আরোপ করিয়া গৌর-নাগরী ভাবের উপাসনার প্রবর্ত্তন করেন।

(২) মুরারি গুপ্ত

মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিলেন। তিনিই প্রভুর প্রথম চরিতাখ্যায়ক। তাঁহার কড়চা বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য রচনা করেন। লোচন মুরারির গ্রন্থের অনেক স্থলের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্য-লীলা সম্বন্ধে অন্ততঃ দুইটি পদ রচনা করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে একটি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি (৬।১)-তে স্থান দিয়াছেন (এই সঙ্কলনের চতুর্থ পদ)। গৌরপদ তরঙ্গিণীতে ধৃত "একদিন মনে আনন্দ বাঢ়ল" ইত্যাদি পদটির ভণিতায় দাসু মুরারির নাম আছে। "শচীর আঙ্গিনা মাঝে" ইত্যাদি (পৃঃ ৫৪) "শচীর দুলাল মনোরঙ্গে" ইত্যাদি (পৃঃ ৫৫) পদটিতে এবং "চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে" ইত্যাদি (পৃঃ ২৪৬) পদে এবং "ধর ধর ধর রে নিতাই আমার গৌরে ধর" (পৃঃ ২৪৭) ইত্যাদি পদে শুধু মুরারি ভণিতা আছে—গুপ্ত নাই। এই

পদগুলি মুরারি গুপ্তের রচনা বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার যে দুইটি অকৃত্রিম পদ ক্ষণদায় পদামৃত সমুদ্রে ও পদকল্পতরুতে (৭৫১, ২১২১) ধৃত হইয়াছে তাহাতে মুরারি গুপ্ত এই ভণিতা আছে। পদকল্পতরুর ১৬৯৯ সংখ্যক পদটির ভণিতা

গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহু রাতি।

এই পদকে মুরারি গুপ্তের রচনা বলিয়া ধরিবার কোন কারণ দেখি না। ইহার ভণিতার ধরণ শুধু আলাদা নহে, ভাষাও পৃথক্। গুপ্তদাস বলিয়া একজন পদকর্ত্তার পদ ক্ষণদা গীত-চিন্তামণিতে (৩।২) ধৃত হইয়াছে। তরু ধৃত এ পদটি তাঁহার রচনা হওয়া সম্ভব।

মুরারি গুপ্ত ভণিতাযুক্ত নিম্নলিখিত পদটি জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে স্থান দিয়াছেন—

সখি হে কেন গোরা নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া দিয়া সেই পদছায়া
বঞ্চল এ অভাগিরে কাহে॥
গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ জিউ করে আনচান
স্থির হৈয়া রইতে নারি ঘরে।
আগে যদি জানিতাম পীরিতি না করিতাম
যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে॥
আমি ঝুরি যার তরে সে যদি না চায় ফিরে
এমন পীরিতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহে
যায় ফাটি যায় কিনা বুক॥
মুরারি গুপত কয় পীরিতি সহজ নয়
বিশেষে গৌরাঙ্গ-প্রেমের জ্বালা।
কুল মান সব ছাড় চরণ আশ্রয় কর
তবে সে পাইবা শচীর বালা॥

গৌর-নাগরী ভাবের ঈষৎ আভাষ এই পদের মধ্যে আছে। এখানে লক্ষ্য

করিবার বিষয় এই যে গৌরাঙ্গপ্রভু আকারে প্রকারে কোন রকমে নাগরীর প্রেমে উৎসাহ দিতেছেন না। পরবর্ত্তীকালের নাগরী ভাবের পদে এই গণ্ডী রক্ষা পায় নাই।

মুরারি গুপ্তের পদ রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যাইবে ৭২ সংখ্যক পদে। নায়িকার হইয়া কবি বলিতেছেন 'সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।' তিনি আর ঘরে ফিরিবেন না, তাঁহাকে ঘরে ফিরিতে যুক্তি দেওয়া বৃথা, কেননা তাঁহার আর কোন প্রকার সুখের জন্য প্রত্যাশা নাই। প্রেম করিয়া তিনি যেন সব বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এমন কি নিজের অহং বোধকেও ত্যাগ করিয়াছেন—তিনি 'আপনা খাইয়াছেন' তিনি তো জীবন্তেও মৃত। দয়িতের মোহন রূপ নয়নপুত্তলি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রাণের মতন রাখিয়াছেন। আর প্রেমের আগুনে তিনি জাতি, কুল, শীল বা সুচরিত এবং অভিমান সব কিছু পোড়াইয়াছেন। এ কথা জানে না বলিয়া মূঢ়লোক, যাহারা জীবনে কখনও প্রেমের আস্বাদ পায় নাই, তাহারা নানা কথা বলে, কিন্তু তিনি তাহা কানেও তুলেন না। প্রেমের স্রোতস্বিনীতে তিনি তনু বিসর্জ্জন দিয়াছেন— উহা মাঝ নদী দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, আর নদীর দুই কূলে (পিতৃকুলে ও শ্বশুরকুলে) কুকুরেরা উহা ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু প্রেমের স্রোতে তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন—"কি করিবে কূলের কুকুরে।" মুরারি গুপ্ত জানেন যে এরূপ প্রেম সুলভ নহে, ইহা অনন্যসাধারণ, তাই তিনি জোর দিয়া বলিতেছেন—

মুরারি গুপতে কহে পিরিতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিনলোকে গায়।

চণ্ডীদাসের রাধা কলঙ্কের ভয়ে অস্থির; লোক-গঞ্জনার হাত এড়াইবার জন্য তিনি মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে চান। আর মুরারি গুপ্তের রাধা কুলাচার ও লোকাচারকে দৃপ্তভঙ্গীতে তুচ্ছ করিয়াছেন, জীয়ন্তে মরা হইয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছেন ও তাঁহার প্রেমের অনির্ব্বাণ দীপশিখাকে কালজয়ী করিয়া তুলিয়াছেন। এরূপ একটিমাত্র পদই কবিকে অমর করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

(৩) গোবিন্দ ঘোষ

গোবিন্দ ঘোষ মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষের অগ্রজ (শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান—২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৯-৩৩)। তিন ভাই-ই নবদ্বীপে প্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, তিন জনেই কবি এবং তিন জনেই কীর্ত্তনে পারদর্শী।

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥

(চৈঃ চঃ ১।১০।১১৫)

কীর্ত্তনীয়া হিসাবে হয়তো মাধব ঘোষ আর দুই ভাই অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা বৃন্দাবন দাস তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

সুকৃতি মাধব ঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
তেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥

মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষ শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধেও পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দ ঘোষ বোধ হয় শুধু গৌরাঙ্গ-লীলার পদই লিখিয়াছেন—এ পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রীকৃষ্ণলীলার কোন পদ পাওয়া যায় নাই। গোবিন্দ ঘোষের সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠতা প্রভুর ভাব-প্রকাশের বেশ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ছিল। সে সময়ে কেহ ভাবিতে পারে নাই যে এই চঞ্চল উদ্ধত নিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রেমে নিজে মাতিবেন, জাতিকে মাতাইবেন। কিন্তু তাঁহার অলোকসামান্য রূপ ও প্রীতি আকর্ষণ করিবার সহজাত ক্ষমতা গোবিন্দ ঘোষকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই প্রভু তাঁহার প্রথম বিবাহের পর যখন পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন তখন তাঁহার অনুপস্থিতিতে ক্লিষ্ট হইয়া গোবিন্দ ঘোষ লিখিলেন—

গোরা গেল পূর্ব্বদেশ নিজগণ পাই ক্লেশ
বিলপয়ে কত পরকার।
কান্দে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া শুনিতে বিদরে হিয়া
দিবসে মানয়ে অন্ধকার॥
হরি হরি গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ নাহি সহে।
পুন সেই গোরামুখ দেখিয়া ঘুচিবে দুখ
এখন পরাণ যদি রহে॥

শচীর করুণা শুনি কান্দয়ে অখিল প্রাণী
মালিনী প্রবোধ করে তায়।
নদীয়া নাগরীগণ কান্দে তারা অনুক্ষণ
বসন ভূষণ নাহি ভায়॥
সুরধুনী তীরে যাইতে দেখিব গৌরাঙ্গ পথে
কতদিনে হবে শুভদিন।
চাঁদমুখের বাণী শুনি জুড়াবে তাপিত প্রাণী
গোবিন্দ ঘোষের দেহ ক্ষীণ॥ (তরু ১৫৯৭)

কবি শুধু শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নহে, তাঁহার মাতা ও মাতার সখী, শ্রীবাসের পত্নী মালিনী দেবীর সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। বোধ হয় উভয়ে একই ঘাটে স্নান করিতেন, স্নানের সময় উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হইত, তাই গোবিন্দ ঘোষ বলিতেছেন যে, আবার কবে এমন শুভদিন হইবে যে গঙ্গার তীরে যাইবার পথে গৌরাঙ্গকে দেখিব, তাঁহার চাঁদমুখের দুইটি কথা শুনিব। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গেলে গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ তিন ভাইই তথায় গিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মাধব ও বাসু ঘোষকে গৌড়ে পাঠাইয়া দিলেন। কেবল গোবিন্দ ঘোষ প্রভুর সঙ্গেই রহিয়া গেলেন (চৈঃ চঃ ১।১০।১১৮)।

গোবিন্দ ঘোষের সাতটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে দুইটিতে (১০২৯, ২১৪৬) শ্রীগৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা। প্রথমটিতে গতানুগতিকভাবে আলঙ্কারিক রীতিতে রূপ বর্ণনা থাকিলেও শেষের দিকে কবি ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন—

কহয়ে গোবিন্দ ঘোষ মোর মনে সন্তোষ
নিছনি যাইয়ে হেন বাসি।

দ্বিতীয় পদটি আকারে জাপানী কবিতার মতন ক্ষুদ্র, কিন্তু ভাবে ভরা। শ্রীগৌরাঙ্গের রূপের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

বিনি হাসে গোরা-মুখ হাস।

সুতরাং এখন মুখের ছবিখানি

গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে।
গোরা না দেখিলে বিষ লাগে॥

এই প্রকার ভাবের অভিব্যক্তির মধ্যে গৌর-নাগরী-বাদের আভাষ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

সন্ন্যাসের ঘটনা লইয়া কবি দুইটি পদ রচনা করিয়াছেন (তরু ১৬০৬, ১৬২২)। দুইটি পদেই, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয়টীতে, আন্তরিকতা এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে পাঠককে বিচলিত করিয়া তুলে। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তদের নিকট কিরূপ ভালবাসার ধন ছিলেন তাহা গোবিন্দ ঘোষের এই পদটি হইতে যেমন বুঝা যায়, ঐরূপ ক্ষুদ্রকায় অন্য কোন রচনা হইতে তাহা যায় না—

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পাসরিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥
তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
পরাণ-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন-বিলাস॥
কান্দয়ে ভকত সব বুক বিদরিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া॥

গোবিন্দ ঘোষের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যে ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিয়াছিল আজ সাড়ে চারিশত বৎসরের ব্যবধানেও তাহা আমাদের অন্তরে প্রতিধ্বনি জাগাইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি ভক্তদের অনুরাগ ষোড়শ শতাব্দীতে পদাবলী-সাহিত্য রচনায় অনেক কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। অবশ্য এখানে অনেকটা বীজাঙ্কুর ন্যায়ের মতন ঘটিয়াছিল। বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, আবার অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইলে তাহা হইতে বীজ জন্মে। শ্রীমদ্ভাগবত ও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের প্রেমের সাহিত্য ভক্তদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল; আবার তাঁহাদের জীবনের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া কবিরা রাধাকৃষ্ণের বিরহ ও অনুরাগের চিত্র আঁকিয়াছেন।

(৪) মাধব ঘোষ

পদকল্পতরুতে মাধব ঘোষেরও সাতটী পদ ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে চারটি (২২৭৬—২২৭৮ এবং ২২৮৯) শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবন লইয়া ও তিনটি (৬৬০, ১৫৩৯ ও ১৯২৮) শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। ইহা ছাড়া আরও কিছু পদ তিনি নিশ্চয়ই লিখিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে পীতাম্বর দাস তাঁহার রসমঞ্জরীতে (পৃঃ ৬৩) মাধব ঘোষের এই পদটি ধরিয়াছেন—

উলসিত মঝু হিয়া আজু আয়ব পিয়া
দৈবে কহল শুভবাণী।
শুভসূচক যত নিজ অঙ্গে বেকত
অতয়ে নিশ্চয় করি মানি॥
সজনি সবহু বিপদ দূরে গেল।
সুখ-সম্পদ যত সব ভেল অনুগত
সো পিয়া অনুকূল ভেল।
সব তনু পুলকিত পুছইতে সুন্দরি
রাইক অমিঞা সিনান।
মাধব ঘোষ কহ হৃদয় জুড়ায়ব
তনু ভেল গদগদ মান॥

এটি ভাবোল্লাসের পদ। শ্রীকৃষ্ণ যখন ফিরিয়া আসিবেন, তিনি যখন অনুকূল হইবেন, তখন যত কিছু সুখ ও সম্পদ্ আছে সবই আমার অনুগত হইবে— শ্রীরাধার এই ভাবটির ইঙ্গিত দিয়া কবি ভবিষ্যতের সুখের পটভূমিকায় বিরহিণীর বর্ত্তমানের দুঃখের দুঃসহ ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক রোমাঞ্চ কেন দেখা দিয়াছে, এই কথা সখী জিজ্ঞাসা করিতেই রাধার যেন 'অমিয়া-সিনান' হইল—কেননা প্রিয় আসিবে এই আশা তাহার মনে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পদকল্পতরুধৃত ৬৬০ সংখ্যক পদেও (বর্ত্তমান সঙ্কলনের ১৮৮) মাধব ঘোষের অল্প কথায় যেন ছবি আঁকিবার তুলির দুই একটি আঁচড়ে, এক মনোরম আলেখ্য অঙ্কন করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাত্রির

বিলাসাদির পর উষার আবির্ভাবে শঙ্কিত হইয়া শ্রীরাধা মাধবের নিকট বিদায় লইতেছেন। কিন্তু পরস্পরের মুখের পানে কয়েকবার চাহিতেই উভয়ের হৃদয়ের প্রেমের ক্ষীরসমুদ্র (লবণ সমুদ্র নহে) উথলিয়া উঠিল। শ্রীরাধা মাধবকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া বলিতেছেন, এখন বিদায় দাও মাধব; তোমার প্রেমের বশে ফের আমি আসিব; এখন আর দেখা হইবে না। এই বলিয়া কাতর দৃষ্টিতে শ্রীরাধা মাধবের মুখের পানে চাহিলেন; মাধবও সেইভাবে তাকাইতেই রাধা মূর্চ্ছিতা হইলেন, মাধবও সেইসঙ্গে সংজ্ঞা হারাইলেন। ললিতা অশ্রুপূর্ণলোচনে রাধাকে 'সুমুখি' 'সুমুখি' করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তবুও তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছে না দেখিয়া কবি বলিতেছেন—

কতি গেও অরুণ কিরণ ভয় দারুণ
কতি গেও লোকক ভীত।

তুমি যে লোকলজ্জার ভয়ে সূর্য্য উঠিবার আগেই বাড়ী ফিরিতে চাহিয়াছিলে, সে ভয় তোমার এখন কোথায় গেল? প্রেমে এমন মুগ্ধ হইয়াছ যে, তোমার উদ্ভট চরিত্র আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আমরা গরমের ভয়ে কাতর হই, গ্রীষ্মকাল চলিয়া গেলেই বাঁচি বলি, কিন্তু মাধব ঘোষের যশোদা গ্রীষ্মের আগমনে আনন্দিত হইতেছেন—

গিরিষ-সময় গৃহ মাহ।
যশোমতি হরিষ বাড়াহ॥ (তরু ১৫৩৯)

কেননা গ্রীষ্মকালে প্রাণ ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করিতে পারিবেন, তাঁহার গায়ে সুগন্ধি চন্দন-কস্তুরি লেপন করিতে পারিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ পুথিতে (পৃ. ১৩৭) মাধব ঘোষের ফাগু খেলার একটি নূতন পদ পাইয়াছি। পদটির ধ্বনি-বিন্যাস এমন যে দোলের ছবিটি যেন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে—

যশোদা-নন্দন ফাগু খেলে
বৃষভানু নন্দিনি সঙ্গে রঙ্গে দোলে।
ফাগু ডগমগি অঙ্গ ফাগু ভরিয়ে।
ফাগু সিনান করে রঙ্গিনি রঙ্গিয়ে॥

দোলনা উচায় দোলে রাই বিনোদিয়া।
অরুণ হইল অঙ্গ ফাগু দিয়া দিয়া॥
বড় শোভা হইয়াছে রাঙ্গিয়ে রঙ্গিনি।
কাল অঙ্গে গোরা গায় মিলালো কি জানি॥
রসের হিল্লোলে ভাল দোলে শ্যাম রায়।
হেরিয়া মাধব ঘোষের নয়ান জুড়ায়॥

৫. বাসু ঘোষ

কবি হিসাবে বাসুদেব ঘোষ তাঁহার অগ্রজদ্বয় অপেক্ষা অধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কোন কোন আধুনিক গবেষক মনে করেন যে বাসু ঘোষের পদে কবিত্ব তেমন নাই; তবে মহাপ্রভুর লীলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাঁহার পদের ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর। ইঁহাদের মনে কবিত্ব সম্বন্ধে কি ধারণা আছে জানি না; তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥

বাসু ঘোষের নিমাই-সন্ন্যাসের পদগুলি আজ প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর ধরিয়া গীত হইতেছে এবং সেই গীত শুনিয়া সত্যই পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিরও চক্ষু সজল হয়। বাসু ঘোষ দুই-একটি কথায় শচীমাতার ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অপরিসীম দুঃখের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা উচ্চতম কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। নিমাই ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন এই কথা শুনিয়া শচীদেবী—

আউদড়-কেশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা। (তরু ২২২১)

শচীমাতার এই বিপর্য্যস্ত বসনে ও আউদড় বা আলুলায়িত কেশে ছুটিয়া যাওয়ার মধ্যেই তাঁহার শোকের গভীরতা অনেকখানি প্রকাশ পাইল। বিষ্ণুপ্রিয়া অল্পবয়সী বধূ, অতি বড় শোকেও তিনি বহির্বাটীতে আসিতে পারেন না বা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে পারেন না। তিনি একটি কথায় মাত্র তাঁহার দুঃখ শ্বাশুড়ীকে জানাইয়াছেন—

শয়ন-মন্দিরে ছিলা নিশিভাগে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।

সত্যই বজ্রাঘাত ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে এই শোকের তুলনা করা যায় না। বাসু ঘোষ ইনাইয়া-বিনাইয়া শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ বর্ণনা করেন নাই— শ্রোতা ও পাঠককে তাহা কল্পনা করিয়া লইতে অবসর দিয়াছেন। তিনি শুধু তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে। (তরু ২২২২)

নদীয়ার নাগরীরা বলিতেছেন—

আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি
কেমনে বাঁচিবে বিষ্ণুপ্রিয়া। (তরু ২২২৮)

বাসু ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলার বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের বর্ণনা করিয়া অনেকগুলি পদ লিখিয়াছেন। এই সমস্ত পদই পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ লীলা সম্বন্ধে পদ-রচনায় অনুপ্রেরিত করিয়াছে। দীনবন্ধু দাস সঙ্কীর্ত্তনামৃতে (পৃ. ২) এই শ্লোকটি দিয়াছেন—

শ্রীগৌরচন্দ্র জননাদি সমস্ত লীলা
বিস্তারিতানি ভুবি সর্ব্বরসানি সন্তি।
শ্রীবাসু ঘোষ রচিতানি পদানি যানি
তান্যেব গায়ত বুধাঃ কিল কীর্ত্তনাদৌ ॥

ইহার পর তিনি নিজের ভাষায় লিখিয়াছেন—

বাসু ঘোষ ঠাকুরের বিচিত্র বর্ণন।
শুনিতেই যুড়ায় শ্রোতার কর্ণ মন ॥
গৌরাঙ্গের জন্ম আদি যত যত লীলা।
বিস্তারি অশীতি পদে সকল বর্ণিলা ॥
কীর্ত্তনের আরম্ভে রসের অনুসারে।
গৌরচন্দ্র সেই পদ গাও সমাদরে ॥

বাসু ঘোষ কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধেও কয়েকটি পদ লিখিয়াছেন। ৮১ সংখ্যক পদে প্রেমের প্রভাব সম্বন্ধে বাসু ঘোষ লিখিয়াছেন যে মনের আগুনে পুড়িয়া শ্রীরাধার দশা যেন 'পাকনিয়া পাটের ডোরির' মতন হইয়াছে—বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় যেন কাল দড়ি রহিয়াছে, কিন্তু হাত দিলেই ছাই হইয়া

সব উড়িয়া যায়। বাসু ঘোষ প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া আর কোন ভাষা না পাইয়া বলিয়াছেন 'ডাকাতিয়া পিরিতি', সে সবকিছু লুটিয়া লইয়াছে, নিজের বলিতে আর কিছু রাখে নাই। বঁধুই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়াছেন; তাহাকে সযতনে হৃদয়ে রাখিলেও প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় হয় 'এই বুঝি হারাইলাম'—

তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই।

বাসু ঘোষ 'দানলীলা' লইয়াও পদ বা পালা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার একটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে (১৩৬৯) রক্ষিত হইয়াছে। ঐ পদটিতেও তাঁহার নাটকোচিত ঘটনা সন্নিবেশের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরাধা মথুরায় দুধ-দই বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, কিন্তু নিজে মাথায় করিয়া নহে—দাসীর মাথায় চাপাইয়া। শ্রীরূপ ও রঘুনাথ গোস্বামী যথাক্রমে দানকেলিকৌমুদী ও দানকেলি-চিন্তামণিতে লিখিয়াছেন যে যখন শ্রীরাধা হৈয়ঙ্গবীন বা ঘৃত মাথায় করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে যজ্ঞস্থলে যাইতেছিলেন তখন গোবর্দ্ধনের মানসগঙ্গার তটে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট দান বা চুঙ্গি (Octroi) আদায় করিয়াছিলেন। বাসু ঘোষের রাধা কানুর কথা বলিতে বলিতে পথে চলিতেছেন—

নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
চঞ্চল হরিণী যেন দীগ নেহারে॥

এইরূপে ভাবে চলিতে চলিতে সহসা কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া রাধা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

হোর কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে॥

বাসু ঘোষ কেবল করুণরসই নহে কৌতুকরস পরিবেশনেও যে সুনিপুণ ছিলেন তাহা তাঁহার দানলীলার পদ হইতে বুঝা যায়। তাঁহার ১৩৫টি পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে ধৃত হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত পদ অকৃত্রিম নহে।

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিয়াছেন যে—

অতএব যত মহমহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি বোলে॥ (চৈ. ভা. ১।১০)

কিন্তু বাসু ঘোষ নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের অনুগত ছিলেন; তাই তিনি নিঃসঙ্কোচে লিখিয়াছেন—

আরে মোর রসময় গৌরকিশোর।
এ তিন ভুবনে নাহি এমন নাগর॥ (তরু ২২১১)

৬. গোবিন্দ আচার্য্য

গোবিন্দ আচার্য্য শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। কবি-কর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে শচী ও জগন্নাথ মিশ্রের তত্ত্ব নিরূপণের পরই ইঁহার কথা বলিয়াছেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর বল্লভাচার্য্যের কথা আছে। কবিকর্ণপূরের মতে গোবিন্দ আচার্য্য ব্রজে পৌর্ণমাসী ছিলেন। পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের গুরু সন্দীপন মুনির মাতা। গোবিন্দ আচার্য্য কবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন; তাই কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন—

আচার্য্য শ্রীল গোবিন্দো গীতপদ্যাদিকারকঃ
(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ৪১)

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক দেবকীনন্দন তাঁহার বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিয়াছেন—

গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥

আমার মনে হয় যে এই গোবিন্দ আচার্য্য গোবিন্দ দাস ভণিতা দিয়া পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া বাসু ঘোষের বড় ভাই গোবিন্দ স্বরচিত পদের ভণিতায় গোবিন্দ ঘোষ ভণিতা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দেখাদেখি তাঁহার দুই ভাইও পদের ভণিতায় ঘোষ লিখিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ দাস ভণিতার কয়েকটি খাঁটি বাংলা পদ এই গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে। গোবিন্দ দাস কবিরাজ সাধারণতঃ ব্রজবুলিতে পদ লিখিয়াছেন। যে দুই চারিটি বাংলা পদ তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও অলঙ্কারের সুনিপুণ প্রয়োগ দেখা যায়। গোবিন্দ আচার্য্যের পদ অলঙ্কারবর্জ্জিত, কিন্তু ভাবের গৌরবে মহীয়ান্। ৬২ সংখ্যক পদে কবি কৃষ্ণের নয়নবাণের সন্ধান কি অব্যর্থ তাহা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

তাকিয়া মের‍্যাছে বাণ যেখানে পরাণ

এখানে 'তাকিয়া' শব্দের অর্থ তাক্ করিয়া বা লক্ষ্য করিয়া। ৬৩ সংখ্যক পদেও ঐরূপ নিরাভরণ প্রত্যক্ষ অনুভূতির পরিচয় পাই।

কত না যতনে যদি মুদি দুটি আঁখি।
নবীন ত্রিভঙ্গ রূপ হিয়া মাঝে দেখি॥

৭. পরমানন্দ গুপ্ত

কবিকর্ণপূরের নাম পরমানন্দ দাস সেন ছিল, কিন্তু তিনি বাংলায় কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া জনশ্রুতি নাই। পদকল্পতরুতে পরমানন্দ ভণিতায় যে বারটি পদ দেখা যায়, তাহা এক ব্যক্তির রচনা নহে। ২৯০৬ সংখ্যক পদটির ভণিতায় 'শ্রীরূপমঞ্জরিচরণ হৃদয়ে ধরি' আছে। মঞ্জরিভাবের সাধনা বৃন্দাবনে প্রচারিত হইবার পর ইহা রচিত হইয়াছিল। ১৬৯৩, ২১২০, ২৫২৮ প্রভৃতি পদ নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী অন্য কোন পরমানন্দ রচনা করিয়াছেন, কেননা এই পদ কয়টিতে প্রত্যক্ষদর্শীর অনুভব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পরমানন্দ হইতেছেন পরমানন্দ গুপ্ত, যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সম্বন্ধে গীতাবলী লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে জয়ানন্দ বলেন—

সংক্ষেপে করিলেন তিহঁ পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গ-বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় (১৯৯) ইঁহার সম্বন্ধে আছে 'পরমানন্দ গুপ্তো যৎকৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী'। তাহা হইলে ইনি গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা দুই-ই লিখিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিয়াছেন যে ইঁহার বাড়ীতে নিত্যানন্দ কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন—

প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয়॥ (৩।৬)

কৃষ্ণদাস কবিরাজও ঐ উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া লিখিয়াছেন—

পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি। (চৈ. চ. ১।১১)

পরমানন্দ গুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া গদাধরকে রাধা রাধা বলিয়া আলিঙ্গন করার ভাবটি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন (শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—২য় সং, পৃ. ৪৭-৪৮)। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন

নবদ্বীপে ভাব প্রকাশ করিতেছেন তখনও যে রস-কীর্ত্তন বা লীলা-কীর্ত্তন প্রচলিত ছিল তাহার ইঙ্গিত এই পদটিতে পাওয়া যায়। কবি বলিতেছেন—

কেহো বলে সাবধান না করিহ রসগান
উথলিয়া না ধরে ধরণী। (তরু ২১২০)

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ এখন যদি আবার রসগান শুনেন তাহা হইলে তাঁহার ভাবসমুদ্র এমনই উথলিয়া উঠিবে যে তাহাতে পৃথিবী বুঝি ভাসিয়া যাইবে ; সুতরাং এখন রসগান করিওনা ।

পরমানন্দ গুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের পর বিলাপ করিয়া একটি পদ রচনা করিয়াছিলেন—

কি করিলা গোরাচাঁদ নদিয়া ছাড়িয়া।
মরয়ে ভকতগণ তোমা না দেখিয়া॥
কীর্ত্তন-বিলাস আদি যে করিলা সুখ।
সোঙরি সোঙরি সভার বিদরয়ে বুক॥
মুরারি মুকুন্দ না জিয়ব শ্রীনিবাস।
আচার্য্য অদ্বৈত ভেল জীবন নৈরাশ॥
নদিয়ার লোক সব কাতর হইয়া।
ছটফট করে প্রাণ তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে পরমানন্দ দন্তে তৃণ ধরি।
একবার নদিয়া চল প্রভু গৌরহরি॥ (তরু ১৬৯৩)

এখানে বিশেষ করিয়া চারজন ভক্তের দুঃখের কথা বলা হইয়াছে। অদ্বৈত, শ্রীনিবাস বা শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত ও মুকুন্দ দত্ত। ইঁহাদের মধ্যে শেষোক্ত দুইজন কবি।

৮. মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্ত

মুকুন্দ নামে শ্রীচৈতন্যের কয়েকজন পার্ষদ ছিলেন। যথা, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের বড় ভাই মুকুন্দ দাস, নবদ্বীপের মুকুন্দ সঞ্জয়, যাঁহার বাড়ীতে প্রভু প্রথম টোল খোলেন ; মুকুন্দ দত্ত যিনি বাসুদেব দত্তের ভাই ও প্রভুর সহাধ্যায়ী। শেষোক্ত মুকুন্দের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥ (১।১০।৪০)

ইঁহার বড় ভাই বাসুদেব দত্তও পরম ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু ইঁহাকে বলিয়াছিলেন—

যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হইতে।
তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে॥ (চৈ. চ. ২।১১।১৩৮)

মুকুন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে পুরীতে গিয়াছিলেন। বাসুদেব দত্তও শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে পুরীতে কিছুকাল ছিলেন—

বাসুদেব দত্ত বন্দো বড় শুদ্ধভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে॥
(দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা ২৬)

ইঁহাদের উপাধি দত্ত হইলেও জাতিতে ইঁহারা বৈদ্য ছিলেন, কেননা কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যে (১৭।৩২) বাসুদেবকে 'ভিষগৃষভ' বলিয়াছেন। দুই ভাই-ই কীর্ত্তনে পারদর্শী ছিলেন। কবিকর্ণপূর বলেন বাসুদেব দত্ত শ্রীকৃষ্ণলীলায় মধুব্রত নামক গায়ক ছিলেন (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা)। আমার মনে হয় দুই ভাই-ই পদ রচনা করিয়াছেন। মুকুন্দ ভণিতায় যে পদটি সংকীর্ত্তনামৃতে পাইয়া এই সঙ্কলনে (২৪) দিয়াছি তাহা খুব সম্ভব মুকুন্দ দত্তের রচনা। মুকুন্দ ভণিতাযুক্ত অন্য কোন পদ এ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই। বাসুদেব দত্তের ভণিতায় নিম্নলিখিত পদটি ক্ষণদাগীত-চিন্তামণিতে পাওয়া যায়—

অপরূপ গোরা নটরাজ।
প্রকট প্রেম- বিনোদ নব নাগর
বিহরে নবদ্বীপ মাঝ॥
কুটিল কুন্তল গন্ধ পরিমল
চন্দন তিলক ললাট।
হেরি কুলবতী লাজ-মন্দির—
দুয়ারে দেওই কপাট॥

করিবর-কর জিনি বাহুর স্ববলনি
দোসরি গজ-মতি-হারা।
সুমেরু-শিখর যৈছন ঝাঁপিয়া
বহই সুরধুনী-ধারা ॥
রাতুল অতুল চরণ যুগল
নখ-মণি বিধু উজোর।
ভকত ভ্রমরা সৌরভে আকুল
বাসুদেব দত্ত রহু ভোর ॥

(ক্ষণদা ২২।১)

পদটি পদকল্পতরুতে (২৯২৫) গোবিন্দ দাস ভণিতায় মুদ্রিত হইয়াছে। বৈষ্ণবদাস বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অপেক্ষা ২।৩ পুরুষ পরে তরুর সঙ্কলন করেন। সেইজন্য চক্রবর্ত্তী পাদের সঙ্কলনে প্রদত্ত ভণিতাই প্রামাণ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বাসুদেব দত্তের অন্য কোন পদ পাওয়া যায় নাই; তিনি যে কবি ছিলেন একথারও কোথাও নাই।

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বিবরণে' লিখিয়াছেন যে বল্লভ ঘোষের নয়টি পুত্রের মধ্যে ছয়জন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব, মুকুন্দ এই চারিজন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পার্ষদ ও পদকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত।' বৈষ্ণব সাহিত্যে বাসু ঘোষদের তিন ভাইয়ের নামই আছে; মুকুন্দ ঘোষের নাম নাই। যাহা হউক মুকুন্দ নামে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক একজন পদকর্ত্তা যে ছিলেন তাহা বসু মহাশয়-সংগৃহীত জনশ্রুতি হইতে প্রমাণিত হইল।

৯. শঙ্কর ঘোষ

পদকল্পতরুতে শঙ্কর ঘোষের কোন পদ নাই। কিন্তু ক্ষণদাগীত-চিন্তামণিতে এই কবির দুইটি পদ ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩০।২ সংখ্যক পদটি এই সঙ্কলনের ১৭ সংখ্যক পদ রূপে দেওয়া হইল। শ্রীবাস-অঙ্গনে নিত্যানন্দের নৃত্য দেখিয়া পদটি লেখা। নিতাই যে মল্লবেশ ধারণ করিয়া থাকিতেন তাহা এই পদটি হইতে জানা যায়। বৃন্দাবন দাসও বলেন—

পরম মোহন সঙ্কীর্ত্তন মল্ল-বেশ ॥
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ। (৩৷৫)

পদটিতে যেভাবে শ্রীবাস, মুকুন্দ, গদাধর ও অভিরাম ঠাকুরের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ থাকে না যে ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনাতে ইঁহার সম্বন্ধে আছে—

শ্রীশঙ্কর বন্দো বড় অকিঞ্চন রীতি।
ডম্ফের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি ॥

কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় (১৪২) বলিয়াছেন—

পুরাসীদ্যো ব্রজে নাম্না মৃদঙ্গী শ্রীসুধাকরঃ।
স শ্রীশঙ্কর ঘোষোঽস্য ডম্ফবাদ্য বিশারদঃ ॥

শঙ্কর ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব বর্ণনা করিয়া নিম্নলিখিত পদটি লিখিয়াছেন—

দেখ দেখ সুন্দর শচী-নন্দনা।
আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা ॥
ময়মত্ত হাতী ভাতি গতি চলনা।
কিয়ে মালতী-মালা গোরা-অঙ্গে দোলনা ॥
শারদ-চাঁদ জিনি সুন্দর-বয়না।
প্রেম-আনন্দ-বারি-পূরিত নয়না ॥
সহচর লই সঙ্গে অনুখন খেলনা।
নবদ্বীপ মাঝে গোরা হরি হরি বলনা ॥
অভয় চরণারবিন্দে মকরন্দ-লোভনা।
কহয়ে শঙ্কর ঘোষ অখিল-লোক-তারণা ॥ (২৪।১)

১০. গৌরীদাস

গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিখ্যাতি এখন খুব কমই শোনা যায়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীত প্রবন্ধে যাঁর পদে পদে ধ্বনি ॥ (পৃ. ৩)

ইনিই সর্ব্বপ্রথমে অম্বিকা-কালনায় গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের এত অন্তরঙ্গ ছিলেন যে কবি-কর্ণপূর

ইঁহাকে কৃষ্ণলীলার সুবল সখা বলিয়াছেন (গৌ. গ. দী. ১২৮)। গৌরীদাসের বড় ভাই সূর্য্যদাস সারখেলের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবী দেবীকে নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করিয়াছিলেন।

হাটপত্তনের পদ রচনার ইনিই বোধ হয় প্রবর্ত্তক। সেকালে রাজা-জমীদারেরা হাট বসাইতেন। হাটে যাহারা জিনিষ বেচিতে আসিত তাহাদিগকে কর দিতে হইত। কর আদায় করিবার জন্য কর্ম্মচারী থাকিত। তাহার হিসাব রাখিত মুন্সি। কর যদি কেহ না দিত তাহাকে কোতোয়াল শাস্তি দিত। সুতরাং হাটে রাজার কোতোয়ালও উপস্থিত থাকিত। এই অর্থনৈতিক বিষয় লইয়া প্রেমধর্ম্ম-বিতরণের প্রথম পদ লিখিয়াছেন গৌরীদাস।

পহু মোর নিত্যানন্দ রায়।
মথিয়া সকল তন্ত্র হরি-নাম মহামন্ত্র
করে ধরি জীবেরে বুঝায়॥
চৈতন্য-অগ্রজ নাম ত্রিভুবন-অনুপাম
সুরধুনী-তীরে করি থানা।
হাট করি পরবন্ধ রাজা হৈলা নিত্যানন্দ
পাষণ্ডী-দলন বীর-বানা॥
রামাই সুপাত্র হৈয়া রাজ-আজ্ঞা চালাইয়া
কোতোয়াল হৈলা হরিদাস।
কৃষ্ণদাস হৈলা দাড়্যা কেহো যাইতে নারে ভাঁড়্যা
লিখন পড়ন শ্রীনিবাস॥
পসরিয়া বিশ্বম্ভর আর প্রিয় গদাধর
আচার্য্য-চত্বরে বিকিকিনি।
গৌরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনি॥

(তরু ২৩১৩)

থানা মানে আড্ডা। কৃষ্ণদাস বলিতে এখানে নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ ভক্ত কালা কৃষ্ণদাস। তিনি দাড়্যা অর্থাৎ দাড়ীপাল্লা লইয়া জিনিষ মাপিতে

লাগিলেন। বোধ হয় ওজন হিসাবে জিনিষের উপর কর লওয়া হইত; তাই গৌরীদাস বলিতেছেন কেহ ভাঁড়াইয়া অর্থাৎ ফাঁকি দিয়া যাইতে পারে না। আজকালও হাটে বেশী পরিমাণ জিনিষ ওজন করিবার জন্য এক শ্রেণীর স্বতন্ত্র লোক থাকে, তাহাদিগকে ওজন করিবার জন্য পয়সা দিতে হয়। শ্রীনিবাস বা শ্রীবাস মুন্সী হইলেন। অদ্বৈত হইলেন হাটের দোকানঘরের মালিক। সেই ঘর ভাড়া লইয়া বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ও গদাধর জিনিষ বেচাকেনা করিতে লাগিলেন। এই পদটি কোথাও কোথাও বলরাম ও ধনঞ্জয় ভণিতায় দেখা যায়—

বসু বলরাম বলে অবতার কলিকালে
জগাই মাধাই হাটে আসি;
ভাণ্ড হাতে ধনঞ্জয় ভিক্ষা মাগিয়া লয়;
হাটে হাটে ফিরয়ে তপাসি॥

বলরাম বসু নামে কোন পদকর্তার অস্তিত্বের কথা জানা নাই।

রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য রায়শেখর যে হাট পত্তন লেখেন তাহাতে আছে (তরু ২১৯৯) নরহরি সরকার ও শ্রীনিবাস হইলেন হাটের বিশ্বাস বা প্রধান কার্য্যকারক, অদ্বৈত হাটের মুন্সী। হরিদাস, রামানন্দ, সত্যরাজ প্রভৃতি হাটের বিক্রেতা। অন্যান্য পসারির মধ্যে আছেন গদাধর, রায় রামানন্দ, মুরারি, মুকুন্দ, বাসুদেব, সুলোচন, সনাতন, রূপ, স্বরূপ দামোদর, বসু রামানন্দ, সেন শিবানন্দ, বক্রেশ্বর, শঙ্কর পণ্ডিত, কাশীশ্বর, মুকুন্দ, মাধব দাস, রঘুনাথ প্রভৃতি। তাঁহার হাটের কোটাল হইতেছেন ঠাকুর গোপাল, দান লন গোপীনাথ, আর হাট পালন করেন তাঁহার গুরু শ্রীরঘুনন্দন। এ হাট শুধু দিনের বেলায় বসে না, রাত্রিতেও বেচাকেনা চলে।

প্রেমের পসার করল বিথার
শচীর দুলাল রায়॥

এই হাট হওয়ার দরুণ, দুর্ভিক্ষ (প্রেমের) দূর হইল—

ভাঙ্গিল আকাল মাতিল কাঙ্গাল
খাইয়া ভরল পেট।

দেখিয়া শমন করয়ে ভাবন
বদন করিয়া হেট ॥

যমের দুঃখ এই যে প্রেম পাইয়া সকলেই তো বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইবে, তাঁহার নরক খালি থাকিবে।

পদকল্পতরুধৃত (১৬১ ও ২৩১৩) এই দুইটি পদ ছাড়া গৌরীদাসের আর কোন পদ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

১১. শিবানন্দ সেন

শিবানন্দ ভণিতায় যে সব পদ পাওয়া যায় তাহা কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ার কবি-কর্ণপূরের পিতা শিবানন্দ সেনের রচনা। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী বৃন্দাবনে ভজন-সাধন করিতেন। তিনি পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যের সহচরগণের মধ্যে যাঁহারা বাংলায় পদ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই রাঢ়-গৌড়ে বাস করিতেন। রূপ-সনাতন, শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি যাঁহারা বৃন্দাবনে বসিয়া ভজন করিতেন তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ভক্তি-ধর্ম্মকে সর্ব্ব-ভারতীয় ধর্ম্মরূপে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের রচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও প্রথমে সংস্কৃতে গোবিন্দলীলামৃত রচনা করেন ও শেষ বয়সে বাংলায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখেন। ষোড়শ শতকে শ্রীবৃন্দাবন বাংলা সাহিত্যের রচনার কেন্দ্র হইয়া উঠে নাই। এত কথা বলিবার কারণ এই যে হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে (পৃ ১৬১৩) অনুমান করিয়াছেন যে, শিবানন্দ ভণিতায় যে সব পদে 'পঁহু' শব্দ পাওয়া যায় সেগুলি বাংলা দেশে শিবানন্দ সেন কর্তৃক রচিত না হইয়া বৃন্দাবনে শিবানন্দ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা লিখিত হইবার সম্ভাবনা অধিক। প্রভু শব্দের স্থানে 'পঁহু' দেখিলেই যদি পদের রচয়িতাকে বৃন্দাবনবাসী বলিতে হয়, তাহা হইলে বাসু ঘোষ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি অধিকাংশ বাঙালী কবিকেই বৃন্দাবনের অধিবাসী বলিতে হয়। বাবাজী মহাশয়ের আর একটি যুক্তি এই যে পদকল্প-তরুর ২৩৫৫ সংখ্যক পদের প্রারম্ভে যেহেতু

'জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি
যার কৃপা-বলে সে চৈতন্য-গুণ গাই'

আছে, সেই হেতু এটি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (১।১০) মূল স্কন্ধশাখায় যাঁহাদের নাম আছে তাঁহারা প্রায় সকলেই গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর কৃপা পাইয়াছিলেন। শিবানন্দ সেনও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু-স্থানে যাইতে সবে লয় যাঁর সঙ্গ॥
প্রতি বর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া॥

(চৈ. চ. ১।১০)

শিবানন্দ সেনের তিনটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে—দুইটি শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক ও একটি মাথুর বিরহের। শিবাই দাস ভণিতার যে ছয়টি পদ উহাতে আছে তাহা অন্য কোন পদকর্ত্তার রচনা। শিবা-ভণিতাযুক্ত পদটিও শিবানন্দ সেনের লেখা নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ পুথিতে (পৃ. ৯৪) শিবানন্দের রচিত শ্রীরাধার মুরলী শিক্ষার এই সুন্দর পদটি পাইয়াছি।

কৌতুকে মুরলি শিখে রসবতী রাধা।
মদনমোহন-মনমোহিনী সাধা॥
প্রেমবশে শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
মুরলি পূরয়ে রাই ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
বিনা তন্ত্রে বিনা মন্ত্রে কত ফুক দেই।
বাজে বা না বাজে বাঁশি মুখ পিয়া চাই॥
রাধার অধরে বেণু ধরে বনমালি।
পানিপঙ্কজ ধরিয়া লোলায় অঙ্গুলি॥
কানু কোলে কলাবতি কেলির বিলাস।
দুহুক রস হেরি শিবানন্দ ভাষ॥

১২. বসু রামানন্দ

বসু রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচয়িতা মালাধর বসুর বংশধর। কবিকর্ণপূর ইঁহাকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৯।২) 'গুণরাজান্বয়' বলিয়াছেন। পূর্ব্বেই গোবিন্দ ঘোষের পদ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি

বাসুদেব রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পহু নরহরি সঙ্গে॥

এই পদ্যাংশ হইতে জানা যায় যে রামানন্দ বসু নবদ্বীপেই শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ভক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার বাড়ী কুলীনগ্রামে—পূর্ব্ব রেলপথের নিউ কর্ড লাইনের জৌগ্রাম ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় 'বসুদেবসুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' লিখিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত।
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥

(চৈ. চ. ২।১৫)

রামানন্দ বসু ভণিতায় ৭টি পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি নবদ্বীপলীলায় গৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণবিরহের (১৯২৪), একটি সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের ভাব বর্ণনা (২০৮২), একটি নিত্যানন্দের নৃত্য বর্ণনা আর চারটি পদ শ্রীকৃষ্ণলীলার পূর্ব্বরাগ, রূপানুরাগ, কুঞ্জভঙ্গ ও যুগলমিলন বিষয়ক। শ্রীচৈতন্য যে শুধু ভাবাবেগে নৃত্য ও গান করিতেন তাহা নহে—

হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥ (তরু ২০৮০)।

রামানন্দ বসুর এই কথা শ্রীরূপগোস্বামীও পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিবার সময় তাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিত ও উচ্চারিত নামের গণনার জন্য গ্রন্থীকৃত কটিসূত্র তাঁহার বামহস্তে শোভা পাইত (স্তবমালা ১।৫)। বর্ত্তমান সঙ্কলনের পঞ্চম সংখ্যক পদটি পদকল্পতরু বা

অন্য কোন সঙ্কলনগ্রন্থে ধৃত হয় নাই, কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে এটি পাওয়া যায়। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন মাধুর্য্য ও প্রভুর সঙ্গী হিসাবে ঘোষভ্রাতৃত্রয় ও মুকুন্দদত্তের নাম উল্লেখ করিয়া রামানন্দ বসু বলিতেছেন—

রঙ্গিয়া ঢঙ্গিয়া সে অমিয়া-রসে ভোর।
বসু রামানন্দ তাহে লুব্ধ চকোর॥

শুধু রামানন্দ ভণিতায় পদকল্পতরুতে যে ১১টি পদ আছে, তাহা রামানন্দ বসুর রচনা নহে। কেননা উহার মধ্যে দুইটি পদে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত হইবার কথা আছে।

কহে দীন রামানন্দে এ হেন আনন্দ কন্দে
বঞ্চিত রহিলু মুঞি এক।

আবার অপর পদটিতেও—

দিন-হিন রামানন্দ তহিঁ বঞ্চিত
কিঞ্চিত পরশ না ভেল॥

দুইটি পদেই রামানন্দের বিশেষণ 'দীন', বসু নহে।

রামানন্দ বসুর ২টি পদ সংকীর্ত্তনামৃতে ধৃত হইয়াছে—ঐ পদ দুইটি পদকল্পতরুতে নাই। প্রাচীন পুথির মধ্যে তাঁহার অনেক পদ এখনও লুক্কায়িত আছে।

বসু রামানন্দ একজন উঁচুদরের কবি। শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ অঙ্কন করিতে যাইয়া তিনি যে অপূর্ব্ব স্বপ্নময় পরিবেশ সৃজন করিয়াছেন তাহার তুলনা মেলা ভার। শ্রীরাধা অতি গোপনে সখীকে তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতেছেন।

শাওন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বাস।
শ্যাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন॥ (৭১)

শ্রাবণমাসের মেঘলা দিন, রিম ঝিম করিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, সেই প্রায়ান্ধকার দিবসে শ্রীমতী বিপর্য্যস্ত বসনে নিদ্রা যাইতেছেন; এমন সময় এক শ্যামল পুরুষ যেন স্বপ্নের মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব প্রচারিত হইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রামানন্দ বসু শ্রীরাধার

অবচেতন মনের গোপন বাসনা স্বপ্নের আকারে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। একটি কথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের কি অনুপম প্রকাশ—

আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন যাচিয়া বিকাই।

শ্রীকৃষ্ণ সাধিয়া সাধিয়া যেন নিজেকে বেচিয়া দিতেছেন—তিনি প্রেম ছাড়া আর অন্য কোনপ্রকার মূল্য চাহেন না।

বসু রামানন্দ যেমন মধুর রসের পদরচনায় দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তেমনি বাৎসল্যরসের। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইবেন, মা যশোদা তাঁহার কপালে চূড়া বাঁধিয়া দিতে দিতে অনেক প্রকার রক্ষামন্ত্র পড়িতেছেন—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কোন আপদ বিপদ না হয়। বিদায় দিবার সময় মা কেবল কৃষ্ণ-বলরামের পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকেন—

রামপানে চায় রাণী শ্যামপানে চায়।
কি বল্যা বিদায় দিব মুখে না ব্যারায়॥ (২২)

সখ্যরসের চিত্রও তিনি অসাধারণ পটুতার সহিত অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাথার চূড়ায় বকুলমালা, তাহার সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া লাখ লাখ অলি আসিয়াছে। সখারা শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য হাতে এক একখানি গাছের ছোট ডাল লইয়া বাতাস করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের যাহাতে কোন-রূপ কষ্ট না হয়, সেজন্য

"শ্রীদাম করে পদসেবা সুবল ধেনু রাখে।"

আবার অন্যান্য সখাদের মধ্যে—

"কেহো জল কেহো ফল আনিয়া জোগায়।
বসু রামানন্দ দাস অনুগত চায়॥ (৩১)।

(১৩) বংশীবদন

পদকল্পতরুতে বংশীবদন ভণিতায় ২৫টি, বংশীদাস ভণিতায় ৮টি ও বংশী ভণিতায় ৯টি পদ আছে। কিন্তু এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের নাম থাকা সত্ত্বেও তিন নাম একই কবির, কেননা একই পালার বিভিন্ন পদে বিভিন্ন প্রকার ভণিতাযুক্ত নাম পাওয়া যায়। কৃষ্ণ রাধিকার মান ভাঙ্গাইবার জন্য

নারীবেশ ধারণ করিলেন, তরুর ৫৪৪ সংখ্যক এই পদের ভণিতায় বংশীবদন নাম আছে ; তাহার পূর্ব্বে কি হইয়াছিল ও পরে কি হইল তাহা বংশী ভণিতায় ৫৪৩, ৫৪৫ ও ৫৪৬ সংখ্যক পদে আছে। পদচারিটিতে সামান্ত দু'চারিটি ব্রজবুলির ব্যবহার দেখা যায়। ভাবে ও ভাষায় এই চারিটি পদ এক জাতীয়—এক কবির রচনা। তরুর ১৪১৯ সংখ্যক পদে গোপীরা নাবিকরূপী কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। পদটির ভণিতায় বংশীবদন নাম আছে। ১৪২০ সংখ্যক পদ ঐ পালারই অনুসরণ, ভণিতা বংশী ; ১৪২১ সংখ্যক পদেও ঐ পালার ঘটনা চলিতেছে, ভণিতা বংশীদাস। দানের পদেও ঐরূপ দেখিতে পাই। ১৩৮৫, ১৩৮৮ তে বংশীবদনের দানের পদ, ১৩৯০ পদও তাই, ভণিতা বংশীদাস। সুতরাং একজন কবিই ছন্দের অনুরোধে তিন প্রকার নামে ভণিতা দিয়াছেন।

এই কবি বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এই কথা নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে (পৃঃ ১২২-২৩) লিখিয়াছেন। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পাত্র ছিলেন বলিয়া ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপূর গৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় নরহরি সরকার ও গোপীনাথ আচার্য্যের পর এবং রূপসনাতনের পূর্ব্বে ইঁহার নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"বংশী কৃষ্ণপ্রিয়া যাসীৎ সা বংশীদাস ঠকুরঃ" (১৭৯)। সুতরাং এই বংশীদাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য বংশীদাস হইতে পারেন না। মহাপ্রভুর পরিকর বংশীবদন গৌরাঙ্গলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া যে পদ লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার ভণিতা দিবার ধরণ হইতে বুঝা যায়। পদকল্পতরুধৃত ১৮৫৫ সংখ্যক পদটি এই—

আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা-তিলক-কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়ন-খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে
ভকত-চাতক লৈয়া।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চায়া॥

আর কি দু ভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঞি।
নিমাই করিয়া ফুকরি সদাই
নিমাই কোথায় নাই॥
নির্দ্দয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ-সুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌর রায়।
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিতে
বংশী গড়াগড়ি যায়॥

শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া সমবেদনায় গড়াড়ড়ি যাইবার কথা তিনিই লিখিতে পারেন যিনি প্রভুর পরিবারে রক্ষক হইয়া বাস করিতেন। অন্য একটি পদে (তরু ২৮৫১) কবি শ্রীগৌরাঙ্গের গোষ্ঠের ভাব দেখিয়া লিখিয়াছেন—

ধবলি শাঙলি বলি করয়ে ফুকার।
পূরল পুলকে অঙ্গ বহে প্রেমধার॥
কালিন্দি যমুনা বলি প্রেমজলে ভাসে।
পূরব পড়িল মনে কহে বংশীদাসে॥

ষোড়শ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে বংশীবদনের স্থান, নরহরি বলরামদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও নরোত্তম ঠাকুরের সমপর্য্যায়ে। ইনি সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের পদরচনায় সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বালগোপাল নৃত্য করিতেছেন, তাহা দেখিয়া ব্রজরমণীদের মনে এমন বাৎসল্যভাব জাগিতেছে যে—

হেরইতে পরশিতে লালন করইতে
স্তন-খিরে ভীগল বাস॥ (তরু ১১৫৪)

মা যশোদা যে নবনীত দিয়াছেন তাহা গোপাল না খাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে

বলিয়া মা নিজের অভাগ্যের জন্য বিলাপ করিতেছেন।

বংশী কহয়ে শুন মাত যশোমতি
তোহারি চরণে করোঁ সেবা।
এ তুয়া নন্দন ভুবন-বিমোহন
পুণ-ফলে পাওই কেবা॥ (তরু ১১৫৫)

বালগোপালের নৃত্যের শ্রেষ্ঠ পদ হইতেছে তরু ১১৫৬। ইহাতে ছন্দের তালে তালে যেন নন্দদুলালের নৃত্যের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

রুনুর ঝুনুর ধ্বনি ঘাঁঘর কিঙ্কিণী
গতি নট খঞ্জন-ভাতি।
হেরইতে অখিল— নয়ন মন ভুলয়ে
ইহ নব-নীরদ কাঁতি॥

বংশীবদনের গোষ্ঠলীলার পদকয়টি বলরামদাসের পদের পাশাপাশি স্থান পাইবার যোগ্য। পদকল্পতরুতে বংশীবদনের গোষ্ঠলীলার একটি মাত্র পদ (১১৯৪) আছে। পদটিতে সখাগণের সঙ্গে গোষ্ঠে যাইয়া কৃষ্ণবলরামের খেলার সুন্দর বর্ণনা আছে।

কেহ হাতী ঘোড়া হয় রাখাল রাখালে বয়
কেহো নাচে কেহো গায় গীত।
কেহো বায় শিঙ্গা বেণু বনে রাজা হইল কানু
বলাই হইলা তার মীত॥

বলাই কৃষ্ণের মীত বা আমাত্য হইলেন। সংকীর্ত্তনামৃতে (১৩৬) আর একটি চিত্তাকর্ষক পদ পাওয়া যায়।

গরুয়া চরাওত বেণু বাজাওত
কাহ্নু কালিন্দী-তীরে।
ধবলি শ্যামলি বলি দীগ নেহারই
গরজই মন্দ গভীরে॥
শ্রুতি অবতংশ অংস পরিলম্বিত
মুরলী অধর সুরঙ্গে।

চরণে নাম্যাছে পীত ধড়ার অঞ্চল
গোধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে ॥
ব্রজ-শিশু সঙ্গে রঙ্গে বনে ধাবই
মত্ত সিংহ গতি গমনে।
ও চান্দ-মুখের ঘাম বাম করে মোছই
রহই লগুড় হেলনে ॥
ঘামে তিতিল চারু শ্যাম কলেবর
তিতিল পীত নীচোল।
প্রতি তরু ছায় তায় ঘন বৈঠত
ঘামে তিতিল কপোল ॥
উচ্চ শ্রবণ করি ধেনু সব ধাওত
চাহত ছল ছল দীঠে।
বংশীবদন কহে কাহ্নু মুখ হেরি হেরি
পুচ্ছ নাচাওত পীঠে ॥

রৌদ্রের মধ্যে গোরু চরাইতে চরাইতে শ্রীকৃষ্ণের মুখে যে ঘাম দেখা দিয়াছে, তাহাতে কবির মনে অপরিসীম বেদনা জাগিয়াছে। তাই তিনি নানাভাবে তাহার বর্ণনা করিতেছেন আর বলিতেছেন যে যেখানে একটু গাছের ছায়া পাওয়া যাইতেছে, সেইখানেই একটু একটু জিরাইয়া লইতেছেন। কানাইয়ের কষ্ট দেখিয়া ধেনুদের মনেও দুঃখ হইতেছে, তাই—তাহারা

চাহত ছল ছল দীঠে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখের সৌন্দর্য্য সব দুঃখ ভুলাইয়া দেয়, সেইজন্য তাহারা "পুচ্ছ নাচাওত পীঠে।" গোরুর সঙ্গে মানুষের সমপ্রাণতা এবং গোরুর ভাব প্রকাশের এই ছবিটি সমগ্র পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য।

বংশীবদনের পূর্ব্বরাগের বর্ণনার মধ্যে মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীরাধা শ্যামকে দেখিয়া কেমন করিয়া ভুলিলেন তাহা সখীকে বলিতেছেন—

তেমাথা পথের ঘাট সেখানে ভুলিলুঁ বাট
কালামেঘে ঝাপাদিল মোরে। (তরু ১২১)

ক্ষণদায় এখানে পাঠ আছে—"তিমিরে ঝাঁপিয়া দিল মোরে" (৩।৫)
বড়াই ইহার উত্তরে বলিলেন—

তখনি বলিলুঁ তোরে যাইস না যমুনা-তীরে
চাইস্ না সে কদম্বের তলে।
তুমি এখন কেন বা বোল শুন গো বড়িমাই
গা মোর কেমন কেমন করে॥

শ্রীকৃষ্ণের এমনই অদ্ভুত শক্তি যে

আন সনে কথা কয় আন জনে মুরুছায়
ইহা কি শুন্যাছ সখি কাণে। (তরু ১২২)

একজনের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণ অপাঙ্গ দৃষ্টিতে একবার অন্যের প্রতি তাকাইতেই সে সম্বিত হারাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

অন্য একটি পদে (ক্ষণদা ৬।৪) আছে—

যে ধনী তাহার নয়, সে তারে দেখিলে।
শ্রবণে মকর-কুণ্ডল মন ধরি গিলে॥

ব্যঞ্জনার দ্বারা ভাবপ্রকাশে বংশীবদন সিদ্ধহস্ত। পূর্ব্বরাগে রাধার অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা বলিতে যাইয়া কবি বলিতেছেন—

ডাকিলে রাধা সমতি না দে।
আঁখি কচালে সদা কাঁদে॥
মনে ঘর দুয়ার না ভায়।
জুড়ায় কদম্বতলার বায়॥
বংশীবদনে কহে তথাই নিয়ে।
চাহিতে চিন্তিতে রাই বা জীয়ে॥
(ক্ষণদা ৩।৩)

রাধা ডাকিলে সাড়া দেয় না, তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু শুধু শুধু কাঁদিলে লোকে কি বলিবে, তাই ভাবিয়া যেন চোখ চুলকাইতেছে, ছল করিয়া চোখ কচলাইয়া কাঁদে। তাহার মনে ঘর দুয়ার কিছুই ভাল লাগে না; কেবল কদম্বতলার বাতাস পাইলে তাহার দেহ ও মন জুড়ায়—কেন না কদম্বতলাতেই যে তাহার সঙ্গে কানাইয়ের দেখা হইয়াছিল। কবি রাধার

প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া বলিতেছেন, এমনই যদি হয়, তাহা হইলে না হয় তাহাকে কদম্বতলাতেই লইয়া যাই, সেখানে গেলে যদি বা তাহার প্রাণ রক্ষা পায়।

বসু রামানন্দ শ্রীরাধার স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের চুম্বনলাভের বর্ণনার সঙ্গে বংশী-বদনের এই পদটি (গীত চন্দ্রোদয় পৃঃ ২৬১) তুলনীয়।

কি পেখিনু নিশির স্বপনে।
এক পুরুষবর তনু নব জলধর
হাসিয়া করয়ে আলিঙ্গনে॥
শরদ পূর্ণিমা চান্দ জিনিয়া বদন ছান্দ
মোর ঘরে করিয়া প্রবেশে।
মধুর মধুর বোলে যৈছন অমিয়া ঝরে
মুখে মুখ দিয়া পুন হাসে॥
নবীন তুলসী দাম গাঁথা অতি অনুপাম
আজানুলম্বিত গলে দোলে।
মাথায় বিনোদচূড়া মালতী মালায় বেড়া
শিখিপুচ্ছ ঝলমল করে॥
কপালে চন্দন চাঁদ কামিনী মোহন ফাঁদ
ভূষণে ভূষিত সব অঙ্গ।
বংশীবদনে বোলে অনেক ভাগ্যেতে মিলে
এই ব্রজে নবীন অনঙ্গ॥

এই পদটিতে বিশেষ কোন ব্যঞ্জনা নাই। বসু রামানন্দ যে পরিবেশে স্বপ্নকাহিনী বলাইয়াছেন তাহারও অভাব এখানে দেখা যায়।

বসু রামানন্দের সঙ্গে বংশীবদনের তফাৎ এই যে বংশী বিভিন্ন রসের বিচিত্র পদ রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইঁহার দানলীলা ও নৌকা-বিলাসের পদে একদিকে যেমন শ্রীরাধার অন্তর্নিহিত প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ছলনাময় কৌতুক। উভয়ের সন্নিবেশে লীলা দুইটি এক অনন্যসাধারণ রূপ পাইয়াছে। বংশীবদনের রচিত দানলীলার ১২টি পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে; কিন্তু উহাদের সন্নিবেশে ঘটনার পর্য্যায়

বিন্দুমাত্র রক্ষিত হয় নাই। ঐ ১২টির অতিরিক্ত আর ৪টি পদ আমার মাতামহ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের সংগ্রহ হইতে লইয়া নবদ্বীপ-চন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয় পদামৃত-মাধুরীতে (৩।৩৪৬, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৭১) স্থান দিয়াছেন। এই ষোলটি পদ পর্য্যায়ক্রমে সাজাইয়া আলোচনা করিতেছি। (তরু ১৩৮৫)—শ্রীকৃষ্ণ দানের ছলে পথের মধ্যে ঘট পাতিয়া বসিয়াছেন। বড়াইয়ের সঙ্গে রাধা যাইতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ বলিলেন—তুমি কাহার ঘরের বধূ সঙ্গে লইয়া যাইতেছে?

এ রূপ যৌবনে কোথা লৈয়া যাও বধূ।
না জানি অন্তরে উহার কত আছে মধু॥

এই বধূর চরণ দুখানি বড়ই কোমল, এমন বধূকে বাহিরে বেচাকেনা করিতে পাঠায়, ইহার পতি কেমনধারা লোক? ইহার উত্তরে—

বড়াই কহে এত কথা কিবা প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে কেন না করি গমন॥
পর বধূ প্রশংসিয়া তোমার কি কাজ।
ঘনায়্যা আসিছ কাছে নাহি বাস লাজ॥

বড়াই নন্দের সজ্জনতার প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণের মন ফিরাইতে চেষ্টা করি-লেন। কিন্তু তাহাতে যখন ফল হইল না, তখন ভয় দেখাইলেন—"কংস রাজা শুনিলে লইবে জাতি প্রাণ" (মাধুরী ৩।৩৭১ পৃঃ)।—কৃষ্ণ ইহার জবাবে রাধাকে রাজার ভয় দেখাইলেন। রাজা লোক ভাল নয়, তাহার হাতে তোমার লাঞ্ছনা ঘটিতে পারে।

হেন রূপে কেন যাও মথুরার দিকে।
বিষম রাজার ভয় ঠেকিবা বিপাকে।

তাহাতেও রাধা প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন না দেখিয়া কৃষ্ণ সুর বদলাইয়া রাধার প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেন—

দিনকর-কিরণে মলিন মুখখানি।
হেরিয়া হেরিয়া মোর বিকল পরাণী॥

সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে রাধার রূপের একটু প্রশংসাও করিলেন—

শ্রমজল বিন্দু যেন মুকুতার দাম।

ইহাতেও রাধার মন ভুলিল না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রশংসার সুর আর একটু উঁচু করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভয় দেখাইয়া বলিলেন (মাধুরী ৩।৩৫৮ পৃঃ)—তোমার মুখখানি নলিনীকে দলন করে, সুতরাং ভ্রমর উহার রস পান না করিয়া ছাড়িবে না, তোমার চোখ খঞ্জনকে গঞ্জনা দেয়, ব্যাধ তোমাকে সোনার হরিণ মনে করিয়া বাণ ছুঁড়িবে ইত্যাদি। সুতরাং

না যাইও না যাইও রাই বৈস তরু মূলে ।
আসিতে পাইয়াছ বেথা চরণ যুগলে ॥

কিন্তু রাধা প্রশংসাতেও গলিলেন না, ভয় পাইয়াও কানাইয়ের কাছে বসিলেন না দেখিয়া (তরু ১৮৮৭)—

বাহু পাসরিয়া দানী রাখল তাই ।

এবারে কানাই রীতিমত কর-আদায়কারী রাজকর্ম্মচারীর ভঙ্গীতে বলিলেন—

যত আভরণ গায় বেশ ভূষা আছে ।
সব লেখা করি দান দেহ মোর কাছে ॥

এই কথা শুনিয়া বোধ হয় রাধা একটু উপহাসের হাসি হাসিয়াছিলেন, তাই কৃষ্ণ কৃত্রিম ক্রোধে বলিলেন—

কত ভঙ্গে কথা কহ ভয় নাহি বাস ।
রাজ-অনুগত জনে হেরি পুন হাস ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাজকর্ম্মচারীর মর্য্যাদা পাইবার লোভে ঐকথা বলিলে, রাধা সঙ্গে সঙ্গে কড়া উত্তর দিলেন (তরু ১৩৮৮)—

রাজা এথা থাকে কোথা কেবা সাধে দান ।
কিবা চায় কিবা লয় কেবা করে আন ॥

হায় ! হায় ! এদেশে যদি রাজাই থাকিবে তবে কি আর তোমার মতন একজন রাখাল সহসা কর আদায় করা সুরু করিতে পারে ? কি ধরণের কর যে তুমি চাও, আর কি যে তুমি লও তাহার ঠিকঠিকানা নাই ; এ সব অন্যায় কাজে বাধা দিবারও কেউ নাই। যাক্, রাজা থাকুক না থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না, সমাজ তো আছে। আমি সেখানেই

তোমার এই অন্যায় ব্যবহারের কথা বলিব—

এখনি যাইয়া কব গোকুল সমাজ।
কোথা যাবে দান সাধা কোথা যাবে সাজ॥
কোথা পালাইয়া যাবে স্নবল রাখাল।
তিলেকে ভাঙ্গিয়া যাবে সব ঠাকুরাল॥

রাধা স্নবলের কথা বলিতে না বলিতে, শ্রীকৃষ্ণ আবার tactics বদলাইয়া স্নবলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন (তরু ১৩৯১)—

স্নধাও দেখি স্নবল সখা কার ঘরের এ হটী
দেখিতে দেখিতে মোরে কি গুণ করিল যে
খেপা কৈলে এই যে মায়াটী॥

হটী অর্থে ধৃষ্টা হয়, আবার যে বল প্রকাশ করে তাহাকেও বুঝায়। রাধা জোর করিয়া আবার কি করিলেন ?—তিনি জোর করিয়া কৃষ্ণের "তনুমন সব কৈল চুরি"। চুরির অপবাদে রাধা ভীষণ রাগিয়া বলিলেন (তরু ১৩৯০)—তোমার মতন লোকের মন চুরি করতে আমার বয়ে গেছে—

আন্ধার-বরণ গা ভূমিতে না পড়ে পা
কি গরবে ঘন ঘন হাস।
বনে বনে চরাও গাই আপনাকে চিহ্ন নাই
হায় ছিছি লাজ নাহি বাস॥

তোমার যেমন রূপ তেমন গুণ। তুমি যেমন ফ্যাশন করিয়া কাপড়চোপড় পর, তার খরচ জোগাইতে হয়তো নন্দ রাজার গোরুর পাল বিক্রি করিতে হইবে।

পেঁচ রাখি পর ধড়া টেড়া করি বান্ধ চূড়া
কাণে গোঁজ বনফুল ডাল।
ডিগর লইয়া সাথী বনে ফির নানা ভাতি
বেচাইবে ব্রজ-রাজের পাল॥

ডিগর শব্দের অর্থ লম্পট। যেমন তুমি, তেমনি তোমার বন্ধুর দল।

এদিগে বড়াই চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া রাধা বলিতেছেন (তরু ১৩৭১)—

বিকি শিখাইব বল্যা লৈয়া আইলা সাথে
আনিয়া সোঁপিয়া দিছ রাখালের হাতে ॥

এ ভর্ৎসনা বিফল হইল দেখিয়া রাধাও আরও আকুল হইয়া বলিলেন (তরু ১৩৯৭)—

এড়িয়া না যাইহ বড়াই ধরি তোমার পায় ।
কি লাগি নন্দের পো ধরিয়া রহায় ॥
ঘরের বাহির কৈলা বলিয়া কহিয়া ।
আনিয়া রাখালের হাতে দিলা যে সোঁপিয়া ।
এ দেশে বিচার এই রাজা নাহি পাটে ।
গোয়ালা হইয়া দানী দান সাধে বাটে ॥

কৃষ্ণ তখন রাধাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন--(তরু ১৪০২ ও ১৪০৬)—

বিনোদিনি মো বড় উদার দানী ।
সকল ছাড়িয়া দানী হইয়াছি
তোমার মহিমা শুনি ॥

কবি পূরাপূরি কৃষ্ণের দিকে ; তাই তিনি রাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

বংশী বদনে কহল যতনে
শুনহ রাজার ঝি ।
উচিত কহিতে মনে মন্দ ভাব
আঁচলে ঝাঁপিলা কি ॥

তুমি কর ফাঁকি দিবার জন্য বুকের আঁচলে কি লুকাইয়া লইয়া যাইতেছ ? জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবি কখনও কৃষ্ণের পক্ষ লইয়া এমন ভণিতা দেন নাই—তাঁহারা সর্ব্বথা রাধার অনুগত ।

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় রাধাকে অনুরোধ করিতেছেন যে এই ভর দুপুর বেলা, পথের ধূলা পর্য্যন্ত গরম আগুন, ইহার মধ্যে তোমার মথুরায় যাওয়ার দরকার নাই, তোমার সবকিছু আমিই কিনিয়া লইব (তরু ১৪০৩)—

মথুরা অনেক পথ তেজ অন্য মনোরথ
মোর কাছে বৈস বিনোদিনি।
বংশীবদনে কয় এই সে উচিত হয়
শ্যাম সঙ্গে কর বিকিকিনি ॥

কিন্তু রাধা আর একবার কৃষ্ণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে দুই জনের মধ্যে এমন সামাজিক ব্যবধান যে তাঁহার সঙ্গে প্রেম করা সম্ভব নহে। এখানে বংশীবদনের ভাষা এমন ধ্বনিপূর্ণ যে একদিকে মানা করা হইতেছে, অন্যদিকে আরও অগ্রসর হইতে প্রলুব্ধ করা হইতেছে।

ওহে নাগর কেমনে তোমার সনে পিরিতি করিব
সোনার বরণ তনুখানি মোর
ছুঁইলে বদল পাছে হব। (মাধুরী ৩।৩৬০ পৃঃ)

তখন সখীরা দূরে চলিয়া গেলেন (তরু ১৪০৪)

মোহন বিজন বনে দূরে গেল সখীগণে
একলা রহিলা ধনী রাই।
দুটি আঁখি ছলছলে চরণ-কমল-তলে
কানু আসি পড়ল লোটাই ॥

রাধাকে শ্যাম "বসায়ল নিজ পীতবাসে"। তারপর শ্রীকৃষ্ণ প্রেম নিবেদন করিলেন—

শুনলো সুন্দরী প্রেমের অগোরি
তুয়া অনুরাগে মরি।
তোমার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
আইলুঁ গোকুল পুরী ॥
তোমার কারণে ফিরি বনে বনে
ধেনু রাখিবার ছলে।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া লাগি না পাইয়া
ছলে বসি তরু তলে ॥ (মাধুরী ৩।৩৪৭ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণের এই অকপট ভালবাসার কথা শুনিয়া শ্রীরাধাও আকুল হইয়া বলিলেন—(তরু ১৩৬৫)—

কিছু বৈল না হে কৈয় না হে
কথা শুনি ফাটে মোর বুক।
তোমা না দেখিলে প্রাণ সদা করে আনছান
দেখিলে সে জিয়ে চাঁদমুখ॥

আমি যে দই বেচিতে বাহির হই, সে তো তোমার সাথে দেখা করার একটু ছুতা মাত্র—

তোমার বিয়োগে হাম সদাই বিয়োগী হে
তেঞি আনি দধির পসারি।

সুতরাং এখন যখন তোমাকে পাইয়াছি তখন—

দাড়াঞা পথের মাঝে তিলাঞ্জলি দিলাম লাজে
তুয়া গুণে বীজায়্যা নিশান।

বংশীবদনের কৌতুকনাট্যের এখানেই যবনিকাপাত হইল। এই পালাটির সংলাপের মধ্যে যেন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। শ্রীরাধা এখানে ভীতা লাজনম্রা অসহায়া বলিয়া নহেন। তাঁহার বিদ্রূপবাণে শ্রীকৃষ্ণকেও অস্থির হইতে হইয়াছে। যেমন তাঁহার শ্লেষমুখর প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গী তেমনি আবার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য প্রেমের অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি। শ্রীকৃষ্ণ এখানে কৌতুকময় প্রেমিক —নিষ্ঠুর নারী-ধর্ষক নহেন।

(১৪) বলরাম দাস

বলরাম দাস নামে দুইজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা আছেন। একজন ব্রাহ্মণ, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক এবং নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর; অপরজন বৈদ্য, সপ্তদশ শতাব্দীতে গোবিন্দদাস কবিরাজের বংশে জন্মিয়াছিলেন। প্রথম মহাজনের সম্বন্ধে দেবকীনন্দন বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিয়াছেন—

সঙ্গীত-কারক বন্দো শ্রীবলরাম দাস।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস॥

আর দ্বিতীয় মহাজন সম্বন্ধে বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে (১৮) লিখিয়াছেন—

কবি-নৃপ-বংশজ ভুবন-বিদিত যশ
ঘনশ্যাম বলরাম।

ঐছন দুহুঁ জন নিরূপম গুণগণ
গৌর-প্রেমময় ধাম ॥

কবি-নৃপ-বংশজ মানে গোবিন্দদাস কবি-রাজের বংশধর। ইঁহাদের মধ্যে ঘনশ্যাম হইতেছেন গোবিন্দদাসের পৌত্র, দিব্যসিংহের পুত্র। ইঁহার "গোবিন্দরতিমঞ্জরী" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পদকল্পতরুর ঘনশ্যামভণিতাযুক্ত যে যে পদগুলি ইঁহার লেখা—ঘনশ্যাম-নামধারী নরহরি চক্রবর্ত্তীর নহে—তাহার তালিকা পাদটীকায় দিলাম। এই ঘনশ্যামের রচনায় যেমন গোবিন্দদাস কবিরাজের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, বলরাম কবিরাজের পদও তেমনি। সুতরাং এখানে আমরা ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের সঙ্গে একমত হইয়া বলিতেছি—"একজন—যিনি প্রধানতঃ বাংলায় পদ লিখেছেন এবং যিনি প্রাচীনতর; আর একজন যিনি প্রধানতঃ ব্রজবুলিতে পদ লিখেছেন এবং যিনি গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী। এই দুই বলরামদাসের রচনা পৃথক করে নেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়।" (ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত বলরাম দাসের পদাবলীর ভূমিকা, পৃঃ ১৮)। কেহ কেহ বলেন যে 'প্রেম বিলাসে'র রচয়িতা বলরামদাসই পদকর্তা বলরামদাস। প্রেমবিলাসের খঞ্জভাষা যাঁহার, তিনি কোন ক্রমেই এরূপ সুন্দর পদ লিখিতে পারেন না।

বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে উভয় বলরামের পদই তুলিয়াছেন। বলরাম দাস ভণিতার ১৩৬টি পদের মধ্যে অন্ততঃ ৮২টিই গোবিন্দদাস কবিরাজের পদের অনুকরণে লেখা। এই অনুকরণ স্থানে স্থানে একেবারে হুবহু নকল করার পর্য্যায়েও পৌছিয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

জয়তি জয় বৃষ- ভানু নন্দিনি
শ্যাম-মোহিনি রাধিকে।

তরুসংখ্যা প্রথমে দিয়া = চিহ্ন দিয়া গোবিন্দরতি মঞ্জরীর পদ সংখ্যা দেওয়া হইল— ৩৮৪=১৫; ৪৬৭=১৬; ৪৯১=১৪; ১৫০=৪; ১৫১=৫; ১৫৫=৯; ৩৫০=১৯; ১৬৩৫=৩০; ১৬৯৬=৪২; ১৬৯৭=৩৪; ৫৩৭=১৩; ১৬০৩=২৮; ১৬০৮=২৭; ১৯৭১=৪০; ১৯৮৮=৪৩; ২০১০=৪৪; ১৬৯৮=৩৬; ১৭২৫=৩৫; ১৮১৬ ও ১৮১৭=৩৯; ২৭৪০=৪৫; ২৯১৫=১। সর্ব্বসমেত তরুধৃত ২৫টি ২০২১=২৫; ২৩১০=২; ২৪১১=৩; পদ গোবিন্দরতি-মঞ্জরীতে পাওয়া যায়। ঘনশ্যাম ভণিতায় বৈষ্ণবদাস ৪২টি পদ ধরিয়াছেন। বাকী ১৭টি নরহরি চক্রবর্ত্তীর লেখা কি এই বৈদ্য ঘনশ্যামের লেখা তাহা বলা কঠিন।

কনয়-শতবান কান্তি কলেবর
কিরণ-জিত কমলাধিকে॥
ভঙ্গি সহজই বিজুরি কত জিনি
কাম কত শত মোহিতে।
জিনিয়া ফনি ধনি বেণি লম্বিত
করবি মালতি শোহিতে॥ (তরু ২৪৬৬)

বলরামদাস লিখিতেছেন—

জয়তি জয় বৃষ- ভানু নন্দিনি
শ্যাম-মোহিনি রাধিকে।
বেনি লম্বিত যৈছে ফণি মণি
বেঢ়ল মালতি-মালিকে। (তরু ২১)

গোবিন্দদাস রাসের সুপ্রসিদ্ধ পদ—

'বিপিনে মিলল গোপ-নারি' ইত্যাদিতে (১৭৪)

'প্রেম সিন্ধু গাহনি'র সঙ্গে 'কাহে কুটিল চাহনি', 'থোর নহত কাহিনী', 'বেঢ়ল বিশিখ-বাহিনি', 'বুঝি আওলি সাহনি' প্রভৃতির মিল দিয়াছেন। বলরামদাস ঠিক উহারই প্রতিধ্বনি করিয়া রাসের পদ রচনায়—'আরে সে শরদ যামিনি'র সহিত 'বিবিধ রাগ গায়নি', 'পিয়ল বসন দামিনি', 'সবহু বরজকামিনি', 'মেলি কতহুঁ গায়নি','ভালি ভালি বোলনি' ও 'হৃদয়-পুতলি দোলনি'র মিল করিয়াছেন। (তরু ১২৭৮)। শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা বর্ণনায় গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

পতিত হেরি কান্দে থির নাহি বান্ধে
করুণ নয়ানে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা-তনু
অবনী ঘন গড়ি যায়॥ (তরু ২২১৩)

বলরামদাস ইহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—

পতিত হেরিয়া কান্দে নাহি বান্ধে থির।
কত শত ধারা বহে নয়নের নীর॥ (তরু ২০৮১)

গোবিন্দদাসের অষ্টকালীয় নিত্যলীলার একান্নপদের অনুকরণে বলরাম

দাস কবিরাজ ২২টি পদ লিখিয়াছেন।* সব কয়টি পদই ব্রজবুলিতে রচিত।

নরহরি চক্রবর্ত্তী গীতচন্দ্রোদয়ে দুই বলরামদাসের দুইটি নিত্যানন্দ-বন্দনার পদ পাশাপাশি উদ্ধৃত করিয়াছেন। একটিতে প্রত্যক্ষদর্শনজাত অনুভূতির ছাপ রহিয়াছে, অন্যটিতে আলঙ্কারিক নৈপুণ্য দেখাইবার কঠিন প্রয়াস দেখা যায়। পদ দুইটি নীচে দিতেছি। প্রথম বলরামদাসের পদ—

গজেন্দ্র গমনে যায় সকরুণ দিঠে চায়
পদভরে মহী টলমল।
মহামত্ত সিংহজিনি কম্পমান্ মেদিনী
পাষণ্ডিগণ শুনিয়া বিকল॥
আয়ত অবধূত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গরগর মন করে হরি-সংকীর্ত্তন
পতিতপাবন দীনবন্ধু॥
হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নড়ে
প্রেমে ভাসে অমর সমাজ।
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন রঙ্গে
অলখিত করে সব কাজ॥
শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ অবতারী নারায়ণ
যার অংশ কলায় গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্ত্তা
সেই রাম রোহিণীনন্দন॥
যার লীলা লাবণ্যধাম আগমনিগমে গান
যার রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে পহুঁ দেশে দেশে
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥

---

* তরু ২৪৭৬, ২৪৭৭, ২৪৭৯, ২৪৮২, ২৪৮৩, ২৪৮৭ হইতে ২৪৯৮, ২৫০০—২৫০৩, ২৫০৫ এবং ২৬৫৩।

ব্রজের বৈদগধি সার যত যত লীলা আর
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয় মনোরথ সিদ্ধি হয়
ভজ ভাই শ্রীপাদ-চরণ॥ (পৃঃ ২৭)

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের সহজ সরল রচনাভঙ্গী পরবর্ত্তী কালে কিরূপে কৃত্রিমতাপূর্ণ হইয়াছিল তাহা উপরের পদটির সঙ্গে নীচের পদটির তুলনা করিলে বুঝা যাইবে। বলরামদাস কবিরাজের পদ—

অনুখন অরুণ নয়ন ঘন চূয়ত
ঢরকত লোরে বিথার।
কিয়ে ঘন অরুণ বরুণালয় সঞ্চরু
অমিয়া বরষে অনিবার॥
নাচেরে নিতাই বরচাঁদ।
সিঞ্চই প্রেম— সুধারস জগজনে
অদভুত নটন সুছাঁদ॥
পদতলতাল রণিত মণি মঞ্জীর
চলতহি টলমল অঙ্গ।
মেরু শিখর কিয়ে তনু অনুপাম রে
ঝলমল ভাবতরঙ্গ॥
রোয়ত হসত চলত গতি মন্থর
হরি বলি মূরছি বিভোর।
খণে খণে গৌর গৌর বলি ধাবই
আনন্দে গরজত ঘোর॥
পামর পঙ্গু অধম জড় আতুর
দীন অবধি নাহি মান।
অবিরত দুর্ল্লভ প্রেম রতন ধন
যাচি জগতে করু দান॥
অবিচল দুলহ প্রেমধন বিতরণে
নিখিল তাপ দূরে গেল।

দীনহীন সবহি মনোরথ পূরল
অবলা উনমত ভেল ॥
ঐছন করুণ নয়ন অবলোকনে
কাহুঁ না রহু দুরদিন।
বলরাম দাস তাহে ভেল বঞ্চিত
দারুণ হৃদয়-কঠিন ॥

বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ প্রভুর বেশভূষা বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন

রজত-নূপুর-মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
(চৈঃ ভাঃ ৩।৫)

রূপার নূপুর পরবর্ত্তীকালের কবির কল্পনায় মণিময় মঞ্জীর হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমবিতরণের ফলে যদি সকলেরই মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'বলরামদাস বঞ্চিত হইল' এরূপ ভণিতা দিবার সার্থকতা কোথায়? তরুর ২০৬৫, ২০৬৭, ২০৮১ (বিমুখ), ২১১১, ২১১৩, ২১৪৫, ২২০৭, ২২৪৪, ২৩০১, ২৩৪৮ প্রভৃতি পদে অনুরূপ ভণিতা আছে বলিয়া ঐ পদগুলিও দ্বিতীয় বলরামদাসের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে।

নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে শ্রীচৈতন্যের জীবনী সম্বন্ধে যে সব সমসাময়িকের রচনা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম বলরামদাস অন্যতম। ইঁহার নিম্নলিখিত পদটিতে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণতা সম্বন্ধে একটি নূতন কথা পাওয়া যায়—

ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল।
সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল ॥
বিশাল হৃদয়ে গজ মুকুতার হার।
পদতলে তাল উঠে নূপুর ঝঙ্কার ॥
ছন্দ বিছন্দে কত জানে অঙ্গ ভঙ্গি।
নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙ্গী ॥
কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদুগান।
গন্ধর্ব্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ান ॥

পঙ্কজ সঙ্কোচ পায় দেখিয়া নয়নে।
হাসিতে বিজুরি ছটা পড়য়ে দশনে॥
বাঁধুলি জিনিয়া রাঙ্গা ওঠখানি হাস।
ও রূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস॥

(ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৮৩৭)

এই সুন্দর পদটি পদকল্পতরুতে নাই; ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সঙ্কলিত "বলরামদাসের পদাবলী"তেও নাই। অথচ ইহাতে পাওয়া যায় যে মহাপ্রভু গুণগুণ করিয়া মৃদুস্বরে এমন সুন্দর গান করিতেন যে তাহা শুনিয়া মনে হইত কিন্নরেরা বুঝি তাঁহার নিকট গান শিক্ষা করিতে আসেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব ঘোষ, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে কীর্ত্তনে যোগ দিতেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তিনি যে ভাল গান করিতে পারিতেন এটি বলরামদাসের পদ হইতেই আমরা প্রথম অবগত হই।

প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর রাঢ় দেশ হইতে শান্তিপুরে যাইবার সময় নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন (চৈঃ ভাঃ ৩।১)। নিত্যানন্দ শচীমাতা ও অসংখ্য ভক্তগণ সঙ্গে নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে গমন করেন।

তবে সর্ব্বভক্তগণ নিত্যানন্দ সঙ্গে।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ হইলেন রঙ্গে॥ (ঐ)

ইঁহাদের মধ্যে খুব সম্ভব নিত্যানন্দের প্রিয় অনুচর বলরামদাস ছিলেন। কেননা সাহিত্যপরিষদের ৯৬৯ সংখ্যক পুথিতে তাঁহার তিনটি পদ পাইয়াছি, যাহাতে ঐ সময়ের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ঐ পুথিখানি অন্ততঃ আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন; সুতরাং উহার প্রামাণিকতা পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণী (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত) হইতে অধিক। প্রথম পদটি পদকল্পতরুতে (২২৩৩) বল্লভ ভণিতায় পাওয়া যায়, অপর দুইটি উহাতে নাই; গৌরপদতরঙ্গিণীতে তিনটি পদই আছে (পৃঃ ২৪৬-২৪৯) কিন্তু ভণিতায় বাসুঘোষের নাম। পদ তিনটি যে বাসুঘোষের রচনা নহে, তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদটির মধ্যেই পাওয়া যায়।

ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্যও অন্য কোন পুথিতে পদ তিনটি বলরামদাসের ভণিতায় পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অথবা গৌরপদতরঙ্গিণীর ধৃত পাঠ

অপেক্ষা সাহিত্যপরিষদের পুথির পাঠ পূর্ণতর ও বিশুদ্ধতর। পদ তিনটি ঐ পুথি হইতে নীচে দিতেছি—

(১)

করজোড় করি[১] আগে মায়ের চরণ যুগে
পড়িলেন দণ্ডবত হৈঞা।
দুহাতে তুলি বুকে চুম্ব দিলা চান্দ মুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিঞা॥
ইহার লাগিয়া যত [২]পড়াইনু ভাগবত
[৩]একথা কহিব আমি কায়।
[৪]হাপুতি করিয়া মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়॥
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি
ঘরে ঘরে যাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্তে থাকিতে মায় ইহা নাহি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগি॥
গোরাচান্দের বৈরাগ্যে ধরণী বিদায় মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
[৫]কহে বলরামদাস গোরাচান্দের সন্ন্যাস
জগভরি রহিল ঘোষণা॥

---

* পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণীতে পাঠান্তর—

১ করজোড়ি অনুরাগে দাঁড়াল মায়ের আগে ২ পড়াইলাম ৩ এ দুখ ৪ অনাথিনী করি মোরে (অনাথিনী শব্দের অর্থ, যাহার নাথ নাই, সুতরাং 'হাপুতি করিয়া মোরে' পাঠই ঠিক)

৫ কহে বাসুদেব ঘোষে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা॥ —গৌরপদতরঙ্গিণী

কহয়ে বল্লভদাস গোরাচাঁদের বৈরাগ
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা॥ —তরু

দাসের সঙ্গে বৈরাগ শব্দের মিল হয় না, সুতরাং এই ভণিতা ভুল।

ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্যের সংস্করণে (৪) চিহ্নিত ত্রিপদী নাই।

(২)

হেদে রে নদীয়ার চান্দ বাছারে নিমাঞি।
অভাগিনী [১]শচী মায়ের আর কেহ নাঞি॥
এত বোলি ধরে শচী গৌরাঙ্গের গলে।
স্নেহভরে চুম্ব দেয় বদন কমলে॥
মুঞি বৃদ্ধ মাতা তোর [২]আমারে ফেলিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দিলি[৩] গলায় গাঁথিয়া॥
তোমার[৪] লাগিয়া কান্দে সব নদীয়ার লোক।
ঘরে[৫] চল বাছা তুমি যাউক মোর শোক॥
[৬]শ্রীবাস হরিদাস যত ভকতগণ।
তা সভা লইঞা বাছা করিলা[৭] কীর্ত্তন॥
[৮]মুরারি মুকুন্দ বাসু আর যত দাস।
এ সব ছাড়িয়া কেনে করিলা সন্ন্যাস॥
যে করিলা সে করিলা চলরে ফিরিয়া।
পুন যজ্ঞসূত্র দিব ব্রাহ্মণ [৯]লইয়া॥
[১০]বলরাম দাসে কহে হেন দিন হব।
শ্রীবাস মন্দিরে আর কীর্ত্তন শুনিব॥

(৩)

নানা[১] প্রকারে প্রভু মায়েরে বুঝায়[২]।
অদ্বৈতঘরণী সীতা শচীরে বৈসায়[৩]॥

---

* ২য় পদের পাঠান্তর—গৌরপদতরঙ্গিণীতে পৃঃ ২৪৯

(১) তোর (২) মোরে ফেলাইয়া (৩) দিলা (৪) তোর লাগি (৫) ঘরেরে চলরে বাছা দূরে যাকু শোক। (৬) শ্রীনিবাস (৭) করহ (৮) মুরারি মুকুন্দ বাসু আর হরিদাস (পূর্ব্বের পয়ারে একবার হরিদাসের নাম করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে 'আর যত দাস' পাঠই ঠিক)। (৯) ডাকিয়া

(১০)
বাসুদেব ঘোষ কয় শুন মোর বাণী
পুনরায় নৈস্থা চল গৌর গুণমণি॥

তৃতীয় পদের পাঠান্তর—গৌরপদ তরঙ্গিণীতে পৃঃ ২৪৭

১ নানান ২ সান্থায় ৩ বুঝায়। প্রথম পয়ারের পর অতিরিক্ত আছে—
শচীর সহিত যত নদীয়ার লোক।
সু দৃষ্টি মেলিয়া প্রভু জুড়াইল শোক॥

শান্তিপুর ভরিয়া উঠিল জয়ধ্বনি[৪]।
অদ্বৈত[৫] অঙ্গনে নাচে গোরা গুণমনি॥
প্রেমে টলমল প্রভু স্থির নহে চিত।
নিতাই ধরিয়া নাচে[৬] নিমাঞি পণ্ডিত॥
অদ্বৈত পসারি বাহু ফিরে কাছে কাছে[৭]।
আছাড় খাইয়া প্রভু[৮] ভূমি পড়ে পাছে॥
চৌদিগে ভকতগণ বলে হরি হরি।
শান্তিপুর হৈল যেন নবদ্বীপপুরী॥
প্রভু অঙ্গ[৯] কোটি চন্দ্র জিনিয়া আভাষ।
এ ডোর কৌপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ॥
হেন ভাব[১০] রূপ বেশ দেখি শচীমায়।
বাহিরে দুঃখিত অতি[১১] আনন্দ হৃদয়॥
[১২]বুঝিয়া শচীর মন অবধৌত রায়।
সংকীর্ত্তন সমাধিয়া[১৩] প্রভুরে বৈসায়॥
এইরূপে দিন দিন[১৪] অদ্বৈতের ঘরে।
বিলাস ভোজন প্রভুর আনন্দ অন্তরে॥
[১৫]বলরাম দাস কহে কাতর হইয়া।
অদ্বৈতের এই আশা না দিব ছাড়িয়া॥

ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য এই পদটি এই ভণিতাতেই পাইয়াছেন; গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে ধৃত ভণিতার কোন সঙ্গত অর্থ হয় না।

বাসুদেব ঘোষ কয় চরণে ধরিয়া।
অদ্বৈতের এই আশা না দিব ছাড়িয়া॥

বাসুঘোষ প্রভুর চরণে ধরিয়া কখনও বলিতে পারেন না যে প্রভু অদ্বৈত

---

৪ হরিধ্বনি ৫ অদ্বৈতের আঙ্গিনায় নাচে গৌরমণি ৬ কাঁদে (এখানে কাঁদা অপেক্ষা নাচাই স্বাভাবিক) ৭ পাছে পাছে ৮ গোরা ৯ সঙ্গে (সঙ্গে ভুল, অঙ্গে ঠিক; 'প্রভুর সঙ্গে কোটীচন্দ্র দেখিয়ে আভাষ' বলা অনর্থক অলৌকিকত্বের সৃষ্টি করা) ১০ রূপ প্রেমাবেশ ১১ কিন্তু ১২ বুঝায় (ভুল পাঠ—বুঝিয়াই ঠিক) ১৩ সমাপিয়া ১৪ দশদিন (এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা—কিন্তু কোন চরিতগ্রন্থে দশদিন থাকার আভাষ নাই) ১৫ বাসুদেব ঘোষ কয় চরণে ধরিয়া।

এই আশা করিতেছেন যে তোমাকে আর শান্তিপুর হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। এরূপ বলার মানে হয়, প্রভু তুমি শীঘ্র চলিয়া যাও। এ ধরণের উক্তি অন্ততঃ শচীমাতার মুখ চাহিয়া বাসুঘোষ করিতে পারেন না। এরূপ বলা শুধু নিষ্ঠুরতা নহে, অন্যান্য ভক্তদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। দ্বিতীয় পদটির একাদশ চরণে শচীমাতা প্রভুর প্রধান প্রধান দাসের মধ্যে বাসুর নাম করিয়াছেন; ঐ বাসু সম্ভবতঃ বাসুদেব দত্ত নহেন। বাসু ঘোষ নিজে পদ লিখিলে ঐভাবে নিজের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গতার বিজ্ঞাপন দিতেন না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে পদ তিনটি বলরাম দাসেরই রচনা। তবে পরবর্ত্তীকালের কোন কোন কীর্ত্তন-গায়ক ভাবিয়াছিলেন যে বলরামদাস তো গোবিন্দদাস কবিরাজের পরবর্ত্তী লোক, তাঁহার পক্ষে এ লীলা দেখিয়া লেখা সম্ভব নহে; আর বাসুঘোষের নিমাই-সন্ন্যাসের পালা সুপ্রসিদ্ধ, অতএব তাঁহারা ভণিতা বদলাইয়া বাসুঘোষের নাম বসাইয়া দিয়াছেন।

বলরামদাস বাৎসল্যরসের ভাব অঙ্কনে যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে এই পদ তিনটি তাঁহার রচনা হওয়াই অধিক সম্ভব। বলরামদাসের কৃষ্ণ কথায় কথায় মায়ের উপর অভিমান করে, আর মা যশোদা তাহার মান ভাঙ্গাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। দুধ উতলাইয়া পড়িতেছে এমন সময় কৃষ্ণ স্তন পান করিতে চাহিলেন, যশোদা তাহার আবদার পূর্ণ করিলেন না। অমনি কৃষ্ণ কোথায় লুকাইলেন। মা যশোদা ভাবিয়া অস্থির।

কোপিত নয়ান কোণে চাইয়াছিল আমাপানে
আমি কি এমন হবে জানি।
তোমরা করিছ খেলা গোপাল কোথায় গেলা
দৃঢ় করি বল এক বোল।

আর একদিন গোপাল ননী চুরি করিয়া খাইয়াছে বলিয়া তাহাকে মা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। অমনি গোপাল অভিমানভরে বলিতেছে—

অন্যের ছাওয়াল যত তারা ননী খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে কারে।

যে বল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে
এ যা দুঃখ সহিতে না পারে॥

কানাই একটু বড় হইয়াই গোষ্ঠে যাইবার জন্য জিদ ধরিল—

গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥

মা যশোদা অগত্যা তাহাকে সাজাইয়া বলরামের হাতে সঁপিয়া দিলেন।

হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে।
দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে॥

কত উদ্বেগ তাঁহার মনে। পাছে গোরু চরাইতে চরাইতে কানাই-বলরাম দূরে চলিয়া যান; পাছে তাঁহারা পথ হারান অথবা কোন বিপদ আপদে পড়েন, তাই অনুরোধ করিতেছেন যে গোষ্ঠের মাঠ হইতে শিঙ্গা বাজাইয়া যেন তাঁহারা জানাইয়া দেন যে ভাল আছেন।—

যোড় শিঙ্গা রব দিহ পরাণে না মারি।

মায়ের আর এক ভাবনা যে কানাই বুঝি মাঠ হইতে ননী খাইবার জন্য একা বাড়ী চলিয়া আসে।

দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা।
নবনী লোভিত গোপাল পাছে আইসে একা॥

নিত্যানন্দের অনুচরগণ সখ্যরসে ভাবিত থাকিতেন। বলরামদাস মাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—

বলরাম দাসের বাণী শুন শুন নন্দরাণী
কেন সদা ভাবিতেছ তুমি।
গোপাল সাজায়ে দেহ মোর মিনতি মানহ
সঙ্গে যাইব গোঠে আমি॥

এত আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও মায়ের মন মানে না। কানাইকে সাজাইতে গেলে তাঁহার হাত কাঁপে, বারবার চূড়া খসিয়া পড়ে। শেষ পর্য্যন্ত "যতনে কানাই চূড়া বলাই বান্ধিল।" ছেলে গোষ্ঠে যাইতেছে, আর মা অনিমেষ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া থাকেন—"অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে।" তিনি প্রত্যেক সখাকে কাতর হইয়া অনুনয় করিয়া

বলিতেছেন—গোপালের পা বড় নরম, কুশের অঙ্কুর বিঁধিলে তাহার বড় ব্যথা বাজিবে, বোধ হয় সেই ব্যথা আরও বেশী হইয়া মায়ের প্রাণে লাগিবে (পদ ২১ দ্রষ্টব্য)।

নব তৃণাঙ্কুর আগে   রাঙ্গা পায়ে যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন।

গোষ্ঠ হইতে ছেলে ফিরিয়া আসিলে মা প্রথমেই তাহার পায়ের দিকে তাকাইয়া দেখেন—

নব তৃণাঙ্কুর কত ভকিল চরণে।
একদিঠি হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে॥

মায়ের এমন স্নেহ ছেলের অন্তরে প্রতিধ্বনি না জাগাইয়া পারে না। তাই গোষ্ঠের মধ্যে মায়ের কথা মনে করিয়া কানাই বলিতেছেন—

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায়॥

ষোড়শ শতকে অন্য কোন কবির হাতে বাৎসল্য রসের এমন ছবিটি ফুটে নাই। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস গোষ্ঠলীলার মধ্যেও শৃঙ্গাররসের অবতারণা করিয়াছেন। বলরামদাস অতি সংক্ষেপে গোপন ইঙ্গিতে মাত্র বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইবার সময় বারবার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছেন, কেন না গৌরবর্ণা রাধাকে একটু মাত্র দেখা যাইতেছে—

নয়ানে সঘনে উলটি উলটি
হেরি হেরি পালটি পালটি
গোরী গোরী থোরি থোরি
আন নাহিক ভায় গো। (২৮)

এই পদটি কিন্তু বলরামদাসের কি না নিশ্চিত বলা যায় না কেননা উহার পূর্ণতর রূপ একটি পুঁথিতে পাওয়া যায়; সেখানে ভণিতায় লোচনের নাম আছে।

জ্ঞানদাস এই ইঙ্গিতকে আরও পরিস্ফুট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সম্ভোগের চিহ্ন দেখাইয়াছেন—যদিও তাঁহার সরল-বুদ্ধি সখারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

হিয়ায় কণ্টক দাগ বয়নে বন্দন রাগ
মলিন হইয়াছে মুখশশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া কোন বনে ছিলে গিয়া
তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি॥

মাধুর্য্যরসের প্লাবনে পদাবলীসাহিত্য সখ্য ও বাৎসল্য রসে প্রায় ভাসিয়া গিয়াছে। যে কয়েকজন কবি এই ভাববন্যার হাত হইতে বাৎসল্য রসকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বলরামদাস শ্রেষ্ঠ। ষোড়শ শতকের যদুনাথদাস ও রায় শেখর এবং পরবর্ত্তীকালের যাদবেন্দ্রদাস, মাধবদাস, ঘনরামদাসের বাৎসল্য রসের পদও উল্লেখযোগ্য। বলরামদাসের মা যশোদা কয়েকটি পদে কানাইয়ের সম্বন্ধে যে যে বিষয়ে সাবধানতার কথা বলিয়াছেন এবং শিঙ্গা বাজাইয়া কুশল-সংবাদ জানাইতে বলিয়াছেন, সেইগুলি যাদবেন্দ্র একটি সুন্দর পদে সংহত আকারে দিয়াছেন—

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম তার পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥
ক্ষুধা হইলে চেয়ে খাইও পথপানে চাইয়া যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিহ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে দিও*
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

---

* বাধা মানে খড়ম আর পানই অর্থে উপানহ বা চামড়ার জুতা।

এ পদটির আন্তরিকতা বলরামদাসের পদের চেয়ে কোন অংশে কম নহে। মা যে ছেলেকে বলিতেছেন, তুমি আমার মাথা ছুঁইয়া শপথ কর যে বড় বড় গোরু চড়াইতে চেষ্টা করিবে না—এই চিত্রটি খুবই মর্ম্মস্পর্শী।

বলরামদাস সখ্যরসের পদেও অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। "যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া" (৩০) ইত্যাদি পদে রৌদ্রে কানাইয়ের মুখখানি মলিন হইয়াছে দেখিয়া সখাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে দেখিতে পাই। সখাদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া খেলার ছবিটিও (২৭) মনোরম। বলরামদাস চিরাচরিত আলঙ্কারিক উপমা দিয়া সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেন না—ঘরোয়া কথায় স্বকীয় ভঙ্গীতে সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি প্রকাশ করেন—

মুরহর হলধর ধরাধরি করে কর
লীলায় দোলায় নিজ অঙ্গ।
ঘনায়্যা ঘনায়্যা কাছে মউরা মউরী নাচে
চান্দে মেঘে দেখি এক সঙ্গ॥ (পদাবলী পৃঃ ৩৯)

মেঘ দেখিলে মউর নাচে; শ্রীকৃষ্ণ নবজলধর, তাহার কাছে আসিয়া বিস্মিত হইয়া তাহারা চাহিয়া দেখে যে এই মেঘ বলরাম রূপ চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলে নাই, বরং উভয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি রহিয়াছে।

অনুরাগ বর্ণনাতেও বলরামদাসের এই নিজস্ব ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। একদিকে কৃষ্ণকে ধিক্কার দিয়া অন্যদিকে আবার তাঁহার প্রেম আকর্ষণ করিবার অদ্ভুত শক্তির উল্লেখ করিয়া রাধা বলিতেছেন—

কিসের রঙ্গে এত না ভঙ্গে
অঙ্গ দোলাইয়া হাঁট।
কথার ছলে ভিতরে পশিয়া
পাঁজরে পাঁজরে কাট॥ (পদাবলী পৃঃ ৬২)

নরহরি সরকারের উপর যেমন চণ্ডীদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, বলরাম দাসের উপরও তেমনি। 'ভাদরে দেখিনু নট চাঁদে' (তরু ৮৬৮) ইত্যাদি পদটিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে; কিন্তু পদরসসারে ঐ পদটি বলরাম দাসের ভণিতায় আছে। 'যারে মুই না দেখোঁ নয়নে, কলঙ্ক তোলায় তার সনে'

প্রভৃতি অনেকগুলি পদে চণ্ডীদাসের সুর কানে বাজে। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা কলঙ্কের জ্বালায় প্রাণ ছাড়িতে চায়, আর বলরামদাসের রাধা শ্যাম-কলঙ্ক প্রার্থনা করে—

কিবা রূপ কিবা বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ
পাপ-চিতে পাসরিতে নারি।
কিবা যশ অপযশ কিবা মোর গৃহ বাস
একতিল না দেখিলে মরি॥
সই কতদিনে পুরিবেক সাধ।
সাধিমু সকল সিধি পরসন্ন হবে বিধি
তার সনে হবে পরিবাদ॥

বলরামদাসের রাধা যে ভাবে শাশুড়ী ননদিনীর নির্য্যাতনের কথা বলিয়া তাহার অন্তরের গভীর অনুরাগ প্রকাশ করে তাহার তুলনা মেলা ভার। 'দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা' ইত্যাদি পদে (৮৫) রাধা বলিতেছেন যে তোমার নাম আকার ইঙ্গিতেও শাশুড়ী মুখে আনিতে দেয় না, তোমার গায়ের রংয়ের শাড়ী পর্য্যন্ত পরিতে দেয় না, এসব সহ্য করা যাইত যদি তুমি মাঝে মাঝে দেখা দিতে—

দুখের উপর বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদমুখ॥

বলরামদাসের শ্রীকৃষ্ণও অকুণ্ঠভাবে তাঁহার প্রেমের গভীরতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করেন।

চন্দন মাখায় গায় দেয় বসনের বায়
নিজ করে তাম্বুল খাওয়ায়।
বিনি কাজে কত পুছে কত না মুখানি মোছে
হেন বাসে দেখিতে হারায়॥
(পদাবলী ৮৯)

শুধু তাহাই নহে, তাঁহার কৃষ্ণ জানেন যে রাধা আর তিনি ভিন্ন নহেন—একই— তাঁহারই অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন রাধাকে বাহির করিয়াছে—

হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁ চিত নহে থির ॥ (পদাবলী পৃঃ ১৫০)

(১৫) যদুনাথ দাস

যদুনাথ দাসকে হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য ও গোবিন্দ-লীলামৃতের অনুবাদক বৈদ্য যদুনন্দন দাসের সঙ্গে বা গদাধর দাসের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করার কোন হেতু নাই। যদুনাথ মহাপ্রভুর সমসাময়িক পদকর্ত্তা হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি হইয়াছিল কবিচন্দ্র। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিয়াছেন যে ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথমিশ্রের স্বগ্রামবাসী সঙ্গী রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র।

তিনপুত্র তাঁর কৃষ্ণ-পদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র ॥ (২।১।১৫১)

কৃষ্ণদাস কবিরাজও লিখিয়াছেন—

মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
তাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ (চৈঃ চঃ ১।১১।৩৫)

ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব তরঙ্গ দেখিয়া লিখিয়াছেন—

গদাধর নরহরি করে ধরি গৌর হরি
প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়।
কহিলে না হয় তহু ফুকরি ফুকরি পহু
বৃন্দা-বিপিন গুণ গায় ॥

পদের ভণিতায় কবি লীলাদর্শনে বঞ্চিত হইবার কথা বলেন নাই— শুধু লীলার ভাব বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াছেন—

প্রেম সিন্ধু উথলিল জগত ভরিয়া গেল
না বুঝিল যদুনাথ দাস ॥ (তরু ২১২৬)

আর একটি পদে কবি মহাপ্রভুর ভাব বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

অরুণ নয়ানে বরুণ আলয়
বহয়ে প্রেম-সুধা জল।
যদুনাথ দাস বলে যেন সোনার কমলে
প্রসবিছে মুকুতার ফল ॥ (তরু ২১৯১)

অপর একটি পদে (তরু ২৫১২) কবি তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন—

মুখ পাখালিয়া গৌর হরি।
বৈসে নিজগণ চৌদিগে বেড়ি॥
নদিয়া নগরে হেন বিলাস।
যদুনাথ দেখে গদাই পাশ॥ (তরু ২৫২২)

যদুনাথ দাসের কৃষ্ণলীলার পাঁচটি পদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতেও (৯।৪, ৯।৯, ১৯।৭, ২২।৬, ২৬।১২) ধরিয়াছেন ; ইহার একটিও পদকল্পতরুতে নাই। যদুনাথ ভণিতায় আরও কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ প্রাচীন পুথিতে দেখিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যদুনাথ দাসের "ভ্রমরগীত" নামক গ্রন্থের পাঁচখানি পুথি আছে—(২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪ ও ২০২৪ সংখ্যা)। এগুলির মধ্যে ২৯১ সংখ্যক পুথিখানির অনুলিপির তারিখ ১১৯৮ বঙ্গাব্দ বা ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু হাতের লেখা দেখিয়া বোধ হয় অন্য ২।১ খানি পুথি ইহার চেয়েও প্রাচীন। যদুনাথের কবিচন্দ্র উপাধি নিরর্থক মনে হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের পরিকর কবিবৃন্দ

প্রভুর নবদ্বীপলীলার পরিকরবর্গ পদাবলীসাহিত্যকে যেরূপ পুষ্ট করিয়াছেন, সন্ন্যাসজীবনের সঙ্গীরা সেরূপ করেন নাই। সম্ভবতঃ প্রভুর নবদ্বীপ লীলার, বিশেষ করিয়া গয়া হইতে ফিরিবার পর হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত এক বৎসর কালের ভাবমাধুর্য্য গীতিকবিতা রচনায় যেমন অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল, তাঁহার নীলাচললীলা সেরূপ করে নাই। নবদ্বীপলীলা যেন ফুল, আর নীলাচললীলা ফল। সন্ন্যাসজীবনের পরিকর রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়া তাঁহার "মনোভীষ্ট" প্রচার করেন।

(১৬) রঘুনাথ দাস গোস্বামী

রঘুনাথ সপ্তগ্রামের অধিকারী হিরণ্য মজুমদারের ভ্রাতুষ্পুত্র, গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্র। ইঁহাদের বার্ষিক আয় অনূ্যন বার লক্ষ মুদ্রা ছিল। শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাইবার পথে যখন শান্তিপুরে আসেন তখন রঘুনাথ দাস সাতদিন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন (চৈঃ চঃ ২।১৬); পরে স্ত্রী ও সংসার ছাড়িয়া তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বোধ হয় ঐ ঘটনা ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। কেননা কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন—

> প্রভুর গুপ্ত-সেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
> ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
> স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥ (১।১০)

মহাপ্রভুর তিরোভাব ঘটে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই; ইহার পূর্ব্বে ষোল বৎসর তিনি তাঁহার সেবা করেন। স্বরূপ দামোদরের অপ্রকটের পর রঘুনাথ গোস্বামী রাধাকুণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অর্দ্ধশতাব্দীর উপর ব্রজমণ্ডলে বাস করেন। সেইজন্য তাঁহার ভাষায় ব্রজ-ভাষার প্রভাব লক্ষ্য

করা যায়। মদন গোপালের আরতির এই পদটি এমন ভাষায় লেখা যে বঙ্গভাষাভাষী ও ব্রজভাষাভাষী কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় না।

হরত সকল সন্তাপ জনমকো
মিটত তলপ যম কাল কি।
আরতি কিয়ে মদনগোপাল কি॥
গো-ঘৃত রচিত কপূর কি বাতি
ঝলকত কাঞ্চন থার কি।
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি
বাজত বেণু বিষাণে কি॥
চন্দ্র-কোটি জ্যোতি ভানু-কোটি ছবি
মুখ শোভা নন্দলাল কি।
ময়ূর-মুকুট পিতাম্বর শোহে
উরে বৈজয়ন্তি-মাল কি॥
চরণ-কমল পর নূপুর বাজে
আজ রি কুসুম গুলাব কি।
সুন্দর লোল কপোলক ছবিসোঁ
নিরখত মদনগোপাল কি॥
সুর-নর-মুনিগণ করতহি আরতি
ভক্ত-বৎসল প্রতিপাল কি।
হুঁ বলি বলি রঘুনাথ দাস প্রভু
মোহন গোকুল বাল কি॥ (তরু ২৮৬৯)

এখানে তলপ শব্দ সংস্কৃত তল্প (শয্যা) শব্দের প্রাকৃত রূপ নহে, কিন্তু হিন্দী তলব্ বা আহ্বান শব্দের প্রতিরূপ, অর্থ—কালরূপ যমের আহ্বান দূর করে। পদটির শব্দঝঙ্কার যেন আরতির ঘণ্টা মৃদঙ্গ ঝাঁঝরির ধ্বনির সঙ্গে একতান হইয়াছে। তাঁহার রচিত এই সঙ্কলনের ৪৯ সংখ্যক পদটিরও শব্দঝঙ্কার অনুপম। দাস গোস্বামী কেমন অল্পাক্ষরে অনেক কথা বলেন তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়—

'উরজ-লম্বি-বেণি মেরুপর যেন ফণি' চরণটিতে। বুকের উপর চুলের বেণী

লুটাইয়া পড়িয়াছে ; দেখিয়া মনে হইতেছে যেন কুচরূপ মেরুর উপরে সাপ শুইয়া রহিয়াছে। ব্রজমণ্ডলের সম্ভ্রান্তঘরের মহিলারা এখনও 'ঝাঁপি ওড়নি তনুপদ অবনী' অর্থাৎ ওড়না দিয়া সমস্ত দেহ শুধু নহে পা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া চলেন। তাঁহার শ্রীরাধা 'মধুরিম হাসিনি কমল-বিকাশিনি'— হাসিতে যেন কমল ফুটিয়া উঠে ; স্মিতহাস্যের শোভায় মুখখানি প্রস্ফুটিত কমলের মতন দেখায়। দাস গোস্বামীর সংস্কৃতে লেখা মুক্তাচরিত, দানকেলিচিন্তামণি ও স্তবাবলী তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

(১৭) শ্রীরূপ গোস্বামী

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে অর্থাৎ ১৫১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের অমাত্য শ্রীরূপ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহাদের সংসার আশ্রমে কি নাম ছিল জানা যায় না, কেননা রূপ-সনাতন নাম প্রভুর দেওয়া। "আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন'' (চৈঃ চঃ ২।১।১৯৫)। শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচলে প্রভুর নিকট কয়েক মাস ছিলেন। তারপর ব্রজমণ্ডলে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ব্রজমণ্ডলে বসিয়া তিনি যে অমূল্য গ্রন্থরাজী রচনা করেন, তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাণ-কেন্দ্র। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের মনের অভীষ্ট কথা শ্রীরূপ গোস্বামী ভূতলে স্থাপন করিয়াছেন। রূপ-সনাতন, গোপালভট্ট ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থাদি শ্রীনিবাস আচার্য্য গৌড়দেশে আনিয়া প্রচার করিলে বাঙ্গালাদেশে পদাবলী-সাহিত্য যেন নূতন এক প্রেরণা লাভ করিল।

শ্রীরূপ বাংলায় কিছু লেখেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার দুই চারিটি সংস্কৃত রচনা ঠিক বাংলা ত্রিপদীর ছাঁদে লেখা। চণ্ডীদাসের একটি পদে ত্রিপদীর মিল এইরূপ—

তুমি ত নাগর রসের সাগর
যেমত ভ্রমর রীত।
আমি ত দুঃখিনী কুল কলঙ্কিনী
হইনু করিয়া প্রীত॥ (তরু ৮১৬)

শ্রীরূপ গোস্বামীর রাসক্রীড়া স্তবের কয়েকটি শ্লোক ত্রিপদীর আকারে সাজাইয়া লিখিতেছি—

ইষ্ট ভজন বল্লভ জন
চিত্তকমলবর ॥
গোপযুবতি মণ্ডলমতি
মোহনকলগীত।
মুক্ত সকল কৃত্যবিকল
যৌবতপরিবীত ॥

অথবা—

বিস্ফুরদিভ নায়কনিভ
মঞ্জুল জলখেল।
চঞ্চলকর পুষ্করবর
কৃষ্ণযুবতিচেল ॥
রত্নভবন সংনিভবন
কুঞ্জবিহিতরঙ্গ
রাগ বিরত যৌবতরত
চিহ্ন বিলসদঙ্গ ॥

শ্রীরূপ গোস্বামী গীতাবলী নাম দিয়া যে ৪১টি অপূর্ব্ব পদ লিখিয়াছেন, তাহা শ্রীজীব গোস্বামী সংগ্রহ করিয়া স্তবমালায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পদগুলির প্রত্যেকটিতে সনাতনের নাম সুকৌশলে লিখিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে এগুলি সনাতনের রচিত। কিন্তু গীতগুলির রচনাশৈলী শ্রীরূপের রচনাভঙ্গীর সঙ্গে অভিন্ন। আর সনাতন নিজে লিখিলে তিনি সনকাদির সহিত সমপদবীতে নিজের নামের উল্লেখ করিতেন না। পদগুলির মধ্যে পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, রাস, দোল, প্রভৃতি বিষয়ের উপর গীত আছে। পদকল্পতরুতে ৪১টির মধ্যে ৩৭টি গীত বিভিন্ন পর্য্যায়ে ধৃত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ সংখ্যক পুথিতে এই গীতগুলির ভাব লইয়া রচিত চমৎকার বাংলা পদ দেখা যায়। শ্রীরূপের

পদ না গাহিলে কীর্ত্তনের কোন পালা সেকালে জমিত না। আমরা সেইজন্য তাঁহার দুইটি গীত এই সঙ্কলনে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

(১৮) রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য

শ্রীচৈতন্যদেব বরাহনগরে আসিয়া রঘুনাথের ভাগবত পাঠ শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে

এইমত রাত্রি তিনপ্রহর-অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণ-নিধি ॥ (চৈঃ ভাঃ ৩।৫)

প্রভুই তাঁহাকে ভাগবতাচার্য্য উপাধি দেন। তিনি স্বতন্ত্রভাবে কোন পদ রচনা করেন নাই। তবে তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে এমন অনেক অংশ আছে যাহা গান করিবার উপযুক্ত। আমরা গোষ্ঠলীলা এবং রাসলীলায় তাঁহার কয়েকটি পদ দিলাম। শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমরগীত এক অপূর্ব্ব কাব্য। যদুনাথ দাস ভ্রমরগীত নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা তাঁহার স্বাধীন রচনা। পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে জ্ঞানদাসের মাত্র দুইটি পদ শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমরগীতের আধারের উপর লিখিত। ঐ পদ দুইটির আস্বাদন যাহাতে পাঠকগণ সম্যক্‌রূপে করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যকৃত ভাগবতের অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে দিব্যোন্মাদের ছয়টি পদ দিলাম। এই পদকয়টি কতটা গীতধর্ম্মী তাহা বলা কঠিন।

(১৯) কানাই খুঁটিয়া

কানাই খুঁটিয়ার মাত্র একটি পদ পদরসসারের পুথিতে পাইয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। কানাই খুঁটিয়া উৎকলবাসী। তাঁহার পক্ষে এরূপ খাঁটি বাংলা পদ (৭২) লেখা সম্ভব কি না, এ সন্দেহ মনে জাগে। তবে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদে মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার কিয়দংশ উৎকলরাজ্যের অধীন ছিল। উৎকলের কোন কোন ভক্তের সঙ্গে গৌড়ীয় ভক্তদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্য ছিল। মহাপ্রভু পুরীতে নন্দোৎসব করিলে, কানাই খুঁটিয়া নন্দ সাজিয়া নাচিয়াছিলেন।

কানাই খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহাতি হইয়াছেন ব্রজেশ্বরী॥ (চৈঃ চঃ ২।১৫)

ইনি 'মহাভাবপ্রকাশ' নামক গ্রন্থ উড়িয়া ভাষায় লিখিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু উহা এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

(২০) দেবকীনন্দন

দেবকীনন্দন বৈষ্ণববন্দনা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অনুরাগ-বল্লীতে ইঁহার সম্বন্ধে আছে—

শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় পুরুষোত্তম মহাশয়।
দৈবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়॥
তেঁহো যে করিলা বড় বৈষ্ণব-বন্দনা॥

ইঁহার রচিত ৫টি মাত্র পদ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটি মাত্র (তরু ২০১১) কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ও বাকী চারটি শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ সম্বন্ধীয়। দেবকীনন্দন বৈষ্ণব বন্দনায় লিখিয়াছেন—

ইষ্টদেব বন্দিব শ্রী পুরুষোত্তম নাম। কি কহিব তাঁহার গুণ অনুপাম॥
সর্ব্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে। আপনার সহজ করুণা শক্তি বলে॥
সপ্তম বৎসর যার কৃষ্ণের উন্মাদ। ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ॥

(২১) কানুরাম দাস

কানুরাম দাস, তাঁহার পিতা পুরুষোত্তম এবং পিতামহ সদাশিব কবিরাজ —এই তিন পুরুষ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের কৃপা পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রী পুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর।
যাঁর দেহে বহে কৃষ্ণপ্রেমামৃতপুর॥ (চৈঃ চঃ ১।১১)

নয়নানন্দ প্রভুর লীলাদর্শন করিয়া পদরচনা করিতেন এরূপ কথা জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় পদসমুদ্র নামক সঙ্কলন গ্রন্থে পাইয়াছিলেন। যথা—

পণ্ডিতের স্নেহপাত্র শ্রীনয়ান মিশ্র।
বাল্যকালে প্রভু যারে করিলেন শিষ্য॥
পণ্ডিতের পাছে নয়ন থাকে সর্ব্বক্ষণ।
প্রভু-লীলা দেখি পদ করয়ে বর্ণন॥
ঐছে চেষ্টা দেখি প্রভু হরষিত হৈলা।
নয়নানন্দ বলি নাম পশ্চাৎ থুইলা॥

এই পদটি অকৃত্রিম কি না বলা কঠিন। গৌর-গদাধর উপাসনাপদ্ধতি চালাইবার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন নয়নানন্দ। হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী সাধনদীপিকায় গদাধরের মহিমা দেখাইবার জন্য বাসু ঘোষের পদ, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত, এমন কি নরোত্তম ঠাকুরের পদ উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু নয়নানন্দের পদ তুলেন নাই। হয়তো ভাইপো কাকার প্রশংসায় মুখর হওয়া স্বাভাবিক বলিয়াই তাঁহার পদ উদ্ধৃত হয় নাই। নয়নানন্দের পদে গৌরনাগর ভাবের বর্ণনাও দেখা যায়। তরুর ৬৯৪ সংখ্যক পদে এক নাগরী স্বপ্নে দেখিলেন যে গোরাচাঁদ "আচম্বিতে আসিয়া ধরল মোর বুক"। বলা যাইতে পারে যে নবদ্বীপ-নাগরীর অবচেতন মনের কামনা হিসাবে এখানে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ দায়ী নহেন।

(২৩) অনন্ত দাস

পদকল্পতরুতে অনন্তদাস-ভণিতায় ৩২টি, অনন্ত আচার্য্য-ভণিতায় ১টি ও অনন্ত রায়-ভণিতায় ১টি পদ ধৃত হইয়াছে। ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে রায় অনন্ত-ভণিতায় দুইটি পদ (১১।২, ২৮।২) পাওয়া যায়, দুইটিই নিত্যানন্দ বন্দনার, তন্মধ্যে প্রথমটি তরুতে অনন্ত-ভণিতায় আছে। গীতচন্দ্রোদয়ে (পৃঃ ২১৩) অনন্ত রায় ভণিতাযুক্ত একটি পূর্ব্বরাগের পদ পাওয়া যায়। শুধু অনন্ত-ভণিতা দিয়া ক্ষণদায় (১৬।১) একটি গৌরাঙ্গ-বন্দনা আছে। অনন্ত আচার্য্যই অনন্তদাস-ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন, কেননা সপ্তদশ শতাব্দীর

দ্বিতীয় পাদে রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী সাধন-দীপিকায় (পৃঃ ২৫৭) প্রামাণ্য লেখকদের মধ্যে 'শ্রীমদনন্তাচার্য্য-পাদ-শ্রীনয়নানন্দপাদাদীনাং পদ্যবল্যাদি'র উল্লেখ করিয়াছেন। এই অনন্তাচার্য্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত অদ্বৈতশাখার অন্তর্ভুক্ত অনন্ত হওয়া সম্ভব। ইঁহার অনেকগুলি পদ পাওয়া যায়। ক্ষণদায় অনন্তদাসের এমন চারিটি পদ (৪।৩, ৯।৮, ১০।৩, ১৫।৩) আছে যাহা পদকল্পতরুতে নাই। তাছাড়া অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে অনন্তদাসের ১৩টি পদ আছে, তন্মধ্যে একটি (৩৯১) ক্ষণদাতে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

অনন্তদাসের কবিত্বশক্তি খুব উচ্চস্তরের না হইলেও, তাঁহার পদের শব্দঝঙ্কার ও ব্যঞ্জনাভঙ্গী উপভোগ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞানদাসের যুগ

শ্রীনিবাস-নরোত্তমের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে অথচ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর যাঁহারা কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে একটি বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই পর্য্যায়ে বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই তিনজন শ্রীচৈতন্যের চরিতাখ্যায়ক, মাধব আচার্য্য ও কৃষ্ণদাস নামে দুইজন শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের লেখক ও জ্ঞানদাসকে সন্নিবিষ্ট করা হইতেছে। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশ রচনার বৎসর পর্য্যন্ত কালের মধ্যে কেবলমাত্র একজন মহাজনকে পাওয়া যায় যিনি শুধু গীতি-কবিতাই লিখিয়াছেন, কোন চরিতগ্রন্থ বা আখ্যায়িকা রচনা করেন নাই। ইনি হইতেছেন জ্ঞানদাস; পদাবলী-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

(২৪) বৃন্দাবনদাস

এই পর্য্যায়ের কবিদের মধ্যে একমাত্র বৃন্দাবনদাসের নাম (১০৯) গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যে এমন কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, যাহা গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত। এগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি পদও তিনি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস-ভণিতায় যত পদ দেখা যায় সব ইঁহার রচনা নহে। পদকল্পতরুতে বৃন্দাবনদাস-ভণিতার ৩৪টি পদ ও গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে ৬৩টি পদ ধৃত হইয়াছে। বৃন্দাবনদাসের আন্তরিকতা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(২৫) লোচনদাস

লোচনদাস মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বন করিয়া চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। চরিতকার হিসাবে তাঁহার খ্যাতি তত নহে যত গীতিকার হিসাবে। তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলের পালা-গান গায়কেরা পায়ে নূপুর বাঁধিয়া

চামর হাতে করিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করিয়া আসর মাতাইয়া তুলিতেন। লোচনের ধামালীর পদগুলিও খুব প্রসিদ্ধ। পদামৃত-সমুদ্রে—

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করোঁ এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার নিধি তাহে ডুবাওল বিধি
চুলে ধরি মোরে কর পার॥

ইত্যাদি প্রার্থনার পদটি লোচনের ভণিতায় দেখা যায়, কিন্তু পদকল্পতরুতে (৩০৯৪) এবং সাহিত্য পরিষদের ৪৯৫, ৪৯৬ ও ১৩৫৯ সংখ্যক পুঁথিতে পদটির ভণিতায় নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নাম আছে। এটি ঠাকুর মহাশয়েরই প্রার্থনার পদ, লিপিকার প্রমাদে বা গায়কদের ভুলে হয় তো লোচনের নাম পদামৃত-সমুদ্রে স্থান পাইয়াছে।

জগন্নাথবল্লভের শ্লোকের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া লোচন যে পদগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় তিনি চমৎকারিত্বে রায় রামানন্দের রচনাকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

লোচন গৌর-নাগরীবাদের একজন প্রধান প্রচারক। গৌর-নাগরীর ভাব-বর্ণনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সহজ কথায়, ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে তিনি নবদ্বীপের নাগরীদের যে অনুরাগ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মাধুর্য্য কোন কোন স্থলে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে তুলনীয়। এই পদটি তাঁহার খুবই প্রসিদ্ধ—

আরো শুনেছ আলো সই গোরা-ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কাঁদে আকুল তথা॥
হলুদ বাটিতে গোরী বসিল যতনে।
হলুদ-বরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপে মনপ্রাণ টানে।
ছন্‌ছনানি মনে লো সই ছট্‌ফটানি প্রাণে॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন কিসের হলুদ-বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা॥

উঠিল গৌরাঙ্গভাব সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটল গেল ছারেখারে॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার॥

লোচন চৈতন্যমঙ্গলের শেষে নিজের পরিচয় লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম সদানন্দী। "মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।" সেই গ্রামের নাম কোগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের নিকট। লোচন নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য— ধর্ম্মে ও কাব্যে উভয় ক্ষেত্রেই।

শ্রীনরহরি দাস দয়াময় দেহে।
কি দেখিয়া করে মোরে অবাধ সিনেহে॥
দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি অনাচারে।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমারে॥ (চৈতন্যমঙ্গল পৃঃ ১১৮)

দুরন্ত পাতকী, অনাচার প্রভৃতি উক্তি বৈষ্ণবীয় দীনতাসূচক মাত্র।

(২৬) কৃষ্ণদাস কবিরাজ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এমন অনেক পদ লিখিয়াছেন যাহা কীর্ত্তনের বহু পালাতেই গীত হয়। পদকল্পতরুতেও চরিতামৃত হইতে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বহু স্থানে রঘুনাথদাস গোস্বামীর কথা লিখিয়াছেন।—রঘুনাথদাস গোস্বামীও তাঁহার মুক্তচরিত্রম্ কাব্যের শেষে কৃষ্ণদাস কবিভূপতির কথা বলিয়াছেন—

যস্য সঙ্গ বলতোঽদ্ভুতা ময়া
মৌক্তিকোত্তমকথা প্রচারিতা।
তস্য কৃষ্ণকবিভূপতের্ব্রজে
সঙ্গতির্ভবতু মে ভবে ভবে॥

—আমি যাঁহার সঙ্গ বলে এই অদ্ভুত মৌক্তিকোত্তম কথা প্রচার করিলাম, আমার জন্মে জন্মে এই ব্রজমণ্ডলে সেই কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গ হউক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার বহু পূর্ব্বে কবিরাজ-গোস্বামী গোবিন্দলীলামৃত লিখিয়া কবিরাজ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

(২৭) মাধব আচার্য্য

কৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতাকে কেহ শ্রীচৈতন্যের শ্যালক, কেহ বা খুড়তুতো শালা বলিয়াছেন। কিন্তু মাধব আচার্য্য স্বয়ং লিখিয়াছেন—

সব অবতার শেষ কলি পরবেশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র গুপ্ত যতিবেশ।
প্রেমভকতিরস করেন প্রকাশ।
কহে দ্বিজ মাধব তাহার দাসের দাস॥ (পৃঃ ১)

দাসের দাস বলিতে শ্রীচৈতন্যের কোন পরিকরের শিষ্য বুঝায়। দেবকীনন্দন তাঁহার বৈষ্ণব-বন্দনায় ইঁহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্বশীতল।
যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

বঙ্গবাসী সংস্করণ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের মধ্যে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী ও পরমানন্দ নামক এক কবির রচনা ঢুকিয়া গিয়াছে। মাধব আচার্য্যের কয়েকটি গীত খুব সুন্দর।

(২৮) কৃষ্ণদাস

কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা কৃষ্ণদাস মাধব আচার্য্যের সমসাময়িক। আজকাল শিল্পবিষয়ক সঙ্ঘ কার্টেল যেমন স্থির করিয়া দেয়, কাহার তৈয়ারী জিনিষ কোন্ কোন্ দেশে চলিবে, তেমনি মাধব আচার্য্য স্থির করিয়া দিয়াছিলেন যে কৃষ্ণ দাসের বই বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে গীত হইবে, অন্যান্য অঞ্চল বোধ হয় নিজের খাসে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ করিবার অধিকার ছিল, কেননা কৃষ্ণদাস নিজেই বলিতেছেন—

আচার্য্য গোসাঞির স্থানে করি ভৃত্যকার্য্য
দেখিঞা করিল দয়া মাধব আচার্য্য॥ (পৃঃ ৩৮৫)

এবং দয়া করিয়াই তিনি বলিলেন—

দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার।
এথাতে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার॥ (পৃঃ ৬)

সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত ইঁহার গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল হইলেও,

কবি তাঁহার গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন—"মাধবচরিত"। কেননা অধিকাংশ প্রসঙ্গের শেষেই আছে—"মাধব-চরিত গান যাদবনন্দন" যথা পৃঃ ১২, ১৫, ২২, ২৫, ৫৫, ১৩৭ ইত্যাদি। কবির পিতার নাম যাদব। কৃষ্ণদাসের বাৎসল্যরসের বর্ণনার মধ্যে মৌলিকতা আছে। দানলীলা লিখিতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন—

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে॥ (পৃঃ ১৩৭)

পূর্ব্ববঙ্গের কবি ভবানন্দও প্রতি অনুচ্ছেদের শেষে এই হরিবংশের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন—

সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সংক্ষেপে রচিল পুণ্য-শ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥

প্রচলিত সংস্কৃত হরিবংশে রাধার নাম পর্য্যন্ত নাই। জৈন হরিবংশের ন্যায় অপর কোন হরিবংশ নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল বলিয়া উভয় কবিই তাহার দোহাই দিয়াছেন।

(২৯) জ্ঞানদাস

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ শাখায় এক জ্ঞানদাসের নাম পাওয়া যায়—

পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥ (১।১১)

এই জ্ঞানদাস কবি জ্ঞানদাস হওয়া অসম্ভব নহে। জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দের ভাববর্ণনার পদগুলি দেখিয়া মনে হয় যে কবি যেন নিজে চোখে দেখিয়া এগুলি লিখিতেছেন। ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রতি রাত্রিতে গেয় পদাবলীর প্রথমে গৌরাঙ্গচন্দ্রের ও পরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বর্ণনামূলক পদ সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় গৌরচন্দ্রিকার মতন নিত্যানন্দচন্দ্রিকারও প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের

অন্তরঙ্গদের মধ্যে বৃন্দাবনদাসের তিনটি (২।২, ৮।২, ১৪।২) বাসুঘোষের দুইটি (২৬।২, ২৭।২), বলরামদাসের দুইটি (১২।২, ২৫।২), লোচনের দুইটি (৪।২, ১৭।২), অনন্তরায়ের দুইটি (১১।২, ২৮।২) এবং এক একটি করিয়া কানুদাসের ও শঙ্করঘোষের পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ক্ষণদায় জ্ঞানদাসের তিনটি পদ (৯।২, ১৩।২, ২২।২) চক্রবর্ত্তী পাদ ধরিয়াছেন দেখিয়া মনে হয় জ্ঞানদাসকে তিনি নিত্যানন্দলীলার প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। পদ তিনটি পড়িলেও সেইরূপই মনে হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'জ্ঞানদাসের পদাবলী'তে কোন আকর গ্রন্থের নাম নাই, পাঠান্তর নাই, পদসূচী নাই। এমন কি পদগুলির ক্রমিক সংখ্যা পর্য্যন্ত নাই। ক্ষণদা হইতে পদ তিনটি উদ্ধৃত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থের পাঠান্তর দেখাইতেছি—

দেখরে ভাই ; প্রবল মল্লরূপ-ধারী।
নাম নিতাই ভায়া বলি রোয়ত
লীলা বুঝই না পারি ॥১
ভাবে বিঘূর্ণিত লোচন ঢর ঢর
দিগ বিদিগ নাহি জান।
মত্ত সিংহ যেন গরজে ঘনে ঘন
জগ মাহ কাহু না মান ॥২
লীলারসময় সুন্দর বিগ্রহ
আনন্দে নটন-বিলাস।
কলি-মদ-দলন দোলন গতি মন্থর
কীর্ত্তন করল প্রকাশ ॥৩
কটি-তটে বিবিধ বরণ পট পহিরণ
মলয়জ লেপন অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে বিধি আনি মিলাওল
কলি মাহ ঐছন রঙ্গে ॥৪

(ক্ষণদা ১৩।২)

এই পদটি যেভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মনে হয় কবি নিজে দেখিয়া

অপরকে প্রবল মল্লরূপধারী নিত্যানন্দকে দেখাইয়া দিতেছেন। বৃন্দাবনদাসও শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলিয়াছেন যে নিত্যানন্দ "পরমমোহন সঙ্কীর্ত্তন-মল্ল বেশ" (৩।৫)। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণে দ্বিতীয় কলিটিকে প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। প্রথম কলিটিতে আছে—

দেখ দেখ পুরণ মল্লরূপধারি

তৃতীয় কলিতে 'কলিমদদলন' স্থলে 'কলিবন দলন' পাঠ ধরা হইয়াছে এবং পাদটীকায় তাহার ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে যে 'কলিবন দলন' মত্ত সিংহের সহিত উপমার প্রকাশক ;—কিন্তু সিংহ বনকে দলন করে না, হস্তীই করে ; হয়তো তাঁহাদের পুথিতে পাঠ ছিল 'কলিবল দলন' তাহাই ছাপায় 'কলিবন দলনে' দাঁড়াইয়াছে। নিত্যানন্দের কটিতটে যে বিবিধ বর্ণের পট্টবস্ত্র থাকিত তাহার সাক্ষ্য বৃন্দাবন দাসও দিয়াছেন—

শুক্ল নীল পীত—বহুবিধ পট্টবাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস (৩।৫)॥

ক্ষণদাধৃত দ্বিতীয় পদটির (৯।২) সহিত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের বিশেষ পার্থক্য শেষ কলিটিতে দেখা যায়।

ক্ষণদার পাঠ—

রামদাসের পহুঁ সুন্দর বিগ্রহ
গৌরীদাস আন নাহি জানে
অখিল লোক যত ইহ রসে উনমত
জ্ঞানদাস নিতাই-গুণ গানে॥

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের পাঠ—

রামদাসের পহু সুন্দরের জীবন
গৌরীদাসের ধন প্রাণ।
অখিল জীব যত এহ রসে উনমত
জ্ঞানদাস গুণ গান॥

উভয় পাঠেই দেখা যায় যে নিত্যানন্দের সঙ্গে অভিরাম-রামদাসের ও গৌরীদাসের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুন্দর-বিগ্রহ নিত্যানন্দের বিশেষণ রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে, পাঠান্তরে সুন্দরানন্দ ঠাকুরের কথা

সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখাভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম॥

(চৈঃ চঃ ১।১১।২৩)

তৃতীয় পদটিতেও (ক্ষণদা ২২।২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণের পাঠের সহিত প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। ক্ষণদার পাঠ এই—

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বলায়॥
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ড-মতি না রাখিল দেশে॥
পাট-বসন পরে নিতাই মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল ঝলমল করে নানা আভরণে॥
সঙ্গে সঙ্গে যায় নিতাইর রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর॥
চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশিদিশি নিতাইর গুণ গায়॥

ভক্তিরত্নাকর পৃঃ ৯৭৬ এবং পদকল্পতরু ২৩০৬ সংখ্যক পদেও প্রায় এই পাঠ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণের পাঠে এমন সামনের উপর দেখার ছবি ফুটিয়া উঠে না। উহা এইরূপ—

পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল করে অঙ্গ নানা আভরণে॥
পিঠে দোলে পাট থোপা তাহে হেম ঝাঁপা।
কলি-কল্মষ-রাশি নাশি করে কৃপা॥
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় গৌর বোলায়॥
লাফে ঝাঁপে পহুঁ গৌর আবেশে।
পাপ পাষণ্ডি-মতি না থুইল দেশে॥
দয়ার কারণে পহুঁ ক্ষিতিতলে আসি।
অবিচারে দিল পহুঁ প্রেম রাশি রাশি॥

সঙ্গে প্রেম-রসে সঙ্গী রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর॥
চৌদিশে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়।
জ্ঞানদাস লাখ মুখে পঁহু গুণ গায়॥

১৩০৪ সালে 'বসুমতী'র 'প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী'তে (পৃঃ ৫৫) এবং ১৩১২ সালে দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'বৈষ্ণবপদ লহরী'তে (পৃঃ ২৬৬) এইরূপ পাঠই পাওয়া যায়। কিন্তু এই পাঠের অপেক্ষা ক্ষণদা ও তরুতে প্রদত্ত পাঠ উৎকৃষ্টতর।

নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং ও তাঁহার সঙ্গীরা গোপাল-ভাবে মত্ত হইতেন বলিয়া বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন।

হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ-মল্ল রায়।
করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাল লীলায়॥ ৩।৫

তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে

প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ॥ (ঐ)

তারপর

কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস দুইজন।
গোপালভাবে হৈহৈ করে সর্ব্বক্ষণ॥ (ঐ)

এইজন্য জ্ঞানদাস ষোড়শ গোপালের (শ্রীদাম, সুদাম, স্তোককৃষ্ণ, সুবল, অংশুমান, বসুদাম, কিঙ্কিণী, অর্জ্জুন, দেবদত্ত, সুনন্দ, বরুথপ, নন্দক, বিশালা, বিষয়া, এবং উজ্জ্বল ও সুবাহু) বেশভূষা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ইহার মধ্যে প্রথম চৌদ্দজনের কথা বলিতে যাইয়া লেখা হইয়াছে

"শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা
শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণ—দ্বাদশ গোপালের রূপ।"

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় আমার দৃষ্টি প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীতে (পৃঃ ৬০) প্রদত্ত অন্য একটি পদের প্রতি—যাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণে নাই—আকর্ষণ করেন। উহাতে উজ্জ্বল ও সুবাহুর রূপবেশ বর্ণনা করিয়া জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের পরিকরদের মতন গোপাল

ভাব (সখ্যরস) প্রার্থনা করিতেছেন—

সংক্ষেপে কহিনু এই ষোড়শ গোপাল।
লক্ষ লক্ষ গোপ আছে বিনোদ রাখাল ॥
জ্ঞানদাসেতে কহে সে দিন কবে হব।
যে দিন রাখাল পদে আশ্রিত হইব ॥

জ্ঞানদাস জাহ্নবাদেবীর শিষ্য বলিয়া প্রবাদ আছে। উপরে উল্লিখিত তাঁহার পদগুলি দেখিলে সন্দেহ থাকে না যে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান একচাকা হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে বর্দ্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাঁদড়ায় জ্ঞানদাসের যে মঠ আছে, তাহাতে পৌষ-পূর্ণিমা তিথিতে কবির তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

জ্ঞানদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবি তাঁহার মতন এত অধিক লীলার পদ লেখেন নাই। বলরামদাসের আক্ষেপানুরাগের কোন পদ দেখা যায় না। জ্ঞানদাসের বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতার পদ সংখ্যায় কম হইলেও কাব্য-সুষমায় অন্য কোন কবির রচনা হইতে ন্যূন নহে। জ্ঞানদাসের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে তাঁহার পূর্ব্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, দান ও নৌকাবিলাসের পদাবলী। কিন্তু এইসব পদরচনার পূর্ব্বে তিনি বিদ্যাপতির অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া হাত পাকাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহার বয়ঃসন্ধি, নবোঢ়া-মিলন প্রভৃতি লইয়া রচিত পদগুলির মধ্যে সেই চেষ্টার সুস্পষ্ট চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। যেমন গীতচন্দ্রোদয়ে (৪১১ পৃঃ) ও কীর্ত্তনানন্দে (১৪১ পৃঃ) ধৃত জ্ঞানদাসের পদের

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ ॥

এই দুই চরণ তরু ধৃত (৮০) বিদ্যাপতি-ভণিতাযুক্ত পদের প্রথম দুই চরণ। ইহার পর অবশ্য বাকী বারটি চরণ জ্ঞানদাসের নিজস্ব। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন (তরু ১০৫)

কো কহে বালা কো কহে তরুণী।

জ্ঞানদাসের পদে (পদাবলী পৃঃ ৩৬) পাই—

কি কহব মাধব বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী॥

বিদ্যাপতি রাধার বিরহ বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে রাধার "অঙ্গুরি বলয়া ভেল কামে পিন্ধায়ল"। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া জ্ঞানদাস বলিতেছেন—"অঙ্গল-আঙ্গুরি বলয়া ভেল। জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল" (ক্ষণদা ১৮।৫)। জ্ঞানদাস নবোঢ়া-মিলন বিষয়ক পদগুলিও বিদ্যাপতির আদর্শ সামনে রাখিয়া লিখিয়াছিলেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

বিদ্যাপতি (মিত্র-মজুমদার ২৭৭)	বদর সরিস কুচ পরসব লহু।
	কত সুখ পাওব করিত উহু উহু॥
জ্ঞানদাস (পদাবলী, পৃঃ ৮০)	উরজ উঠল জনু বদরি।
	করে জনি ঝাঁপহ সগরি॥
বিদ্যাপতি—(ঐ, ২৮১)	কাঁচ কমল ভ্রমরা ঝিক-ঝোর।
জ্ঞানদাস—(ঐ, ৮২)	কলিকা কমলে ভ্রমর নহ মেলি॥

ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে ধৃত (৮।১৫) নিম্নলিখিত পদটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে নাই,—কিন্তু এটির বর্ণনাভঙ্গী অবিকল বিদ্যাপতির মতন।

অবনত-বয়ণী না কহে কছু বাণী।
পরশিতে তরসি ঠেলই পহুঁ পাণি॥
সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ।
অভিমানী রাই না মানয়ে বোধ॥
পিরীতি-বচন কছু কহল বিশেষ।
রাইকো হৃদয়ে দেখল রস-লেশ॥
পহিরণ-বাস ধরল যব হাত।
তব ধনী দিব দেওল নিজ মাথ॥
রস-পরসঙ্গে করয়ে বহু রঙ্গ।
নিজ পরথাব নামে দেই ভঙ্গ॥
নাহক আদর বহুত বাঢ়ায়।
জ্ঞানদাস কহে এত না জুয়ায়॥

বিদ্যাপতির—(ঐ, ৫৯) নিম্নলিখিত পদটির প্রভাব উপরে উদ্ধৃত পদের উপর লক্ষ্য করা যায়।

বালমু বেসনি বিলাসিনি ছোটি।
মেল না মিলএ দেলহু হিম কোটি॥
বসন ঝপাএ বদন ধর গোত্র।
বাদর তর সসি বেকত ন হোত্র॥
ভুজ-জুগ চাঁপ জীব জেঁ সাঁচ।
কুচ কঞ্চন কোরী ফল কাঁচ॥
লগ নহিঁ সরত্র, করএ কসিকোর।
করে কর বারি করহি কর জোর॥

কিন্তু জ্ঞানদাস নিতান্ত দৈহিক ব্যাপারের মধ্যে সুকৌশলে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নায়িকা অনভিজ্ঞা বটে, কিন্তু বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্তা নায়িকার মতন তাহারও রসালাপ শুনিতে খুব ইচ্ছা

(তুলনীয়—কেলিক রভস জব সুনে।
অনতত্র হেরি ততহি দত্র কানে॥ বিদ্যাপতি ৬১৬)

তাই সে স্পর্শ-ভয়ে ভীতা হইলেও, ভালবাসার কথা শোনে, এবং তাহাতে তাহার হৃদয়ে রসের সঞ্চার হয়—

পিরীতি বচন কছু কহল বিশেষ।
রাইকো হৃদয়ে দেখল রস-লেশ॥

সে রসের প্রসঙ্গে রঙ্গ করে, কিন্তু

নিজ পরথাব নামে দেই ভঙ্গ

অর্থাৎ আসল প্রস্তাবের কথায় পশ্চাৎপদ হয়। জ্ঞানদাস বিদ্যাপতির অনুকরণে দৃষ্টকূট বা প্রহেলিকাময় পদও রচনা করিয়াছেন। "সজনি কি পেখনু নীপমূলে ধন্দ" (পদাবলী ৬৯ পৃঃ) তাহার উদাহরণ। পদটির উৎকৃষ্টতর পাঠ সাহিত্য পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে আছে।

শিক্ষানবিশীর যুগে জ্ঞানদাস বসু রামানন্দের পদেরও অনুকরণ করিয়াছিলেন। বর্তমান সঙ্কলনের ১৮৫ সংখ্যায় বসু রামানন্দের পদটি দেওয়া হইয়াছে। বিলাস-কুঞ্জে নিদ্রা হইতে উঠিতে দেরী হইয়া গিয়াছে,

গোকুলের পথে লোকজন চলাফেরা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই বসু রামানন্দের রাধা কৃষ্ণকে অনুরোধ করিতেছেন

তোমার পীতবাস আমারে দাও পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলায়্যা কবরী॥

জ্ঞানদাসের রাধাও বলিতেছেন—

তোমার পীত ধটি আমারে দেহ পরি।
উভ করি বাঁধ চূড়া আউলাইয়া কবরি॥

(পদাবলী, পৃঃ ১০১)

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ভবানন্দের রাধাও ঐরূপ কথা বলিতেছেন দেখা যায়—

তোমার অম্বর পীত মোরে দেহ পৈন্ধি।
আমার হাতে দেহ তোমার মোহন মুরারি॥
কবরী খসাঞা বন্ধু বান্ধিয়া দেহ চূড়া।
দোসুতী গাঁথিয়া দেহ মুকুতার ছড়া॥
মউরের পুচ্ছ বন্ধু দেও তছু পরে।
ই রূপ দেখিলে লোকে না পুছিব মোরে॥
তোমার সমান বেশ সাজাইয়া মোরে দেহ।
প্রেম-সখা হেন কৈমু জিজ্ঞাসিলে কেহ॥

শেষ চরণটি বসু রামানন্দের পদের—

"মোর প্রিয়সখা কৈয় সুধাইলে গোকুলে"

অনুবাদ মাত্র। তথাপি সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন যে বসু রামানন্দ ও ভবানন্দ উভয়ে স্বাধীনভাবে ঐ পদ দুইটি লিখিয়াছিলেন (ভবানন্দের হরিবংশের ভূমিকা, পৃঃ ৫।৴০, ৫॥০)। বসু রামানন্দের রচিত রাধার স্বপ্নের পদটির (৭১) অনুকরণে জ্ঞানদাস "মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা" ইত্যাদি (পদাবলী পৃঃ ৪৫, গীতচন্দ্রোদয় ২৬৩, তরু ১৪৪) লিখিয়াছেন। ঐ পদের প্রতিধ্বনি মিলে

রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে॥

বসু রামানন্দের কৃষ্ণের মত জ্ঞানদাসের কৃষ্ণও বলেন

"আমা কিন বিকাইলুঁ বোলে।"

শিক্ষানবীশির যুগে জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও বসু রামানন্দের পদ সামনে রাখিয়া গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কবি-প্রতিভা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়া উঠিতে বেশী সময় লয় নাই। তিনি বিদ্যাপতির আলঙ্কারিক রীতি পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডীদাসের ও নরহরি সরকারের সহজ সরল মরমী রীতিতে পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পথে তাঁহার সাফল্য হইল অনন্যসাধারণ। দেহের সঙ্গে মনের যে নিবিড় সম্পর্ক তাহা জ্ঞানদাসের পদে যেমন অভিব্যক্ত হইয়াছে এমনটি আর কোন বৈষ্ণব মহাজনের পদে নহে। রূপ আর গুণ এই দুইটি হইতেছে প্রেম আকর্ষণের প্রধান উপায়—একটি বাহিরের বস্তু, অপরটি অন্তরের। উভয়েরই যুগপৎ আকর্ষণে জ্ঞানদাসের রাধা বলেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।

এই যে দয়িতের রূপ দেখিবার জন্য আকুলতা তাহাই প্রকাশ পায়

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।

কিন্তু এ মিলন কি শুধু দৈহিক? না, শুধু দেহের মিলনে শান্তি নাই—অন্তরের মিলন চাই—

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।

প্রিয়তমের দর্শন চাই, তাঁহার স্পর্শ লাভ করিবার জন্য মন ব্যাকুল, আর মনের সেই অধীরতার দরুণ রাধার কেমন অবস্থা হইতেছে তাহা একটি অত্যন্ত ঘরোয়া সাধারণ কথায় জ্ঞানদাস প্রকাশ করিয়াছেন—

দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥

রাধাকে মুগ্ধা করিয়া আঁকাই ছিল প্রাক্-জ্ঞানদাস যুগের রীতি। জ্ঞানদাস তাঁহাকে প্রগল্‌ভা ও সুরসিকা করিয়া আঁকিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

ছলে দরশায়ল উরজক ওর।
আপনি নেহারি হেরল মোহে থোর॥
বিহসি দশন আধ দরশন দেল।
ভুজে ভুজ বান্ধি অলপ চলি গেল॥

রাধিকা অতি সুকৌশলে বুকের একটু সীমা মাত্র দেখাইলেন; নিজের দিকে প্রথম তাকাইয়া কৃষ্ণের দিকে অল্প তাকাইলেন, তারপর একটুমাত্র দন্ত বিকাশ করিয়া স্মিত হাসিয়া ভুজে ভুজে বাঁধিয়া আলিঙ্গনের ইঙ্গিত করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে গোপালদাস রাধাকে আরও প্রগল্‌ভা করিয়া আঁকিয়াছেন

আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া বিকল কৈলে মোয়।
ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচ, বসন ঘুচে, মুচকি মুচকি হাস॥ —রসকল্পবল্লী

জ্ঞানদাস শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করেন নাই, কিন্তু গোপালদাসের বেলায় সে কথা বলা যায় না।

বস্তুর সঙ্গে অবস্তুর এবং জড় জগতের সঙ্গে ভাবজগতের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক দেখাইতে জ্ঞানদাসের সমকক্ষ বৈষ্ণব কবি আর নাই।

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ কেমন তাহা রাধা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি শুধু বলিলেন যে, সে যেন রূপের সমুদ্র— তাহার সীমা নাই, কুল নাই; তাহাতে চোখ পড়িল, সে চোখ আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না, যেন অমৃতের সমুদ্র পাইয়া চক্ষু তাহাতেই ডুবিয়া রহিল। শ্রীকৃষ্ণ তরুণ, তাঁহার তারুণ্য কেমন তাহা রাধা বর্ণনা করিতে পারেন না; তিনি শুধু জানেন যে প্রিয়তমের যৌবন যেন শ্যামল শ্রীতে পরিপূর্ণ দিগন্ত-বিস্তৃত এক বন, তাহাতে তাঁহার মন প্রবেশ করিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। রসজ্ঞ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"যে যৌবনের চির-নূতন শ্যামল শোভা দর্শনকারিণীর চিত্তকে সৌন্দর্য্যের গোলকধান্ধায় চিরকাল ঘুরাইয়া ফিরায় ও উহা হইতে বাহির হওয়ার পথ দেয় না, তাহাকে যৌবনের

গহন বন ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?” (তরু ১২৩)। রাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপরাশির দিকে বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছেন, তাঁহার আর বাড়ী ফিরিবার জন্য পা আগাইতেছে না, কাজেই

“ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।”

শ্রীকৃষ্ণের কপালে চন্দন দিয়া চাঁদ আঁকা হইয়াছে, আর চাঁদের কলঙ্ক দেখাইবার জন্য উহার মধ্যে মৃগমদকস্তুরীর বিন্দু দেওয়া হইয়াছে—তাহাতে এমন অপরূপ বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে যে রাধার হৃদয়-পুত্তলী তাহাতে বান্ধা পড়িয়া গেল।

জ্ঞানদাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি শুধু রাধা কৃষ্ণকে কিরূপ ভালবাসেন তাহা দেখান নাই, কৃষ্ণও রাধাকে কিরূপ সোহাগ করেন, ভালবাসেন তাহাও দেখাইয়াছেন। রাধা সখীদের নিকট নিজের সৌভাগ্য ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন যে ঘুমের ঘোরে তিনি একটু জোরে নিশ্বাস লইলেও কৃষ্ণ ‘কি হইল, কি হইল’ বলিয়া ভয়ে ব্যাকুল হন—

ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ নিশাস।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস॥ (তরু ৬৬৮)

কৃষ্ণ গায়ে চন্দন পর্য্যন্ত মাখেন না, পাছে চন্দনের প্রলেপের জন্য হিয়ায় হিয়া লাগাইতে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়—

হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে। (তরু ৬৭৮)

ইহার মধ্যে অবশ্য বিদ্যাপতির (৭২৭) ‘চির চন্দন উরে হার ন দেলা’র প্রতিধ্বনি আছে। কিন্তু যাহা রাধার কাজ ছিল তাহা কৃষ্ণে আরোপ করায় বৈচিত্র্য স্পষ্ট হইয়াছে।

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥ (তরু ৬৯১)

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণে ইহার পাঠ

হাসি হাসি মোর মুখ নিরখয়ে
মনে মনে কথা কয়।

কায়ার সহিত ছায়া মিশাইতে
পথের নিকট রয় ॥

"মনে মনে কথা কয়" পাগলের লক্ষণ, এখানে উহা নিরর্থক সুতরাং তরুধৃত "মধুর কথাটি কয়" পাঠই ঠিক মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে (পৃঃ ২০১)

"কি মোর এঘর দুয়ারের কাজ
লাজে কহিবারে নারি" ইত্যাদি

পদের ভণিতায় জ্ঞানদাসের নাম পদকল্পতরুতে ৮৪৭ নাই বটে, কিন্তু পদামৃত সমুদ্রে (পৃঃ ২৪৯) আছে। সেখানে শেষ কলি এই—

সো মুখ না দেখি পরাণ বিদরে
রহিতে নারিয়ে বাসে।
এমত পিরিতি জগতে নাহিক
কহই এ জ্ঞানদাসে ॥

রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে জগতে অতুলনীয় এই কথা এখানে কবি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে রাধামোহন ঠাকুর ধৃত এই প্রামাণিক পাঠের পরিবর্ত্তে মুদ্রিত আছে

গঞ্জে গুরুজন লুব কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
জ্ঞানদাস কহে এ অঙ্গ বেচ্যাছি
তিল তুলসী দিয়া ॥

জ্ঞানদাস দেহ হইতে মনকে পৃথক্ করিয়া দেখেন নাই, এবং শুধু দেহের (এ অঙ্গ বেচ্যাছি) কথা কোথাও বলেন নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা।

দানলীলায় জ্ঞানদাসের রাধা বংশীবদনের রাধার চেয়েও বেশী টিট্‌কারী দিয়া কৃষ্ণকে ধিক্কার দিতেছেন। কৃষ্ণ যে সুন্দর নহেন এ কথাও রাধা প্রমাণ করিয়া দিলেন—

সহজই তনু তিরিভঙ্গ
এমন হইয়া এত রঙ্গ।

যবে তুমি সুন্দর হইতা
তবে নাকি কাহারে থুইতা ॥

(তরু ১৪০৭)

ইহাতেও কৃষ্ণ ক্ষান্ত হইলেন না দেখিয়া রাধা ভয় দেখাইয়া বলিতেছেন—

কাড়ি নিব পীতধড়া আউলাইয়া ফেলিব চূড়া
বাঁশীটি ভাসাইয়া দিব জলে।
কুবোল বলিবা যদি মাথায় ঢালিব দধি
বসিতে না দিব তরুতলে ॥

(পদাবলী, পৃঃ ১১২)

জ্ঞানদাস নিজেও রাধার পক্ষে, তিনিও কৃষ্ণকে শাসাইতেছেন—

কুলবধূ সনে হাস ইথে নাহি লাজ বাস
জ্ঞানদাস কংসে দিবে কইয়া ॥

কিন্তু রাধা যখন কৃষ্ণকে বলিলেন

কাচে কর কাঞ্চন সমান।

তখন জ্ঞানদাস কৃষ্ণের হইয়া বলিতেছেন যে কৃষ্ণ কাচ নহেন, খাঁটি সোনা, বিশ্বাস না হয় তো তোমার বক্ষরূপ কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখ —

শুনি জ্ঞানদাস কহে হিয়ায় কষিয়া লহ
কাচ নহে কষটি পাষাণ ॥

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে দানলীলার শেষে "রাধামাধব নীপ মূলে" ইত্যাদি গোবিন্দদাসের সুপ্রসিদ্ধ পদটি জ্ঞানদাস ভণিতায় দেওয়া হইয়াছে। উহার পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে যে "পদকল্পতরুতে এই পদের ভণিতা নাই" ; একথা আংশিক সত্য। পদটি দুই স্থানে ধৃত হইয়াছে, ১৩৬৭ সংখ্যকে ভণিতা নাই কিন্তু ১৪০৫ সংখ্যায় গোবিন্দদাস ভণিতা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ পুথিতেও (পৃ ২৬) গোবিন্দদাস ভণিতা দেখা যায়। জ্ঞানদাসের দুই একটি চরণ গোবিন্দদাসের পদের মধ্যে পাওয়া যায় যেমন জ্ঞানদাসের

সিন্দূর-বিন্দু ভালে কিবা ভাতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি। (তরু ১৩৫৬)

গোবিন্দদাসের

চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম-পাতি। (তরু ১৩৭৩)

জ্ঞানদাসের নৌকা-বিলাসের পদগুলির মধ্যেও তাঁহার রসের বৈচিত্র্য সৃষ্টি-ক্ষমতার নিদর্শন পাওয়া যায়। গতানুগতিকতা পরিহার করিয়া জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ বলিতেছেন—

কি আর করিব বল উথলে যমুনা জল
কাণ্ডার করেতে নাহি রয়।
এতদিনে নাহি জানি লোকমুখে নাহি শুনি
যুবতি-যৌবন এত ভারি ॥ (পদাবলী, পৃঃ ১১৮)

অন্যত্রও

জলের ঘুরণী বড় তরণী আমার দড় অশ্বগজ কত নরনারী।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যত পার করি শতশত যুবতী যৌবন এতে ভারী ॥
(পদাবলী, পৃঃ ১২১)

কৃষ্ণ শুধু যৌবনের গুরভারের কথা বলেন না, তিনি বলেন—আমি নৌকা চালাইব কি করিয়া, তোমরা যে ক্ষীর সরের সহিত আমাকে কি যেন খাওয়াইয়া গুণ করিয়াছ, আমি তোমাদের মুখ ছাড়া আর অন্য কোন দিকে তাকাইতেই পারিতেছি না—

খাওয়াইয়া খীর সর কি গুণ করিলা মোরে
আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই জল না দেখিতে পাই
তোমরা হইলা প্রাণের অরি ॥ (পদাবলী, পৃঃ ১১৮)

বংশীবদন নৌকাবিলাসের লীলা বর্ণনায় বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ ও সহযোগিতা দেখাইয়াছেন—

কুম্ভীর মকর মীন উঠত
সঘনে বদন তুলি।
হরিষে যমুনা উথলে দ্বিগুণা
রাই কানু রূপে ভুলি ॥ (১৬৯)

অনুরূপভাব জ্ঞানদাস বা অন্য কোন কবির রচনায় দেখা যায় না। বংশী-বদনের রাধা সত্যসত্যই কটাক্ষদৃষ্টিতে কৃষ্ণের মন চুরি করিয়াছিলেন —তিনি স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণকে আঁচল ধরিতে উৎসাহিত করিলেন—

হাসি কহে গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই
অশ্ব গজ কত করি পার।
দেবতাগন্ধর্ব্ব কত পার হইছে শত শত
যুবতী যৌবন কত ভার॥
শুনি বিনোদিনী রাই নয়ন ইঙ্গিত চাই
কানু মন করিলেন চুরি।
হাসি হাসি ধীরে ধীরে এ ভাঙ্গা তরণী পরে
আঁচলে ধরিলা যাই হরি॥

(মাধুরী ৪।৪০৮ পৃঃ)

জ্ঞানদাসের রাধা কৃষ্ণকে কোন প্রকার উৎসাহ তো দেনই নাই; বরং অভিযোগ করিয়া বলিতেছেন—

কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে ন্যায়া মোরে কোলে করি নিল॥ (তরু ১৪১৩)

জ্ঞানদাসের বংশীশিক্ষায় রাধা কৃষ্ণের নিকট জানিতে চাহিতেছেন যে কোন্ রন্ধ্রে ফুঁ দিয়া কৃষ্ণ কদম্বতরুতে ফুল ফোটান, কি ভাবেই বা যমুনাকে উজান বহান, কোন্ রন্ধ্রে বাজাইলে ময়ূর নাচিয়া উঠে, আর কেমন ধ্বনি করিলে বা "ষড়ঋতু হয় এককালে"। রাধা বংশী বাজাইবার কৌশল আয়ত্ব করিয়া যে ভাবে বিভিন্ন রাগরাগিণীতে গান করিলেন, তাহাতে মনে হয় জ্ঞানদাস শুধু গীতিকবিতা রচনাতেই পারদর্শী ছিলেন না, সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল।

মায়ূর মঙ্গল আর গায়ত পাহিড়া।
সুহই ধানশী আর দীপক সিন্ধুড়া॥
রাগ রাগিণী শুনি মোহিত নাগর।
শুনিয়া দিলেন তারে হার মনোহর॥ (পদাবলী, পৃ. ১২৭)

মায়ূর বোধ হয় মায়ূরী বা মায়ূরিকা ; হিন্দোল রাগের প্রথমা ভার্য্যা। মঙ্গল পঞ্চম রাগ। পাহিড়া ও পহাড়ী একই রাগ—

ষড়্জএয়া পাহাড়ী স্যাদ্ রি-প-হীনা তথৌড্রবা।

সুহই ও ধানশী রাগে পদাবলীর বহু পদ কীর্ত্তন করা হয়। ক্রমে দুইটি করিয়া দ্রুত, লঘু ও গুরু মাত্রার তালকে দীপক বলে। সিন্ধুড়া মালব রাগের চতুর্থ স্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় জ্ঞানদাস হয়তো পদ লিখিয়া নিজেই সুর সংযোজনা করিয়া গাহিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীনিবাস-নরোত্তমের যুগ

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে কয়েকজন প্রতিভাবান বৈষ্ণব গীতিকারের আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ। ইনি শ্রীচৈতন্যের পরিকর চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় কবি কর্ণপূর চিরঞ্জীব সেনকে 'মহত্তর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

খণ্ডবাসৌ নরহরেঃ সাহচর্য্যান্মহত্তরৌ
গৌরাঙ্গৈকান্তশরণৌ চিরঞ্জীব-সুলোচনৌ॥ ২০৯

খণ্ডবাসী নরহরির সাহচর্য্যহেতু চিরঞ্জীব ও সুলোচন মহত্তর; উভয়েরই শ্রীগৌরাঙ্গদেব একান্ত আশ্রয়। শ্রীচৈতন্য যে ভাবধারা অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন তাহা শ্রীবৃন্দাবনে রচিত রসশাস্ত্রের প্রভাবে কি আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা গোবিন্দদাসের পদাবলী হইতে বুঝা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায় যেমন পনেরো জন কবিকে পদরচনায় প্রবৃত্ত হইতে দেখিতে পাই, তেমনি শ্রীনিবাস-নরোত্তমের যুগেও অন্ততঃ আর পনেরো জন কবিকে আবির্ভূত হইতে দেখি। ইঁহারা হইতেছেন শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, বীর হাম্বীর, নৃসিংহদেব, শ্রীনিবাসের পুত্র গোবিন্দগতি, গোবিন্দকবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার শিষ্য বল্লভদাস, বসন্ত রায় ও প্রথম উদ্ধব দাস, গদাধরদাসের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, রঘুনন্দনের শিষ্য রায় শেখর এবং নরোত্তম-শ্রীনিবাসের সহচর উৎকলবাসী শ্যামানন্দ। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী 'সাধনদীপিকা'য় লিখিয়াছেন —"উৎকলনিবাসি শ্রীশ্যামানন্দাদীনাং পদাবলী প্রসিদ্ধা" (পৃ. ২৫৮)। সুতরাং বর্ত্তমান সঙ্কলনের ১০৩ সংখ্যক পদ পদকল্পতরুধৃত শ্যামানন্দ ভণিতাযুক্ত আর দুইটি পদ (২৮৪৩ এবং ৩০৪০) যে ইঁহারই রচনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প। গোবিন্দদাস কবিরাজের সম্বন্ধে আমার একখানি বড় বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে, সেইজন্য তাঁহার কবিত্ব-

শক্তি সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কোন আলোচনা করিলাম না। শ্রীনিবাস একাধারে পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁহার তিনটি মাত্র পদ হরিদাসদাস বাবাজী মহোদয় শ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থমালায় দিয়াছেন, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে (পৃ, ১৩৯২) লিখিয়াছেন—"আচার্য্য প্রভু মাত্র পাঁচটি পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ"। আমরা শ্রীনিবাসের আরও দুইটি পদের সন্ধান পাইয়াছি। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত অনুরাগবল্লীতে (পৃ. ৩২) শ্রীনিবাসের সুপ্রসিদ্ধ পদ—

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো ইত্যাদি পদটি

উদ্ধৃত করিবার পর উহার ৪৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে—

শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের দ্বিতীয় পদ হয়।
যাহাতে সম্পূর্ণ পাই তাঁহার আশয় ॥
শ্রীবিশাখা প্রতি রাধা অনুরাগে কহে
রসের নির্য্যাস রসিকের মন মোহে ॥

তথাহি পদং

অনুক্ষণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ার বাহিরে পর বাস।
আপনা বলিয়া বোলে হেন নাহি ক্ষিতিতলে
হেন ছারের হেন অভিলাষ ॥
সজনি তুয়া পায়ে কি বলিব আর।
সে হেন দুলহ জনে অনুরত যার মনে
কেবল মরণ প্রতিকার ॥
কি করিতে কিবা করি আপনা দঢ়াইতে নারি
রাতি দিবস নাহি যায়।
গৃহে যত বন্ধুজন সব মোর বৈরীগণ
কি করিব কি হবে উপায় ॥

অনুরাগবল্লী রচনার প্রায় সমসময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে (৪।৪) ভণিতাহীন অবস্থায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার পাঠ অধিকতর বিশুদ্ধ বলিয়া শেষ কলি ছাড়া অন্য কলিগুলি ঐ গ্রন্থ অনুযায়ী দিলাম।

অনুরাগবল্লীতে "অনুক্ষণ কোলে থাকে, বসনে আপনা ঢাকে" পাঠ আছে। পুথির ণ স্থানে ল পঠিত হইয়াছে ; যদি রাধা বিশাখাকে বলিয়া থাকেন তাহা হইলে 'থাকে' ও 'ঢাকে' স্থানের 'থাকি' ও 'ঢাকি' পাঠই ঠিক। শেষ কলিটির ক্ষণদা-ধৃত পাঠ এই—

যত যত মনে করি নিশ্চয় করিতে নারি
রাতি দিবস নাহি যায়।
গৃহে যত গুরুজন সব মোর বৈরীগণ
কি করিব নাহিক উপায়॥

পদটিতে চণ্ডীদাসের রচনার ঝঙ্কার পাওয়া যায়।

শ্রীনিবাসের পঞ্চম পদটি পাওয়া গিয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ পুথিতে (পৃ. ৯০)। পদটি সম্ভোগের—

ধনি রঙ্গিনি ভোর।
ভোলল কানু গরবে করি কোর॥
ধনি মন মানস সুখে।
তাম্বুল দেই চুম্বই চাঁদমুখে॥
ধনি মন মানয় বাধা।
কানু পরাভব, জিতল রাধা॥
ভূমে গড়ি যায় মোহন বেণু।
রতিরণ অলসে অবশ ভেল কানু॥
ভণে শ্রীনিবাস দাস
রাই কানু রঙ্গ দেখি সখিগণ হাস॥

শ্রীনিবাসের শ্রেষ্ঠ রচনা হইতেছে "বদনচাঁদ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো।" (পদকল্পতরু ৭৯০)। উহাতে

করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুল-মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে॥

মরমী কবির রচনার পর্যায়ে পৌছিয়াছে। কৃষ্ণের বাহুর বলনি বা গঠন

দেখিয়া নায়িকার যৌবনরূপ বনের প্রাণরূপ পাখী পিপাসায় আকুল হইয়া উহার স্পর্শরস আস্বাদন করিতে চাহে। ঐ পদের ভণিতাতে—

শ্রীনিবাস দাস কয় লখিলে লখিল নয়
রূপসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা

আছে। পদকল্পতরুধৃত ৩০৭৩ সংখ্যক পদটির ভণিতাতেও ঐ নাম

শ্রীনিবাস দাস নামে প্রেমসেবা ব্রজধামে
প্রার্থহুঁ তুয়া পরিবারে॥

এইসব সুস্পষ্ট ভণিতা সত্ত্বেও ডাঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করিয়াছেন—"এগুলি তাঁহার ভক্ত-শিষ্যের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় সং, পৃ. ৪৩৩ পাদটীকা)। কোন কোন সভাসদ নিজে কিছু লিখিয়া রাজার নামে চালাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিবাসের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি কোন শিষ্যের রচনা নিজের নামের ভণিতায় চালাইলে শিষ্যমণ্ডলীতে তাঁহার গৌরব নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইত। ডাঃ সুকুমার সেন ঐ স্থানে আরও লিখিয়াছেন—"তাঁহার সংস্কৃত রচনা কিছু পাওয়া যায় নাই।" কিন্তু হরিদাস দাস বাবাজী মহোদয় শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধাদামোদরের গ্রন্থাগারের ৪২৭ সংখ্যক পুথিতে শ্রীনিবাস আচার্য্য কৃত ভাগবতের চতুঃশ্লোকী ভাষ্য পাইয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনিবাস ভাগবতের ভ্রমরগীতার ব্যাখ্যা করিয়াই বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। যে হরিদাস পণ্ডিতের আদেশ লইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন (২।২), তাঁর শিষ্য রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী সাধনদীপিকায় (পৃ. ২৫৮) "শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত চতুঃশ্লোকী টীকাদি''র উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীনিবাসের কবি-শিষ্যগণ

শ্রীনিবাসের অসংখ্য শিষ্যগণের মধ্যে আটজন কবিরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা হইতেছেন— রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস দুই ভ্রাতা, কর্ণপূর কবিরাজ (কবি কর্ণপূর হইতে পৃথক্ ব্যক্তি), নৃসিংহ কবিরাজ, ভগবান কবিরাজ, বল্লবীকান্ত, গোপীরমণ ও গোকুল। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত শ্রীনিবাসের শাখা নির্ণয়ের এক সপ্তদশ

শতকের পুথিতে (জি ৫৬৩৮) উহাদের নাম এইভাবে দেওয়া হইয়াছে—

কর্ণপূরো নৃসিংহঃ শ্রীভগবান্ কবিনৃপতিঃ।
বল্লবিদাস কবিরাজৌ শ্রীগোপীরমণ গোকুলৌ॥

ইঁহাদের মধ্যে কর্ণপূর কবিরাজ শ্রীনিবাসাচার্য্য-গুণ-লেশ-সূচক ৯১টি সংস্কৃত শ্লোকে লিখিয়াছেন। নৃসিংহ কবিরাজ নবপদ্য নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ স্মরণ দর্পণ ও গোবিন্দদাস সাত শতের অধিক পদ রচনা করেন। গোকুল দাসের একটি পদ (২৯৭৫) ও গোপী-রমণের একটি (১৬০৮) পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। বল্লবিদাস ও ভগবান কবিরাজের কোন পদ এ পর্য্যন্ত পাই নাই। কিন্তু তাঁহারাও যে ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধবদাসের (তরু ৩০৯২) একটি পদ হইতে জানা যায়—

শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নৃসিংহ খ্যাতি
কর্ণপূর শ্রীবল্লবী দাস।
শ্রীগোপীরমণ নাম ভগবান গোকুলাখ্যান
ভক্তি-গ্রন্থ কৈল পরকাশ।

নৃসিংহ কবিরাজ বোধ হয় মানভূমের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। 'সারাবলী' নামক গ্রন্থে আছে—

আচার্য্য প্রভুর শিষ্য নৃসিংহ রাজন।
পরম পণ্ডিত হয় ভক্তি পরায়ণ॥
পূর্ব্বপুরুষ হৈতে মানভূমে স্থিতি।
পদকর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বত্র যাঁর খ্যাতি॥

এই নৃসিংহ কবিরাজই একাবলী-ছন্দে রচিত

ব্রজ নন্দকি নন্দন নীলমণি
হরি চন্দন তিলক ভালে বণি" ইত্যাদি। (তরু ১৩২৪)

এবং নব-নীরদ-নীল সুঠাম তনু
ঝলমল ও মুখ চান্দজনু॥ ইত্যাদি (তরু ১১৫৯)

পদদ্বয়ের রচয়িতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাসনার মধ্যে অষ্টসখী, অষ্টমঞ্জরী প্রভৃতি

বেষ্টিত রাধাকৃষ্ণের ধ্যান করিবার নিয়ম আছে। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন গোপালগুরু। গোপালগুরুর শিষ্য ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী যে যোগপীঠ অঙ্কন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তাহার কমলদলে স্বরূপ দামোদর (ললিতা), রামানন্দ রায় (বিশাখা) গোবিন্দানন্দ (চিত্রা), বসু রামানন্দ (ইন্দুলেখা), শিবানন্দ সেন (চম্পকলতা) গোবিন্দ ঘোষ (রঙ্গদেবী) বক্রশ্বের (তুঙ্গবিদ্যা) ও বাসু ঘোষ (সুদেবী)—এই আটজন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক স্থান পাইয়াছেন। আর উপদলে জাহ্নবা দেবী (অনন্ত মঞ্জরী), গোবিন্দ কবিরাজ (কলাবতী), কর্ণপূর কবিরাজ (শুভাঙ্গদা), নৃসিংহ কবিরাজ (হিরণ্যাঙ্গী), ভগবান কবিরাজ (রত্নরেখা) বল্লবী কবিরাজ (শিখাবতী), গোপীরমণ কবিরাজ (কন্দর্পমঞ্জরী) ও গোকুল কবিরাজের (ফুল্লমল্লিকা) স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শ্রীনিবাস আচার্য্যের অষ্ট কবিরাজ শিষ্যের মধ্যে রামচন্দ্র কবিরাজের স্থান ইহাতে নাই— তাঁহার স্থানে নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবী আছেন। যোগপীঠের মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র নারী। যোগপীঠের কমলদলের কিঞ্জল্কে রাধাকৃষ্ণের পরেই স্থান পাইয়াছেন ছয় গোস্বামী, লোকনাথ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের কোন আসন যোগপীঠে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যগণের মধ্যে উক্ত আটজন ছাড়া আরও অনেক কবি ছিলেন। বীর হাম্বীরের ভণিতাযুক্ত দুইটি পদ কর্ণানন্দে (পৃ. ১৯) এবং ভক্তিরত্নাকরে (পৃ. ৫৮১-৮২) ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে—

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পূরাইল মনের আশ,
তুয়া পদে বলিব কি আর।
আছিলুঁ বিষয় কীট, বড়ই লাগিত মীঠ,
ঘুচাইল রাজ অহঙ্কার।

ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরুতেও (২৩৭৮) আছে। কিন্তু কবিত্ব হিসাবে এটির চেয়ে অনেক বেশী ভাল অন্য পদটি, যাহার আরম্ভে আছে—

শুন গো মরম সখি কালিয়া কমল-আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।

কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ানু পরাণি ॥ ইত্যাদি—

উহার ভণিতায় সুস্পষ্ট ভাবে শ্রীনিবাসের আনুগত্যের কথা আছে—

এ বীর হাম্বীর চিত শ্রীনিবাস-অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায় ॥

শ্রীনিবাসের শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নাগর ভাব লইয়া তিনি কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া পদামৃত-সমুদ্রের টীকায় রাধামোহন ঠাকুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার পদের ভণিতায় গোবিন্দ দাসিয়া, পামরি গোবিন্দ দাস ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীনিবাসের আর একজন কবি-শিষ্য হইতেছেন বংশীদাস। ভক্তিরত্নাকরে (দশম তরঙ্গ পৃ, ৬২৯-৩০)। পদকল্পতরু-ধৃত বংশীদাস ভণিতার ১৭টি পদের মধ্যে দুই-চারিটি ইঁহার রচনা হইলেও হইতে পারে। কর্ণানন্দের মতে (প্রথম মঞ্জরী) মোহন দাস নামে শ্রীনিবাসের একজন বৈদ্য শিষ্য ছিলেন।

শ্রীমোহন দাস নামে জন্ম বৈদ্যকুলে।
নৈষ্ঠিক ভজন যাঁর অতি নিরমলে ॥

এই মোহনই সম্ভবতঃ পদকল্পতরু-ধৃত ত্রিশটি পদের রচয়িতা। গোবিন্দদাস একটি পদের ভণিতায় "মোহন গোবিন্দদাস পহু" বলিয়া ইঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় মনে করেন। শ্রীনিবাসের কবি-শিষ্যদের মধ্যে রাধাবল্লভ দাস ও কবিবল্লভেরও নাম পাওয়া যায়।

শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দও একজন কবি ছিলেন। পদকল্পতরুর ২৩১৮ সংখ্যক পদে তিনি

মনের আনন্দে শ্রীনিবাস-সুত
গতিগোবিন্দ-চিত ভোর রে ॥

ভণিতা দিয়াছেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম ইঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। ঘনশ্যাম গোবিন্দ-রতি-মঞ্জরীর মঙ্গলাচরণে গতিগোবিন্দকে "গান্ধর্ব্বীয় কলা-বিলাস রসিকো গান প্রবীণঃ স্বয়ং" বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। শ্রীনিবাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবী গোবিন্দ-

লীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতির অনুবাদক বৈদ্যকুলোদ্ভব যদুনন্দন দাসের গুরু ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের ২৯৫ সংখ্যক পুথিতে গোবিন্দ-লীলামৃতের অনুবাদে এক স্থানে তিনি ভণিতা দিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্য দাসের দাস ঠাকুর শ্রীনিবাস
আচার্য্য সুতা যে হেমলতা।
তার পাদপদ্ম আশ এ যদুনন্দন দাস
অস্বষ্ঠ প্রাকৃতে কহে কথা॥

সাহিত্য পরিষদের ৩৬২ সংখ্যক পুথিখানি কর্ণানন্দের একখানি অনুলিপি —একশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। তাহার দ্বিতীয় নির্যাসের ভণিতা—

দীন যদুনন্দন বৈদ্য দাস নাম তার।
মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥

মুদ্রিত কর্ণানন্দ গ্রন্থের ষষ্ঠ মঞ্জরীতে আছে—

পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥

এই তারিখ যথার্থ হইলে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনার কাল হয়। কিন্তু উক্ত ৩৬২ সংখ্যক পুথিতে তারিখের পয়ারের আগের ও পরের পয়ার থাকিলেও তারিখ দেওয়া পয়ারটি নাই। কর্ণানন্দে শ্রীনিবাসের দুই পৌত্রকেও ভক্তি-মান্ বলা হইয়াছে। যদি ১৬০৭ খৃষ্টাব্দ কর্ণানন্দ রচনার কাল বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে উহা হইতেই মোটামুটিভাবে শ্রীনিবাসের কাল নির্ণয় করা যায়। পরে দেখাইব যে শ্রীনিবাসের দুই শিষ্যের উক্তি অনুসারে পাওয়া যায় যে তিনি পুরীতে যাইবার পথে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কথা জানিতে পারেন। সেই সময় অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর হইলে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার জন্মের প্রায় নব্বই বৎসর পরে তাঁহার পৌত্রেরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু শ্রীনিবাসের কালনির্ণয় ব্যাপারে অনেকগুলি সমস্যা আছে।

নরোত্তম ঠাকুরের কবি-শিষ্যগণ

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' ছাড়া অনেক সুন্দর সুন্দর লীলাকীর্ত্তনের পদও রচনা করিয়াছেন।

তাঁহার "শ্যাম বঁধুর কত আছে আমা হেন নারী" (তরু ১৯৫৫)

"তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ" (তরু ১৯৫৯)

প্রভৃতি পদ সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার অন্ততঃ তিনজন শিষ্য উচ্চস্তরের কবি ছিলেন। প্রথম হইতেছেন রায় বসন্ত। তাঁহার সম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে লিখিয়াছেন—

শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত।
বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত॥ (প্রথম তরঙ্গ পৃ. ২৯)

"গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত, ভুলল যাহে দ্বিজবর বসন্ত" বলিয়া গোবিন্দদাস কবিরাজ একটি পদের ভণিতা লিখিয়াছেন। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে কবি বসন্তরায় ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং তিনি বঙ্গজকায়স্থ প্রতাপাদিত্যের খুড়া হইতে পারেন না। গোবিন্দদাস আরও দুইটি পদে বসন্ত রায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ৫১টি পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় হইতেছেন বল্লভ। তিনি পদকল্পতরুর (১০২২)—

ও মুখ শরদ— সুধাকর সুন্দর
ইহ নলিনি-দল গঞ্জে

ইত্যাদি পদটির শেষে ভণিতা দিয়াছেন—

নরোত্তম দাস আশ চরণে রহু
শ্রীবল্লভ-মন ভোর॥

ইনি বল্লভদাস ভণিতাতেও পদ রচনা করিয়াছেন (তরু ২৯৮১)। ইনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন

শ্রী আচার্য্য প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেম-রসময়॥
এসব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদ্-গণ।
উজ্জ্বল ভকতি-কথা করিলুঁ শ্রবণ॥

ইঁহাদের বিয়োগে কাতর হইয়া বলিতেছেন—

ভিট সেঙরিয়া কুক্কুর কান্দে এমতি আছোঁ এথা ॥

(তরু ২৯৮৩) ।

গোবিন্দদাস কবিরাজ ইঁহার নামও খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজের পদের ভণিতায় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

গোবিন্দদাস কহই শ্রীবল্লভ জানই রসমরিযাদ।

(গীতচন্দ্রোদয় পৃ. ২৭৩)

অন্যত্র—

গোবিন্দদাস বিন্দু লাগি রোয়ত শ্রীবল্লভ পরমাণ

(ঐ পৃ. ২৮৬)।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের তৃতীয় কবি-শিষ্যের নাম উদ্ধবদাস। এই উদ্ধব দাসের কথা রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য দ্বিতীয় উদ্ধবদাস 'ভক্তিমান শ্রী. উদ্ধবদাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পদকল্পতরু ৩০৯২)।

রাধামোহন ঠাকুরের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দকিশোর দাস, যিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার 'রসকলিকা' গ্রন্থে প্রথম উদ্ধবদাসের দুইটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১০৮-১০৯)। পদ দুইটি শ্রীরাধার মাদন ও মোদন ভাবের। ইহার একটিও পদকল্পতরুতে নাই। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সময় ঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারিলে, তাঁহাদের কবি-শিষ্যগণেরও কালনিরূপণ করা সহজ হইবে।

কালনির্ণয় সমস্যা

বৈষ্ণবপদাবলীর কাল নির্ণয় করিবার প্রথম চেষ্টা হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি ও জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় কোন প্রকার যুক্তি তর্ক না দেখাইয়া, কোন প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া আপ্ত পুরুষের ন্যায় বৈষ্ণব কবিদের আবির্ভাব-তিরোভাবের তারিখ নির্দ্দেশ করিবার রীতি প্রচলন করেন। তাঁহাদের সেই রীতি এখনও সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে বলিতে পারি না। ১৩৬২ সালের ফাল্গুন মাসে ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য যে "বলরামদাসের পদাবলী" প্রকাশ করেন, তাহাতে 'পদাবলী

কীর্ত্তনের পরিচয়' দিতে যাইয়া স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিয়াছেন (পৃ. ৩৭) যে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের তিরোধান ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে হয়। বোধ হয় যাঁহারা ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে খেতরীর মহোৎসব হইয়াছিল বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া স্বামীজী এইরূপ লিখিয়াছেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ডাঃ সুকুমার সেন তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে লিখিয়াছেন (পৃ. ৪৩৫)—"খেতরী উৎসবের তারিখ জানা নাই। অনেকে মনে করেন ১৫৮১ খৃষ্টাব্দ। এ তারিখের সমর্থনে কোন তথ্য নাই, প্রবল যুক্তিও নাই। আরও বিশ-পঁচিশ বছর পরে হওয়া সম্ভব।" খেতরীর উৎসব নরোত্তম ঠাকুরের ও আনুষঙ্গিকভাবে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনের তথা গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসের একটি ভূস্তম্ভ। ডাঃ সুকুমার সেন খুবসম্ভব ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের মত অনুসরণ করিয়া খেতরী উৎসবের তারিখ ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের বিশ-পঁচিশ বৎসর পরে বলিয়াছেন।

ডাঃ নাথ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় (১৩৩৯ সং, পৃ. ৩া৶ হইতে ৪া৶ পর্য্যন্ত) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রীনিবাসের জন্ম ১৫৭২ হইতে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে; বৃন্দাবন গমন ১৫৯৯-১৬০০ খৃষ্টাব্দে এবং খেতরীর মহোৎসব ১৬০১-১৬০২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাধামাধব তর্কতীর্থ মহাশয় সংস্কৃত কলেজে কয়েক বৎসর সরকারী বৃত্তিভোগী গবেষকরূপে কাজ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে "শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্মকাল হিসাবে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ বা নিকটবর্ত্তীকালের গ্রহণই যুক্তিযুক্ত মনে হয়" (Our Heritage, দ্বিতীয় খণ্ড প্রথমভাগ, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী-জুন সংখ্যা, পৃ. ১৯৭—১৯৮)। নাথ মহাশয় ও তর্কতীর্থ মহাশয় প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম বিলাসের কোন কোন উক্তির প্রামাণিকতা বিচার করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় আপ্তবাক্য হিসাবে বলিয়াছিলেন যে ১৫৬৫।৬৬ শকে অর্থাৎ ১৫৪৩ কি ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাসের জন্ম হয় (গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকা—প্রথম সং, পৃ. ১৭০)। ইঁহারা কেহই শ্রীনিবাসের শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের লিখিত শ্রীনিবাসের গুণলেশসূচকের ৯১টি শ্লোক দেখেন নাই।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর তরুণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' নামক মূল্যবান গ্রন্থে অনুমান করিয়াছেন যে শ্রীনিবাস ১৫১৯।২০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন (পৃ. ১৮৯), ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেন এবং ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়। তাঁহার বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ তিনি ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত শ্রীনিবাসের শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজের নবপদ্য হইতে একটি শ্লোক তুলিয়াছেন; তাহাতে বলা হইয়াছে যে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে গমন করিতে ইচ্ছুক শ্রীনিবাস কৃপানিধি প্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোধানবার্ত্তা লোকমুখে শুনিয়া অতি দুঃখে পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। সুখময়বাবুর সিদ্ধান্ত এই—"নৃসিংহ কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য। অতএব শ্রীনিবাসের জীবনকাহিনী সম্বন্ধে তাঁর কথা সম্পূর্ণ প্রামাণ্য। তিনি যখন বলেছেন যে শ্রীনিবাস আচার্য্য চৈতন্যদেবের জীবৎকালে জন্মেছিলেন এবং নীলাচল যাবার পথে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব সংবাদ শুনেছিলেন, তখন আর এ বিষয়ে কোন কথা উঠিতেই পারে না" (পৃ. ১৯২)।

সুখময়বাবু যদি নরহরি চক্রবর্ত্তীর নরোত্তমবিলাস দেখিতেন, তাহা হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্যের অপর একজন শিষ্য, কর্ণপূর কবিরাজের "শ্রীনিবাসাচার্য্য গুণলেশসূচক" হইতে উদ্ধৃত আর দুইটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে তাঁহার মত দৃঢ়ীকৃত করিতে পারিতেন। শ্লোক দুইটির দ্বিতীয়টি এই—

গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং পথি [১]শ্রুতশ্চৈতন্যসঙ্গোপনং
মূর্চ্ছীভূয় কচান্ লূনন্[২] স্বশিরসো ঘাতং দধদ্ধিক্[৩]কৃতঃ।
তৎপাদং[৪] হৃদি সন্নিধায় গতবান্নীলাচলং যঃ স্বয়ং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রী[৫]নিবাসপ্রভুঃ॥

(নরোত্তমবিলাস, পৃ. ৮৩)

নরহরি চক্রবর্ত্তী খুব সম্ভব ভক্তিরত্নাকর লিখিবার সময় কর্ণপূর কবিরাজের লিখিত সূচকটি পান নাই, তাই ঐ গ্রন্থে উহার উল্লেখ করেন নাই। উহার একখণ্ড বরাহনগর পাটবাড়ীর গ্রন্থমন্দিরে আছে। হরিদাস দাস বাবাজী মহোদয় উহার আর একখণ্ড পুথি শ্রীবৃন্দাবনের নন্দকিশোর

গোস্বামীর নিকট হইতে পাইয়া উহা শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যগ্রন্থমালায় প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে (পৃ. ২৫) পূর্ব্বে উদ্ধৃত শ্লোকটির নিম্নলিখিত পাঠান্তর দেখা যায়—

(১) শ্রুতশ্চৈতন্যসঙ্গোপনং (২) ধুনন্ (৩) দদদ্ধিক্কৃতম্ (৪) তৎপদং (৫) শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুঃ।

কর্ণপূর কবিরাজকৃত স্থচকটির প্রামাণিকতা প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক। প্রেমবিলাসের কলেবর কি করিয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা আমি শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদানে (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৭৭-৪৮৫) দেখাইয়াছি। উহার চতুর্বিংশ বিলাসে (পৃ. ৩০১) আছে যে ১৫২২ শকের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ঐ তারিখ যথার্থ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রেমবিলাসে এত উক্তি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে যে ইহার কোন কথার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আশ্বিন তারিখের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় (পৃ. ৩৮৯) হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"আমার বাড়ীতে দুইশত বৎসরের অধিকালের হস্তলিপি যে একখানি প্রেমবিলাস গ্রন্থ আছে, তাহার সহিত মুদ্রিত পুস্তকের অনেক স্থলে প্রসঙ্গের মিল নাই।...কেবল বর্ত্তমান কাল বলিয়া নহে, প্রাচীন কাল হইতেই এই প্রেমবিলাসের নানাস্থানে নানাজনের কারিগরি আছে। অতএব এই গ্রন্থ বিশেষ তলাইয়া পাঠ করা উচিত।"

কর্ণানন্দ গ্রন্থখানি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যদুনন্দন দাসের রচনা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাতেও অনেক প্রক্ষিপ্ত ঘটনার বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। মুদ্রিত কর্ণানন্দে প্রেমবিলাসের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। যথা—

যে প্রকারে গৌড়দেশে গমন করিলা।
প্রেমবিলাস গ্রন্থ মাঝে বিস্তরি বর্ণিলা॥
লিখিলেন সেই গ্রন্থ জাহ্নবা আদেশে।
গ্রন্থ প্রকাশিলা তাহা নিত্যানন্দ দাসে॥ (পৃ. ১১৬)

কিন্তু কর্ণানন্দের সপ্তম মঞ্জরীতে প্রেমবিলাসের উক্তির বিরোধিতা দেখা

যায়। প্রেমবিলাসে (বিষ্ণুপুরের রাণী ধ্বজামণি দেবীর পুথির দ্বাদশ বিলাস ও যশোদানন্দন তালুকদারের সংস্করণের ত্রয়োদশ বিলাস (পৃ. ৯৪) আছে যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, যাহা শ্রীনিবাসের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে পাঠানো হইয়াছিল, তাহা চুরি গিয়াছে খবর পাইয়া কবিরাজ গোস্বামী—

কুণ্ডতটে বসি সদা করে অনুতাপ।
উছলি পড়িল যাই দিয়া বড় ঝাঁপ॥

(সাহিত্য পরিষদ পুথি ২৬২ সংখ্যা)

ছাপা গ্রন্থের পাঠ—

কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতাপ।
উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাঁপ॥

তার পর "মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামণ" (পৃ. ৯৪)। কর্ণানন্দে আছে যে তিনি রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন বটে, কিন্তু তখনই তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। শ্রীরূপ সনাতনের আদেশ পাইয়া তিনি গ্রন্থ পাইবার আশায় আর কিছুদিন জীবিত ছিলেন। উভয় গ্রন্থের বিবরণই সম্পূর্ণ অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় গ্রন্থের কি কেহ কোন অনুলিপি না রাখিয়াই গৌড়দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন? কোন অনুলিপি করিবার পূর্ব্বেই কি মূল গ্রন্থখানি শ্রীনিবাসের সঙ্গে পাঠানো হইয়াছিল? যদিই বা তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কবিরাজ গোস্বামীর মতন সিদ্ধপুরুষ কি গ্রন্থ নষ্ট হওয়ার জন্য আত্ম-হত্যা করিতে পারেন? বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কি রাধাকুণ্ডে বা বৃন্দাবনে সেই খবর পৌছিয়াছিল? গ্রন্থ চুরির কয়েকদিনের মধ্যেই তো শ্রীনিবাস সেগুলি ফেরত পান বলিয়া কিম্বদন্তি। অনুরাগবল্লীতে গ্রন্থ চুরি যাইবার কোন কথাই নাই; আর ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম-বিলাসে গ্রন্থ চুরির কথা থাকিলেও কবিরাজ গোস্বামীর রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিবার কোন প্রসঙ্গ নাই।

সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে এই যে বৃন্দাবন হইতে কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী যাজিগ্রামে বা দাঁইহাটের নিকটে চাকুন্দি যাইবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি কেন যাইবেন? প্রেমবিলাসে আছে যে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে ক্রিটা নগর (বোধ হয় এটোয়া) পর্য্যন্ত যাইয়া

ঝাড়িখণ্ড পথে যাব করিলা নির্ব্বন্ধ।
মগদেশ বামে করি পথে চলি যায়॥
ঝাড়িদেশ ছাড়াইলা উত্তরিলা গিয়া।
তমলুকে যান মনে আনন্দ পাইয়া॥ (ত্রয়োদশ বিঃ, পৃ. ৯১)

শ্রীনিবাসকে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার কাছাকাছি যাইতে হইবে। তিনি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বৃন্দাবন হইতে মগদেশ, বোধ হয় মগধ দেশ, বামে রাখিয়া ছোটনাগপুরের ভিতর দিয়া সোজা দক্ষিণে তমলুক চলিয়া যাইবেন কেন? আবার তমলুক হইতে ফের

"পঞ্চবটী বামে রাখি রঘুনাথপুর" (পৃ. ৯২)

(পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী) যাইয়া বিষ্ণুপুরের নিকট আসিবেন কেন? ভৌগোলিক তথ্য এই বিবরণের বিরুদ্ধে। এইরূপভাবে কাহারও উদ্দেশ্যহীন চলাফেরা করার বিবরণ অবিশ্বাস্য।

কর্ণপূর কবিরাজের লিখিত সূচকে বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থ আনিবার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতেও গ্রন্থ চুরির কোন কথা নাই। বিবরণটি উদ্ধৃত করিতেছি—

নীত্বা চৈব নরোত্তমং পুনরসৌ শ্রীজীবকুঞ্জং ব্রজন্
গ্রন্থং ভারচতুষ্টয়ং স্বয়মসৌ নীত্বা ব্রজন্ গৌড়কম্।
শ্রীজীবোঽপি শতেন বৈষ্ণবজনৈঃ ক্রোশন্তু চানুব্রজৎ
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ৫৯

(চতুর্থ চরণটি প্রায় সব শ্লোকেই আছে, সুতরাং অন্যান্য শ্লোক তুলিবার সময় এই চরণটি ছাড়িয়া দিব)।

—শ্রীনিবাস পুনরায় নরোত্তমকে লইয়া শ্রীজীবের কুঞ্জে যাইলেন এবং স্বয়ং চারিভার গ্রন্থ লইয়া তিনি গৌড়ের দিকে যাত্রা করিলে শ্রীজীব শত বৈষ্ণবের সহিত এক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন।

প্রেমবিলাসে আছে যে শ্রীজীব

সিন্ধুক সজ্জা করি পুস্তক ভরেন বিরলে।

তার পর

সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে কুলুপ দিল তায়।
মোম জামায় ঘোরাইল সর্ব্বাঙ্গে লেপটায়॥

ঐ সিন্ধুক বলদের গাড়ীতে চড়ানো হইল এবং

দশজন অস্ত্রধারী হিন্দু সঙ্গে যায় (পৃ. ৯১)।

অর্থাৎ বড়লোক ধন-সম্পত্তি লইয়া যাইবার সময় যে যে আয়োজন করিতেন, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের গ্রন্থাদি লইবার সময়ও সেইরূপ আয়োজন করা হইল—যাহাতে ডাকাত মনে করে যে ইহাতে ধন-সম্পত্তি যাইতেছে।

নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে কর্ণপূরের বিবরণের 'ভার-চতুষ্টয়' শব্দটি লইয়াছেন—

গোস্বামীহ দেখি গ্রন্থ ভার-চতুষ্টয়।
রাখে কাষ্ঠ-সম্পুটে নিবারি বর্ষা ভয়॥ (পৃ. ৪৭০)

কর্ণপূর কবিরাজের স্থচকে দেখা যাইতেছে যে নরোত্তম ঠাকুর শ্রীনিবাসের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে যান নাই—

তান্ নীত্বা খলু বৈষ্ণববানতিশুচ—দৃষ্ট্যা মহত্যা পুরো
দৃষ্ট্বা যং কিল জীবঠক্কুরবরো বৃন্দাবনেঽসৌ গতঃ।
এবঞ্চৈব নরোত্তমো হরিরিতি স্মৃত্বা ব্রজং প্রাপ্তবান্। (৬৩)

—শ্রীশ্রীজীব ঠক্কুরশ্রেষ্ঠ বড় সহর অর্থাৎ মথুরা হইতে বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীনিবাসের প্রতি মহাশোক সহকৃত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে ফিরিলেন এবং নরোত্তমও হরি স্মরণ করিয়া ব্রজে চলিলেন।

ইহার পর কর্ণপূর কবিরাজকৃত স্থচকে আছে— শ্রীনিবাস আচার্য্যও বারংবার শ্রীজীব গোস্বামীর চরণে পড়িয়া তথা হইতে অতি দ্রুতগতিতে চলিলেন এবং অদূরে যাইতে না যাইতেই আবার ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তার পর তাঁহাদের কথাগুলি স্মরণ করিতে করিতে গৌড়-দেশের দিকে শীঘ্র গমন করিলেন (৬৪)। ব্রজগিরির গহ্বর হইতে গ্রন্থমেঘ আনিয়া গৌড়ভূমিতে যিনি সানন্দে কৃষ্ণপ্রেমরূপ বর্ষণে কলিরূপ সূর্য্যতাপে দগ্ধ জীবরূপ শস্যসমূহকে সিঞ্চনপূর্ব্বক পুনরায় সজীব এবং প্রেমভক্তির বাদল করিয়াছেন এবং নিজেও আনন্দিত হইয়াছেন, সেই শ্রীনিবাস প্রভুর জয় হউক (৬৫)। যাজিগ্রামে প্রবেশ করিয়া ইনি প্রীতিভরে বাস করিতে লাগিলেন; তাঁহার দর্শন লাভের আশায় প্রত্যহ শত শত বৈষ্ণব আসিতে লাগিলেন; তাঁহাদের সহিত প্রেম-সম্ভাষণপূর্ব্বক ইনি যত্নসহকারে

গোস্বামি-গ্রন্থসমূহ শ্রবণ করাইতেন (৬৬)। সকলের অনুরোধে ইনি দারপরিগ্রহ করিলেন; ভক্তিগ্রন্থের ব্যবসায় (পঠন-পাঠন), হরিনাম গ্রহণ, ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দর্শনের আশায় ইনি প্রতিদিন রাধেকৃষ্ণ এই নাম গ্রহণ করিয়া কাল কাটাইতেন (৬৭)।

কর্ণপূর কবিরাজের এই বিবরণ অনুরাগবল্লীর বর্ণনার দ্বারা সমর্থিত হয়। অনুরাগবল্লী ১৬১৮ শকে বা ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের চৈত্র মাসের শুক্লা-দশমী তিথিতে বৃন্দাবনে মনোহর দাস কর্ত্তৃক লিখিত হয়। শ্রীনিবাসের শিষ্য রামচরণ চক্রবর্ত্তী— তাঁহার শিষ্য রামশরণ চট্টরাজ এবং চট্টরাজের শিষ্য এই মনোহর দাস। সুতরাং শ্রীনিবাসের সঙ্গে ইঁহার দুই পুরুষের মাত্র ব্যবধান। ইঁহার বাড়ীও ছিল শ্রীনিবাসের বাড়ীর কাছে; কাটোয়ার নিকটে বাগণ্যকোলা বা বোওনকোলায়। নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তি-রত্নাকরে অনুরাগ-বল্লীর প্রামাণিকতার উল্লেখ করিয়াছেন (ত্রয়োদশ তরঙ্গ, পৃ. ১০১৮)। অনুরাগবল্লীর মতে শ্রীজীব তাঁহার অনুগত এক মহাজনকে বলিলেন—

তবে মহাজনের গাড়ি আগরা চলিতে।
তাহারে শ্রীজীব গোসাঞি কহিলা নিভৃতে॥
আচার্য্য মহাশয়ের হয় পুস্তকাদি যত।
সামগ্রী লইয়া তুমি চলহ ত্বরিত॥
সেখানে আপন ঘরে ইঁহাকে রাখিয়া।
গাড়িতে যে ভাড়া লাগে তাহা তাঁরে দিয়া॥
ইঁহাকে পথের যেবা খরচ চাহিয়ে।
সভে মিলি দিহ যেন আমি সুখ পাইয়ে॥

—ষষ্ঠ মঞ্জরী, পৃ. ৩৬

এই কথা অনুসারে সেই মহাজন শ্রীনিবাসকে আগরা পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। তার পর—

সেখানে সর্ব্ব মহাজন একত্র হইয়া।
গাড়ি ভাড়া করি দিল বিনয় করিয়া।
অনেক পুস্তক সঙ্গে সামগ্রী না চলে।
এতেক বুঝিয়া তারা সমাধান কৈলে॥

যাবার খরচপত্র যতেক লাগয়ে।
বস্ত্র পাত্র সঙ্গে মাত্র যে কিছু চাহিয়ে॥
সকল দিলেন পাছে রাজ-পত্রী ধরি।
আপন আপন সীমা সভে পার করি॥
এই মত ক্রমে ক্রমে আইলা গৌড়দেশ।
সূত্ররূপে কহি কিছু তাহার বিশেষ॥ —পৃ. ৩৭

এই বিবরণে সিন্ধুকের সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর লইয়া যাইবার কথা নাই এবং তাহার ফলস্বরূপ চুরির কথাও নাই। এই বর্ণনা খুবই স্বাভাবিক।

তাহা হইলে গ্রন্থচুরির কথা কি মিথ্যা? না, তাহা নহে। গ্রন্থ চুরি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা বৃন্দাবন হইতে যাজিগ্রাম আসিবার পথে নহে। পরবর্ত্তী কোন সময়ে গৌড়দেশ হইতে পুরীধামে কিছু গ্রন্থ লইয়া যাইবার কালে। কর্ণপূর কবিরাজ বলেন—

গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং বনপথা চৌরৈহৃতং পুস্তকং
তস্মাদ্রাজসভাং গতঃ প্রপঠিতং বিপ্রেণ শ্রুত্বা যঃ।
শ্রীমদ্‌ভাগবতীয় ষট্‌পদগনৈর্গীতং প্রহস্যং কৃতং।

—বনপথে পুরুষোত্তম যাওয়ার সময় গ্রন্থ চুরি হইলে তিনি সেখানকার রাজসভায় গিয়া ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীমদ্‌ভাগবতীয় ভ্রমর (ষট্‌পদ) গীতের পাঠ শ্রবণ করিয়া অতিশয় হাস্য (বিদ্রূপাত্মক) করিয়াছিলেন। এই উক্তির প্রতিধ্বনি কর্ণানন্দে ও ভক্তিরত্নাকরে আছে। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে আসিবার সময়কার ঘটনার সহিত এই ঘটনাকে গুলাইয়া ফেলা হইয়াছে। যথা—

শ্রীনিবাসাচার্য্য লৈয়া গ্রন্থ-রত্নগণ।
চলে গৌড়পথে করি গৌরাঙ্গ স্মরণ॥
সঙ্গে নরোত্তম ঐছে দেহ ভিন্ন মাত্র।
শ্যামানন্দ আচার্য্যের অতি স্নেহ পাত্র॥
নরোত্তম শ্যামানন্দ সহ শ্রীনিবাস।
নির্ব্বিঘ্নে চলয়ে পথে হইয়া উল্লাস॥

নীলাচলে যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া।
সে সভার সঙ্গে চলে বনপথ দিয়া॥
সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন।
নীলাচলে যায় সঙ্গে লৈয়া বহু ধন॥
রাজা বীর হাম্বীরের দস্যুগণ যত্নে।
গণিয়া দেখিল গাড়ী পূর্ণ নানা রত্নে॥

—ভক্তিরত্নাকর, সপ্তম তরঙ্গ, পৃ. ৪৮৮-৮৯

অনুরাগবল্লীতে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে যে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় শ্যামানন্দকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন এবং সেই সময় বীর হাম্বীর শিষ্য হইয়াছিলেন। যথা—

শ্রীজীব গোসাঞি নিকটে শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞি ছিলা।
তাঁরে আচার্য্য ঠাকুর সঙ্গে করি দিলা॥
... ...
এবং ব্যাস আচার্য্য ঠাকুর দুইজন লইয়া।
গৌড়দেশে আইলা কবিরাজ সঙ্গে করিয়া॥
পূর্ব্ববৎ ভক্তিশাস্ত্র কৈল প্রবর্ত্তন।
বীর হাম্বীর আদি শিষ্য হৈল বহুজন। —পৃ. ৪০-৪১

শ্রীনিবাস আচার্য্য তিনবার বৃন্দাবনে যান। প্রথম ও দ্বিতীয়বার গমনের মধ্যে বেশ কিছু সময়ের তফাৎ, আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার গমনের মধ্যেও বেশ তফাৎ। পূর্ব্বেই কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণ হইতে দেখাইয়াছি যে প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর শ্রীনিবাস বিবাহ করেন। বিবাহের পর রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অনুরাগবল্লীও বলেন—

বিবাহ করিতে যত্ন অনেক প্রকার।
করিল প্রভৃতি আদি ঠাকুর সরকার॥ (নরহরি সরকার)
সভাকার উপরোধে বিবাহ করিল।
ভক্তিগ্রন্থ অনেক জনেরে পঢ়াইল॥
সিদ্ধান্তসার রসসার আচরণ করি।
রাগানুগামার্গ জানাইল সর্ব্বোপরি॥

শ্রীগোসাঞি জিউর আজ্ঞা পালন করিলা।
এইমত কথোক কাল সেখানে রহিলা॥ —পৃ. ৩৮

তারপর শ্রীনিবাসের মনে—

বৃন্দাবনে যাইবারে উৎকণ্ঠা বাঢ়িলা।
পুনর্ব্বার সব ছাড়ি যাত্রা করিলা॥ —পৃ. ৩৮

এইবার বৃন্দাবন যাইলে গোপালভট্ট গোস্বামী তাঁহাকে অবিবাহিত জানিয়া বা ভাবিয়া রাধারমণ বিগ্রহের সেবার ভার লইতে বলেন। শ্রীনিবাসও রাজী হইলেন। এদিকে তাঁহার পত্নী, অনেকদিন চলিয়া গেল, অথচ তিনি ফিরিলেন না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি রামচন্দ্র কবিরাজকে ডাকিয়া বলিলেন—

তুমি বৃন্দাবন গেলে এ সুসার হয়।
একবার তাঁর তত্ত্ব করিতে যুয়ায়॥

রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের খোঁজ-খবর লইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। বৃন্দাবন পৌছাইতেই তাঁহার সঙ্গে গোপালভট্টের দেখা হইল এবং তিনি তাঁহাকে বৃন্দাবনে আসিবার কারণ বলিলেন। তাহাতে গোপালভট্ট গোস্বামী বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীনিবাস বিবাহ করিয়াছেন। শ্রীনিবাসকে ডাকিয়া—

গোসাঞি কহে এত মিথ্যা কহিলা আমারে।
কোন ধর্ম্ম বুঝিয়াছ বুঝিব বিচারে॥
ঠাকুর কহয়ে তোমার চরণ বন্দন।
গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ দরশন॥
শ্রীজীব গোসাঞি সঙ্গ বৃন্দাবন বাস।
সভার সহিত কৃষ্ণ-কথায় বিলাস॥
এত লভ্য হয় এক অসত্য বচনে।
এই লোভে কহিয়াছো সঙ্কোচিত মনে॥
এত কহি ঠাকুর দণ্ড-প্রণাম করিল।
হাসি হাসি ভট্ট গোসাঞি আলিঙ্গন কৈল॥
মিথ্যা কহিয়াও তুমি জিনিলে আমারে।
কিছু দোষ নাহি ইথি কহিল তোমারে॥

কিন্তু শ্রীরাধারমণের অধিকারী।
বৈরাগী নহিলে আমি করিতে না পারি ॥

—অনুরাগবল্লী পৃ. ৩৯-৪০

তৃতীয়বার যখন শ্রীনিবাসাচার্য্য বৃন্দাবনে যান, তখন তাঁহার পুত্র বৃন্দাবনবল্লভও তাঁহার সাথে পায়ে হাঁটিয়া যাইবার মতন বয়স পাইয়াছেন—

বড় পুত্র বৃন্দাবনবল্লভ ঠাকুর।
সঙ্গে বড় কবিরাজ আনন্দ প্রচুর ॥

—অনুরাগবল্লী, পৃ. ৪১

বড় কবিরাজ বলিতে গোবিন্দদাস কবিরাজের বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজকে বুঝাইতেছে।

প্রাচীন গ্রন্থাদির এই সব বিবরণ হইতে শ্রীনিবাসের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা যাউক। শ্রীনিবাস যখন পুরীতে যাইতেছিলেন তখন পথের মধ্যে তিনি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানবার্ত্তা শুনিতে পান। সুতরাং ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স অন্ততঃ ১৬।১৭ বৎসর হইয়াছিল। যখন রেলপথে যাইবার সুযোগ ছিল না, তখন ইহার চেয়ে কম বয়সে কেহ পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ ছাড়া পুরীতে যাইতেন না। তাহা হইলে শ্রীনিবাসের জন্ম ১৫১৬।১৭ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে পারি। তার পর তিনি যখন প্রথমবার বৃন্দাবনে যাইতেছেন তখন

কৃত্বা যো হৃদি পাদপদ্ম-যুগলং শ্রীরূপ গোস্বামিনঃ তজ্জ্যেষ্ঠস্য সনাতনাবৎ চ মুদা গচ্ছন্ ব্রজং সত্বরম্। শ্রুত্বা শ্রীমথুরাখ্য-নাম্নি নগরে তদ্‌গোপনং যোঽপতৎ সোঽয়ং ইত্যাদি (১৯)।
হা হা রূপঃ কুতো গতঃ ক্ব গতবান্ হা হা তদীয়াগ্রজো ইত্যাদি (২০)

—কর্ণপূর কবিরাজকৃত শ্রীনিবাস-সূচক

—শ্রীরূপ গোস্বামীর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সনাতনের পাদপদ্মযুগল (মনে মনে) হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি আনন্দে সত্বর ব্রজে প্রবেশ করিলেন। মথুরা নগরে তিনি শ্রীরূপ-সনাতনের অপ্রকটবার্ত্তা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন (১৯)। পরে হা রূপ কোথায় গেলে ? হা সনাতন কোথায় গেলে— ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন (২০)। সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবতোষণী নামে

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ১৪৭৬ শকাব্দে বা ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। উহাতে ১০।১৯।১৬ এবং ১০।৩২।৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীরূপের উজ্জ্বল নীলমণির উল্লেখ আছে, সুতরাং ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে উজ্জ্বল নীলমণি রচিত হয়। শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৪৬৩ শকাব্দে বা ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়; এই গ্রন্থের (বহরমপুর সং) ১২৯ পৃষ্ঠায় হরিভক্তিবিলাসের ও ২১৯ পৃষ্ঠায় বৃহদ্ভাগবতামৃতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ দুইখানি গ্রন্থ ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের রচনা। যাহা হউক ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সনাতন গোস্বামী জীবিত ছিলেন। কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণে দেখা যাইতেছে যে রূপ ও সনাতন প্রায় একই সময়ে অপ্রকট হন। ব্রজমণ্ডলে অদ্যাপি আষাঢ়ী-পূর্ণিমা বা গুরু-পূর্ণিমা তিথিতে সনাতন গোস্বামীর ও উহার ২৭ দিন পরে শ্রাবণী শুক্লা-ত্রয়োদশীতে শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। তাঁহারা দুই ভাই খুব সম্ভব ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন। কারণ শ্রীজীব তাঁহার মাধবমহোৎসব কাব্য ঐ সালে রচনা করেন এবং উহাতে সনাতন গোস্বামীর কথা এমনভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে উহাতে মনে হয় সনাতনের বৃন্দাবনপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। যথা—

অঙ্ঘ্রিযুগ্মমিহ সার-সারস
মর্দ্ধি মূর্দ্ধণি দধাতু মামকে।
যঃ সনাতন তয়া স্ম বিন্দতে
বৃন্দকাবনমমন্দ-মন্দিরম্॥ (তৃতীয় শ্লোক)

এই শ্লোকে এক অর্থে কৃষ্ণের কথা অন্য অর্থে সনাতন গোস্বামীর কথা বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ পক্ষে অর্থ— যিনি সনাতনতয়া অর্থাৎ সুনিশ্চলরূপে বৃন্দাবনে বাস করেন— যিনি বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি। আর শ্রীরূপের বড় ভাই সনাতন সম্বন্ধে অর্থ যিনি চিরকালের জন্য বৃন্দাবনলাভ করিয়াছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (বাঙ্গালার ইতিহাস পৃ. ৩১০) কোন প্রমাণ না দেখাইয়া লিখিয়াছেন যে সনাতন ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ও রূপ ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অপ্রকট হন। প্রায় সমসাময়িক লেখক কর্ণপূর কবিরাজের উক্তি ইহার বিরুদ্ধে যায়।

কর্ণপূর কবিরাজ বলেন যে শ্রীনিবাস বৈশাখ মাসে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনের কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীজীব বৃন্দাবনে আসেন—যথা—(শ্লোকের অনুবাদ দিতেছি)

—সনাতন প্রভু ও শ্রীরূপ প্রভু সত্বর সুবুদ্ধি শিশু শ্রীজীব গোস্বামীকে বৃন্দাবনে আকর্ষণ করিয়া আনাইয়া যমুনাজলে স্নান করাইলেন ও কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া বলিলেন (২২)—"বৎস! আমার কথা শুন। ব্রজে তোমাকে এইজন্য স্থাপিত করা হইল যে তুমি মদীয় গ্রন্থাদির এমন সরল টীকা কর যাহা বালকেও বুঝিতে পারে; আর শ্রীহরির বিশুদ্ধা ভক্তির স্থাপন কর। গোবিন্দের সেবা কর ও পাষণ্ডের নিবারণ কর (২৩)।" এই কথা শুনিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার পদযুগলে শ্রীজীব বলিলেন—"হে নাথ! আমি যে শিশু, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব, এত বড় কাজ করিবার আমার শক্তি কোথায়? সঙ্গীই বা কোথায়? আজ্ঞা যদি পালনই করিতে হয়, তবে শুদ্ধমতি সঙ্গী আপনি দিউন (২৪)।" শ্রীজীবের কথা শুনিয়া শ্রীরূপ মনে মনে একটু চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"শোন, আমি তোমাকে সঙ্গী দিতেছি। আগামী বৈশাখ মাসে কৃশতনু এক ব্রাহ্মণকুমার ব্রজে আসিয়া তোমার সঙ্গী হইবে (২৫)।"

শ্রীনিবাস তাহা হইলে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীবৃন্দাবনে পৌছিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর। তিনি দেখিতে রোগাপাৎলা— কৃশতনু ছিলেন। তাঁহার তৎকালীন চেহারার একটি ছবি কর্ণপূর কবিরাজ আঁকিয়াছেন—

> কৌপীনং দধতং বহির্ব্বসনকং মালাং তুলস্যা মৃদা
> রাধাকুণ্ড-ভুবা বিধায় তিলকং গাত্রেষু নামাক্ষরম্।
> গ্রন্থে নেত্রযুগং মনশ্চ ভুজয়োঃ সল্লেখনী পত্রকং
> চানন্দেন সদোর্ণকাসনবরে বিষ্টং তদা বৈষ্ণবৈঃ॥ ৩২

—ইনি তখন কৌপীন, বহির্বাস ও তুলসীমালা ধারণ করিতেন, রাধাকুণ্ডের রজ তিলক এবং গায়ে নামাক্ষর (কৃষ্ণনাম) লিখিতেন। নেত্রদ্বয় ও মন গ্রন্থে নিবিষ্ট রাখিতেন এবং হস্তদ্বয়ে লেখনী ও পত্র (তালপত্র) রাখিয়া বৈষ্ণবগণের সঙ্গে লোমের আসনে বসিয়া কাল কাটাইতেন। এই

বর্ণনা হইতে পাওয়া যায় যে শ্রীনিবাস বিবাহের পূর্ব্বে রীতিমত বৈরাগীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস প্রথমবার বৃন্দাবনে যাইয়া কতদিন ছিলেন জানা যায় না। কর্ণপূর কবিরাজ বলেন—

এবং যে বহুকালমাত্রমনয়ৎ কুর্বন্ ব্রজে প্রত্যহং (৪৯)

—এইরূপে প্রত্যহ সেবা ও 'গ্রন্থস্যাভ্যসনং' (৪৮) করিতে করিতে ব্রজে বহুদিন অতিবাহিত করিলেন। যদি শ্রীনিবাস ৪।৫ বৎসর বৃন্দাবনে থাকিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন অনুমান করা যায়, তাহা হইলে ১৫৬০।৬১ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার বয়স আন্দাজ ৪৫ বৎসর তখন গৌড়ে ফেরেন ও বিবাহ করেন। ৪।৫ বৎসরের বেশী তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন অনুমান করিলে এক দিকে যেমন তাঁহার বিবাহের বয়স পার হইয়া যায়, অন্য দিকে তেমনি নরহরি সরকার ঠাকুরের প্রকট থাকা ও শ্রীনিবাসকে বিবাহ করিতে আদেশ দেওয়া কঠিন হয়। যদি সরকার ঠাকুরকে শ্রীচৈতন্যের সমবয়সী বলিয়াও ধরা যায়, তাহা হইলেও ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বয়স ৭৪।৭৫ হয়।

গোপালভট্টের জীবনকাল বিচার করিয়াও শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন ও দ্বিতীয়বারে তথায় গমনের সময় নির্ণয় করা প্রয়োজন। মুরারিগুপ্তের কড়চা (৩।১৫। ১৪-১৬, অর্থাৎ যে অধ্যায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরমানন্দ সেন কবি কর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য অনুসরণ করিয়াছেন) অনুসারে ১৪৩২।৩৩ শকে অর্থাৎ ১৫১০।১১ খৃষ্টাব্দে গোপাল-ভট্ট শিশু অবস্থায় শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তাঁহার জন্ম ১৫০৫।৬ খৃষ্টাব্দে হওয়া সম্ভব। ১৫৬০।৬১ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর যদি বিবাহ করেন ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিয়া ১২।১৩ বৎসর কাটান এবং তার পর বৃন্দাবনে যাইয়া বছর-দুই বাস করেন, তাহা হইলে তিনি যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে শ্যামা-নন্দের সঙ্গে গৌড়ে আসেন সে সময়ে অর্থাৎ ১৫৭৫।৭৬ খৃষ্টাব্দে গোপাল-ভট্টের বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হয়। এইজন্যই তাঁহার পক্ষে রাধারমণের সেবা চালাইবার উপযুক্ত লোক খোঁজা স্বাভাবিক।

শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর বীর হাম্বীরকে শিষ্য করেন তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সম্ভবতঃ গৌড়দেশে দুইচার মাস বাস করিয়া তাঁহার উদ্বিগ্না স্ত্রীকে শান্ত করিয়া পরে উৎকলে গোস্বামীদের গ্রন্থ প্রচার করিতে যাইতেছিলেন। পথে ঐ গ্রন্থ চুরি যায় এবং সেই সূত্রে বীর হাম্বীরের রাজসভায় তিনি উপস্থিত হন। এইবার দেখা যাক্ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বীর হাম্বীর রাজা হইয়াছিলেন কি না।

বীর হাম্বীরের সময়

বীর হাম্বীর আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালের একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ একটি অব্দ প্রচলন করেন, তাহার নাম মল্লাব্দ। বিষ্ণুপুরের রাজবংশ শুধু নহে, ঐ অঞ্চলের লোকেরাও মল্লাব্দে কাল নির্দ্দেশ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ডাঃ ব্লক বিষ্ণুপুরের একটি মন্দিরে ১০৬৪ মল্লাব্দ ও ১৬৮০ শক পাইয়া স্থির করেন যে ৬৯৪ খৃষ্টাব্দে মল্লাব্দ সুরু হয়। অভয়পদ মল্লিক বলেন (History of Vishnupur Raj, 1921, পৃ. ৮২) যে, ভাদ্র মাসের ইন্দ্র দ্বাদশী তিথিতে মল্লাব্দের প্রবর্ত্তন হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় ব্লকের মত মানিয়া লইয়া ৬৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মল্লাব্দের আরম্ভ হওয়ার কথা স্বীকার করিরাছেন (Indian Historical Quarterly, 1927, পৃ. ১৮০-১৮১)। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশ্বকোষে 'বিষ্ণুপুর' শব্দ লিখিবার সময় ৭১৫ খৃষ্টাব্দে মল্লাব্দের আরম্ভ ধরেন এবং সেই গণনা অনুসারে লেখেন যে বীর হাম্বীরের রাজ্যকাল আরম্ভ হয় ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে। ৭১৫ ও ৬৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পার্থক্য ২১ বছরের। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ২১ বৎসর বাদ দিলে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। নগেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেবের Statistical Account of Bengal গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (পৃ, ২৩৫) বীর হাম্বীরের সিংহাসনাধিরোহণ ৮৮১ মল্লাব্দে লিখিত আছে দেখিয়া ৮৮১-র সহিত তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা অনুসারে মল্লাব্দের প্রারম্ভ ৭১৫ খৃষ্টাব্দ যোগ করিয়া ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ পাইয়াছিলেন। হাণ্টার সাহেবের মত ঐ ভুলসহ দীনেশচন্দ্র সেন

মহাশয় (Vaisnava Literature পৃ. ১০৯) পুনরাবৃত্তি করেন। ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে হাণ্টার সাহেবের পক্ষে বিষ্ণুপুরের প্রাচীন কাগজপত্র পাওয়ার যতটা সুবিধা ছিল, তাহার প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক অভয়পদ মল্লিকের পক্ষে ততটা ছিল না। তাহার উপর আবার অভয়পদবাবুর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব তাঁহার লেখাতেই ধরা পড়ে। সেইজন্য আমরা হাণ্টার সাহেবের মত মানিয়া লইয়া বীর হাম্বীরের রাজ্যকালের আরম্ভ ৮৮১ মল্লাব্দ বা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নিরূপণ করিতেছি।

ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় কোনপ্রকার যুক্তি না দেখাইয়া হাণ্টার সাহেবের মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে L. S. S. O' Malley কর্তৃক সম্পাদিত বাঁকুড়া গেজেটিয়ারের মত মানিয়া লইয়াছেন। ঐ গ্রন্থে পরস্পরবিরোধী উক্তি আছে। উহার ২৬ পৃষ্ঠায় আছে "The reign of Bir Hambir fell between 1591 and 1616"; কিন্তু ১৫৮ পৃষ্ঠায় আছে যে মল্লেশ্বর মন্দিরের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে বীর হাম্বীর ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যে রাজার ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাবসান হয়, তিনি ১৬২২ খৃষ্টাব্দে কি করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন? বস্তুতঃ বীর হাম্বীর ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নাই—বীরসিংহ করিয়াছেন। ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দের Archæological Survey of India-র রিপোর্টের অষ্টম খণ্ডে আছে—"The oldest dated temple in Bishnupur is known as the Mallesvara temple, which has long been regarded as the oldest in Bishnupur, and as dating back to near the beginning of the Malla era, chiefly on the strength of the inscription of which Bishnupur enjoys its fame as a very ancient city, the inscription is dated clearly in Saka 928, but this is a mistake, the word Saka having through some oversight been put instead of Mallabda, and the proof of it is to be seen in the next few lines, where the temple is stated to have been built by Vira Simha, in the year

'Vasu Kara Hara Malla Saka' *i. e.* 928 of the Malla era (পৃ. ২০৩)।

মল্লেশ্বর মন্দিরে উৎকীর্ণ শ্লোকটির যে পাঠ অভয়পদ মল্লিক মহাশয় (পৃ. ৪১) ধরিয়াছেন তাহাতে 'হর' শব্দের পরিবর্ত্তে 'নব' আছে—

বসুকরগণিতে মল্ল শকে শ্রীবীরসিংহেন।
অতিললিতং দেবকুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেষু॥

মল্লিক মহাশয় বলেন যে মল্লেশ্বর মন্দির সম্ভবতঃ বীর হাম্বীর আরম্ভ করেন; কিন্তু সহসা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তিনি উহার নির্ম্মাণ শেষ করেন নাই; তাঁহার পুত্র রঘুনাথ উহা সমাপ্ত করেন এবং মন্দিরলিপিতে নিজের নাম উৎকীর্ণ না করিয়া পিতা বীরসিংহের নাম লেখেন। রঘুনাথের পিতা কিন্তু বীরসিংহ নহেন—বীর হাম্বীর। এইজন্য মল্লিক মহাশয়কে বলিতে হইয়াছে—"In the inscription he named his father, Beera Singha, though the title of 'Singha' was first gained by himself. It seems probable that out of respect for his father, he did not think it proper to name him as Hambeera, he himself being a Singha." এই মত যুক্তিযুক্ত নহে। মল্লিক মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে বিষ্ণুপুরে সে সময়ে রীতি ছিল যে মন্দির তৈয়ারী করিয়া নির্ম্মাণকারীর পিতার নামে আরোপ করা। এ কথা যদি সত্য বলিয়া মানিয়াও লওয়া যায় তাহা হইলেও রঘুনাথ তাঁহার পিতার নাম বীর হাম্বীর না লিখিয়া বীরসিংহ লিখিবেন কেন? বীরসিংহ তো রঘুনাথের পুত্রের নাম। রঘুনাথ সিংহ ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে শ্যামরায়ের, ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে জোড়বাংলার ও ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কালাচাঁদের মন্দির স্থাপন করেন এবং প্রত্যেকটিতে লেখেন—"শ্রীবীর হাম্বীরনরেশ সূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ।" ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে মল্লিক মহাশয় যে মন্দির তৈয়ারী করিয়া পিতৃনামে উহা আরোপ করিবার কথা লিখিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব অমূলক। সেই জন্যই বলিয়াছি যে মল্লিক মহাশয়ের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না।

বাঁকুড়া গেজেটীয়ারে বীর হাম্বীর রাজ্যকালের আরম্ভ ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে

লেখা শেষ হইয়াছে ; কেননা এখানে শুধু উত্তরচম্পূ সংশোধন বাকী আছে, লিখিত হইয়াছে ; পূর্ব্বচম্পূ সম্বন্ধে কোন কথা নাই। পরের পত্রে দেখা যাইবে যে পূর্ব্বচম্পূ পাঠান হইতেছে। পূর্ব্বচম্পূ ১৬৪৫ সম্বৎ বা ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে এবং উত্তরচম্পূ ১৫১৪ শকাব্দায় বা ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। সুতরাং এই পত্র ১৫৮৯-র পরে এবং ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে যে কয়খানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সবই শ্রীজীবের রচনা। রসামৃতসিন্ধু বলিতে শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বুঝাইতে পারে, উহা ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়—কিন্তু শ্রীজীব নিশ্চয়ই শ্রীরূপের গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইবেন না। সুতরাং শ্রীরসামৃতসিন্ধু বলিতে শ্রীজীব কৃত "শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ" শীর্ষক গ্রন্থ বুঝাইতেছে। ঐ গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় (হরিদাস দাস সংস্করণ) গোপালচম্পূ হইতে "বনরুচিরুচিরঃ" ইত্যাদি যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা আমি পূর্ব্বচম্পূর ২৯ চম্পূতে (২৭৩ পৃ., পুরীদাসজীর সংস্করণ) পাইয়াছি। সুতরাং ঐ গ্রন্থখানি শ্রীজীব পূর্ব্বচম্পূ রচনার পরে লেখেন। মাধবমহোৎসব ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইলেও শ্রীজীব পুনরায় উহা সংশোধন করিবার প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন।

রাজা মহাশয় বলিতে বীর হাম্বীর ছাড়া আর কাহাকেও বুঝাইতেছে না। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বীর হাম্বীর যে শ্রীনিবাসের কৃপা পাইয়াছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই পত্রে পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনদাস বলিতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বুঝায়। শ্রীনিবাসের তিনটি পুত্র ও চারিটি কন্যা হইয়াছিল—

> বৃন্দাবনবল্লভ ঠাকুর বড় পুত্র।
> তাঁর ছোট শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠাকুর পুত্র॥
> শ্রীহেমলতা ঠাকুর ঝি ভগিনী তাঁহার।
> শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরঝি ভগিনী যাঁহার॥
> শ্রীকাঞ্চন ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি যমুনা অভিধাম।
> সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি নাম॥
>
> —অনুরাগবল্লী, ৭ম মঞ্জরী, পৃ. ৪৪

হরিদাস দাস মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে (পৃ. ১৩৯২) ভ্রমক্রমে যমুনার নামটি ছাড়িয়া গিয়াছেন।

ভূগর্ভ গোস্বামীর তিরোভাবের কথা সম্বন্ধে ডাঃ নাথ বলেন যে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত যখন ভূগর্ভের আদেশ লইয়া লেখা হইয়াছিল, তখন এই পত্র চরিতামৃত রচনার আরম্ভের ২।১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬০৮।৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু চরিতামৃত আরম্ভের সময় যে শ্রীগর্ভ জীবিত ছিলেন, সে কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন নাই। তিনি যাঁহাদের আজ্ঞা পাইয়া গ্রন্থ আরম্ভ করেন, প্রথমে তাঁহাদের গুরুর নাম লিখিয়াছেন। যেমন হরিদাস পণ্ডিতের গুরুর নাম দিয়া ১।৮-র এই প্রকরণ আরম্ভ—

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করল প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ঞিহো পণ্ডিত হরিদাস ॥

তার পর—

কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি।

সেইরূপ ভূগর্ভ গোসাঞির তিনজন শিষ্যের কথা বলিবার পূর্ব্বে ভূগর্ভের নাম লওয়া হইয়াছে। যথা—

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
চৈতন্য কথা বিনা মুখে আর কথা নাই ॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমিক কৃষ্ণদাস ॥

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে হরিদাস পণ্ডিতের গুরুর যেরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, ঠিক সেই ভাষাতেই চৈতন্যদাস প্রভৃতির গুরুর কথাও বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পত্র

স্বস্তি সমস্ত গুণের দ্বারা প্রশংসনীয় যে বন্ধুবর মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্য সমীপেষু—এই বৃন্দাবন হইতে জীব নামক ব্যক্তির সপ্রণাম আলিঙ্গন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপক এই প্রারম্ভ ঃ—

শ্রীবৃন্দাবন বাসরূপ অভীষ্ট কল্যাণ এখানে অবশ্যই রহিয়াছে। আপনার কল্যাণ (সংবাদ) জানিতে সমুৎসুক থাকিলেও, মধ্যে মধ্যে তাহা শুনিতে না পাইয়া, বরং তাহার বিরুদ্ধ কথাও শুনিতে পাইয়া আমার চিত্ত পীড়িত আছে। অতএব যথাযোগ্য আপনার বর্ত্তমান অবস্থা শুনাইয়া আমাকে সান্ত্বনা দিবেন।

অপর পূর্ব্বেকার পত্রের উত্তর আগেই দিয়াছি। এখন নিবেদন করিতেছি—বিরুদ্ধ ভগবৎভক্তের দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং দেহ বিদগ্ধ হওয়ায় শোক হইতেছে। তথাপি কর্ত্তব্য করিতেছি, যদি ইহাতে শোক নিবৃত্ত হয়।

আরও পারমার্থিক শ্যামদাস আচার্য্য আপনার সঙ্গলাভে ইচ্ছুক এবং ব্যুৎপন্ন। অতএব ইহার সহিত প্রেমপূর্ব্বক শ্রীভগবদ্ভক্তি— বিচারাধিক্য করা উচিত। ঈদৃশ সহায় হইলে পাষণ্ডীরাও খণ্ডিত হইবে। সম্প্রতি বৈষ্ণব-তোষণী দুর্গমসঙ্গমিনী ও শ্রীগোপালচম্পূ পুস্তক কয়খানি শোধন করিয়া বিচার করিয়া ইঁহার মারফৎ পাঠান হইতেছে। অতএব পুস্তকের এবং বিচারের সংশোধনের জন্য ইঁহার সহিত মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য। ইঁহাকে আত্মীয়বৎ পালনবুদ্ধি করিবেন।

অপর পূর্ব্বে যে হরিনামামৃত ব্যাকরণ আপনার সঙ্গে পাঠান হইয়াছে, তাহা যদি পড়ানো হয়, তবে সে বিষয়ে ভাষ্যাদি বৃত্তি প্রভৃতি দেখিয়া ভ্রমাদি শোধনের জন্য অপর একখানি পরিশিষ্ট পুস্তকও এখানে আছে; যদি সেটি আপনি চাহেন তো জানাইবেন। সম্প্রতি শ্রীমৎ উত্তর গোপালচম্পূ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিচার প্রয়োজন। নিবেদন ইতি।

পুনরায় কবে সেই ভাগ্য হইবে যখন দূর হইতেও আপনার প্রসঙ্গ শুনিয়া অনুধ্যান করিতে পারিব? শ্রীবৃন্দাবন দাসাদিত শুভ চিন্তন করি, শ্রীগোপাল দাস প্রভৃতির শুভ চিন্তন করি। ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্য চরণেষু।

টীকা—

ভক্তিরত্নাকরে (পৃ. ১০৩৩—৩৪) আছে যে শ্যামদাস শ্রীব্যাস আচার্য্যের পুত্র।

বৃন্দাবনদাস শ্রীনিবাসের নন্দন।
আদি শব্দে জানো তাঁর ভ্রাতাভগ্নীগণ॥

বীর হাম্বীরের পুত্র শ্রীগোপাল দাস।
শ্রীজীব গোস্বামি দত্ত এ নাম প্রকাশ॥
শ্রী ধাড়ি হাম্বীর নাম সর্ব্বত্র প্রচার।
শ্রীজীব গোস্বামী শুভ চিন্তে এ সভার॥

এই পত্রখানি ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল, কেননা ইহাতে সম্প্রতি উত্তর গোপালচম্পূ লিখিত হইয়াছে এই কথা আছে। পত্রে উল্লিখিত 'দুর্গমসঙ্গমিনী' শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্রীজীবরচিত টীকার নাম। বৈষ্ণবতোষণী বলিতে এখানে শ্রীজীবকৃত লঘুবৈষ্ণবতোষণী বুঝাইতেছে। উহা ১৫০৪ শকে বা ১৫৮২—৮৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

তৃতীয় পত্রখানি রামচন্দ্র কবিরাজ, নরোত্তমদাস ও গোবিন্দদাসকে সম্বোধন করিয়া শ্রীজীব লিখিয়াছেন। এই পত্রে তিনি সাধনার রীতি সম্বন্ধে আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ লইতে বলিয়া লিখিয়াছেন "তিনি আমার সর্ব্বস্বই"। চতুর্থপত্র গোবিন্দদাস কবিরাজকে লিখিত। উহার এক স্থানে আছে—"শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামীর জন্য পূর্ব্বে শ্যামাদাস মৃদঙ্গবাদকের হাতে বৃহদ্ভাগবতামৃত পাঠানো হইয়াছে; তাহা সেখানে পৌছাইল কি না তাহা লিখিয়া আমার সন্দেহ দূর করিবেন।" পত্র চারখানির সর্ব্বত্র শ্রীনিবাসকে বন্ধুভাবে ও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীজীব দেখিয়াছেন। কর্ণপূর কবিরাজের সূচকেও উভয়ের বন্ধুত্বের কথা আছে।

পত্রগুলির অকৃত্রিমতায় সন্দিহান হইয়া শ্রীযুক্ত রাধামাধব তর্কতীর্থ লিখিয়াছেন যে পত্রগুলিতে—"গোস্বামীদের রচিত যে সকল গ্রন্থ লোক-মারফৎ প্রেরিত বা প্রেরিতব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলিকে বাদ দিলে গোস্বামীদের রচিত অপরগুলির মূল্য নিতান্ত অল্প হইয়া যায়। এই গ্রন্থ-গুলিকে বাদ দিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রচারযোগ্য গ্রন্থ নাই বলিলেই চলে।" এ কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। শ্রীনিবাস প্রথমবারে নিম্নলিখিত গ্রন্থ বৃন্দাবন হইতে আনিয়াছিলেন বলা যায়—(১) উজ্জ্বল নীলমণি (২) ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু (৩) হরিভক্তিবিলাস (৪) লীলাস্তব (৫) বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী টীকা (৬) দানকেলি কৌমুদী (৭) বিদগ্ধ মাধব (৮) ললিত মাধব (৯) লঘুভাগ-বতামৃত (১০) স্তবমালা (১১) হংসদূত (১২) উদ্ধবসন্দেশ (১৩) পদ্যাবলী

(১৪) নাটক চন্দ্রিকা (১৫) মথুরা মহিমা (১৬) গীতাবলী (১৭) কৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি (১৮) বৃহৎ ও লঘু রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা (১৯) প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা (২০) রঘুনাথদাসকৃত দানকেলিচিন্তামণি (২১) স্তবাবলী (২২) মুক্তাচরিত্র, এবং (২৩) কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত গোবিন্দলীলামৃত। তালপাতায় লিখিত এই গ্রন্থগুলি ভারচতুষ্টয় অনায়াসেই হয়। আমার পাশের বাড়ীর এক বন্ধু আমার নিকট কেবলমাত্র হরিভক্তিবিলাস ও গোপালচম্পূ চাহিতে আসিবার সময় লোক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন এবং দুইজনে সাতখণ্ড গ্রন্থ কষ্টের সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পত্রকয়খানিতে একমাত্র বৃহদ্ভাগবতামৃত ছাড়া আর যে সব গ্রন্থের নাম আছে, সেগুলির প্রত্যেকখানি শ্রীজীবের রচনা। কোন কারণে প্রথমবারে শ্রীনিবাস বৃহদ্ভাগবতামৃত আনিতে পারেন নাই। তর্কতীর্থ মহাশয় পত্রগুলিতে তিথি ও মাসের উল্লেখ দেখিয়া ও সন সালের উল্লেখ না পাইয়া উহাদিগকে জাল বলিয়াছেন। একালের অনেক পণ্ডিত ও অফিসের বড় সাহেব সাল উল্লেখ না করিয়া শুধু মাস ও তারিখ লিখিয়া থাকেন। শ্রীজীব যাঁহাদের জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন তাঁহারা সাল জানিতেনই বুঝিয়া তিনি উহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। তর্কতীর্থ মহাশয় অনেক কিছুকেই মিথ্যা ও জাল বলিয়াছেন। শ্রীনিবাসের জন্ম ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ বা তাহার নিকটবর্তী কালে প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে যে শ্রীনিবাস গোপালভট্টের শিষ্য নহেন এবং যে পদে শ্রীনিবাস গোপালভট্টকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উহা জাল (Our Heritage, Vol. II, Part 1, 1954 পৃ. ২০১)। শ্রীনিবাসের পুত্র গোবিন্দগতি স্বয়ং তাঁহার পিতাকে গোপালভট্টের শিষ্য বলিয়াছেন (কর্ণানন্দে উদ্ধৃত শ্লোক ৮ পৃ.); কর্ণপূর কবিরাজ (সূচকশ্লোক ৪৩-৪৪), মনোহর দাস অনুরাগবল্লীতে, ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম-বিলাসে নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি সকলে তর্কতীর্থ মহাশয়কে ধোঁকা দিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়াছেন এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

কর্ণানন্দ যদি সত্যই ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়, তবে সে সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্রের তিনপুত্র, কৃষ্ণপ্রসাদ, সুন্দরানন্দ ও শ্রীহরি ঠাকুর "ভক্তশূর" (পৃ. ২৮) হইতে পারেন কি না তাহা বিচার্য্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি

যে শ্রীনিবাস আনুমানিক ১৫১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৫৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেন। ১৫৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে যদি গতিগোবিন্দের জন্ম হয়, তাহা হইলে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিনটি পুত্র হওয়া কিছু অসম্ভব নহে।

কর্ণপূর কবিরাজের সূচকে (৭৪) ও অনুরাগবল্লীতে (পৃ. ৩৭) দেখা যায় যে শ্রীনিবাস প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে আসিয়া রামচন্দ্র কবিরাজকে শিষ্য করেন। তারপর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া বীর হাম্বীর ও গোবিন্দদাস কবিরাজকে শিষ্য করেন। গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্র চিরঞ্জীব সেনের কনিষ্ঠপুত্র। সুতরাং তাঁহার জন্ম মহাপ্রভুর তিরোধানের অল্প পরেই হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাঁহার যখন দীক্ষা হয় তখন তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহ বেশ বড় হইয়াছেন। প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থে দেখা যায় যে দিব্যসিংহই শ্রীনিবাসকে গ্রামের প্রান্ত হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং গোবিন্দ-দাসের বয়স তখন চল্লিশ বৎসরের কাছাকাছি। তিনি যদি ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়স ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে। ঐ সময়ের কাছাকাছিই শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করেন।

পুলিনবিহারী দাস মহাশয় "বৃন্দাবন কথায়" লিখিয়াছেন যে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধরদের গৃহে রক্ষিত পুথি হইতে জানিয়াছেন যে শ্রীনিবাস ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন। এই ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্ত প্রায় মিলিয়া যাইতেছে।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাসের অপেক্ষা বয়সে অন্ততঃ ১৪।১৫ বছরের ছোট ছিলেন। কেননা শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া প্রবাদ। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস যখন প্রথমবার শ্রীবৃন্দাবনে যান তখন নরোত্তম ঠাকুর লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা লইয়া গুরুর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কর্ণপূর কবিরাজ লিখিয়াছেন যে লোকনাথের কুঞ্জে যখন শ্রীনিবাসের সঙ্গে নরোত্তমের পরিচয় হয় তখন শ্রীনিবাস বলেন—

ধাতা কিং নয়নং কিমুস্বচ করং সৎপক্ষ কিং মে মনঃ
কিং রত্নং বহুমূল্যকং কিমথ বা প্রাণশ্চ মে দত্তবান্।

—বিধাতা আজ আমাকে কি নয়নই দিলেন না নেত্রাচ্ছাদক পক্ষ্মই দিলেন ? অথবা আমাকে মনই দিলেন না বহুমূল্য রত্ন দিলেন ? অথবা আমাকে প্রাণই দিয়াছেন কি ? (৪৭ শ্লোক)। কর্ণপূর কবিরাজের মতে নরোত্তম যে শ্রীনিবাসের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে ফেরেন নাই তাহা পূর্ব্বেই ৬৩ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। নরোত্তম ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের পরও কিছুকাল বৃন্দাবনে ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই হয়তো রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, কেননা কর্ণপূর কবিরাজ বলেন যে শ্রীনিবাস রামচন্দ্র কবিরাজকে গোস্বামি গ্রন্থ পড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন—

বৃন্দায়া বিপিনে ভবৎ সমদৃশং চৈকং প্রদাতা বিধি—
মহ্যং কক্ষিপুরা যতো বহুদিনং চৈকাক্ষিবানপ্যহম্।
ধাত্রা ত্বং পুনরদ্য চক্ষুরপরং দত্তস্থিদং যোঽবদৎ
সোঽয়ং ইত্যাদি……(৭৮ শ্লোক)।

—বৃন্দাবনে তোমার তুল্য এক চক্ষু বিধাতা আমাকে পূর্ব্বে দিয়াছিলেন, বহুদিন আমি একচক্ষুই ছিলাম ; আজ বিধাতা আবার তোমাকে দিয়া আমাকে আর এক চক্ষু প্রদান করিলেন। এই শ্লোকটির প্রতিধ্বনি অনুরাগ-বল্লীতে পাওয়া যায়—

বৃন্দাবনে তোমা সম পাইল এক লোচন॥
একাক্ষি হইয়া আমি ছিলাম বহুদিন।
অদ্য দ্বিতীয়াক্ষি দিল বিধি সুপ্রবীন॥ (পৃ. ৩৮)

এইরূপ অনুবাদ কর্ণপূর কবিরাজের সূচকের প্রামাণিকতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অনুরাগবল্লীতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে শ্রীনিবাসের নিকট রামচন্দ্র কবিরাজের দীক্ষা হইবার পর তাঁহার সহিত নরোত্তম ঠাকুরের বন্ধুত্ব হয়—

আচার্য্য ঠাকুরের শিষ্য বড় কবিরাজ ঠাকুর।
তাঁহার সহিত প্রীতি বাড়িল প্রচুর॥ (পৃ. ৩৭)

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তনের নূতন পদ্ধতি স্থাপন করেন। তিনি খেতুরীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং সেই উপলক্ষ্যে তৎকালীন সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভক্তকে একত্রিত করেন। খেতুরীর এই

উৎসবে বৃন্দাবনের ভজনপ্রণালীর সঙ্গে গৌড়ের গৌরাঙ্গ-পারম্যবাদের সামঞ্জস্য (synthesis) স্থাপিত ও ঘোষিত হয়। রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরাঙ্গের মূর্ত্তিপূজার কোন বিবরণ আমরা পাই না। এই উৎসবে গোবিন্দ কবিরাজ অতিথি-পরিচর্য্যার ভার লইয়াছিলেন বলিয়া নরোত্তমবিলাসে (সপ্তম বিলাস) লিখিত আছে। সুতরাং এই উৎসব ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের পরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বেশী পরে নহে। কেননা উৎসবে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের পরিকরদের মধ্যে নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন, অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দ, শ্রীবাসের ভ্রাতা—শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, নিত্যানন্দের পার্ষদ রঘুপতি উপাধ্যায়, মীনকেতন রামদাস, কানুপণ্ডিত, বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাস প্রভৃতি ও নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবাদেবী উপস্থিত ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি ছিল এবং সেই কথা নরহরি চক্রবর্ত্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দুই-চারিটি নামের সম্বন্ধে তাঁহার ভুল হইতে পারে, কিন্তু কাটোয়ার মহোৎসবে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন বলিয়া তিনি ভক্তিরত্নাকরে লিখিয়াছেন ও খেতুরীতে উপস্থিত মহাজনবর্গের যে তালিকা নরোত্তমবিলাসে দিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকিয়া পারে না। ১৫৮০।৮১ খৃষ্টাব্দের পরে খেতুরীর উৎসব হইলে অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দ, যাঁহার বয়স ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পাঁচ বৎসর ছিল বলিয়া বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে উপস্থিত থাকা কঠিন হয়।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদেই রচিত হইয়াছিল। কেননা সাহিত্য পরিষদের ২৩০৪ সংখ্যক প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার পুথির লিপিকাল ১০০৯ সাল অর্থাৎ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দ। এই সাল মল্লাব্দ নহে। সাহিত্য পরিষদের পুথিশালার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও পুথির অক্ষরাদি দেখিয়া উহা ৩৫০ বৎসরের প্রাচীন বলিলেন। পুথিখানি আমি মুদ্রিত পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছি যে বহু স্থানেই পাঠান্তর—কোন কোন স্থানে মূল্যবান পাঠান্তর আছে। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে যে পুঁথি নকল হইয়াছিল তাহা অন্ততঃ ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বল্লভদাস শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্র ও

গোবিন্দদাস কবিরাজের তিরোধানের পরও জীবিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

উচ্ছিষ্টের কুক্কুর মুঞি আছিলুঁ সেখানে।
যখন যে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে॥
শুনিতে স্বপন হেন কহিতে কহো কথা।
ভিটা সোঙরিয়া কুক্কুর কান্দে এমতি আছি একা॥

অন্য একটি পদে (তরু ২৯৮১) তিনি লিখিয়াছেন—

গোরাগুণে আছিলা ঠাকুর শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দদাস॥
একুই কালে কোথা গেল দেখিতে না পাই।
থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই॥

শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র কিছু আগে অপ্রকট হইয়াছিলেন বলিয়া নরোত্তম ঠাকুর বিলাপ করিয়াছেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ অন্ততঃ ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাহার পর হয়তো তিনি ও নরোত্তমঠাকুর মহাশয় প্রায় একই সময়ে তিরোধান করেন বলিয়া বল্লভদাস দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—"একুই কালে কোথা গেল দেখিতে না পাই।"

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" ও "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" এখনও অসংখ্য নিষ্ঠাবান ভক্ত প্রত্যহ পাঠ করেন। এই দুই গ্রন্থের আন্তরিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মনিবেদনের ভাব পাষাণ-হৃদয়কেও গলাইয়া দেয়। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কেবলমাত্র ভক্ত ও সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন না। তাঁহার কবিত্ব শক্তিও অতুলনীয়। বর্ত্তমান সঙ্কলনে প্রদত্ত তাঁহার পদগুলি নরহরিসরকার, বংশীবদন ও বলরামদাসের পদের পাশে বসিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। "কদম্বতরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল" ইত্যাদি রসের পদটি পড়িতে পড়িতে চোখের সামনে যেন দেখা যায় যে

রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়॥

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রায় বসন্তের কোন কোন পদকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির পদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কবিগুরু লিখিয়াছেন— "বসন্তরায়ের কবিতায় আর একটি মোহ-মন্ত্র আছে, যাহা বিদ্যাপতির কবিতায় সচরাচর দেখা যায় না। বসন্তরায় প্রায় মাঝে মাঝে বস্তুগত বর্ণনা দূর করিয়া দিয়া এক কথায় এমন একটি ভাবের আকাশ খুলিয়া দেন যে, আমাদের কল্পনা পাখা ছড়াইয়া উড়িয়া যায়, মেঘের মধ্যে হারাইয়া যায়। এক স্থলে আছে—'রায় বসন্ত কহে ও রূপ পিরীতিময়'। রূপকে পিরীতিময় বলিলে যাহা বলা হয়, আর কিছুতে তাহার অপেক্ষা অধিক বলা যায় না। যেখানে বসন্তরায় শ্যামের রূপকে বলিতেছেন—

কমনীয় কিশোর কুসুম অতি সুকোমল
কেবল রস নিরমান।

সেখানে কবি এমন একটি ভাব আনিয়াছেন, যাহা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। সেই ধরা-ছোঁয়া দেয় না, এমন একটি ভাবকে ধরিবার জন্য কবি যেন আকুল ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। 'কমনীয়', 'কিশোর', 'সুকোমল' প্রভৃতি কত কথাই ব্যবহার করিলেন, কিছুতেই কুলাইয়া উঠিল না, অবশেষে সহসা বলিয়া ফেলিলেন, 'কেবল রস নিরমাণ'। কেবল তাহা রসেই নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার আর আকার-প্রকার নাই।"

(রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী পৃঃ ১১০৬)।

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখর গোবিন্দদাস কবিরাজের মতন অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদ লিখিয়াছেন। রায়শেখর শ্রীকৃষ্ণলীলার বাল্যলীলা, গোষ্ঠ, পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মান, খণ্ডিতা, রসোদ্গার, আক্ষেপানুরাগ বিষয়ে পদ রচনা করিয়াছেন। ইনি ভণিতায় শেখর বা রায়শেখর লিখিতেন। কবিশেখর অথবা নব কবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদগুলি ইঁহার রচনা নহে, যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'রায়শেখর পদাবলী'তে এগুলি স্থান পাইয়াছে। পদকল্পতরুতে রায়শেখরের ৯১টি অষ্টকালীয় লীলার পদ ধৃত হইয়াছে, উহার মধ্যে ৭৬টির ভণিতায় শুধু শেখর নাম আছে, ৫টিতে রায়শেখর ও ১০টিতে শেখর রায় ভণিতা আছে। কবির নাম শেখর ছিল, রায় উপাধি। ২১৫৯ ও ২৫১১,

সংখ্যক পদে তিনি "কহ কবি শেখর রায়'' লিখিয়াছেন—কিন্তু কবিশেখর লেখেন নাই। তরুর ২৩৭৩ সংখ্যক পদে তিনি রঘুনন্দনের স্তুতি করিয়া লিখিয়াছেন—

সে পদ রজনী দিনে, শয়ন স্বপন মনে,
রায় শেখর করু আশে।

২৩৭৪ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে

পপিয়া শেখর রায় বিকাইল রাঙ্গা পায়
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর॥

রায়শেখর গোবিন্দদাসের অনুসরণ করিয়া কয়েকটি ব্রজবুলির পদ ও কয়েকটি অনুপ্রাসযুক্ত চিত্রগীতও রচনা করিয়াছেন। ইঁহার কবিত্ব স্থানে স্থানে উত্তম।

পঞ্চম অধ্যায়

গোবিন্দদাসের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব
এবং
পদসঙ্কলন গ্রন্থাদির ইতিহাস

বাংলার ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হইতেছে ষোড়শ শতাব্দী। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কিরণচ্ছটায় বাঙ্গালীর জীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অনুপ্রেরণায় আমাদের সমষ্টিগত জীবনের ভাবধারা উদ্বেল হইয়া উঠিয়া কীর্ত্তন ও পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে তাহার বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। সহজ সরল ভাষায় গভীরতম ভাব প্রকাশ করিয়া মহাজনগণ বাংলার জনসাধারণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষ পাদে কিন্তু এই স্বচ্ছ ভাবধারার মধ্যে আলঙ্কারিক কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত অধিকাংশ পদাবলীর মধ্যে ষোড়শ শতকের প্রাঞ্জলতা ও মর্ম্মস্পর্শী দ্যোতনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ষোড়শ শতকের পদাবলী-সাহিত্যকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যকে এক অখণ্ড কাব্যরূপে দেখিতেই ভক্ত ও সাহিত্যিকগণ অভ্যস্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞান-দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ সঙ্কলন আরম্ভ হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ সাতখানি পদসংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হইতেছে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত ক্ষণদাগীতচিন্তামণি। রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা স্মরণ করিবার উদ্দেশ্যে চক্রবর্ত্তী মহোদয় ৪৫জন কবির লিখিত ৩০৯টি মাত্র পদ এই গ্রন্থে স্থান দেন ; তাহার মধ্যে ৫১টি পদ তাঁহার নিজের রচনা। তিনি আরও পদ হয়তো সঙ্কলন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কেননা প্রত্যেক ক্ষণদার নীচে "শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে" লেখা দেখিয়া মনে হয় যে তিনি গ্রন্থের একটি উত্তরবিভাগও সঙ্কলন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু হয়তো

দেহান্ত হওয়ার জন্য তাহা পারেন নাই। তিনি ১৬২৬ শকে বা ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা শেষ করেন। সম্ভবতঃ ইহার কিছু দিনের মধ্যেই ক্ষণদাগীতচিন্তামণি সঙ্কলিত হয়। ইহাতে ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীর ধারা দেখাইবার কোনই প্রয়াস নাই। চক্রবর্ত্তী-পাদ গোবিন্দদাস কবিরাজের ব্রজবুলিমিশ্রিত আলঙ্কারিক ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রচিত পদে সেইজন্য নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ প্রমুখ কবিকুলের রচনাশৈলীর তীরবৎ অব্যর্থ সন্ধান দেখা যায় না। বর্ত্তমান সংগ্রহে প্রদত্ত ষোড়শ শতকের কবিদের গৌরাঙ্গের ভাব ও রূপের বর্ণনার সহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিম্নলিখিত পদটির তুলনা করিলে এই উক্তির যাথার্থ্য বুঝা যাইবে।

দেখ দেখ সোই মূরতিময় মেহ।

কাঞ্চন কাঁতি, সুধা জিনি মধুরিম, নয়ন-চষক ভরি লেহ।
শ্যামল বরণ, মধুর রস ঔষধি, পূরব যো গোকুল মাহ।
উপজল জগত যুবতী উমতাওল, যো সৌরভ পরবাহ॥
যো রস রাজ গোরী কুচমণ্ডল মণ্ডনবর করি রাখি।
তে ভেল গৌর গৌড় অব আওল, প্রকট প্রেম-সুর শাখী॥
সকল ভুবন সুখ কীর্ত্তন-সম্পদ, মত্ত রহল দিনরাতি।
ভবদব কোন্? কোন্ কলিকল্মষ, যাঁহা হরিবল্লভ ভাঁতি॥

টীকা টিপ্পনী ব্যতীত এই পদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। চষক বা পানপাত্র হইতে সুধা পান করা হয়, নয়ন হইতেছে সেই পানপাত্র, আর গৌরাঙ্গের কাঞ্চন-কান্তি সুধার মাধুর্য্যকেও জয় করিয়াছে বলিয়া উহা নয়নরূপ পানপাত্রে ভরিয়া লইতে বলা হইয়াছে। মেঘকে মেহ ও সৌরভপ্রবাহকে সৌরভ পরবাহ বলিলে মানে বুঝিতে বেশ কিছু সময় লাগে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী হরিবল্লভ নাম দিয়া পদরচনা করিয়াছেন।

কীর্ত্তনীয়াদের মধ্যে হরিবল্লভের পদ বিশেষ সমাদৃত হয় নাই। কিন্তু পদাবলীর দ্বিতীয় সঙ্কলনকর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুরের দুই-একখানি পদ না গাহিয়া খুব কম কীর্ত্তনীয়াই পালা শেষ করেন। রাধামোহন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র অর্থাৎ পঞ্চম অধস্তন পুরুষ। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সমসাময়িক মহারাজা নন্দকুমার রাধামোহনের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রাধামোহন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার পদামৃত-সমুদ্রে ৭৪৬টি পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইনিও গোবিন্দদাসের প্রতিভায় মুগ্ধ। তাই সঙ্কলিত পদের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী পদ অর্থাৎ ২৭০টি গোবিন্দদাসের রচনা হইতে গৃহীত। অবশ্য ইহার মধ্যে কয়েকটি পদ গোবিন্দ আচার্য্য এবং গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীরও রচনা। রাধামোহন গোবিন্দদাস কবিরাজকে অনুসরণ করিয়া ২২৮টি পদ রচনা পূর্ব্বক স্বীয় সঙ্কলনে স্থান দিয়াছেন। যে পালায় যেখানে যে ভাবের পদটির অভাব, সেইখানে তিনি সেই ভাবের পদ রচনা করিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার পদ স্বতঃস্ফূর্ত্ত না হইয়া অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদে লেখা। ঐ প্রয়োজন পূরণের জন্যই আধুনিক কীর্ত্তনীয়ারা তাঁহার পদ গাহিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ শ্রোতা বা পাঠক তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না। একটি উদাহরণ দিলে কথাটি বুঝিবার সুবিধা হইবে। গোবর্দ্ধনে মিলনের কোন পদ না পাইয়া রাধামোহন নিজেই উহা লিখিলেন—

গিরিবর-কুঞ্জে চললি দুহুঁ নিরজনে
উজ্জ্বল-সমরক লাগি।
নিজ-অভিযোগ-বচনক কৌশলে
মনহিঁ মনোভব জাগি॥
সজনি আজু পরম রস ভেল।
অভিনব রাগ তুরঙ্গ মনোরথে
দুহুঁক ঘটন পুন ভেল॥

উজ্জ্বল-সমর হইতেছে উজ্জ্বল বা মধুর রসের যুদ্ধ, সাদা কথায় সুরতসংগ্রাম। 'নিজ অভিযোগ' প্রভৃতির অর্থ হইতেছে এই যে রাধাকৃষ্ণের মনে নিজ নিজ প্রণয়ের ইঙ্গিতসূচক বাক্যের কৌশলে মদন উদ্দীপ্ত হইল। অভিনব রাগ তুরঙ্গের অর্থ বুঝা কঠিন। একদিকে নব অনুরাগ অপরদিকে মনোরথরূপ দ্রুতগামী অশ্ব উভয়ের মিলন ঘটাইল।

রাধামোহন ঠাকুরের সামান্য কিছু পরে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্ত্তী (যাঁহার অপর নাম ছিল ঘনশ্যাম) গীত-চন্দ্রোদয়' নামে একখানি বিপুলকায় পদসঙ্কলনের গ্রন্থ প্রচার করিবার সঙ্কল্প

করেন। ঐ গ্রন্থের মাত্র পূর্ব্বরাগসম্বন্ধীয় ১১৬৯টি পদ হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে ক্ষণদাগীতচিন্তামণির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

সামান্ততর প্রথমেতে গাব গৌর গীত।
চিন্তামণি যৈছে তৈছে এ গীতের রীত॥ (পৃ. ১৫)

গীতচন্দ্রোদয়ের ৪০ পৃষ্ঠায় "আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপচন্দ্র করতলে বদন সঘন অবলম্ব" ইত্যাদি পদটির ভণিতায় দেখি—

পুলক মুকুল ভরু সব দেহ
রাধামোহন কছু না পাওল সেহ।

এই রাধামোহন রাধামোহন গোস্বামী। এই পদটি পদকল্পতরুতে ৬৮ সংখ্যক পদ রূপে ধৃত হইয়াছে। সুতরাং গীতচন্দ্রোদয় সঙ্কলনের সময় রাধামোহন ঠাকুরের কবিখ্যাতি প্রচারিত হইয়াছে। নরহরি চক্রবর্ত্তী গীতচন্দ্রোদয়ে লিখিয়াছেন—

মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা কিঞ্চিৎ ঘুচাইয়া।
অভিসারিকাদি অষ্ট গাব বিস্তারিয়া॥
প্রথমে মুগ্ধাদি নায়িকাভেদ গীত।
তারপর গাব রাগানুরাগা কিঞ্চিৎ॥
ইহার পরেতে গীতে হইব প্রকাশ।
পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস॥

পূর্ব্বরাগেই ১১৬৯টি পদ আছে, সুতরাং তাঁহার সংকলিত গ্রন্থে পাঁচ হাজারের কাছাকাছি পদ থাকিবে ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পূর্ব্বরাগ ছাড়া আর কোন অংশ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

বৈষ্ণবসমাজে পদামৃতসমুদ্রের পরই গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস সংগৃহীত সুপ্রসিদ্ধ 'পদকল্পতরু'র স্থান। বৈষ্ণবদাস নিজে একজন ভাল কীর্ত্তন-গায়ক ছিলেন। তিনি যে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া ভাল ভাল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন সে কথা নিজের সঙ্কলনের শেষে বলিয়াছেন—

আচার্য্য প্রভুর বংশ্য শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥

গ্রন্থ কৈল পদামৃত-সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাঁহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া॥
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥

তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া ৩১০১টি পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া বহু কবির কীর্ত্তি রক্ষা পাইয়াছে। এক একটি লীলার উপর তিনি যতগুলি ভাল পদ পাইয়াছেন তাহা দিয়াছেন। পদগুলি ঐতিহাসিক কালানুযায়ী সাজাইবার তিনি কোন প্রয়াস করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার কলহান্তরিতার পদগুলি লওয়া যায়। তিনটি পল্লবে তিনি যথাক্রমে ১৯, ১২ ও ১৩টি একুনে ৪৪টি পদ সংগ্রহ করিয়াছেন; ইহার মধ্যে কীর্ত্তনীয়া নিজের রুচি ও শ্রোতাদের অভিপ্রায় অনুসারে যে কোন ৮।১০টি পদ গাহিতে পারেন। প্রথমেই রাধামোহন ঠাকুর কৃত গৌরচন্দ্রিকা, তারপর গোবিন্দ-দাসের কয়েকটি পদ, পরে বিদ্যাপতির পদ, জ্ঞানদাসের পদ, অষ্টাদশ শতাব্দীর কীর্ত্তনানন্দের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দর দাসের পদ এবং তারপর ষোড়শ শতকের জ্ঞানদাস এবং দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের পদ স্থান পাইয়াছে। ছয়শত বৎসরের মধ্যে ভাব, ভাষা ও সাহিত্যরীতির যে পার্থক্য দেখা দিয়াছিল তাহার প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন বৈষ্ণবদাস এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কোন সঙ্কলনকারীই বোধ করেন নাই। ধর্ম্মের বা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখানো তাঁহাদের কাজ ছিল না। তাঁহারা রসের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য পালা সাজাইয়াছিলেন। পদকল্পতরুতেও যে কবির রচনা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্থান অধিকার করিয়া আছে তিনি হইতেছেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। গোবিন্দদাসের ৪৬০টি পদ, জ্ঞানদাসের ১৮৬টি ও রাধামোহন ঠাকুরের ১৮২টি পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

বৈষ্ণবদাসের কিছু পূর্ব্বে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে গৌরসুন্দর দাস 'কীর্ত্তনানন্দ' সঙ্কলন করেন। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় (পৃ. ৪) লিখিয়াছেন যে "কীর্ত্তনানন্দে 'বৈষ্ণবদাস' ভণিতায় কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই।"

কিন্তু পদকল্পতরুতে গৌরসুন্দর ভণিতায় ৫টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে কীর্ত্তনানন্দ পদকল্পতরু সঙ্কলনের কিছু পূর্ব্বে হইয়াছিল। কীর্ত্তনানন্দের সম্পূর্ণ পুথিতে ১১১৯টি পদ আছে, তন্মধ্যে বনোয়ারীলাল গোস্বামী মাত্র ৬২৭টি পদ ছাপিয়াছিলেন।

দীনবন্ধুদাস 'সংকীর্ত্তনামৃত' নামে একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া উহাতে নিজের টীকা টিপ্পনী, বিশেষ করিয়া বাংলা পদের সহিত তুলনীয় সংস্কৃত শ্লোক প্রভৃতি যোগ করিয়াছেন। 'সংকীর্ত্তনামৃতে'র যে পুথি দেখিয়া অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন উহার লিপিকাল শকাব্দ ১৬৯৩ অর্থাৎ ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। রাধামোহন ঠাকুরের ন্যায় দীনবন্ধু নিজে কবি ও পণ্ডিত। আবার তিনি পণ্ডিতের বংশের লোক। গ্রন্থের শেষে তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহার বাপ-পিতামহ

স্তবমালা, স্তবাবলী, বিদগ্ধমাধব।
গোবিন্দলীলামৃত আর ললিতমাধব॥
বিল্বমঙ্গল কর্ণামৃত রসামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মসংহিতা ভাগবতামৃত নানা ছন্দ॥
সন্দর্ভদশম টিপ্পনী আদি যত।
ভক্তিগ্রন্থ সংগ্রহ করিল শত শত॥

দীনবন্ধু জয়দেব বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া যাদবেন্দ্র পর্য্যন্ত ৩৯ জন কবির মাত্র ২৮৪টি পদ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং নিজের ২০৭টি পদ ইহাতে সংযোজিত করিয়াছেন। এই ২৮৪টি মাত্র পদের মধ্যে একটিও চণ্ডীদাসের রচনা নাই বলিয়া কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দীনবন্ধুর প্রায় সমসাময়িক গৌরসুন্দর দাস কীর্ত্তনানন্দে চণ্ডীদাসের ৩৭টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন; পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাস ভণিতার ৯০টি, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় ২০টি ও আদি চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত ১টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুরের ন্যায় রক্ষণশীল ও আচার্য্যবংশসম্ভূত সুপণ্ডিতও চণ্ডীদাসের ১০টি পদ সঙ্কলন করিয়াছেন। সুতরাং চণ্ডীদাসের পদ কোন

সময়ে বৈষ্ণবসমাজে অনাদৃত হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। দীনবন্ধুদাসও তাঁহার সমকালীন ও পরবর্ত্তী সঙ্কলয়িতাদের মতন পদনির্ব্বাচনে ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য রক্ষার কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি নিজের ছাড়া অন্য কবির ২৮৪টি পদের মধ্যে ১৫৪টিই গোবিন্দদাস হইতে লইয়াছেন। তিনি নিজের রচনায় অবশ্য গোবিন্দদাস অপেক্ষা চণ্ডীদাসের রচনাভঙ্গী অধিক অনুসরণ করিয়াছেন।

শান্তিনিকেতনে 'পদমেরু' নামে একখানি প্রাচীন পদসঙ্কলনের পুঁথি (সংখ্যা ৩০৭৩) আছে। উহাতে প্রায় চৌদ্দশত পদ আছে। পুঁথির সঙ্কলয়িতার নাম বা অনুলিপির তারিখ নাই। তবে অনুমান হয় যে এখানিও অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্কলন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে, ১২১৩ বঙ্গাব্দে বা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে কমলাকান্ত দাস ৪৩টি তরঙ্গে ১৩৫৮টি পদ 'পদরত্নাকর' গ্রন্থে সঙ্কলন করেন। তাঁহার হাতে লেখা পুঁথিখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। ইনি গ্রন্থের শেষে নিজের পরিচয়ে লিখিয়াছেন যে কাটোয়ার নিকটে ভাগীরথীর তীরে, পূর্ব্ব পক্ষ-যোজনান্তে—অর্থাৎ কাটোয়ার পূর্ব্বে দুইযোজন দূরে সিউর গ্রামে তাঁহার বাসস্থান। জাতি শ্রীকরণ বা কায়স্থ। পিতার নাম ব্রজকিশোর।

বর্দ্ধমানে নির্জ্জনে বসিয়া নিরন্তর।
প্রাণপণে পূর্ণ কৈল পদরত্নাকর॥

ইহার কিছু আগে বা পরে, খুব সম্ভব পরে, নিমানন্দ দাস শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া ২৭০০ পদ লইয়া 'পদরসসার' সঙ্কলন করেন। পদকল্পতরুতে নাই এমন ৬৫০টি পদ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

পদসঙ্কলনের ধারা উনবিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত ছিল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীমোহন দাস ৩৫১টি পদ লইয়া 'পদকল্পলতিকা' মুদ্রিত করেন। ইহাতে বৈষ্ণবদাসোত্তর কবি শশিশেখর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতির পদ ধৃত হইয়াছে। উনবিংশ শতকের শেষ পাদে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদন করেন ও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে সুপ্রসিদ্ধ 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' প্রকাশ করেন। সারদাচরণ মিত্র মহাশয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার

মহাশয়ের সহযোগিতায় ১২৭৮ সাল অর্থাৎ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। ১২৮৫ সালে মিত্র মহাশয়ের 'বিদ্যাপতির পদাবলী' প্রকাশিত হয়। ১২৯২ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থে ১১০টি মহাজন পদ প্রকাশ করিয়া ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পদাবলীর মাধুর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করেন। ইহার পর বসুমতীর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩০৪ সালে 'প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী'তে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী সুলভ মূল্যে প্রকাশ করিয়া জনসাধারণে ইহার প্রচার করেন। ১৩১২ সালে বঙ্গবাসী প্রেস হইতে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় 'বৈষ্ণবপদলহরী' প্রকাশ করিয়া বহু কবিকে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। পদাবলী সংগ্রহ ব্যাপারে অগ্রণীহিসাবে রমণীমোহন মল্লিক, কালিদাস নাথ, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের াম কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা প্রয়োজন। নবদ্বীপ ব্রজবাসী, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীমতী অপর্ণা দেবী পদাবলী-সাহিত্যকে এক অখণ্ড সমগ্র রূপে দেখিয়া তাহার সঙ্কলন ও আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সঙ্কলনে কেবলমাত্র ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীর কথা আলোচনা করা হইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্কলনগ্রন্থ-গুলিতে গোবিন্দদাস কবিরাজকে মুখ্য স্থান প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার অনুপ্রাসের দুর্ভেদ্যজাল ভেদ করিয়া পদের অর্থ বাহির করা সহজ নহে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) কুবলয়-কুন্দল-কুসুম-কলেবর ।
কালিম কান্তি কলোল ইত্যাদি
(পদক° ২৪৩৭)

(২) কুন্দন কনক কলিতকর কঙ্কণ কালিন্দী কুলবিহারী
ইত্যাদি (পদক° ২৪২৮)

(৩) নীরজ নীলজ নয়ন নিন্দিকে নিহারিণী ছন্দ
(কীর্ত্তনানন্দ পৃ. ৪৪)

(৪) নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে পুলক মুকুল অবলম্ব
ইত্যাদি (পদক° ৬৭)

(৫) বহুল-বারিদ-বরণ বন্ধুর বিজুরি বিলসিত বাস ইত্যাদি
(পদক° ২৭১৪)

(৬) বাসিত বিশদ বাসগেহে বৈঠলি
বহ্নি ভবন বলি উঠই।
বরিহা-বিরচিত বীজন বিজইতে
বিষধর-বিষ সম বলই॥ ইত্যাদি (পদক° ১৯২০)

(৭) ভ্রমই ভবন-বনে জনু অগেয়ান।
ভাঙ্গল ভয় গুরু গৌরব মান॥
ভাবে ভরল মন হাসি হাসি রোই।
ভীত পুতলি সম তুয়া পথ যোই॥ (পদক° ১৯২২)

(৮) মুখরিত মুরলী মিলিত মুখ মোদনে মরকত মুকুর মেলান
(পদক° ২৪২৬)

(৯) হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই।
হরি-মণি হেরি সঘনে জল খলই॥
হিমকর-কিরণহিঁ সো তনু দহই।
হা হা শশি-মুখি কত দুখ সহই॥ ইত্যাদি
(পদক° ১৯২৩)

গোবিন্দদাস একসঙ্গে দুই-তিনটি উপমা ব্যবহার করিয়া পাঠকের চিত্ত কোন কোন সময়ে বিভ্রান্ত করিয়া তুলেন। যথা—

মনমথ-মকর ডরহিঁ ডর-কাতর
মঝু মানস-ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার-তটিনি-তট কুচঘট
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ॥ (পদক° ৬২৩)

অর্থাৎ আমার মানসরূপ মৎস্য মন্মথের বাহনরূপ মকরের ভয়ে কাতর হইয়া কাঁপিতেছে। তোমার বুকের হাররূপ তরঙ্গিণীর তীরে কুচরূপ কলসী দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উহার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। গোবিন্দদাস যে শ্রোতা ও পাঠকদের জন্য পদ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা অনুপ্রাস ও অলঙ্কার ভালবাসিতেন, উহা বুঝিবার মতন পাণ্ডিত্যও তাঁহাদের ছিল।

আজকালকার শ্রোতা ও পাঠকদের রুচি বদলাইয়াছে; তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষাও ঐ ধরণের পদ বুঝিবার অনুকূল নহে। গোবিন্দদাস একজন শ্রেষ্ঠ কবি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি শুধু রুচি ও শিক্ষার পরিবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। গোবিন্দদাস সহজ ভাষায় যে দুই চারিটি পদ রচনা করিয়াছেন তাহাও এত ভাবগম্ভীর যে বিনা ব্যাখ্যায় বুঝা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত সুপ্রসিদ্ধ পদটি উদ্ধৃত করিতেছি—

আধক আধ-আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত-কোটি কুসুম-শরে জরজর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনী, জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥
সুনয়নি কহত কানুধন-শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশ-রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জলু আগি॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত
চপল জীবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতি-রস মরিযাদ॥ (পদক° ২৩৪)

ইহার আক্ষরিক অনুবাদ সহজ। যখন হইতে কানুকে অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক দৃষ্টিতে দেখিয়াছি তখন হইতেই কত শত কোটি কন্দর্পের কুসুমবাণে জর্জ্জরিত হইয়াছি। প্রাণ যাইবে কি থাকিবে বুঝিতেছি না। সখি! জানিলাম বিধি আমার প্রতি বাম, কেননা যে নারী দুই নয়ন ভরিয়া হরিকে দেখিতে পারে তার পায়ে আমার নমস্কার। সুনয়না কেহ বলেন যে কানু ঘনশ্যাম, কিন্তু আমার কাছে বিদ্যুতের মতন। রসবতীরা তাঁহার স্পর্শরসে ভাসে, কিন্তু আমার হৃদয়ে আগুন জ্বলে। প্রেমবতীরা প্রেমের জন্য জীবন

ত্যাগ করে, কিন্তু চঞ্চল জীবনেই আমার সাধ। গোবিন্দদাস বলেন শ্রীবল্লভ রসিকা নায়িকার রসের মর্য্যাদা জানেন। এই অনুবাদে পদটির ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইল না। আধক আধ আধ—অর্থাৎ চোখের একটু মাত্র কোণ দিয়া অল্প একটু অপাঙ্গদৃষ্টিতে মাত্র কৃষ্ণকে দেখিয়াই অনর্থ ঘটিয়াছে। এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া কবি একদিকে যেমন শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যের অসীম প্রভাব, অন্যদিকে তেমনি শ্রীরাধার প্রেমের অলৌকিকতার ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'সজনী, জানলু বিহি মোহে বাম'—বিধাতা আমার প্রতি বিরূপ—কেননা তিনি আমাকে দুনয়ন ভরিয়া সাধ মিটাইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনের ক্ষমতা দেন নাই। নিজের ভাগ্যকে নিন্দা করিয়াই, শ্রীরাধা অপর নায়িকাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে যাঁহারা দুই চোখ ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পারেন তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের চরণে প্রণাম। এই কথার ব্যঞ্জনা এই যে নয়ন ভরিয়া দেখিব কি? একটু দেখিলেই সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা যে মন সে ভুলিয়া যায়, দেখা আর হয় না। প্রাচীন একটি উদ্ভট কবিতায় আছে যে এক বিরহিণী নায়িকা অপর বিরহিণীদিগের প্রশংসা করিয়া বলিতেছে—সখি! তোমাদের ভাগ্য ভাল, তাই তোমরা স্বপ্নে দয়িতের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ পাও কিন্তু আমার পোড়া নয়নে যে নিদই আসে না। ইহার ধ্বনি এই যে সত্যকার বিরহজ্বালায় নিদ্রা দূর হইয়া যায়, সুতরাং অন্য সব নায়িকাদের বিরহটি বিলাসমাত্র, তাই তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে ও স্বপ্ন দেখে। গোবিন্দদাসের পদেও তেমনি বলা হইয়াছে যে যাহারা নয়ন ভরিয়া কৃষ্ণরূপ দেখিতে পারে, তাদের দেখা দেখাই নয়। শ্রীকৃষ্ণকে অন্য নায়িকারা মেঘের মতন শ্যামবর্ণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার রূপ আমার নয়ন এমনই ধাঁধিয়া দিয়াছে যে উহাকে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছু বলিয়া আমি বুঝিতে পারি নাই। প্রেমবতীরা প্রেমের জন্য জীবন ত্যাগ করেন, কিন্তু আমি চপল অল্পদিনস্থায়ী জীবনেও সন্তুষ্ট—কেননা মনুষ্য-জীবন না পাইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম আস্বাদন করিয়া তৃপ্তি পাওয়া যাইতে পারে না। এত কথা ব্যাখ্যা না করিয়া বলিলে গোবিন্দদাসের পদের রস উপলব্ধি করা যায় না।

কীর্ত্তন গানে গোবিন্দদাসের প্রাধান্য থাকায় এখনকার কীর্ত্তনীয়ারা

গান করিতে করিতে বক্তৃতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেকালের কীর্ত্তনে এরূপ বক্তৃতা করিবার প্রয়োজন হইত না। কেননা শ্রোতারা আলঙ্কারিক ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাষার সহিত পরিচিত ছিলেন। কীর্ত্তনীয়ারা দুই একটি আখর প্রয়োগ করিয়া পদের মর্ম্মকথা বুঝাইয়া দিতেন। আমার মাতামহ নিত্যধামগত শ্রীল অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহারাজ* শিক্ষকপরম্পরা-প্রাপ্ত প্রাচীন আখর ছাড়া কখনও নিজে আখর সৃষ্টি করিয়া গাহিতেন না। অনেকে এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন যে মহাজনের পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া আখর সৃষ্টি করা সহজ কথা নহে। যা তা আখর দিলে সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস দুষ্টি ঘটার আশঙ্কা প্রবল। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"অনেক সময় কবিতার ভাব গম্ভীর, অর্থ হয়ত জটিল। গায়ক সেইজন্য অক্ষর বা আখর জোগাইয়া তাহাকে সুবোধ্য করিবার চেষ্টা করেন। এই সুযোগে তিনি তাঁহার নিজের কবিত্ব-শক্তি, রসজ্ঞতা ও সুরজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কীর্তন-গানে যেমন গায়কের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন আর কোথায়ও দেখা যায় কি না সন্দেহ" (কীর্ত্তন-গীতি-প্রবেশিকা, পৃ. ৪)। কিন্তু রাষ্ট্রে যেমন অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অরাজকতার সৃষ্টি করে, কীর্ত্তনেও তেমনি আখর দিবার অবাধ স্বাধীনতা কীর্ত্তনকে আজকাল হাফ্-বক্তৃতার পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে। কীর্ত্তনীয়াদের অনেকেরই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় নাই। সুতরাং তাঁহারা পদে পদে রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটাইয়া থাকেন।

নৌকাখণ্ড পালা গান করিবার সময় অনেক কীর্ত্তনীয়াই শ্রীকৃষ্ণকে

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার 'কীর্ত্তন-গীতি-প্রবেশিকা'তে (পৃ. ৮) লিখিয়াছেন, "কীর্ত্তন-গানের শেষ স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন পরম পূজ্যপাদ অদ্বৈতদাস বাবাজি। কীর্ত্তনজগতে তিনি 'পণ্ডিত বাবাজি' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভক্তিশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে লোকে 'পণ্ডিত' বলিত এবং কীর্ত্তনে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তাঁহার আখ্যা ছিল 'বাবাজি'।" সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'র ভূমিকায় (পৃ. ৮) তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ভবপারের কর্ণধাররূপে বর্ণনা করেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র রসাভাসের দৃষ্টান্ত দিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"যখন রূপ-গুণ-যৌবনশালিনী গোপ-বালারা যমুনাতীরে পারে যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তখন যদি গায়ক নাবিকরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া বলান যে তিনি ভবপারের কর্ণধার, জীবকে ভবপারে লইয়া যাইবার জন্য অনাদিকাল হইতে তিনি খেয়া দিতেছেন, তাহা হইলে সেখানে রসাভাস দোষ বা রসভঙ্গ হইল বলিতে হইবে" (বৈষ্ণব রস-সাহিত্য, পৃ. ১৩৭)। অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিশ্বভারতী পত্রিকায় নৌকাখণ্ড সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে অনেক কীর্ত্তনীয়াই এই পালা গাহিবার সময়—ষোল আনাই দিয়া দাও, ষোল আনাই দিয়া দাও ইত্যাদি আখর দেন। কেহ কেহ এরূপ বলিতে বলিতে প্রণামীতোলার থালাও আগাইয়া দেন।

কীর্ত্তনগান বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত ও নিরক্ষর, আবালবৃদ্ধবনিতা একসঙ্গে একই আসরে বসিয়া কীর্ত্তনের মাধ্যমে হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভূতির পরিচয় লাভ করে। তাহারা তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া বৃন্দাবনের কল্পলোকের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ ও উত্তেজনা, মিলন ও বিরহের হাসিকান্নার নাগরদোলায় দুলিতে থাকে। লীলাকীর্ত্তন জনগণের মনকে সুনির্দ্দিষ্ট উপায়ে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়া উচ্চতম ভাবলোকে উন্নীত করিবার পক্ষে অনন্যসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে।

পদাবলীর মধুর শব্দঝঙ্কার ও মধুরতর ভাবব্যঞ্জনা এবং মৃদঙ্গ করতালের সহিত গায়কবৃন্দের সমবেত কণ্ঠের কলধ্বনি এই সাফল্যলাভের মূল কারণ।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কীর্ত্তনের নামে যে তরল হাল্কা সুরের গান ও বক্তৃতা চলিতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় যে আসল কীর্ত্তনগান বোধ হয় লোপ পাইবে। এই সময়ে কীর্ত্তনগানের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বের যুগের যশোরাজখান ও রায় রামানন্দের এক একটি পদ এবং তাঁহার গয়া হইতে ফিরিবার পর ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আনুমানিক একশত বৎসরের মধ্যে ৪০ জন শ্রেষ্ঠ কবির রচিত ২২২টি পদ পালার আকারে সাজাইয়া প্রকাশ করা হইল। নির্ব্বাচিত

পদগুলির মধ্যে গোবিন্দদাসের একত্রিশটি পদ ও তাঁহার বন্ধু চম্পতির একটি পদ ছাড়া অন্যান্য সকল পদের ভাষাই স্বচ্ছ, সরল, অকৃত্রিম ও নিরাভরণ। তাহা বুঝিবার জন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। যে কোন ভাবে ছন্দ বজায় রাখিয়া উহা আবৃত্তি করিলেই 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে'। পদগুলি একই যুগে লিখিত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে একটি রসের ও ভাবের সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে পদাবলীর দুইটি বিশিষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি হইতেছে চণ্ডীদাসের ধারা—অপরটি বিদ্যাপতি ঠাকুরের ধারা। চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পদাবলী গভীরভাবে মনকে আলোড়িত করে, ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার দ্বারা ভাবজগতের দ্বার খুলিয়া দেয়। বিদ্যাপতি উপমা ও অলঙ্কার ছাড়া কথা বলেন না। রবীন্দ্রনাথ "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"যিনি প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবি হইয়াছেন, তিনি সহজ কথার কবি, সহজ ভাবের কবি। কারণ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে, তাহাকে দশ কথা বলিতে হয়, আর যিনি সত্য বলেন, তাঁহাকে এক কথার বেশী বলিতে হয় না। তেমনি যিনি অনুভব করিয়া বলেন, তিনি দুটি কথা বলেন, আর যে অনুভব না করিয়া বলে সে পাঁচ কথা বলে অথচ ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব সহজ ভাষায় সহজ ভাবের সহজ কবিতা লেখাই শক্ত, কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়; সকলের প্রাণের মধ্যেই যে ব্যক্তি আতিথ্য পায়, ফুল বল, মেঘ বল, দুঃখী বল, সুখী বল, সকলের প্রাণের মধ্যেই যাহার আসন আছে, সেই তাহা পারে।··· সহজ কথার গুণ এই যে, তাহা যতটুকু বলে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলে। সে সমস্তটা বলে না। পাঠকদিগকে কবি হইবার পথ দেখাইয়া দেয়, যে দিকে কল্পনা ছুটাইতে হইবে, সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র, আর অধিক কিছু করে না।"

শ্রীচৈতন্যের প্রেমোন্মাদনা তাঁহার সমসাময়িক কবিদিগকে পদরচনায় প্রেরণা জোগাইয়াছিল। তাঁহারা চোখের সামনে যে অপূর্ব্ব প্রেমের অভিব্যক্তি দেখিয়াছিলেন, তাহা কাব্যে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদিগকে

কোনরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। সেই জন্য নরহরি সরকার ঠাকুর, বাসুঘোষ, বলরামদাস, বংশীবদন, বসু রামানন্দ প্রভৃতি কবিগণ চণ্ডীদাসের ধারা অনুসরণ করিয়া সহজ কথায় পদ রচনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের ভাব তাঁহাদিগকে কবি করিয়াছে, আবার তাঁহাদের পদ পাঠকগণকে 'কবি হইবার পথ দেখাইয়া' দিতেছে। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে যে সব কবি শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য পান নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাপতির রীতি অনুসরণ করিয়া প্রথম প্রথম দুই চারিটি পদ রচনা করেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের অনুভূতি যত গাঢ় হইতে লাগিল, ভাষা তত সরল ও সহজ হইতে আরম্ভ করিল। জ্ঞানদাসের রচনারীতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই সূত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছি। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় চণ্ডীদাসের ধারাতেই পদ রচনা করেন; কিন্তু তাঁহার অভিন্ন হৃদয় বান্ধব রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির রীতিই আশ্রয় করেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে গোবিন্দদাসই বহু বৈষ্ণব কবির আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। বাংলার পদাবলী সাহিত্যের ক্রমবিবর্ত্তন বুঝিবার জন্য ষোড়শ শতকের পদাবলীর স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন আছে বিবেচনায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

দ্বিতীয় ভাগ

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

ষষ্ঠ অধ্যায়

কীর্ত্তনের ও রাধাকৃষ্ণলীলা-সাহিত্যের ইতিহাস

শ্রীরূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে (পূর্ব্ব ২।৬৩) কীর্ত্তনের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন—"নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনং"। নাম রূপ ও গুণাদির উচ্চরূপে উচ্চারণ করাকে কীর্ত্তন বলে। শ্রীচৈতন্যদেব প্রত্যেক ভক্তেরই সদাসর্ব্বদা হরি কীর্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাই এখানে শ্রীরূপ গোস্বামী কেবলমাত্র তানলয়মাত্রাসহযোগে গান করাকে কীর্ত্তন বলেন নাই। সনাতন গোস্বামী 'হরিভক্তিবিলাসে'র ১১।২৩৬র টীকায় বলিয়াছেন যে কীর্তন ওষ্ঠস্পন্দনমাত্র। তাহা স্মরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা মনকে নিগ্রহ করা কঠিন বলিয়া স্মরণ দুষ্কর। "ততঃ স্মরণাৎ কীর্ত্তনং বরং সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠমেব মনঃ শ্রবণ বাগিন্দ্রিয়াদি ব্যাপ্য সুখবিশেষস্যা-পাদনাৎ।" তিনি এইখানে আরও বলেন যে এ বিষয়ে তিনি শ্রীবৃহদ্ভাগবতা-মৃতের উত্তর খণ্ডে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বৃহদ্ভাগবতা-মৃত রচনার পরে হরিভক্তিবিলাসের টীকা লিখিত হয়। যাহা হউক, কীর্ত্তনকে কেবলমাত্র তানলয়যুক্ত সঙ্গীতরূপে শ্রীজীব গোস্বামীও ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি 'ভক্তিসন্দর্ভে' লিখিয়াছেন যে "কলৌ যদ্যপ্যন্যা ভক্তি ক্রিয়তে সা কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিসংযোগেনৈব"। তিনিও "ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনং" বলিয়াছেন।

শ্রীরূপগোস্বামী প্রদত্ত সংজ্ঞা হইতে দেখা যায় যে কীর্ত্তনের তিন শ্রেণী। নামকীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তন, আর লীলাকীর্ত্তন। এই তিন শ্রেণীর কীর্ত্তন কি পর্য্যায়ক্রমে সাধক অভ্যাস করিবেন তাহা শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত নামকীর্ত্তনই বিধেয়। চিত্তশুদ্ধি হইবার পর শ্রীকৃষ্ণের রূপকীর্ত্তন ও রূপ-সম্বন্ধীয় কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার অধিকার জন্মে। অন্তরে যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্বতঃই উদিত হয়, তখন গুণকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এই সব স্তর পার হইবার পর শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তন গান করিবার ও শুনিবার অধিকার হয়। শ্রীচৈতন্য স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে লীলাকীর্ত্তন আস্বাদন করিতেন।

হরিভক্তিবিলাসের অষ্টম বিলাসে বরাহপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া 'সম্যক্-তাল-প্রয়োগেণ' গানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত পুরাণের—"নারায়ণানাং বিধিনা গানং শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতং" শ্লোক তুলিয়া সনাতন গোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন "নারায়ণের কর্ম্মসমূহের মধ্যে অথবা জীবগণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসমূহের মধ্যে গীতকেই বিধাতা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি গান দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁহার কীর্ত্তি, জ্ঞান ও প্রভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।" (হরিভক্তিবিলাস ৮।১২০)।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে নাম ও লীলা কীর্ত্তনকে সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অষ্টমাঙ্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে রাজা প্রতাপরুদ্র পুরীতে সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া বলিলেন—"ঈদৃশং কীর্ত্তন কৌশলং ক্বাপি ন দৃষ্টম্"—এইরূপ কীর্ত্তনকৌশল কোথাও দেখি নাই। তাহার উত্তরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"ইয়মিয়ং ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যসৃষ্টিঃ" (৮।৩২)। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে "সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ" সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র পিতা বলিয়া স্তব করিয়াছেন। নামকীর্ত্তন যে তাঁহাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না, তাহা নহে। তবে 'আপন ভোলা' কীর্ত্তনের এক নূতন রীতি শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে যে বিশ্বম্ভর অধ্যাপনা বন্ধ করিয়া তাঁহার ছাত্রগণকে বলিলেন—

"পড়িলাম শুনিলাম এতকাল ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥

শিষ্যগণ বোলেন কেমন সঙ্কীর্ত্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাথে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥ (মধ্য। ১)

তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু মুকুন্দদত্ত কীর্ত্তনগানে পারদর্শী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রিয়তম ভক্ত স্বরূপ দামোদরও লীলাকীর্ত্তনে অদ্বিতীয় ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥

আর একজন বড় কীর্ত্তনীয়া ছিলেন বাসুঘোষের বড় ভাই মাধবঘোষ, যাঁহার সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস বলেন—

সুকৃতি মাধবঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনিয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥ (চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য। ৫)

মাধবঘোষ একদিন আড়িয়াদহে নিত্যানন্দের সমক্ষে গদাধরদাসের মন্দিরে 'দানলীলা' গান করিয়াছিলেন—

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূতসিংহ পরমসন্তোষ॥ (চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য। ৫)

এই গান শুনিতে শুনিতে নিত্যানন্দ ও গদাধরদাস—

"দানখণ্ড-নৃত্য প্রভু করে নিজরঙ্গে"।

নরোত্তমঠাকুর মহাশয় খেতুরীর মহোৎসবে লীলাকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া অনেকের যে ধারণা আছে তাহা এই সব উদ্ধৃতি হইতে ভ্রান্ত প্রমাণিত হইবে। রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তন যে প্রায় আঠারোশত বৎসর হইতে প্রচলিত আছে তাহার কতকগুলি প্রমাণ তামিল, সংস্কৃত, মারাঠি ও গুজরাটি সাহিত্য হইতে উপস্থিত করিব।

ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই 'শিলপ্পাদিকারম' বা নূপুরের কাব্য নামক তামিলকাব্যকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই কাব্যের সপ্তদশ সর্গের নাম গোপী-নৃত্য। নায়িকা কন্নকির সহচরী গোপী মাদরি কতকগুলি দুর্লক্ষণ দেখিয়া ভীত হইয়া তাহার কন্যাকে বলিল যে ঘোরতর বিপদ আসন্ন, সুতরাং তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কুরবই নৃত্য করা কর্ত্তব্য। ঐ নৃত্য পুরাকালে মায়বন পদ্মপলাশাক্ষী পিন্নয়ইয়ের সঙ্গে নাচিয়াছিলেন।* সাতটি মেয়ে বলরাম, মায়বন, পিন্নয়ই প্রভৃতির বেশ ধারণ করিয়া নাচিতে ও গাহিতে লাগিল।—তাহাদিগকে সাজসজ্জা করিয়া নাচিবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইতে দেখিয়া মাদরি খুসীতে উছলিয়া বলিলেন, "যে মেয়ে মায়বনের গলায় সুন্দর তুলসীর মালা পরাইয়া দিয়াছে, সে এখন নির্ভুলভাবে কুরবই নাচ নাচিবে। চুড়িপরা পিন্নয়ই কি এতই সুন্দরী যে, যিনি ত্রিভুবন পায়ে মাপিয়া পরম কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি তাঁহার বক্ষস্থিত লক্ষ্মীর দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিবেন না?" (পৃ. ২৩১-২৩২)। পাদটীকার উদ্ধৃতির সহিত ইহা মিলাইয়া পড়িলে সন্দেহ থাকে না যে মায়বন হইতেছেন যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ, আর পিন্নয়ই বা নপ্পিন্নাই শ্রীরাধার পূর্ব্বাভাষ। নাচিতে নাচিতে আবার গাওয়া হইল—

"সখি! যে মায়বন, গোবৎসকে লাঠির মতন করিয়া ব্যবহার করিয়া বেলফল পাড়িয়াছিলেন, তিনি যদি আমাদের গোষ্ঠে আসেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার 'কোনরই' বেণুর বাজনা শুনিতে পাইব না কি?

সখি! যে মায়বন সাপকে দড়ি করিয়া সমুদ্রমন্থন করিয়াছিলেন, তিনি যদি আমাদের গাভীদলের মধ্যে অসেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার আম্বল মুরলীর বাজনা শুনিতে পাইব না কি?

---

* 'শিলপ্পদিকারমে'র ষোড়শ সর্গে যেখানে নায়ক-নায়িকা ভোজন করিতেছেন, তখন মাদরির কন্যা তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিতেছেন—এ কি কৃষ্ণ ও তাঁহার দয়িতা পিন্নয়ই? "Is this lord who eats good food, Krsna with the colour of the newly-opened Kaya flower, nursed by Asodai (যশোদা) in the village of Cowherds (গোকুল)? Is this lady with shoulder—bracelats the brightest lamp (Pinnai) of our community?" (পৃঃ ২২১)

সখি! যে মায়বন বিস্তৃত ব্রজে কুরুন্ত (যমলার্জ্জুন ?) বৃক্ষ ভঙ্গ করিয়াছিলেন তিনি যদি দিনের বেলায় আমাদের গাভীদের মধ্যে আসেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার 'মুল্লই' বেণু শুনিতে পাইব না কি ?

আমরা সেই মনোরমা সুন্দরী পিন্নয়ইয়ের লাবণ্যর কথা গান করিব, যিনি যমুনার তীরে তাঁর স্বামীর সঙ্গে নাচিয়াছিলেন'' (পৃ. ২৩২-২৩৩)।

ইহার পর বস্ত্রহরণলীলা লইয়া গান—

১। আমরা কেমন করিয়া তাঁহার রূপ বর্ণনা করিব যিনি সুমধ্যমা প্রিয়ার বস্ত্র লুকাইয়া ফেলায় সেই দয়িতা একেবারে মাথা হেঁট করিয়া রহিয়াছিলেন ? আর সেই সুন্দরীর মুখের শোভাই বা কিরূপে বলিব যিনি তাঁর প্রিয়তমকে কাপড় লুকাইয়া ফেলার জন্য অনুতপ্ত দেখিয়া (তাঁহার দুঃখে) দুঃখিত হইয়াছিলেন ?

২। আমরা কেমন করিয়া তাঁহার মাধুর্য্যসীমা বর্ণনা করিব যিনি তাঁহার সেই স্বামীর হৃদয় হরণ করিয়াছেন, যে স্বামী যমুনার জলক্রীড়ায় সকলকে ছলনা করিয়াছিলেন ? যিনি তাঁহার মনোহরণ করিয়াছিলেন এমন নারীর লাবণ্য ও কঙ্কণ যিনি চুরি করিয়াছেন তাঁহার রূপের কথাই বা কিরূপে বর্ণিব ?

৩। যে রমণী বসন ও কঙ্কণ হারাইয়া হাতে মুখ লুকাইয়াছিলেন তাঁহার মুখশোভাই বা কেমনে বর্ণনা করিব ? অথবা তাঁহার দুঃখ দেখিয়া যিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন তাঁহার সৌন্দর্য্যই বা কিরূপে বর্ণনা করিব ? (পৃ. ২৩৩)

ইহার পর এক তালে নিম্নলিখিত গানখানি গাওয়া হইল :

পিন্নয়ইয়ের কেশে সুগন্ধি কুসুমকোরক, তাঁহার বামে সেই জলধিবর্ণ দেবতা, যিনি চক্রের দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করেছিলেন, আর তাঁর ডাহিনে সেই দেবতার বড় ভাই, যাঁর দেহের রং চাঁদের মতন সাদা। পিন্নয়ইয়ের গানের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ঋষি নারদ বীণা বাজাইতেছেন। আমাদের পিন্নয়ইয়ের ঘাড় একটু নীচু হইয়া আছে, আর তার ডাহিনে মায়বন, যার বর্ণ ময়ূরের কণ্ঠের মতন, আর বাঁয়ে তার বড় ভাই যার বর্ণ ফুলের মতন সাদা। তাঁদের সঙ্গে যিনি বীণা বাজাইতেছেন তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ বীণাবাদক নারদ (পৃঃ ২৩৪)।

এই গান করিবার পর নর্ত্তকীদের প্রশংসায় বলা হইল—"ও কি মধুর সেই কুরবই নৃত্য যা মায়বন, তার বড় ভাই ও পিন্নয়ই নাচিয়াছিলেন ও অশোদাই প্রশংসা করিয়াছিলেন। পিন্নয়ইয়ের গলে ছিল বিচিত্রবর্ণের হার। যুবতী গোপীরা চুড়ি-পরা হাতে তাল রাখিতেছিলেন আর নাচিতে নাচিতে তাঁহাদের কুঞ্চিত কেশদামের পুষ্পমাল্য স্থানভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছিল (পৃঃ ২৩৪)।*

তামিল সঙ্গম সাহিত্য হইতে রাস ও বস্ত্রহরণ লীলার গান যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল তাহা নিঃসন্দেহে জানা গেল। পিন্নয়ই আড়বারদের অষ্টম নবম শতাব্দীর পদে নপ্পিন্নাই হইয়াছেন। তিনি কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণের দয়িতারূপে বর্ণিত হন নাই; লক্ষ্মীদেবীর চেয়েও তিনি বেশী প্রিয় এবং নারদও তাঁহার গানে বাদ্য বাজান। সুতরাং তিনি যে উপাস্যস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও প্রমাণিত হয়। তাঁহার রাহিআ বা রাধিকা নামটি সর্ব্বপ্রথম পাওয়া পায় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর সঙ্কলন হালের 'গাথাসপ্তশতী'তে (১।৫।৮৯)। ইহাতে গোপীগণের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে।

মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএঁ অবণেন্তো।
এত্তাণঁ বল্লবীণং অন্নাণঁ বি গোরঅং হরসি॥

কানাই তুমি মুখমারুত বা ফুঁ দিয়া রাধিকার চোখে যে ধূলি পড়িয়াছিল তাহা বাহির করিয়া দিয়া এইসব গোপীদের গৌরব হরণ করিলে।

দ্রাবিড়ে আড়বার বা আলবার সন্তগণ নারায়ণের রূপ, গুণ ও লীলা লইয়া চার হাজার পদ রচনা করেন। প্রথম চারজন আলবার খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করেন। নবম বা দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত অন্যান্য আড়বারগণের প্রাদুর্ভাব কাল বলিয়া ধরা হয়। তামিল ভাষায় রচিত তাঁহাদের পদগুলি এখনও দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবমন্দিরসমূহে পরম ভক্তি সহকারে গীত হয়। কয়েকটি পদের সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবের অপূর্ব্ব মিল দেখা যায়।

---

* Silappadikaram translated by V. R. Ramachandra Dikshitar, published by the Oxford University Press, 1939.

বাংলার পদাবলী সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের মাখন চুরি লইয়া অনেক পদ রচিত হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রাচীন তামিল সাহিত্যে শিশু কৃষ্ণের প্রতি যশোদার বাৎসল্য লইয়া পেরিয় আড়বার (Peria Alvar) যে কয়েকটি সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার ভাবানুবাদ দিতেছি—

১। ওগো বড় চাঁদ, তোমার কপালে যদি চোখ থাকে তো দেখ আমার ছেলে গোবিন্দের খেলা! সে ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাই তার কপালের টিক্‌লি দুল্‌ছে, আর কোমরের ঘুন্টি বাজ্‌ছে।

২। আমার সোনামণি তার ছোট্ট হাত দু'খানি বাড়িয়ে তোমায় ডাক্‌ছে। ওগো বড় চাঁদ, যদি তুমি আমার কালো মাণিকের সঙ্গে খেলতে চাও, তবে মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থেকো না, চলে এসো।

৩। তোমার যদি সব জায়গায় আলো থাকতো, কলঙ্ক না থাকতো, তবুও আমার ছেলের মুখের সাথে তোমার তুলনা হ'তো না। ওগো চাঁদ, তুমি তাড়াতাড়ি এসো, নইলে যে ছোট্ট হাত দু'খানি তার ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

৬। যে তার হাতে গদা, চক্র, ও ধনু ধারণ করে, সে এখন ঘুমের চোটে হাই তুলছে; তার যদি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে সে যে দুধ খেয়েছে, তা হজম হবে না। তাই ওগো বড় চাঁদ! তুমি আকাশ থেকে তাড়াতাড়ি চলে এসো।

৭। সে ছোট্ট ছেলেটি বলে তাকে অবহেলা ক'রো না! এই ছোট্ট শিশুটিই সেই পুরাকালে বটপত্রের উপর শায়িত ছিল। সে যদি চটে যায়, তাহলে উঠে তোমার উপর লাফিয়ে পড়বে! তাই আর দেরী না করে খুসিমনে এখানে দৌড়িয়ে এসো।

৮। আমার এই সিংহশাবককে ছোট্ট বলে মনে ক'রো না। যাও, বলিরাজকে তার বামনলীলার ক্ষমতার কথা জিজ্ঞাসা করে এসো।*

এই পদগুলির মধ্যে বাৎসল্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যভাবও মিশ্রিত আছে। যশোদা জানেন যে তাঁহার পুত্র চক্র-গদা-ধনুর্ধারী; তিনি বামনরূপে বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন এবং ইচ্ছা করিলে তিনি চন্দ্রকে শাস্তি দিতে পারেন।

* Hymns of the Alvars by J. S. M. Hopper, পৃ. ৩৭।

বাংলার বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা এই ঐশ্বর্য্যভাবকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি থাকিলে সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য রসের হানি হয় তাহা তাঁহারা জানিতেন। যদুনাথদাসের

"চাঁদ মোর চাঁদের লাগিয়া কাঁদে" ; এবং

"নীলমণি তুমি না কাঁদ আর

চাঁদ ধরি দিব কহিনু সার ॥" (পদামৃত মাধুরী ৩।১১৮-১২০)

উক্ত পেরিয় আলবারের (যাঁহার সংস্কৃত নাম বিষ্ণুচিত্তঃ) কন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ আণ্ডাল বা গোদাদেবী তিরুপ্পাবৈ নামে এক সুপ্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করেন। তিনি ৭৩১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে জীবিত ছিলেন বলিয়া রাঘব আয়াঙ্গার নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু কে. জি. শঙ্করম্ বলেন যে তিনি ৮৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের লোক (Journal of Sri Venkatesvara Oriental Institute, Vol, II, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ, পৃ. ৪৫১)। ইনি গোপীভাবে ভাবিত হইয়া পদ রচনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী দশজন আড়বারকে নারীরূপে সম্বোধন করিয়াছেন (ঐ, পৃ. ৪৪৮)। তিরুপ্পাবৈ গ্রন্থে তিনি নিজেকে গোপীরূপে ভাবনা করিয়া তাঁহার সখীগণকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যূষকালে শ্রীকৃষ্ণের ঘুম ভাঙ্গাইতে যাইতেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী নপ্পিন্নাই (আক্ষরিক অর্থ সুকেশী) -কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

১৮। ওগো নন্দগোপের বধূ! তোমার গজেন্দ্রের মতন ধীর গতি ; তোমার কেশের সৌরভে দিগন্ত বিস্তৃত, তুমি দরজা খোল! উঠিয়া দেখ সর্ব্বত্র কাক ডাকিতেছে, মাধবীকুঞ্জে কোকিল সুমধুর গান গাহিতেছে! তোমার করকমল দিয়া দরজা খোল। ক্রীড়াকন্দুক তোমার হাতে ; তোমার চুড়ি রিনিঝিনি বাজিতেছে, দরজা খোল, আমরা তোমার ভাইয়ের (cousin's) নাম গান করিব।*

---

* এই পদটি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের Indian Antiquaryতে বাটারওয়ার্থ ও এস্. কে আয়াঙ্গার অনুবাদ করিবার সময় লেখেন (পৃ. ১৬৫) যে নপ্পিন্নাই Daughter-in-law of Nanda Gopal। কিন্তু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Hymns of Alvars গ্রন্থে ঐ স্থানের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে Daughter of Nanda Gopal। উভয় অনুবাদেই পদের শেষে আছে "that we may sing Thy Cousin's name."

২০। ওগো বীর, ওগো সাধু, ওগো পরন্তপ, ওগো অনঘ, ঘুম থেকে তুমি জাগো! ওগো নপ্পিন্নাই, ওগো লক্ষ্মী, তোমার কুচদ্বয় কটোরার মতন, তোমার ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ এবং কোমর সরু, তুমি ঘুম থেকে জাগো। তোমার বরের হাতে এখন পাখা ও আয়না দাও। আমরা এখন তোমাদের স্নান করাবো।

২৭। হে গোবিন্দ, তোমার গুণে শত্রুও পরাজয় মাগে; আমরা বাদ্যসহকারে তোমার গুণগান করি। তাহাতে আমরা এমন যশঃ পাই যাহা সমস্ত দেশ শ্রেষ্ঠ বর বলিয়া মনে করে। আমরা হার, কঙ্কণ, বলয়, নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কার ও ফুলের কর্ণাভরণ পরিয়াছি; সুন্দর বেশ ধারণ করিয়াছি; এইবার তোমার সঙ্গে পায়স এবং হাতের কব্জি ডুবিয়া যায় এত ঘি দিয়া প্রচুর অন্ন খাইব। আহা কি সৌভাগ্য!

২৮। গাভীদের পিছে পিছে আমরা গোষ্ঠে যাই আর তোমার সঙ্গে খাই। আমরা গোয়ালা, কিছুই জানি না, তবুও আমাদের কি সৌভাগ্য যে তুমি আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। গোবিন্দ, তোমার কিছুই না-পাওয়া নাই। তোমার সাথে আমাদের যে আত্মীয়তা তার কিছুতেই ছাড়াছাড়ি নাই। আমরা ভালবেসে তোমায় কত বাল্যনামে ডাকি। তুমি দয়া করিয়া আমাদের উপর রাগ করিও না। প্রভু! আমরা যে বাদ্যযন্ত্র (Drum—ডম্বরু) তোমার নিকট চাহিতেছি, তাহা কি দিবে না?

নপ্পিন্নাইকে অনেকে রাধার নামান্তর বা পূর্ব্বাভাষ মনে করেন; তাঁহাকে নন্দগোপের বধূ বলিয়া পরে cousin বলিলে সম্বন্ধটা গোলমেলে হয়। নন্দগোপের কন্যা বলিলে ব্যাপার আরও গুরুতর হয়, কেননা ১৯ সংখ্যক পদে বলা হইয়াছে যে গোবিন্দ reclining on the bosom of Nappinnai। শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ অবশ্য এইসব গোলমাল উড়াইয়া দিয়া সোজাসুজি নপ্পিন্নাইকে লক্ষ্মী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ডাঃ কে. সি. বরদাচারী লিখিয়াছেন (Journal of Sri Venkatesvara Oriental Institute II; পৃ. ৪৪৬)—"The 18th hymn is important in so far as it brings out the necessity of making the help of Mother Sri, here invoked as Nappinnai, a doctrine special to the Sri Vaisnava school of thought of Ramanuja and the Alvars. The mother of the Universe who is inseparable from the Lord is the mediatrix, who leads the soul to the Lord, who invokes the grace of the Lord to flow towards the suppliant soul." কিন্তু শিলপ্পদিকারম্ হইতে প্রমাণিত হয় যে নপ্পিন্নাই শ্রীকৃষ্ণের গোপদয়িতা।

২৯। এই ভোরের বেলা তোমার সোণার চরণ-কমলের স্তুতি করিয়া আমরা প্রণাম জানাইয়া কি বর চাহিতেছি? তুমি এই গোয়ালাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমরা তোমায় সানন্দে সেবা করিব। আমাদের ছাড়িয়া যাওয়া কি তোমার উচিত? তোমার ঐ ডম্বরু চিরকালের জন্য পাইব বলিয়া আমরা তোমার ক্রীতদাসী হইয়াছি। হাঁ গোবিন্দ, সাতজন্মের ক্রীতদাসী। আমরা শুধু তোমারই সেবা করিব। তুমি আমাদের আর সব ভালবাসা দূর করিয়া দাও (From us do thou remove all other loves)।

শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীগীতের "ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং" (১০।৩১।১৪) -এর ধ্বনি এই শেষোক্ত চরণের মধ্যে পাই।

বাংলার কুঞ্জভঙ্গের পদাবলীর পূর্ব্বাভাষরূপে আণ্ডালের এই পদগুলি আলোচনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পরিবর্ত্তে আণ্ডাল এখানে drum-এর উল্লেখ করিয়াছেন।

নাম্ম আড়বার বা শঠকোপস্বামীও মধুর রসের পদ লিখিয়াছেন। ডাঃ বরদাচারী লিখিয়াছেন, "Nammalvar has depicted his relationship with the supreme Godhead as one of lover to the Beloved"। তাঁহার কবিতা খুব উচ্চস্তরের হইলেও আণ্ডালের ন্যায় আত্ম-সমর্পণের চরমসীমায় পৌছিতে পারে নাই। তাঁহার একটি পদে বিরহিণী নায়িকার পালনকারিণী মাতৃস্থানীয়া এক মহিলা নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

রূপে গুণে শীলে সে যে তোমারি গো সমতুল।
তব দরশন আশে দিবানিশি সে ব্যাকুল॥
হে নিঠুর, দেখা দাও, দেখা দাও।
কিবা নিশি, কিবা দিশি, কিছু নাহি জানে।
সদাই বিভোর তব রূপ গুণ গানে॥
শীতল তুলসী গন্ধে মত্ত তার প্রাণ।
করিবে হে চক্রধারী কত দুঃখদান॥

(শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাসের অনুবাদ)

ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা। তাঁহার গ্রন্থ হইতে আলঙ্কারিক বামন (৪।৩।২৮) ও আনন্দবর্দ্ধন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে ঐ নাটকে লিখিয়াছেন—

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
তস্যাদপ্রতিমানিবেশিতপদস্যোদ্ভূতরোমোদগতে
রক্ষরোঽনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ॥

দক্ষিণদেশের নারী আড়বার আণ্ডালের পদে শ্রীরাধার নাম স্পষ্ট না থাকিলেও তাঁহার প্রায় সমসাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত গৌডবহো কাব্যের মধ্যে একটি কবিতায় (১. ২২) শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে শ্রীরাধার নখ ও চুড়ির দাগ লাগার কথা আছে।

তাঁহার প্রায় সমসাময়িক এবং ভারতের উত্তরপ্রান্তস্থিত কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বন্যালোকের দুইটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার নাম শ্রদ্ধাভরে বিজড়িত দেখা যায়। কল্হন রাজতরঙ্গিণীতে লিখিয়াছেন যে আনন্দবর্দ্ধন কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্ম্মার সমসাময়িক ; সুতরাং তাঁহাকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক বলিয়া ধরা হয়। শ্লোক দুইটি এই :

তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পন মৃদুচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠী ভবন্তী বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ॥ (২।৬)

অর্থাৎ—ভদ্রে ! সেই গোপবধূদের বিলাসের সুহৃদ, রাধার গুপ্ত (প্রেমের) সাক্ষীস্বরূপ কালিন্দীতীরবর্ত্তী লতাগৃহসমূহের কুশল তো ? স্মরশয্যা রচনার জন্য এদের কোমল পল্লব এখন ছেদনের প্রয়োজন না হওয়ায় সবুজ রংয়ের সেই পল্লবরা এখন (গাছেই) শুকাইয়া জীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে।

দুরারাধ্যা রাধা সুভগ যদনেনাপি মৃজত
স্তবৈতৎ প্রাণেশাজঘনবসনেনাশ্রু পতিতম্।

কঠোরং স্ত্রীচেতস্তদল মুপচারৈ র্বিরমহে
ক্রিয়াৎ কল্যাণং বো হরি রনুনয়েষ্বেবমুদিতঃ। (৩।৪৯)

এই শ্লোকটিতে একদিকে রাধিকার মান ও অন্যদিকে খণ্ডিতা-নায়িকার ভাব সুকৌশলে ধ্বনিত হইয়াছে। রাধা কাঁদিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহার পরিধেয় বসন দিয়া রাধার চোখ মুছাইতে গেলে রাধা বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ভুল করিয়া তাঁহার গতরাত্রির প্রেয়সীর বসন পরিয়া আসিয়াছেন। তাই তিনি শ্লেষ ও অসূয়াসহকারে বলিলেন—"হে সুন্দর! আমি দুরারাধ্যাই বটে। স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ কঠিনই বটে। তাই বলিতেছি এখন তুমি ক্ষান্ত হও। আর বৃথা অনুনয় করিয়া কি হইবে? শ্রীকৃষ্ণ বহুপ্রকার অনুনয় করিলে রাধা কর্তৃক যে হরি এইরূপে সম্বোধিত হইয়াছিলেন সেই হরি তোমাদের কল্যাণ করুন।" [১]

আনন্দবর্দ্ধনের প্রায় সমসাময়িক অভিনন্দ একটি শ্লোকে সকলের অলক্ষ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলনের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। শ্লোকটি ১২০৫ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতে (১।৫৪।২) ধৃত হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই—কংসরিপুর কৈশোর বয়সের গভীর শোভাযুক্ত বপু বিজয়লাভ করুক। তিনি যশোদার ভয়ে নিকটবর্ত্তী যমুনাতীরবর্ত্তী লতাগৃহসমূহে অতি নির্জ্জনে ক্রীড়া করেন; রাধাতে অনুবদ্ধ নর্ম্ম (প্রেম) লুকাইয়া তিনি সাধারণ গোপদের অনুকরণে ক্রীড়া করেন। অর্থাৎ মায়ের সামনে দেখান যে তিনি যেন অন্যান্য গোপদের সঙ্গেই খেলা করিতে গিয়াছিলেন। এই শ্লোকটির ভাব লইয়া হয়তো জ্ঞানদাস গোষ্ঠের পদে অবোধ গোপবালকের দ্বারা বলাইয়াছেন—

"হিয়ায় কণ্টক দাগ, বয়ানে বন্দন রাগ" ইত্যাদি।

(বর্ত্তমান সঙ্কলনের ২৫ সংখ্যক পদ ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

---

[১] ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য্য এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন—"হে সুন্দর, রাধা সহজে আরাধ্য নহে। যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তুমি প্রাণেশ্বরীর নীবী বসনের দ্বারা অশ্রুমোচন করিতেছ। স্ত্রীচরিত্র কঠিন, সুতরাং আর প্রসাদোপচার করিয়া লাভ কি? অতএব তুমি বিরত হও। বহু অনুনয়পরায়ণ হইলে যে হরিকে এরূপ বলা হইল তিনি তোমাদের কল্যাণ করুন।"

অভিনন্দ গৌড়দেশের লোক ছিলেন, কাশ্মীরে যাইয়া তিনি বসবাস করেন, সেইজন্য লোকে তাঁহাকে বলিত গৌড় অভিনন্দ। তাঁহার লেখা হইতে অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'লোচনে' উদ্ধৃতি করিয়াছেন। তিনি নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন সময়ে মা যশোদার আকৃতি বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—"বৎস! তুমি যখন দূরে বনে, পর্ব্বতগুহায় গোচারণ করিবে, তখন যদি সামনে কোন হিংস্র জন্তু দেখিতে পাও, তাহা হইলে পুরাণপুরুষ নারায়ণকে ধ্যান করিও। যশোদা এই কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরিত বিম্বোষ্ঠদ্বয় চাপার দরুণ (চাপা হাসি) যে অব্যক্তভাবযুক্ত মন্দহাস্য প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা জগৎসমূহকে রক্ষা করুক।" এই শ্লোকটি সদুক্তিকর্ণামৃতে (১।৫২।১), ও শ্রীরূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতে (১৪৯ সংখ্যক শ্লোক) ধৃত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা তাঁহার মন্দহাস্যের দ্বারা ব্যঞ্জিত হইয়াছে; কিন্তু মাধবদাসের "গায়ে হাত দিয়ে মুখ মাজে নন্দরাণী" ইত্যাদি পদে

ঈশ্বরের নামে মন্ত্র পড়ে হস্ত দিয়া।
নৃসিংহ বীজবন্ধ মণি গলে বান্ধে লইয়া॥
(পদামৃতমাধুরী ৩।১৪৮ পৃ.)

অথবা তাঁহার অন্য পদে

বিপিনে গমন দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে নিয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষামন্ত্র পড়নে আপনি॥ (পদামৃত মাধুরী ৩ পৃ. ১৬১)

ঐশ্বর্য্যভাবের কোন ইঙ্গিত পর্য্যন্ত নাই। অবিমিশ্র মাধুর্য্যভাব লইয়া পদ রচনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বৈশিষ্ট্য।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে মালবপতি বাক্‌পতি মুঞ্জ ৯৭৪, ৯৮২ ও ৯৮৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত তিনখানি অনুশাসনে শ্রীরাধার বিরহে সন্তপ্ত শ্রীকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ তিন লিপিতেই বিষ্ণু সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোকটি আছে—

যল্লক্ষ্মীবদনেন্দু না ন সুখিতং যন্নার্দ্রিতং বারিধে
র্বার্ভিষন্ন নিজেন নাভিসরসীপদ্মেন শান্তিং গতম্।

যচ্ছেষাহিফণাসহস্রমধুরশ্বাসেন শ্বাসিতং
তদ্রাধাবিরহাতুরং মুরবিপোর্বেল্লদ্বপুঃ পাতু বঃ ॥

যে রাধাবিরহে সন্তপ্ত মুররিপুকে লক্ষ্মীর বদন রূপ ইন্দু সুখী করিতে পারে নাই, সমুদ্রের জলরাশি শীতল করিতে পারে নাই, যাহা তাঁহার নাভি-সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলও শান্ত করিতে পারে নাই, যাহা শেষ নাগের সহস্রমুখ হইতে নির্গত সুগন্ধি নিশ্বাসও ঠাণ্ডা করিতে পারে নাই, তাঁহার বপু তোমাদিগকে রক্ষা করুক (Indian Antiquary ৬।৫০ পৃ.; Epigraphica Indica ২৩।১০৮ পৃ)। লক্ষ্মীর সঙ্গে বসবাস করিতে যাইয়াও নারায়ণের যে রাধার কথা সর্ব্বদা স্মরণ হয় তাহা লইয়া একজন কবি দ্বাদশ শতক বা তাহার পূর্ব্বে লিখিয়াছেন—হরি রাত্রে ঘুমান না এই ভয়ে যে পাছে স্বপ্নের ঘোরে রাধার নাম বাহির হইয়া যায়, আর দিনে তিনি ঘুমাইতে পারেন না কেননা তাঁহাকে নির্জ্জনে বসিয়া 'লক্ষ্মী' 'লক্ষ্মী' বলা অভ্যাস করিতে হয়। নিদ্রা না হওয়ায় যে হরি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন (সদুক্তিকর্ণামৃত ১।৬১।৪)। জয়দেবের সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ কবি শরণ আব একটি শ্লোকে দ্বারকায় যাইয়াও শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে শ্রীরাধার প্রণয় স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া আসার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়াছেন—অনুকূল ও মৃদুবেগযুক্তা যমুনার নীলোৎপলের মতন শ্যামল পর্ব্বতের প্রান্তভূমি, কদম্বপুষ্পের গন্ধে আমোদিত গুহাসকল এবং প্রথম অভিসারের জন্য মনোহরা রাধাকে স্মরণ করিতে করিতে যাঁহার অনুতাপ হইয়াছে, সেই দ্বারাবতীপতি দামোদর ত্রিভুবনের আনন্দের কারণ হউন (সদুক্তিকর্ণামৃত ১।৬১।২)। শরণের আর একটি সুন্দর কবিতা শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে (২৩৫) উদ্ধৃত করিয়াছেন।—উহার অর্থ এই: সখি! যখন আমি মুরারিকে দর্শন করি তখন বিধাতা আমার সকল অঙ্গকেই নয়ন করিয়া দেন না কেন? যখন আমি হরির গুণগণের কথা শুনি, তখন আমার সকল অঙ্গকেই কর্ণ করিয়া দেন না কেন? যখন আমি তাঁহার সহিত আলাপ করি, তখন সহসা আমার সকল অঙ্গকে মুখময় করেন না কেন? বিধাতার এই সংঘটন সমূহ মাধুর্য্যময় নহে অর্থাৎ ভাল নহে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শ্লোকের ভাব লইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের

১০।৩১।১৫ -র ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দ্বিনয়ন, বিধি হইয়া হেন অবিচার।

জয়দেবের অন্য একজন সমসাময়িক কবি গোবর্দ্ধনাচার্য্যের শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ বিষয়ক এই সুন্দর শ্লোকটি পাওয়া যায় "হে কৃষ্ণ! রাধা তোমার সন্দেশাক্ষর (অর্থাৎ কৃষ্ণ এইরূপ, এ রকম তাঁহার রূপগুণ) গীতে গান করিতেছেন, বংশীতে বলিতেছেন, বীণায় বাজাইতেছেন আর খাঁচার শুকপাখীকে পড়াইতেছেন।" শ্লোকটি পদ্যাবলীতে (১৯০) এবং গোবর্দ্ধনাচার্য্যের আর্য্যাসপ্তসতীতে (কাব্যমালা সং ২১১) পাওয়া যায়।

সুপ্রসিদ্ধ দেওপাড়ায় বিজয়সেন প্রশস্তির লেখক ও জয়দেব অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ উমাপতিধর রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতির অপেক্ষা শ্রীরাধার উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য লিখিয়াছেন—আমি জলে নিমগ্ন হইয়া প্রণয়বশে সখীকে আলিঙ্গন করিয়াছিলাম তোমার নিকট এ মিথ্যা কথা কে বলিল? রাধা, তুমি বৃথাই দুঃখ পাইতেছ—এই রকম স্বপ্নপরম্পরায় শ্রীকৃষ্ণের বচন শুনিয়া রুক্মিণী যাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন শিথিল করিয়াছেন, সেই শার্ঙ্গী তোমাদিগকে রক্ষা করুন (সদুক্তিকর্ণামৃত ১।৫৩।৫, পদ্যাবলী ৩৭২)।

শ্রীরূপ পদ্যাবলীতে (৩৭১) এবং উজ্জ্বল নীলমণিতে (স্থায়িভাব ১৩৩) উমাপতিধরের আর একটি এই ভাবের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যাহার রত্নচ্ছটাতে সমুদ্র উচ্ছল হইয়াছে এমন দ্বারকার মন্দিরে রুক্মিণী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াও যিনি সুশীতল যমুনার তীরবর্ত্তী বেতসকুঞ্জে শ্রীরাধার ক্রীড়াতিশয় পরিমল ধ্যান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, সেই মুরারির প্রবল পুলকোদ্গম বিশ্বকে রক্ষা করুক।" লক্ষ্মীদেবী, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয় একথা শ্রীরূপগোস্বামীর বহুপূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে কবিবল্লভ তাঁহার রসকদম্বে রুক্মিণীকে দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করাইতেছেন—

তুমি সে ঈশ্বর সর্ব্বজনের আধার।
তোমার সমান কিছু সাধ্য নাহি আর॥
তাতে মোর মনেত বিস্ময় এক বড়।
দেবার্চ্চার ছলে তুমি কাকে ধ্যান কর॥

শ্রীকৃষ্ণ তাহার উত্তরে বৃন্দাবন ও শ্রীরাধার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—

দেবার্চ্চার কালে আমি সেই স্থল ভাবি।
প্রিয় প্রিয়া বিহার সঘন মনে সেবি॥
নিত্যস্থলে প্রমাণ গোকুল বৃন্দাবন।
সে সব নাগরী এহি ব্রজবধূগণ॥
তা সভা সম্ভাষা আমি করি ধ্যানযোগে।
মন প্রাণ তুষ্ট করি গোপীপ্রেমভাবে॥ (দশম অধ্যায়)

কবিবল্লভ শ্রীরাধার প্রাধান্য শ্রীরূপের ললিতমাধব নাটকের চতুর্থ অঙ্ক হইতে লন নাই, উমাপতিধর প্রভৃতি প্রাচীন কবি ও পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড হইতে লইয়াছেন।

পূর্ব্বভারতের উমাপতিধরের প্রায় সমসাময়িক পশ্চিমভারতের গুজরাত প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র (১০৮৯-১১৭৩) তাঁহার কাব্যানুশাসনে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক নিম্নলিখিত শ্লোকটি ধরিয়াছেন—

কনককলসস্বচ্ছে রাধাপয়োধরমণ্ডলে
নবজলধরশ্যামাত্মদ্যুতিং প্রতিবিম্বিতাম্।
অসিতসিচয়প্রান্তভ্রান্ত্যা মুহুর্মুহুরুৎক্ষিপ-
জ্জয়তি কলিত ব্রীড়াহাসঃ প্রিয়াহসিতো হরিঃ।

শ্রীকৃষ্ণের নবজলধরশ্যাম দ্যুতি শ্রীরাধার কনককলসতুল্য স্বচ্ছ পয়োধরে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া যিনি উহাকে কোন কালো কাপড় ভ্রমে বারংবার সরাইবার চেষ্টা করিলে রাধা হাসিয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাহাতে লজ্জা পাইয়া হরিও নিজের ভুল দেখিয়া হাসিয়াছিলেন সেই ক্রীড়াহাস্যের জয় হউক।

গোপীদের মধ্যে শ্রীরাধার প্রাধান্য বর্ণনা করিয়া উমাপতিধর আর একটি শ্লোক লিখিয়াছেন। উহার ভাবার্থ এই : শ্রীরাধা অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে পথ দিয়া যাইতেছেন এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেখা। শ্রীকৃষ্ণকে কোন গোপী ভ্রূভঙ্গী করিয়া, কোন গোপী নয়ন উন্মেষ করিয়া, কোন গোপী ঈষৎ হাস্যজ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়া, কোন গোপী গোপনে আদর করিয়া সম্মানিত করিলেও শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীরাধাতেই নিবদ্ধ ছিল। তাহাতে

শ্রীরাধা একদিকে যেমন গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন তেমনি আতঙ্কিত হইয়া যেন নয়নের দ্বারা অনুনয় করিতেছিলেন 'অমন করিয়া তাকাইও না গো' —এইরূপ নানাভাবের সংমিশ্রণে বিনয়াবনত শোভাযুক্ত শ্রীরাধার দৃষ্টিসকল জয়লাভ করুক (সদুক্তিকর্ণামৃত ১।৫৫।৩; পদ্যাবলী ২৫৯)। এই শ্লোকটির সহিত গীতগোবিন্দের ২।১৯ শ্লোকের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। উহাতে রাধা বলিতেছেন যে—অন্যান্য গোপীরা আনন্দবর্দ্ধক কটাক্ষক্ষেপ করিলেও আমাকে দেখিয়া কৃষ্ণের গণ্ডস্থলে ঘাম দেখা দিয়াছিল, হাত হইতে বাঁশী খসিয়া পড়িয়াছিল এবং মুগ্ধ বিস্ময়ে মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত রূপদেব নামে একজন কবির একটি শ্লোকে আছে—"এই জলবেতসের নিকুঞ্জের মাঝামাঝি স্থানে কোন রমনের জন্য কচিপল্লব দিয়া বিজনে শয্যা রচিত হইয়াছে? বৃন্দা অন্যান্য স্ত্রীগণকে এই কথা বলিলে রাধা ও মাধবের স্মিতহাস্যের দ্বারা বিচিত্রিত যে অবলোকন তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক" (১।৫৫।১)। বৃন্দাদেবীর সহিত রাধা-কৃষ্ণলীলার সম্বন্ধ যে অন্ততঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে তাহা ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল। বেতসকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের মিলনের কথা প্রাচীন কিম্বদন্তিতে ছিল। জয়দেবে বহুস্থানে (১।৪৪; ৪।১; ৭।৯; ৭।১১) বেতসকুঞ্জের উল্লেখ আছে। তাই শ্রীচৈতন্যদেব "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকের "রেবারোধসি বেতসীতরু-তলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে" শুনিয়া পরমানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ৩।১)। ষোড়শ শতাব্দীতে ও তাহার পরবর্ত্তী কালে অবশ্য পদকর্ত্তারা কেহ বেতসকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটান নাই; তাঁহারা মাধবীকুঞ্জই নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে জরতীর চরিত্র সৃষ্টি যে অন্ততঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাই কবি গোপীকের একটি শ্লোকে। তিনি লিখিয়াছেন "সঙ্কেতমতন কোকিলাদির শব্দ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিবার ব্যগ্রতায় শাঁখা ও বালার আওয়াজ শুনিয়া প্রগল্ভা জরতী "কে কে" করিয়া উঠিলে দুঃখিত অন্তঃকরণে কৃষ্ণ রাধার অঙ্গন কোণে কেলিবৃক্ষের নীচে রাত্রি কাটাইলেন" (সদুক্তিকর্ণামৃত ১।৫৫।৫)।

রাধাবিরহের একটি করুণ শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে অজ্ঞাতনামা কবির

রচনা বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত (শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ. ১১৫) শ্লোকটি আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বন্যালোকে, কুন্তকের 'বক্রোক্তি জীবিতে' এবং হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনেও পাইয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে—মধুরিপু দ্বারাবতীপুরে যাইলে, তাঁহার বস্ত্রকে উত্তরীয় করিয়া কালিন্দীতীরের কুঞ্জের বেতস শাখাকে অবলম্বন করিয়া উৎকণ্ঠিতা রাধা গুরুতর বাষ্পের জন্য গদগদ কণ্ঠে এবং তারস্বরে গান করিলেন; তাহা শুনিয়া জলের মধ্যে বিচরণশীল জন্তুরাও মুখ তুলিয়া কূজন করিল। অর্থাৎ রাধার ক্রন্দন শুনিয়া জলচর প্রাণীরাও তাঁহার প্রতি সমবেদনা জানাইল (১।৫৮।৪)। ষোড়শ শতকের কোন পদে অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত হয় নাই।

সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত নাথোকের একটি শ্লোকে (১।৫৭।৫) শ্রীকৃষ্ণকে রাধাধব, রাধার স্বামী বলা হইয়াছে। প্রাচীন তামিল সাহিত্যের স্বকীয়া-বাদের ইহা প্রভাব বলিয়া মনে হয়। দাক্ষিণাত্যের নিম্বার্কস্বামীও বৃষভানুকন্যা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়ারূপে উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। জয়দেবের পৃষ্ঠপোষক রাজা লক্ষণসেন স্বয়ং একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত এগারটি শ্লোক শ্রীধরদাস সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। —তাঁহার দুইটি শ্লোক দেখিয়া মনে হয় যে তিনি শ্রীরাধাকে পরকীয়ারূপেই অঙ্কন করিয়াছেন। একটি শ্লোকে আছে—"কৃষ্ণ! কুঞ্জমধ্যে তোমার বনমালার সহিত গোপীর কুন্তলের ময়ূরপুচ্ছ ও মালা পাইয়াছি, এই লও, দুগ্ধমুখ গোপশিশু এই কথা বলিলে লজ্জাবনত শ্রীরাধামাধবের যে হাস্য-সমম্বিত চক্ষুসকল স্থির হইয়াছিল তাহারা জয়যুক্ত হউক" (১।৫৫।২)। বিলাসের চিহ্ন অপরের দৃষ্টিগোচর হইলে স্বামী স্ত্রীও অবশ্য লজ্জা পাইতে পারেন। সুতরাং সেদিক্ দিয়া ইহাতে কিছু সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও অপর শ্লোকটি সেই সন্দেহ দূর করিয়া দেয়। শ্রীরূপ গোস্বামী এই শ্লোকটি (২০৬) লক্ষ্মণসেন কৃত বলিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু মুদ্রিত সদুক্তিকর্ণামৃতে ইহা (১।৫৪।৪) শ্রীমৎ কেশবসেন কৃত বলিয়া ধৃত হইয়াছে। উহার অর্থ এই :—শ্রীরাধা "মহোৎসবে আহুতা হইয়া রাত্রিকালে শূন্যগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, ভৃত্যগণ মত্ত হইয়া রহিয়াছে, একাকিনী কুলবধূ

কিরূপে যাইবে, অতএব বৎস! তুমি ইহাকে গৃহে রাখিয়া আইস, যশোদার এই বাক্য শুনিয়া রাধামাধবের যে মধুর ঈষৎ-হাস্য-সমন্বিত অলস দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার জয় হউক"। শ্রীরাধার বাড়ীর সকলেও তাঁহাদের গৃহ হইতে অনুপস্থিত; এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যাইবে ভাবিয়া উভয়ের সস্মিত দৃষ্টিবিনিময় শ্রীরাধার পরকীয়াত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

গীতগোবিন্দের পটভূমিকারূপে রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তনের এই ইতিহাস জানা আবশ্যক। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সহসা জয়দেব অজ্ঞাত অখ্যাত রাধাকে লইয়া কাব্য রচনা করেন নাই ইহা বুঝা প্রয়োজন। শ্রীরাধার অভিসার, মান, রাস, কুঞ্জভঙ্গ, বিরহ প্রভৃতি লইয়া তামিল, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় বহু কবি বহু পদ ও শ্লোক জয়দেবের পূর্ব্বে ও সমসময়ে লিখিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দের সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে প্রদত্ত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক অধ্যায়গুলির সারমর্ম্ম আলোচনা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। পুরাণসমূহের কালনির্ণয় বিষয়ে সুদক্ষ গবেষক ডাঃ হাজরা বলেন যে এই অধ্যায়গুলি খৃষ্টীয় নবম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতকের পরে এগুলি রচিত হইবার সম্ভাবনা না থাকার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে হরিভক্তিবিলাসে পাতালখণ্ডের ৮৪ হইতে ৯৪ ও ৯৬ অধ্যায়ের (আনন্দাশ্রম সংস্করণের) বহু শ্লোক প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। বঙ্গবাসী সংস্করণের এই অধ্যায়গুলির সংখ্যা ৩৮ হইতে ৪৩, ৪৬ এবং ৫২। বাংলা অক্ষরে এই শ্লোকগুলি পড়িয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল যে বুঝি কোন উৎসাহী গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়া পদ্মপুরাণের কোন পুথির মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আনন্দাশ্রম সংস্করণেও এই শ্লোকগুলি পাওয়ায় সে সন্দেহ প্রায় দূরীভূত হইয়াছে—কেননা ঐ সংস্করণে ১২।১৪ খানি প্রাচীন পুথি মিলাইয়া পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে।

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে (৪১ অধ্যায় বঙ্গবাসী; ৭২ অধ্যায় আনন্দাশ্রম) দেখান হইয়াছে যে রাধাকৃষ্ণের লীলার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে গোপীভাব শুধু নহে, স্ত্রীদেহও ধারণ করা আবশ্যক। বহু মুনি শ্রীকৃষ্ণের

"শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি" ধ্যান করিয়া গোপীত্বলাভ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। যেমন উগ্রতপা সুনন্দা হইয়াছেন সত্যতপা ভদ্রা, হরিধামা রঙ্গবেণী, জাবালি চিত্রগন্ধা হইয়াছেন। রাজর্ষিপুত্র বালক চিত্রধ্বজ এক মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিতেন। একদিন চিত্রধ্বজ প্রণামান্তে দেখিলেন যে বিগ্রহ যেন পার্শ্বস্থিত দেবীদ্বয়কে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতেছেন। ইহাতে তিনি লজ্জিত হইলেন। তখন হরি দক্ষিণপার্শ্বস্থিতা লজ্জিতা প্রিয়াকে কহিলেন—মৃগলোচনে, দেখিতেছ কি, এই পরমভক্ত বালক তোমারই শরীরের অংশগত হইয়াছে, এখন তুমি ইহাকে আত্মসম করিয়া লও। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া পদ্মনয়না ঐ দেবী চিত্রধ্বজের নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেবী ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার নিজের অঙ্গ আর ঐ ভক্ত বালক চিত্রধ্বজের অঙ্গ যেন অভিন্ন। দেবীর অঙ্গ হইতে জ্যোতি বাহির হইয়া চিত্রধ্বজের অঙ্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। দেবীর স্তনযুগলের প্রভায় চিত্রধ্বজের দুইটি স্তন হইল, দেবীর নিতম্বপ্রভায় চিত্রধ্বজের অনুরূপ নিতম্ব হইল, কেশরাশির কিরণে কেশরাশি হইল। একটি দীপ হইতে যেমন আর একটি দীপ জ্বলিয়া উঠে, ঠিক সেইরূপ (আনন্দাশ্রম সং ৭২।১১৩)। দেবী তাঁহাকে গোবিন্দের পাশে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "প্রভো! আপনার এই দাসী, ইহার নামকরণ করুন ও ইহাকে কোন অভীষ্ট প্রিয়তম সেবা দান করুন।" এই বলিয়া স্বয়ং তাহাকে চিত্রকলা নাম দিয়া বলিলেন যে "তুমি এই বীণা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা প্রভুর নিকটে থাকিয়া বিবিধ স্বরে আমার প্রাণনাথের গুণকীর্ত্তন করিবে।" তাঁহার গান শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ খুসী হইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সমস্ত ব্যাপারটি কিন্তু একটি স্বপ্ন মাত্র। আলিঙ্গনের আনন্দে চিত্রধ্বজের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কৃষ্ণকে উপলব্ধি করিবার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন—লোকালয় ছাড়িয়া বনে গেলেন। কঠোর তপস্যার পর তিনি বীরগুপ্ত নামক গোপের কন্যা হইয়া জন্মিলেন—তাঁহার নাম হইল চিত্রকলা।

এই কাহিনীটির মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মঞ্জরী ভাবের সাধনার সূত্রপাত দেখা যায়। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে

(আনন্দাশ্রম সং ৮৩ অধ্যায়, পৃ. ৬২৪, বঙ্গবাসী সং ৫২ অধ্যায়) এই সাধনার কথায় আরও বলা হইয়াছে—

পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়া জনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্॥ (৬ শ্লোক) ইত্যাদি

অর্থাৎ, "তাঁহার প্রীতিপাত্রীরা পরকীয়া অভিমানে গোপনে নিজ প্রিয়ের সহিত রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিতে হইলে আপনাকে কৃষ্ণসেবিনী রমণীদিগের মধ্যবর্ত্তিনী রূপযৌবনশালিনী মনোরমা কিশোরীরূপে চিন্তা করিতে হইবে। ভাবনা দ্বারা আপনাকে বিবিধ শিল্পবিদ্যানিপুণা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহবাসের উপযোগিনী রমণী করিয়া তুলিতে হইবে। আরও মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে, আমি রাধিকার পরিচারিকা, কৃষ্ণ আমাকে সম্ভোগার্থ আহ্বান করিতেছেন, তথাপি আমি তাঁহার নিকট গমন করিতেছি না—এইরূপ চিন্তা করিয়া সখীভাবে সর্ব্বদা রাধিকার সেবা করিবে, কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধিকার উপরে সমধিক ভক্তি করিবে। প্রতিদিন যত্ন করিয়া ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণের মিলনসাধনে যত্নবান হইবে এবং তাঁহাদের যুগলমূর্ত্তির সেবা করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিবে। আপনাকে এইরূপ রাধিকার সহচরীরূপে ভাবনা করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মহানিশা পর্য্যন্ত ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবে।"

পদ্মপুরাণে যে সাধনার ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহার সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় সাধনার দুইটি প্রধান পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ মঞ্জরীভাবের সাধনা হইতেছে সখীর অনুগা হইয়া সাধন—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাধকের সম্ভোগের কোন স্থান নাই। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনায়

কবে বৃষভানুপুরে আহীরী গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব। (পদক° ৩০৬৫)

প্রার্থনা করিয়াছেন। আর প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় সখীদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া সেবা কামনা করিতেছেন—

এসব অনুগা হৈয়া প্রেম সেবা নিব চাইয়া
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ;

রূপগুণে ডগমগি সদা হব অনুরাগী
বসতি করিব সখীমাঝ॥
বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সময় বুঝিব রস সুখে ;
সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব করে
তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে॥

মঞ্জরীভাবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-সহবাসের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধ। মঞ্জরীভাবে শুধু রাধাকৃষ্ণের সেবা ছাড়া আর অন্য কোন বাসনা সাধকের থাকে না। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র ভজন প্রণালীর সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ন্যায় কীর্ত্তনানুরাগী পরমভক্ত পণ্ডিতপ্রবরও "ভগবানকে পতি ও আপনাকে পত্নী বা নায়িকা বোধে ভজন করা শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্মের একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়" (বৈষ্ণব রস সাহিত্য, পৃ. ৫) বলিয়া ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রায় রামানন্দের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

সখীর স্বভাব এক অকথ্যকথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসুখ হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮)

সখীর সহিত শ্রীরাধা কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের সহবাস ঘটাইয়া থাকেন এরূপ কথাও কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন। কিন্তু সখী নিত্যসিদ্ধা, আর মঞ্জরী সাধনসিদ্ধা হইবার চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার মনে সেবাভিলাষ ছাড়া আর কিছু থাকে না। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে যে যোগপীঠের বর্ণনা আছে তাহার সঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামীর কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকার

বিবরণের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। পদ্মপুরাণ অনুসারে (পাতাল ৩৯৩৩: বঙ্গবাসী) যোগপীঠের সম্মুখে ললিতা, বায়ুকোণে শ্যামলা, উত্তরে ধন্যা, ঈশানে হরিপ্রিয়া, পূর্ব্বে বিশাখা, অগ্নিকোণে শৈব্যা, দক্ষিণে পদ্মা ও নৈঋতে ভদ্রা। শ্রীরূপ গোস্বামী ললিতা বিশাখা ছাড়া আর ছয় জনকে প্রধানা অষ্টসখীরূপে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে ললিতা পূর্ব্বদিকে, বিশাখা দক্ষিণে, চম্পকলতা পশ্চিমে, চিত্রা উত্তরে, তুঙ্গবিদ্যা অগ্নিকোণে, ইন্দুরেখা ঈশানকোণে, রঙ্গদেবী নৈঋতে ও সুদেবী বায়ুকোণে অবস্থিত। পদ্মপুরাণের এই অংশ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর প্রক্ষিপ্ত হইলে শ্রীরূপের প্রদত্ত বিধির সঙ্গে এরূপ গুরুতর পার্থক্য দেখা যাইত না। পদ্মপুরাণের এই অধ্যায়গুলি যে প্রাক্-চৈতন্য যুগের তাহার প্রধান প্রমাণ হইতেছে এই যে ইহাতে মন্ত্রাদিজপের সাধনায় ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্মের প্রাধান্য ; শ্রীরূপনির্দ্দিষ্ট রাগানুগা ভক্তি সেখানে গৌণ।

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের (আনন্দাশ্রম সংস্করণ ৮৩ অধ্যায়, বঙ্গবাসী ৫২ অধ্যায়) রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শুকসারির গানে কুঞ্জভঙ্গ, স্বভবনে আসিয়া কৃষ্ণের পুনরায় নিদ্রা, মাতা কর্তৃক জাগরিত হইবার পর বলরামের সহিত গোশালায় গমন, রাধিকারও স্বভবনে স্নান, অলঙ্কারাদি ধারণ, যশোদাগৃহে যাইয়া রন্ধন, শ্রীকৃষ্ণের স্নান, অলঙ্কার পরিধান, বলরামের সহিত ভোজন, বিশ্রাম, গোষ্ঠে গমন, তথা হইতে সখাগণকে বঞ্চনা করিয়া সূর্য্যপূজার ছলে আগতা শ্রীরাধার সহিত মিলন, বেণু লুকাইয়া উভয়ের খেলা, তাহার পর উভয়ের মধুপান এবং মধুমদোন্মত্ত হইয়া নিদ্রা যাওয়া—

উপবিশ্যাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ।
ততো মধুমদোন্মত্তৌ নিদ্রয়া মীলিতেক্ষণৌ॥ (৫৪)

তারপর বিলাস, সখীদের সহিত বিলাস, জলক্রীড়া, ফলমূল ভোজন, পরে কপটনিদ্রার অভিনয়, পাশাখেলা প্রভৃতি, গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন। ইহার পরের কথা পদ্মপুরাণের অনুবাদ হইতে বলিতেছি—"তাহার পর তিনি পিতা মাতার অনুরোধে নিজ ভবনে গমন করিয়া স্নান, পান ও মাতার অনুরোধে কিছু ভোজন করিয়া গোদোহন করিবার ইচ্ছায় পুনর্ব্বার গোষ্ঠে গমন করেন।

গোষ্ঠে গিয়া গাভীদোহন ও কতকগুলিকে বা জলপান করাইয়া দুগ্ধ ভার-বাহীদিগের অগ্রে অগ্রে পিতার সহিত গৃহে গমন করেন। গৃহে গিয়া পিতা, পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র ও বলরামের সহিত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ অন্ন আহার করেন। কৃষ্ণগতচিত্তা রাধিকা প্রার্থনার পূর্ব্বেই সখীদ্বারা সুস্বাদু সিদ্ধ অন্ন কৃষ্ণভবনে প্রেরণ করিয়া থাকেন। হরি পিত্রাদির সঙ্গে উপবেশন করিয়া সেই রাধিকাপ্রদত্ত অন্ন প্রশংসা করিতে করিতে ভোজন করেন। আহারের পর শ্রীকৃষ্ণ পিত্রাদির সহিত স্তাবকজন-পরিবৃত সভাগৃহে গমন করেন। যে সকল সখী রাধিকাপ্রদত্ত অন্ন আনয়ন করিয়াছিল, যশোদা আবার তাহাদিগকে প্রচুর অন্ন প্রদান করিয়া থাকেন। সখীগণ তথা হইতে যশোদা প্রদত্ত অন্ন এবং কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া রাধিকার নিকটে গিয়া অর্পণ করে। রাধিকা সেই অন্ন, সখীগণকে কিয়দংশ ভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগের সহিত উপবেশন করিয়া ভোজন করেন। তারপর সখীগণের দ্বারা বিভূষিত হইয়া অভিসারে যাইতে উদ্যত হন।" (পাতালখণ্ড ৫২। ৯০—৯৭ শ্লোক)। উদ্ধৃত অংশের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার গোবিন্দলীলামৃতে করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের বিংশ সর্গের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটির অনুবাদ এই—"যিনি সায়ংকালে স্বীয় সখীদ্বারা নিজ দয়িত শ্রীকৃষ্ণের জন্য নানাবিধ ভোজ্যবস্তু প্রেরণ করিতেছেন এবং সখীগণ কর্তৃক পুনরানীত শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ ভোজন করিয়া যিনি হৃষ্টচিত্তা হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধাকে এবং সুস্নাত মনোহর বেশধারী গৃহমধ্যে জননী কর্ত্তৃক সংলালিত, গোষ্ঠাগত, তথায় গোদোহন ক্রিয়াসমাপ্তির পর পুনশ্চ তথা হইতে গৃহে যিনি বর্ত্তমান হইয়া ভোজন করিতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণকেও আমি স্মরণ করি।" এই সর্গের ৭৭টি শ্লোকে এই লীলাগুলি কবিরাজ গোস্বামী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। একবিংশতি সর্গের প্রথম শ্লোকটির ভাবার্থ এই—"অনন্তর শ্রীরাধা কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষীয় রজনীর উপযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও শুক্লবর্ণ বস্ত্ররচিত বেশ ধারণপূর্ব্বক সখীবৃন্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া সায়ংকালে বৃন্দাদেবীর উপদেশ মত দূতীর সহিত যমুনাতীরবর্ত্তি কল্পবৃক্ষ-সুশোভিত কুঞ্জমধ্যে অভিসার করিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও গোপসকলের সহিত সভামধ্যে গুণিগণের কৌশল সন্দর্শন পূর্ব্বক

স্নেহময়ী যশোদা কর্তৃক সভা হইতে আনীত হইয়া শয্যোপরি শায়িত হওত গোপনভাবে সঙ্কেতকুঞ্জে গমন করিলেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি।"

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত্র ও নিশান্ত এই অষ্টকালের লীলা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই পল্লবিত করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোবিন্দলীলামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে জটিলা, কুন্দলতা, মধুমঙ্গল, ধনিষ্ঠা প্রভৃতির নাম ও চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে—পদ্মপুরাণে তাহা নাই। গোবিন্দলীলামৃতের ২৫৮৮টি শ্লোকের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১১১টি শ্লোকে* রন্ধন ও ভোজনের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর আহার্য্যের বিষয়ে যদি কেহ গবেষণা করেন, তবে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা তাঁহার খুব কাজে লাগিবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোবিন্দলীলামৃতে পদ্মপুরাণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিস্তৃত করিয়াছেন; আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে হরিভক্তিবিলাস, উজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার লিখিয়াছেন। পদ্মপুরাণের অষ্টকালীয় অধ্যায় যদি কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরে প্রক্ষিপ্ত হইত, তাহা হইলে উহাতে কোন না কোন প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামীর সৃষ্ট চরিত্র কুন্দলতা, মধুমঙ্গল, জটিলা প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইত—কেননা ঐ চরিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার বর্ণনার দ্বারা উহাদিগকে আরও ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছেন। আরও বলা যাইতে পারে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কোন পূর্ব্বসূরীর রচনায় রাধাকৃষ্ণের ও অন্যান্য গোপীদের মধুপানের বর্ণনা পাইলে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ লীলার কথা (১৪।৮০—১০৪) বলিতে অগ্রসর হইতেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাপ্রসঙ্গে গোপীদের বারুণীপান বর্ণিত হয় নাই, বলদেবের রাসপ্রসঙ্গে উহা লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ পদ্মপুরাণের অনুসরণ করিয়া লিখিতেছেন—"অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বসনভূষণ স্খলিত হইতেছে তথাপি অজ্ঞানবশতঃ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করা, হাস্যের কারণ না থাকিলেও অসময়ে উচ্চ হাস্য, প্রশ্ন না থাকিলেও উত্তর দান এবং

* ৩।৪-৫, ৪২-৮০, ৮৫-১১০; ৪।২৩-৫৯; ৬।৩২, ৩৮ ১০।১০৯-২৪৪; ১১।৫০-৫৮; ২০।১৩, ৪৬-৫২। গোবিন্দলীলামৃতের এইসব শ্লোকে ভোজনের বর্ণনা আছে।

কারণ ব্যতিরেকে প্রলাপ বাক্য, বারুণী-পানজন্য মত্ততা, গোপাঙ্গনাদিগের এই সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল (৯৯ শ্লোক)। একটি নবীনা কিশোরী পানোন্মত্তা হইয়া তোৎলার মতন বলিতেছেন—

ল ল ল ললিতে ! প প প পশ্য রাধাচ্যুতৌ
স স স সহ বো ম ম ম মণ্ডলৈ র্ভ্রাম্যতঃ। (১০৪)

ইহারই ভাব লইয়া পদকল্পতরুর ২৬৪১ সংখ্যক পদে লিখিত হইয়াছে—

নবীন কিশোরী সখী নব মধু-পানে
মদোদ্রেকে ভ্রান্ত নেত্র প্রলাপ কথনে॥
ল ল ল—ললিতে প-প-পশ্য রাধাচ্যুতে।
স স স—সকল মণ্ডল সামলাইতে॥ ইত্যাদি

জয়দেব প্রথম সর্গে বসন্তবিহার বর্ণনায় কোন গোপীর মধুপানের উল্লেখ করেন নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে রাধাকৃষ্ণের লীলাপূত স্থানগুলি তীর্থ বলিয়া পূজিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। গহঢবালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের (১১১৫-৫৪) প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্মীধর তাঁহার কৃত্যকল্পতরুর তীর্থবিবেচনকাণ্ডে বরাহ-পুরাণ হইতে বৃন্দাবন, কালীয় হ্রদ প্রভৃতি মথুরামণ্ডলের ২৭টি তীর্থের নাম করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি হইতেছে রাধাকুণ্ড—

রাধাকুণ্ডেতি বিখ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরংমম।
তত্রস্নানং তু কুর্ব্বীতে এক রাত্রোষিতো নরঃ॥*

লক্ষ্মীধর মধুবন, তালবন প্রভৃতি মথুরার দ্বাদশ বনের উল্লেখ করেন নাই ; কিন্তু ঐ বনগুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত হইয়াছিল, কেননা নরসিংহ তাঁহার প্রমাণপল্লবে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। চণ্ডেশ্বর (আনুমানিক ১৩০০—১৩৭০ খৃঃ) প্রমাণপল্লব হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীরূপ

* এই শ্লোকটি একখানি ছাড়া উপজীব্য অন্যান্য সমস্ত পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। যে পুথি খানিতে পাওয়া যায় নাই সেখানি ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের অনুলিপি এবং ইহা নাগপুরের ছোট ভোঁসলে মহারাজার গ্রন্থাগারে আছে। বলাবাহুল্য ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর পুথিতে শ্লোকটি আছে। সুতরাং শ্লোকটির অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করা যায় না।

গোস্বামী স্কন্দপুরাণান্তর্গত মথুরাখণ্ড ও পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্য হইতে, আদিবরাহ মথুরামাহাত্ম্যে রাধাকুণ্ডের সম্বন্ধে প্রমাণ তুলিয়াছেন।

পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে প্রদত্ত ঐ শ্লোক তিনটির মধ্যে প্রথমটি এই :—

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ
নরো ভক্তো ভবেদ্ বিপ্রাস্তদ্ধি তস্য প্রতোষণম্॥

দ্বিতীয় শ্লোকটি বহুস্থানে উদ্ধৃত হয়—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে পণ্ডিতাগ্রণ্য অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশে' (২য় সং, পৃ. ১০১) বলিয়াছেন যে "পদ্মপুরাণ হইতে গোস্বামীগণ একটি আধটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।"

এই কথা যে যুক্তিসহ নহে তাহা দেখাইবার জন্য পাদটীকায় পদ্মপুরাণ হইতে শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী মাত্র দুইখানি গ্রন্থে কতবার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার তালিকা দিলাম।* ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণাদিতে কোথায় কোথায় রাধার নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা লইয়া গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন; আর সনাতন

---

*(ক) শ্রীরূপকৃত মথুরামাহাত্ম্য (পুরীদাস সংস্করণ) ৪১ বার যথা—১৫, ২৭, ২৯. ৪৬, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৭৬, ৮৫, ৮৬, ৯৬, ১০৫, ১১৩, ১২৪, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১২৯, ১৩০ ১৩২, ১৩৫, ১৩৯, ১৪৫, ১৭৩, ১৮৮, ১৯১, ১৯৭, ২২৪, ২২৫, ২৩২, ২৪০, ২৪৮, ৩০৮, ৩১৩, ৩১৬, ৩২৭, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৮৭, ৪৫০।

(খ) সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে (মেদিনীপুর প্রপন্নাশ্রম সংস্করণ) ১২ বার, যথা—

পূর্ব্ববিভাগে ১।১২, ৪।৮৬, ৪।১১৭।

উত্তর বিভাগে ১।৭৬, ১।১৫৯, ১।১৬১, ১।১৬৪, ২।২০৪, ৩।১১১, ৩।১২৫, ৭।১৩২, ৫।২১২।

হরিভক্তিবিলাসের টীকায় ও শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় পদ্মপুরাণ অসংখ্যবার উদ্ধৃত হইয়াছে।

গোস্বামী তাঁহার প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে ঐ বিষয়ে অনুরূপ গবেষণা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় ১০।৩২।৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভবিষ্যপুরাণের উত্তর খণ্ডের মল্লদ্বাদশী প্রসঙ্গ হইতে, স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডের দ্বারকামাহাত্ম্য হইতে (বেঙ্কটেশ্বর সং, পৃ. ২৯২ ; বঙ্গবাসী সং, পৃ. ৫২৯৫), পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্য হইতে "যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা" প্রভৃতি শ্লোক তুলিয়া শেষে "রাধা বৃন্দাবনে বন ইতি মাৎস্যস্কান্দাদিভ্যঃ", মৎস্য ও স্কন্দ পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। পরে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতন লিখিতেছেন—"বর্ণিতা চ সা তথৈব শ্রীজয়দেব সহচরেণ মহারাজ লক্ষ্মণসেন মন্ত্রিবরেণোমাপতিধরেণ—ক্রবল্লীবলনৈঃ বয়াপি" ইত্যাদি। উমাপতিধরের এই শ্লোকটির অনুবাদ পূর্ব্বেই দিয়াছি। তিনি নিজের ছোট ভাই শ্রীরূপের লিখিত উজ্জ্বল নীলমণির কথা বলিয়াছেন—"বিবৃতং চৈতন্যদনুজবরৈঃ শ্রীরূপ মহাভাগবতৈ রুজ্জ্বলনীলমণেঃ স্থায়িভাববিবরণে।" এই উল্লেখ হইতে সন্দেহ থাকে না যে এই অংশ সনাতন গোস্বামী লিখিতেছেন—শ্রীজীব নহে। কিন্তু পুরীদাসজী সম্পাদিত শ্রীজীবের লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকায় এই অংশ মুদ্রিত হইয়াছে। যাহা হউক সনাতন গোস্বামী শেষে "তথা শ্রীবিল্বমঙ্গলচরণাঃ" বলিয়া লিখিয়াছেন—

রাধামোহন মন্দিরাদুপগতশ্চন্দ্রাবলীমূচিবান্।
রাধে ক্ষেমমিহেতি তস্য বচনং শ্রুত্বাহ চন্দ্রাবলী।
কংসক্ষেমময়ে বিমুগ্ধহৃদয়ে কংসঃ ক দৃষ্টস্ত্বয়া
রাধাবেতি বিলজ্জিতো নতমুখঃ স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে সনাতন গোস্বামী স্কন্দপুরাণ হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীরূপ মথুরামাহাত্ম্যে স্কন্দপুরাণ হইতে ৩০টি প্রমাণ ধরিয়াছেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বাবুর নিম্নলিখিত উক্তি আমরা মানিয়া লইতে পারি না—"আমরা দেখিতে পাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রসিদ্ধ পুরাণগুলির ভিতর একমাত্র পদ্মপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণে রাধার উল্লেখ আছে বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণগুলির ভিতর রাধার প্রবেশ হয়ত তখনও পর্য্যন্ত ঘটে নাই" (পৃ. ১০৮—১০৯)।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি আলোকস্তম্ভ। ইহাতে আমরা রাধাকৃষ্ণের কেবলমাত্র বিহার নহে—উপাসনারও প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। নবম শতকের আনন্দবর্দ্ধন, অভিনন্দ, দশম শতকের মালবরাজ বাক্‌পতি মুঞ্জ ও সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত ষোলটি শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের লীলা ও নমক্রিয়া প্রভৃতির সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত ছিলেন না তাঁহারা সন্দেহ উঠাইয়াছিলেন যে জয়দেব বুঝি কেবল সাহিত্য-রসিকদের জন্য বিলাসবর্ণনামূলক গীতকাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে শেষে (১২।২৭) তিনি বলিয়াছেন "যদ্গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশল-মনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং" যদি গান্ধর্ব্বকলা বা সঙ্গীতশাস্ত্রের রাগাদিতে, বিষ্ণুর ভজন বিষয়ক অনুধ্যানে, বিবেকতত্ত্বে এবং শৃঙ্গাররসকাব্যে নিপুণতালাভের বাঞ্ছা থাকে তবে "কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ" কৃষ্ণগতপ্রাণ জয়দেবপণ্ডিত কবির এই গীতগোবিন্দকাব্য চিন্তা করুন। সুতরাং গীতগোবিন্দ একদিকে যেমন ভক্তসাধুর ও সঙ্গীতামোদীর প্রিয়, অন্যদিকে তেমনি ইহা শৃঙ্গাররসের কাব্য বলিয়া আদৃত। তবে ইহার কবি নিজেকে কৃষ্ণগতপ্রাণ বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিয়াছেন, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

গীতগোবিন্দে আমরা রাধার কোন সখীর নাম পাই না। তাঁহার শ্বাশুড়ি ননদিনী প্রভৃতি থাকার কোন ইঙ্গিতও দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ দ্বাদশটি সর্গের মধ্যে কোথাও কোন শব্দের দ্বারা রাধাকে গুরুজন, পরিজনের ভয়ে ভীতা বলা হয় নাই। মনে হয় কবি যেন নিত্যলীলার বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক একটিমাত্র কথা আছে—শ্রীরাধা বলিতেছেন যে কৃষ্ণ একসঙ্গে সহস্র বল্লব-যুবতীকে আলিঙ্গন করিতেছেন (২।৫)।

পদকল্পতরুতে গীতগোবিন্দ হইতে ২০টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। রূপ, অভিসারোৎকণ্ঠা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতা, বাসন্তীরাসলীলা, সম্ভোগ, রসোদ্গার ও কুঞ্জভঙ্গে স্বাধীন-ভর্তৃকা রাধার বর্ণনায় জয়দেবের পদ গীত হইয়া থাকে। তাঁহার পদ না গাহিলে কোন পালাই জমে না। পদাবলীসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব পদে পদে লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাপতির মতন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবিও

জয়দেবকে অনুকরণ করিয়া গৌরব বোধ করিতেন। তিনি নিজেকে 'অভিনব জয়দেব' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। তিনি কি ভাবে জয়দেবের ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার দুই চারিটি উদাহরণ দিতেছি।

জয়দেবের (৩।১১) "হৃদি বিসলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গম নায়কঃ'' ইত্যাদি শ্লোকটিতে কৃষ্ণ মদনকে বলিতেছেন—''হৃদয়ে আমার মৃণালের হার, বাসুকি নয়; গলায় নীলপদ্মের পত্রাবলী, গরলের আভা নয়; অঙ্গে শ্বেতচন্দন ভস্ম নয়; পার্শ্বে আমার প্রিয়াও নাই; তবে কেন হে অনঙ্গ, তুমি আমাকে হর ভ্রমে প্রহারের জন্য ক্রোধে ছুটিয়া আসিতেছ? বিদ্যাপতির পদে

কত ন বেদন মোহি দেসি মদনা।
হর নহি বলা মোহি জুবতি জনা॥
বিভূতি ভূষণ নহি চান্দনক রেণু।
বাঘছাল নহি মোরা নেতক বসনু॥ প্রভৃতি

(মিত্রমজুমদার পদ ২৪৫)

জয়দেব মানিনী রাধার মান উপশমের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বলাইয়াছেন (১০।১৩) "হে মুগ্ধে! তুমি নির্দ্দয়ভাবে দন্তদংশনে, ভুজলতার বন্ধনে, এবং নিবিড়স্তনভার পীড়নে আমাকে দণ্ড দিয়া সুখী হও।'' বিদ্যাপতি বলেন—

ভুজ-পাস বাঁধি জঘন-তর তারি।
পয়োধর-পাথর হিয় দহ ভারি॥
উর-কারা বাঁধি রাখ দিন-রাত্রি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ সাতি॥ (মিত্রমজুমদার ৬৪৭)

জয়দেবের "নিন্দতি চন্দনমিন্দু কিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্
ব্যাল নিলয় মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সমীরম্" (৪।২)

প্রতিধ্বনি করিয়া বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

নিন্দঅ চন্দন পরিহর ভূসন।
চাঁদ মানএ জনি আগী (১৮৪)
অথবা চন্দন গরল সমান।
সীতল পবন হুতাসন জান॥

হেরই সুধানিধি সূর।
নিসি বৈঠলি সুবদনি ঝুর॥ (৭৩৮)

অথবা— জা লাগি চাঁদন বিখতহ ভেল। চাঁদ অনল জা লাগি রে।
জা লাগি দখিন পবন ভেল সায়ক। মদন বৈরি জা লাগি রে॥
(৫৬৭)

জয়দেবের "মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥" (৬।৫)

অর্থাৎ, রাধা তোমার ন্যায় বেশভূষা ধারণ করিয়া বারবার তাই দেখিতেছেন এবং আমিই যেন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মনে করিতেছেন।

বিদ্যাপতিতে—

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মধাঈ॥ (৭৫১)।

গীতগোবিন্দে খণ্ডিতা রাধিকা মাধবকে বলিতেছেন—

হরি হরি যহি মাধব যাহি, কেশব মা বদ কৈতববাদং।
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্॥
কজ্জল-মলিন বিলোচন চুম্বন বিরচিত নীলিমরূপম্।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্॥

বিদ্যাপতির রাধিকা বলিতেছেন—

ততহি জাহ হরি ন করহ লাথ।
রঅনি গমওলহ জন্থিকে সাথ॥
কুচকুঙ্কুম মাখল হিয় তোর।
জনি অনুরাগ রাঁগি করু গোর॥ (৩৭১)

অথবা

নয়ন কাজর অধর চোরাওল
নয়ন চোরাওল রাগে।
বদন বসন লুকাওব কতি খন
তিলা এক কৈতব লাগে॥
মাধব কে আবে বোলবঅ সতাহে।

তাহি রমণী সঙ্গে রয়নি গমওলহ
ততহি পলটি পুনু জাহে॥ (৩৭২)

জয়দেবের রাধিকা বলিতেছেন—

বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্।

বিদ্যাপতির রাধিকাও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

অবে পরতীতি করতঁ দহু কোএ।
সামর নহি সরলালয় হোএ॥

জয়দেবের অনেক অলঙ্কার ও শব্দসম্ভারও বিদ্যাপতি নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। জয়দেবে আছে—

মামপি কিমপি তরঙ্গকনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্।

বিদ্যাপতি বলেন—

নয়ন তরঙ্গে অনঙ্গ জগাঈ
অবলা মারণ জান উপাঈ॥

জয়দেব বলেন—"স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—দেহ দিপতি গেল, হার ভার ভেল
জনম গমাওল রোও।

জয়দেবের গীতগোবিন্দে প্রথমসমাগম লজ্জিতা, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতা, সম্ভোগ, রসোদ্গার প্রভৃতির বর্ণনা দেখা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ও তাহার পূর্ব্বে কবিগণ রাধাকৃষ্ণের কোন উল্লেখ না করিয়া এই সব বিষয় লইয়া খণ্ডখণ্ড শ্লোক লিখিয়াছেন। ঐ শ্লোকসমূহের মধ্যে কতকগুলি শ্রীধরদাস সদুক্তিকর্ণামৃতে বিষয় অনুযায়ী সাজাইয়া সঙ্কলন করিয়াছেন। ষোড়শ শতকের লীলাকীর্ত্তনের পদাবলীর সহিত এইসমস্ত লৌকিক প্রেমের কবিতার ঐক্য ও অনৈক্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমেই অভিসারের শ্লোক লওয়া যাউক।

শ্রীধরদাস অভিসারিকাকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—দিবসাভিসারিকা, তিমিরাভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভিসারিকা এবং দুর্দিনাভিসারিকা (২।৬২-৬৬)। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর পদাবলীতে এই চার

প্রকার অভিসারেরই পদ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের বর্ষাভিসারের পদগুলির সহিত সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত অমরু, সুভট, ধরণীধর, চন্দ্রজ্যোতিষ প্রভৃতি সংস্কৃত কবির পদগুলির তুলনা করা যাইতে পারে। সুভট লিখিয়াছেন—"পঙ্কের মধ্যে নূপুর শিঞ্জনের গরিমা ডুবিয়া গিয়াছে, মেঘের ডাকে মেখলার শব্দ চাপা পড়িয়াছে, বিদ্যুৎচমকের দ্বারা লতার মতন হাতে বলয়ের কিরণসমূহ আবৃত হইয়াছেঃ হে সখি! বর্ষারাতির বিভূতিগুলির দ্বারা তোমার বিঘ্নগুলি মুহূর্ত্তের মধ্যে ক্ষীণ হইয়াছে" (২।৬৬।১)। অর্থাৎ, নূপুরের ও মেখলার শব্দ হইলে ও বলয়ের দ্যুতি দেখা গেলে অভিসারিকা ধরা-পড়িত, কিন্তু বর্ষায় তাহার সুবিধা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিরা এরূপ ক্ষেত্রে বলিয়াছেন যে নায়িকা নূপুর মেখলা প্রভৃতি ছাড়িয়া অভিসারে বাহির হইয়াছেন। সুভটের অন্য একটি পদে আছে—"আকাশ যখন স্নিগ্ধ মেঘের ধ্বনি করিয়া নিজেকে প্রাজ্ঞ মনে করিতেছে (গম্ভীর স্বর হওয়ায়), যেখানে সূচিরও সঞ্চরণ হইতে পারে না এমন অন্ধকার, যখন বৃষ্টিবিন্দু পতিত হইতেছে, তখন সৌদামিনীর খেলার মতন মনোহর খেলা অবিনীতাদের যেন দূর হইতে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে" (২।৬৬।২)। অমরু লিখিতেছেন—"মন দৌড়াইতেছে, শরীর নহে; অধরের রাগ বারিধারায় ধৌত হইতেছে, কিন্তু হৃদয়ের নহে; প্রণয়ীর কাছে গমনশীলার গতি স্খলিত হইতেছে" (২।৬৬।৩)। ধরণীধর বলিতেছেন—"অভিসারে নির্গতা মুগ্ধা পথের পঙ্কে পড়িতে পড়িতে যেন প্রাণেশকে ধরিতে যাইয়া অবলম্বনের জন্য জলধারার দিকে হাত বাড়াইতেছে" (২।৬৬।৪)। চন্দ্রজ্যোতিষ অভিসারিকার ধাত্রীস্থানীয়া নারীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"আমার হাতের মধ্যে তোমার ডান হাত রাখ; কাঞ্চীতে বাঁ হাত রাখ। উদ্গত পঙ্কযুক্ত পথে পায়ের আগা কুঞ্চিত কর (পা টিপিয়া চল)। হে পুত্রি, ভয় পাইও না। পিণ্ডের মতন (জমাট) অন্ধকারকে যখন বিদ্যুৎলতা অবলেহন করিতেছে, তখন চোখ খুলিয়া কয়েক মূহূর্ত্তের মধ্যে পথ দেখিয়া লও।" বৈষ্ণব কবিরা মেঘ, বিদ্যুৎ, কর্দ্দম প্রভৃতি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সর্প, পিশাচ, গভীর নদী পার হওয়ার দুঃখ প্রভৃতি অপরূপ শব্দঝঙ্কারের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সঙ্কলনে প্রদত্ত গোবিন্দদাসের বর্ষাভিসারের

পদগুলি ভাবে ও ভাষায় অনবদ্য, যদিও তাহার মধ্যে কয়েকটি সংস্কৃত কবিতার ও বিদ্যাপতির পদের ভাব লইয়া লিখিত।

বৈষ্ণব কবিদের বহুপূর্ব্বেই বাসকসজ্জা সম্বন্ধে শ্লোকাদি রচনার রীতি প্রচলিত ছিল। সদুক্তিকর্ণামৃতে বাসকসজ্জা পর্য্যায়ে জয়দেব ছাড়া অমরু, আচার্য্য গোপীক, রুদ্রট ও প্রবরসেনের শ্লোক ধৃত হইয়াছে। অমরু লিখিয়াছেন: "হে মুগ্ধে! আজ তুমি অলসভাবে চালিত, প্রেমের জন্য আর্দ্র, লজ্জায় চঞ্চল, নিমেষ ফেলিতে পরাঙ্মুখ, হৃদয়ে নিহিত অভিলাষ যেন গমন করিতেছে এমন দৃষ্টির দ্বারা কোন সুকৃতিকে দেখিতেছ?" (২।৩৭।৩)। আচার্য্য গোপীকের শ্লোক—সে তৈয়ারী করা বিছানা আবার পাতিতেছে, সজ্জিত-দেহকে আবার মণ্ডিত করিতেছে, রাত্রি পার হওয়ায় নিজের ক্ষতি মনে করিতেছে, বহুক্ষণ ধরিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতেছে, সেই মদন-ক্লান্তা বেচারী নায়িকা লীলাগৃহে কি না করিতেছে? (২।৩৭।১)। রুদ্রটের শ্লোক—আয়নায় নিজের মুখ, মনোহর অলঙ্কৃতি এবং প্রদীপের শিখায় যে রতিগৃহকে সোনালি রংয়ের মনে হইতেছে, তাহা দেখিয়া ভয়ভীতা হরিণীর ন্যায় চক্ষুশালিনী আজ 'বহুকাল পরে আমাদের দুইজনের এরূপ মিলন হইবে' এই ভাবিয়া আনন্দযুক্তা হইয়া কান্তকে দেখিবার ইচ্ছায় দুয়ারের দিকে অত্যন্ত মনোহর দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছে (১।৩৭।২)। প্রবরসেন বলিতেছেন—অরতি আসিতেছে, কিন্তু নিদ্রা আসিতেছে না; মন তার গুণসমূহের গণনা করিতেছে, দোষের নয়; রাত্রি বিরত হইতেছে, মিলনের আশা নহে; শরীর কৃশতা প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু অনুরাগ নহে (২।৩৭।৫)।

রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের আসার আশায় রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ সকালে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে রতিচিহ্নাদি ধারণ করিয়া রাধার কুঞ্জে আসিলেন, শ্রীরাধাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে তিনি অন্যত্র বিলাস করেন নাই, শ্রীরাধা সরস ভঙ্গীতে বুঝাইয়া দিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ সত্যকে গোপন করিতেছেন ইত্যাদি লীলাকে খণ্ডিতা বলে। বৈষ্ণবেরা খণ্ডিতা সম্বন্ধে কোন পদ লেখার বহু পূর্ব্বে প্রাকৃত নায়ক নায়িকা লইয়া খণ্ডিতা সম্বন্ধে যে শ্লোকাদি রচিত হইত তাহার প্রমাণ শ্রীধরদাস তাঁহার সংগ্রহে রাখিয়া গিয়াছেন। শৃঙ্গারপ্রবাহবীচির খণ্ডিতা প্রকরণে (২।২৩) ধর্ম্ম-

যোগেশ্বরের শ্লোক—হে শঠ! তোমার এই সকল কথা বলার কি দরকার? নিকটবর্ত্তী আমগাছে কোকিলের আলাপ শুনিতে শুনিতে নির্লজ্জা আমি রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছি। হে পাংশুলাদের উচ্ছিষ্ট! ভোরবেলা আর তোমাকে আমি হাত দিয়া ছুঁইব না। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে নায়িকার সখী নায়ককে বলিতেছেন—এখন পাদপতনরূপ বিড়ম্বনার প্রয়োজন নাই। কোন সখী নায়কের হইয়া নায়িকাকে বলিতে আসিলে আচার্য্য গোপীক লিখিয়াছেন—প্রিয় পায়ের তলায় পড়িয়াছেন, পড়ুন না? তাঁর চোখমুখ ছলছল করিতেছে, করুক না? তুমি এখন তাঁহার হইয়া কথা বলিতে আসিয়াছ! কিন্তু আমি যখন একাকিনী নদীতীরে কুঞ্জে জাগিয়াছিলাম, তখন সেই ঘনতমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে তো কোন সখী আমার কাছে আসে নাই (২৩।৩)। বাসুদেব নামক কবি নায়কের মুখ দিয়া বলাইতেছেন যে, কোপ করা বৃথা, নায়কও নায়িকার জন্য রাত্রি জাগিয়াছিলেন—"অশ্রু তোমার চক্ষুকে আচ্ছন্ন করেছে কেন? তোমার ঠোঁটই বা কাঁপছে কেন? তোমার গাল কোপে কষায়বর্ণ হয়েছে কেন? অয়ি অসরলে, আমার রাত্রি-জাগরণের ক্লেশসমূহের একমাত্র সাক্ষী সেই মুবলানদীর তীরে অবস্থিত বেতসকুঞ্জ" (২৩।৪)। অমরুও একটি শ্লোকে নায়কের মাথায় নায়িকার বাম পা রাখার কথা বলিয়াছেন (২৩।৫)। সুতরাং জয়দেবের 'দেহি পদপল্লবমুদারং' ভাবটি সেকালের নায়কদের সাধারণ প্রার্থনা ছিল।

এইরূপ কলহান্তরিতা সম্বন্ধে শ্লোকগুলির সংগ্রহ হইতেও বুঝা যায় যে বৈষ্ণব কবিরা সদুক্তিকর্ণামৃত অথবা তাহারও পূর্ব্বকালের রীতি অনুসরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীধরদাসের শৃঙ্গারপ্রবাহ-বীচির ৪০ সংখ্যক বীচির পাঁচটি শ্লোকের ভাবার্থ হইতে ইহা প্রমাণিত হইবে। (১) অমরু:—সখিজনের কথা যে কানে তুলিলাম না, বন্ধুজনকে যে আদর করিলাম না, প্রিয়তম পায়ে পড়িয়াও যে কর্ণোৎপলের দ্বারা আহত হইলেন, সেইজন্য চাঁদ আগুনের মতন, চন্দনের প্রলেপ স্ফুলিঙ্গের মতন, রাত্রি কল্পশতের মতন ও মৃণাললতার হারও ভারস্বরূপ মনে হইতেছে। এই উপমাগুলি জয়দেব, বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক বৈষ্ণব কবিই ব্যবহার করিয়াছেন। (২) বিম্বোক নামক কবি—

নায়ক ঘুমের ঘোরে অন্য প্রিয়ার নাম করিলে (ইহাকে গোত্রস্খলন বলে) আমি যেন রাগ করিয়াছিলাম, দয়িত যখন চলিয়া যাইতেছেন তখন তাঁহাকে আটকাইলাম না, কিন্তু আমার অভিপ্রায় যাঁহারা জানেন, পরিণতির পরামর্শ দিতে যাঁহারা নিপুণ সেই সখীরাও কি চিত্রে লিখিতের মতন হইয়াছিল? (তাহারা ছবির মতন দাঁড়াইয়া থাকিল, তাহাকে আটকাইল না কেন?) (৩) গঙ্গাধরের শ্লোক:—প্রিয়তম যখন পায়ের তলায় লুটাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে অনাদর করিয়া ভবন হইতে দ্রুত বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম, কিছুই বিবেচনা করি নাই। কিন্তু হে স্তন ও নিতম্বের ভার তোমরা দুইজনেই নিতান্ত গুরু, তোমরা কেন এক মুহূর্ত্তের জন্য বিলম্ব করাইতে পার নাই? (৪) রুদ্রটের শ্লোক:—পদতলে প্রণত প্রিয়কে যে কর্কশবাক্যে দূর করিয়াছ, সখীর কথা যে শুন নাই; মূর্খতা বশতঃ ক্রোধকেই যে একমাত্র অবলম্বন করিয়াছিলে, সেই পাপের ফল এখন পাইতেছ—চন্দন, চন্দ্রকিরণ, শীতলজল ও বাতাস, পদ্ম, মৃণাল এইসব দ্বারা এখন তোমার শরীর বারম্বার দগ্ধ হইতেছে। (৫) অমরুর শ্লোক:—বিরহের সময়ে অঙ্গসকলকে পুড়াইয়া দেয়, মিলনকালে ঈর্ষ্যা উৎপাদন করে, দেখা হইলে হৃদয়কে হরণ করে, স্পর্শ করিলে দেহকে অবশ করিয়া দেয়, মিলিত হইলে মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ পাওয়া যায় না, আবার চলিয়া গেলেও পাওয়া যায় না—ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য যে তবুও তিনি আমার প্রিয়।

এইরূপ মান, বিরহ প্রভৃতি বিষয়ের শ্লোকাবলীর ভাবার্থ দিয়াও দেখানো যায় যে দ্বাদশ শতাব্দীতে বা তাহার পূর্ব্বে নায়ক-নায়িকার প্রেমের বিভিন্ন স্তর লইয়া কবিতা রচনার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব কবিরা লৌকিক প্রেমের স্থলে রাধাকৃষ্ণের আলৌকিক প্রেম লইয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যাংশে তাঁহাদের রচনা অনেক স্থলে সংস্কৃত শ্লোকাদির অপেক্ষা মধুরতর হইয়াছে, কেননা তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভিতর সেই প্রেমোন্মাদনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্ঞানেশ্বর, তাঁহার ভগিনী মুক্তাবাঈ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নামদেব মহারাষ্ট্র দেশকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির এক নূতন

প্রবাহে প্লাবিত করেন। জ্ঞানেশ্বর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গীতাভাষ্য জ্ঞানেশ্বরী ১২৯০ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। নামদেবের তারিখ ১২৭০ হইতে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু তাঁহার ভাষার সহিত জ্ঞানেশ্বরের ভাষার পার্থক্য দেখিয়া আর. জি. ভাণ্ডারকর অনুমান করেন যে তিনি জ্ঞানেশ্বরের একশত বৎসর পরবর্ত্তী হইবেন।

জ্ঞানেশ্বর তাঁহার 'হরিবোল' নামক অভঙ্গে বলিয়াছেন—"ভগবানের দরজায় এক মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়াও, তাহাতেই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিবে। বল 'হরি', বল উচ্চৈঃস্বরে, নামের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হউক, তুমি এমন পুণ্য লাভ করিবে যাহা গণনা করা যায় না। সংসারে থাকিতে চাও থাক, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে নাম কর, সেকালের সাধুদের মতন তুমিও সাধু হইবে। শুন জ্ঞানদেব, ব্যাস বলিয়াছেন কি ভাবে সেকালে ভগবান পাণ্ডবগৃহে আগমন করিলেন। (Psalms of Maratha Saints V)

পুনরায় 'নাম' শীর্ষক প্রার্থনায় বলিতেছেন—সন্তদের বাসস্থানে তোমার মনের গতি হউক ; সেখানে প্রভু তোমার প্রার্থনায় না বলিতে পারিবেন না। বল "রাম কৃষ্ণ"—এই তো জীবনের লক্ষ্যে পৌছানোর পথ। রামকে ভজনা কর, তিনিই শিবের আত্মা। যে তাঁর নামে ঐক্য পায়, তাকে দ্বৈতভাবের বন্ধন বাঁধিতে পারে না। যোগিগণের সকল সিদ্ধি, সকল আলো পাওয়া যায় এই মধুর-মতন মিষ্ট নামে। শিশু প্রহ্লাদের জিহ্বায় এই নাম বাস করিত। উদ্ধবের ডাকে কৃষ্ণ বর লইয়া আসিতেন। এই নাম উচ্চারণ করা কি সহজ নহে? তবুও যাঁহারা নাম লন তাঁদের সংখ্যা কত কম। (Psalm ৬)

নামদেব 'দেহ যাবো অথবা রাহো' শীর্ষক অভঙ্গে গাহিয়াছেন—দেহ যাউক অথবা রহুক, হে পাণ্ডুরং তোমাতেই আমার বিশ্বাস। প্রভু! তোমার চরণ আমি কখন ছাড়িব না—এই শপথ তোমার কাছে আমি করছি। তোমার পূত নাম আমার ওষ্ঠে, আর তোমার প্রেম আমার হৃদয়ে চিরদিন রহিবে। কেশব! এই তোমার নামে আমি ব্রত নিলাম, তুমি ইহা পালন করিতে সাহায্য কর প্রভু। (Psalm ১৪) উক্ত পাণ্ডুরং পাণ্ঢারপুরের বিগ্রহ বিঠোবা।

শ্রীচৈতন্যের 'মম জন্মনিজন্মনীশ্বরির ভবতাডক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি' প্রার্থনার বহুপূর্ব্বে নামদেব তাঁহার 'হেচি দেবা পায় মাগত' শীর্ষক অভঙ্গে বলিয়াছেন—

তোমার পায়ে আমার এই এক প্রার্থনা—
তোমার পদসেবা যেন আমি চিরকাল করি।
আমি যেন পাণ্ঢারিতেই থাকি
তোমারই সাধু সন্তদের পাশে।
উচ্চ বা নীচ যোনিতে আমার জন্ম হউক
আমি যেন, হরি, তোমারই ভজন করি।
হে কমলাপতি, 'নাম' প্রার্থনা করে
যেন সে সারাজীবন তোমার নাম করিতে পারে।

(Psalm ১৫)

নামদেব 'সর্বাভূতি পাহে এক বাসুদেব' শীর্ষক অভঙ্গে বলিয়াছেন—

অহংবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে যিনি বাসুদেবের সব কিছু দেখিতে পান, তাঁকেই তুমি সাধু বলে জেনো; আর সবাই বদ্ধ জীব। তাঁর চোখে টাকা পয়সা ধূলি ছাড়া কিছু নয়; রত্নরাজী পাথর ছাড়া কিছু নয়; তাঁর অন্তর থেকে কামক্রোধ দূরে গিয়েছে; ক্ষমা আর শান্তি সেখানে বাস করে। আমি নাম, যা বল্‌ছি শোন, তিনিই সাধু যিনি গোবিন্দের নাম ছাড়া এক ক্ষণও থাকেন না—দিনরাত নাম গ্রহণ করেন (Psalm ২১)।

এইসব প্রার্থনা কীর্ত্তন আজও মহারাষ্ট্রদেশে বিশেষ করিয়া পাণ্ঢারপুরে গীত হয়। এই লেখক শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শোলাপুর জেলার ভীমানদীর তীরস্থ এই পবিত্রতীর্থ দর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছিল যে মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির নীচে নামদেবের মূর্ত্তি। তিনি নিজের মূর্ত্তি স্থাপন করিতে বলিয়াছিলেন এমন জায়গায় যেখানে মন্দিরে দর্শনপ্রার্থীদের চরণধূলা তাঁহার মাথায় পড়ে। জ্ঞানেশ্বরের জন্মস্থান, পুণা হইতে ১২।১৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত আলন্দী নামক পবিত্রতীর্থ দর্শন করার সৌভাগ্যও এই লেখকের হইয়াছিল। সেখানে আজ ৭৭০ বছর ধরিয়া অখণ্ড বীণাবাদনসহ নামকীর্ত্তন হইতেছে—দিনরাত্রের মধ্যে সে কীর্ত্তনের বিরতি কখনও হয়

না। মহারাষ্ট্রের কীর্ত্তনধারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে মহাপ্রভু কোলাপুরে লক্ষ্মী, ক্ষীর ভগবতী, লাঙ্গগণেশ দেখিয়া

তথা হইতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ॥
প্রেমাবশে কৈল বহু নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
প্রভুর প্রেম দেখি সবার চমৎকার মন॥ (মধ্য ৯)

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙ্গালী সাধু সন্ন্যাসী কেবলমাত্র পাণ্ঢারপুরে দর্শন করিতে যাইতেন তাহা নহে, সেখানে বসবাসও করিতেন, তাহার প্রমাণও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ হইতে জানা যায়। পাণ্ঢারপুরে শ্রীচৈতন্যের পরমগুরু, ঈশ্বরপুরীর গুরু, মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী বাস করিতেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া শ্রীচৈতন্য শুনিলেন যে শ্রীরঙ্গপুরী একবার নবদ্বীপে যাইয়া জগন্নাথমিশ্রের বাড়ীতে মোচার ঘণ্ট খাইয়া আসিয়াছিলেন। আরও শুনিলেন যে শ্রীচৈতন্যের বড় ভাই বিশ্বরূপ শঙ্করারণ্য নাম লইয়া সন্ন্যাসী হইয়া এই পাণ্ঢারপুরে আসিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানেশ্বরের প্রায় সমকালে গুজরাটে জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদ কীর্ত্তন করা হইত। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় ১২৯২ খৃষ্টাব্দে লিখিত বঘেলা সারঙ্গদেবের (১২৭৪-১২৯৫) পলেনপুরে অবস্থিত কর্ম্মচারী মহন্তপেথাডের এক তাম্রলিপি হইতে। গীতগোবিন্দের এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই লিপি আরম্ভ করা হইয়াছে।

গুজরাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তকবি হইতেছেন নরসিংহ মেহতা। ইনি ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়া ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিরোধান করেন (আই. এস্. দেশাই সঙ্কলিত নরসিংহ মেহতাকৃত কাব্যসংগ্রহ, ভূমিকা, পৃ. ২৪-৪৪ ও Dr. Thoothi কৃত The Vaisnavas of Gujarat)। শ্রীযুক্ত কে. এম. মুন্সি তাঁহার Gujarata and its Literature গ্রন্থে মতপ্রকাশ করেন যে নরসিংহ মেহতা আনুমানিক ১৫০০ হইতে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার

প্রধান যুক্তি এই যে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার কোন রচনার অনুলিপি পাওয়া যায় না ; ১৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠ্ঠল নাথজীর পৌত্রের এক রচনায় তাঁহার নাম পাওয়া যায় ; অথচ সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। গুজরাটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি দয়ারাম (১৭৬৭-১৮৫২) বল্লভাচার্য্যের সম্প্রদায়ের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তিনি নরসিংহ মেহতাকে বল্লভাচার্য্যের অগ্রদূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুন্সীর প্রদত্ত তারিখ ঠিক হইলে নরসিংহ বল্লভাচার্য্যের (১৪৭৯—১৫৩২) অপেক্ষা বয়সে প্রায় ২১ বছরের কম হইতেন। গুজরাটের অধিকাংশ সাহিত্যসেবীই শ্রীযুক্ত মুন্সীর প্রদত্ত তারিখ স্বীকার করেন নাই (১)। নরসিংহ মেহতা জুনাগড়ের নিকটস্থ তলজ নামক গ্রামে নাগর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে বিবাহ করেন ও তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তিনি গোপীভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন।

নরসিংহ মেহতা রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ে ৭৪০টি পদ রচনা করিয়া 'শৃঙ্গারমালা' নামক গ্রন্থে নিবদ্ধ করেন। একটি পদে তিনি লিখিয়াছেন যে ভগবান্ শঙ্করদেবের সহিত দ্বারকায় যাইয়া তিনি হাতে মশাল ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের নৃত্যলীলা দর্শন করিতে করিতে এতই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে হাত যে মশালের আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যে পুরুষ তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন—গোপীদের একজন হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্যে বাদ্য বাজাইয়াছিলেন। তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া গাহিয়াছেন "এই নৃত্যের যে আনন্দ তাহা শিব জানেন, আর শুকদেব জানেন, ব্রজের গোপীরা জানেন, আর নরসিংহ জানে"। আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

১। বরোদা Oriental Instituteএর ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত বি.জে. সন্দেসারা আমাকে লিখিয়াছেন (পত্রসংখ্যা ২৭৪২ তারিখ ১৬।৬।৫৯) : "Regarding the date of Narasinha Mehta I would like to inform you that the date suggested by Shri K. M. Munshi was never fully acceptable to scholars in Gujarat. The general trend was always for accepting the traditional date (1414-1481 A. D.).

"আমার বর ঐ কৃষ্ণ, তাঁহাকেই আমি বিবাহ করিয়াছি, তাঁহাকেই বিবাহ করিয়াছি, আমি আর কাউকে জানি না। এই কথা আমি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিব—ইহাতে আমার কোন ভয় নাই।" শৃঙ্গারমালার এক পদে আছে—

"ভালবাসার শপথ লইয়া আমি গোপীজনবল্লভের হাত ধরিয়াছি; আমি আর কাহাকেও চাহি না।...আমার পুরুষত্ব বিলুপ্ত হইল, আমি কুমারীর মতন গান করিতে লাগিলাম। আমার দেহের রূপান্তর ঘটিল, আমি গোপীদের একজন হইলাম। আমি সখীভাবে মিষ্টকথায় কুপিতার (রাধার) ক্রোধ শান্ত করিলাম। তখন আমি এই ভাবের রস বুঝিলাম, আর অপূর্ব্ব অনুভূতি লাভ করিলাম। ইহার পর হইতে রাধার সহিত বসিয়া যিনি গান গাহিয়াছিলেন তিনি আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিলেন।"

মুন্সীজী মনে করেন যে শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসিয়া নরসিংহ মেহতা হয় তো এরূপ গোপীভাব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাসনায় অথবা শ্রীরূপ গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতির রচনায় কোথাও সাধক বা উপাসকের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বা সম্ভোগের কোন ইঙ্গিত নাই। নরসিংহ মেহতা নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করেন—

কণ্ঠে বিলাগী কন্থেজীনে, অধর অমৃতরস পীধোরে। আমি কানাইয়ের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিলাম আর তাঁহার অধরামৃত পান করিলাম। মীরাবাঈও গিরিধর নাগরের সঙ্গে প্রেমের কথা গাহিয়াছেন। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে (৫২ অধ্যায় বঙ্গবাসী ও আনন্দাশ্রম সংস্কারণের ৮৩ অধ্যায়) বর্ণিত গোপী-ভাবের উপাসনার প্রভাবে ইঁহারা এইরূপ পদ রচনা করিয়াছেন।

নরসিংহ মেহতার পদে পূর্ব্বরাগ, আক্ষেপ, বিরহ প্রভৃতির অতি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

কেম জাউ জল জমুনাং ভরবা
বাঁঘল ডীএ বেঁধানীরে;
কামনগারো নেণ নচারে
লটকে হুঁ লোভাণী রে।

কেমন করিয়া যমুনায় জল ভরিতে যাইব? বাঁশী আমাকে অন্তরে বিঁধিয়াছে; লোভানীয়ার (tempter) চোখ নাচিতেছে, আমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি।

বাঁসলডী বাই মারে বহালে
মন্দির মাং ন রহে বায় রে;
ব্যাকুল থইলে বহালানে,
জোবা শুং করুং উপায় রে।

আমার দয়িত বাঁশী বাজাইয়াছে; আমি আর ঘরে রহিতে পারিতেছি না; এত ব্যাকুল হইয়াছি আমি। তাহাকে একবার দেখিবার কি উপায় করি?

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শ্রীরাধার মতন নরসিংহ মেহতা গাহিয়াছেন—

সাচুঁ বোলো শামলিয়া বহালা
কহোনে ক্যাঁ গয়া তারে
হমণং হেত উতাঁর্য্যু হরজী
পেলী নবল নারত্তং মর্ণ মোঝুঁরে
তমো বিনা অমে তলসি ভরিয়ে
তোল তমারুঁ জোয়ুঁরে।

ওগো প্রিয় শ্যামলিয়, সত্য করিয়া বল তো কোথায় গিয়াছিলে? আমাকে আজকাল ভুলিয়া গিয়াছ; নূতন নাগরী তে মন গিয়াছে তোমার; আমি তোমার বিরহে মরি। তোমাকে আমি ওজন করিয়া দেখিয়াছি।

মারো নাথ ন বোলে বোল
অবোলা মরিয়ে রে।

আমার নাথ আমার সাথে কথা বলে না; তাহার কথা না শুনিয়া আমার প্রাণ বাঁচে না।

নরসিংহ মেহতা কৃষ্ণজন্ম, বাললীলা, শৃঙ্গারমালা, নাগদমন, দানলীলা, মানলীলা, রাসসহস্রপদী, গোবিন্দগমন (মাথুর), সুদামাচরিত্র এবং সুরতসংগ্রাম নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষায় অথবা সংস্কৃতে প্রচলিত না থাকিলে তাঁহার পক্ষে দানলীলার কাহিনী লইয়া পদ রচনা করা সম্ভব হইত না।

নরসিংহ মেহতার 'সুরতসংগ্রামে'র কাহিনীও শ্রীকৃষ্ণের চুঙ্গীতে শুল্ক আদায় বা দানগ্রহণের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। বসন্তকালের এক সকালবেলায় শ্রীরাধা তাঁহার দশজন সখীর সঙ্গে দধি বিক্রয় করিতে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার দশজন সখার সঙ্গে দধির উপর শুল্ক আদায় করিতে বাহির হইলেন। কৃষ্ণ রাধাকে গালি দিলে, রাধা রাগিয়া একেবারে রুদ্রের মতন প্রচণ্ডা হইলেন এবং কৃষ্ণকে ধরিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণও গোপীদিগকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ সবে আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় সেখানে নন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নন্দকে দেখিয়া সকলে ভালমানুষ সাজিয়া বসিলেন। তিনি চলিয়া গেলে উভয় পক্ষে স্থির করিলেন যে আগামী পূর্ণিমার রাত্রে যুদ্ধ চালানো হইবে। রাধাই বলিলেন, যে হারিবে সে জেতার দাসত্ব করিবে। পূর্ণিমা আসিলে রাধা তাঁহার সখীদের লইয়া নিজ নিজ গৃহ হইতে বাহির হইলেন। নরসিংহও তাঁহাদের দলে ছিলেন। রাধা তাঁহাকে দূত করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, বিপক্ষদল যেন বিনা সংগ্রামেই আত্মসমর্পণ করেন। কৃষ্ণ এ সর্ত্তে রাজী হইলেন না, কিন্তু তাঁর কোন কোন বন্ধুরা নরসিংহকে চোর ভাবিয়া মারিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। এদিকে গোপেরা জয়দেবকে দূত করিয়া রাধাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, গোপীরা যেন আত্মসমর্পণ করে। রাধা বলিলেন, "সে কি কথা? আমরা আদ্যা প্রকৃতি, নর, দেবতা, অসুর সকলের মা। মাটি না থাকিলে বীজ কি অঙ্কুরিত হইতে পারে?" সুতরাং যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এ যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র অন্য রকমের—অর্থাৎ চুম্বন, কটাক্ষক্ষেপ, আলিঙ্গন প্রভৃতি। নরসিংহও যুদ্ধে মাতিয়া উঠিলেন। প্রথমে গোপীরা গোপদিগকে প্রায় হারাইয়া দিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করায় তাঁহারা আবার বলশালী হইলেন। রাধাকেও কৃষ্ণ হারাইয়া দিলেন, কিন্তু একটু পরেই রাধা কৃষ্ণকে হারাইলেন। রাধা সখীদের সঙ্গে মিলিয়া গোপদিগকে আক্রমণ করিলেন। কেহ কেহ মাটিতে পড়িয়া গেলেন। কৃষ্ণের মূর্চ্ছা হইল; তাঁহার সখারা তাঁহাকে সংগ্রামস্থল হইতে উঠাইয়া লইয়া গেল। বিজয়োন্মত্তা গোপীগণ গোপদিগকে ব্রজের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত অনুসরণ করিল। রাধা ব্রজভূমি জয় করিয়া লইলেন।

সপ্তম অধ্যায়

বিদ্যাপতি

নরসিংহ মেহতা মৈথিল বিদ্যাপতি অপেক্ষা বয়সে ২০।২৫ বৎসরের ছোট ছিলেন। বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতকের শেষের দিকে, আনুমানিক ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মের ১০৬ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার পদ আস্বাদন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য যখন শান্তিপুরে গমন করেন, তখন অদ্বৈত আচার্য্য—

> "কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
> চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥"
> এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।
> আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥ (মধ্য।৩)

উল্লিখিত দুইটি চরণ পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুতে ধৃত বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত পদে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতিকে বাংলার বৈষ্ণবগণ মহাজনরূপে সম্মান করেন। কিন্তু ষোড়শ শতকের পদাবলীর ভাবের সঙ্গে বিদ্যাপতির ভাবের কতকগুলি মূলগত পার্থক্য আছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আকুল হইয়া—

> নব অনুরাগ-ভাবে ভেল ভোর।
> অনুখন কঞ্জ-নয়নে বহে লোর॥
> পুলকে পূরিত তনু গদগদ বোল।
> ক্ষেণে থির করি চিত ক্ষেণে অতি লোল॥
>
> (পরমানন্দ গুপ্তের পদ, পদকল্পতরু, ২৫২৮)

বিদ্যাপতি নায়িকার এই নব অনুরাগের বিষয়ে খুব অল্প কবিতাই লিখিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের আলঙ্কারিক রীতি অনুসরণ করিয়া। যথা—

> অবনত আনন কএ হম রহলিহু
> বারল লোচন চোর।

পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর॥
ততহুঁ সঞে হঠে মোঞে আনল
ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাখি॥ (৩৪)

ইহা অমরুর নিম্নলিখিত শ্লোকের প্রায় ভাবানুবাদ—

তদ্বক্ত্রাভিমুখং বিনমিতং দৃষ্টিঃ কৃতা পাদয়োঃ
তস্যালাপকুতূহলাকুলতরে শ্রোত্রে নিরুদ্ধে ময়া।
পণিভ্যাঞ্চ তিরস্কৃতঃ সপুলকঃ স্বেদোদ্গমো গণ্ডয়োঃ
সখ্যঃ কিং করবাণি যান্তি শতধা যৎকঞ্চুকে সন্ধয়ঃ॥

এখানে উপমাবাহুল্যে অনুরাগিণীর সহজ-মধুর ভাবটি যেন চাপা পড়িয়াছে। তাই পাঠকের মনে উহা অনুরাগের ছোপ লাগাইতে পারে না। ইহার সহিত বর্ত্তমান সঙ্কলনে প্রদত্ত বসু রামানন্দ (৪১ সংখ্যক পদ), বলরামদাস (৪৫), জ্ঞানদাস (৪২, ৪৩, ৪৯) প্রভৃতির পদ মিলাইয়া পড়িলেই বুঝা যাইবে যে, শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রেমানুভূতি সাহিত্যে কিরূপ নূতন ভাবের জোয়ার আনিয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর কবিতায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া শ্রীরাধার রূপানুরাগ একটি প্রধান বিষয়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া শ্রীরাধার মনে অনুরাগের সঞ্চার হইবে; তাঁহার অন্তরলোকে দয়িতের যে মধুর মূরতি ফুটিয়া উঠিবে, তাহাই পাঠকের চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া 'পরানুরক্তি ঈশ্বরে' জাগাইবে, ইহাই উজ্জ্বলরসের সাহিত্যের প্রস্থানভূমি। কিন্তু বিদ্যাপতির প্রথম বয়সের কোন পদে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা নাই। পরিণত বয়সের লেখা পদেও প্রচলিত প্রথানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত কমল, চন্দ্র, তমাল, বিদ্যুৎ, নবপল্লব, বিম্বফল, খঞ্জন, সর্প প্রভৃতির উপমা দিয়াছেন (৬৩০)। রসসৃষ্টি অপেক্ষা প্রহেলিকার দিকে যেন কবির ঝোঁক বেশী। অপর একটি পদেও (৬২৯) অলঙ্কারের ছড়াছড়ি—

সামর ঝামর কুটিলহি কেস।

কাজরে সাজল মদন সুবেস ॥
জাতকি কেতকি কুসুম সুবাস।
ফুলসর মনমথ তেজল তরাস ॥

ইহার সহিত জ্ঞানদাসের "কি মোহন নন্দকিশোর" (৩৫), অথবা গোবিন্দ আচার্য্যের "চিকণ কালা, গলায় মালা, বাজন-নূপুর পায়" (২৯) তুলনা করিলে ষোড়শ শতকের রূপ ও রূপানুরাগের উৎকর্ষ বুঝা যাইবে। বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের রূপ বা শ্রীরাধার রূপানুরাগের পদ লইয়া বেশী কিছু না লিখিলেও শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা লইয়া বহু পদ লিখিয়াছেন। অনেক স্থলেই তিনি নিছক কামভাবের উদ্দীপক পদ লিখিয়াছেন। নায়িকার স্নানের সময়ে সিক্ত বসনের দৈহিক সৌন্দর্য্য (২২৮, ২২৯, ৬২৫, ৬২৬) অথবা বাতাসে কাপড় চোপড় বিস্রস্ত হওয়ার চিত্রের (অম্বর বিঘটু অকামিক কামিনী (৩৯), সপন-পরস খসু অম্বর রে (৫), অনুরূপ পদ শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী যুগে খুব কম লেখা হইয়াছে।

মুরারি গুপ্ত (৬৮), নরহরি সরকার (৬৬), বাসুঘোষ (৬৭), জ্ঞানদাস (৬৯), বংশীবদন (৭০) প্রভৃতি ষোড়শ শতকের বহু কবি অনেকগুলি আক্ষেপানুরাগের অতি সুন্দর পদ লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ পদগুলির প্রতি ছত্রে প্রেমের গভীর অনুভূতির সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। বিদ্যাপতিতে আক্ষেপ অনুরাগের চারিটি মাত্র মর্ম্মস্পর্শী পদ দেখা যায়। তন্মধ্যে একটিকে বৈষ্ণব কবিদের মুরলীর প্রতি আক্ষেপের অগ্রদূতরূপে গ্রহণ করা যায়। পদটি এই—

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁসি-নিসাস-গরলে তনু ভোর ॥
হঠসঁয় পইসএ স্রবনক মাঝ।
তহি খন বিগলিত তনু মন লাজ ॥
বিপুল পুলক পরিপূরএ দেহ।
নয়নে না হেরি, হেরএ জনু কেহ ॥
গুরুজন সমুখহি ভাবতরঙ্গ।
যতনহি বসন ঝাঁপি সব অঙ্গ ॥

লহু লহু চরণ চলিএ গৃহমাঝ।
দইব সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবস খসএ নিবিবন্ধ।
কী কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ॥ (৬৩৩)

রাধিকা কুলের বধূ; তিনি কানাইয়ের বেণুর আহ্বান শুনিতে চাহেন না; তিনি জানেন যে, শুনিলেই তাহার ডাকে সাড়া দিতে হইবে; কিন্তু শুনিতে না চাহিলে কি হইবে? ঐ মুরলীর রব যে চণ্ডীদাসের ভাষায় "দুপুর্যা ডাকাতি" (পদকল্পতরু, ৮২৭); সে জোর করিয়া কাণের ভিতর প্রবেশ করিল। যদি বাঁশীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বঁধুয়াকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে 'অমিয় সাগরে সিনান' হইত, কিন্তু বঁধুর কাছে ছুটিয়া যাইবার উপায় নাই; তাই বিচ্ছেদের গরলে যেন সমস্ত তনু আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিন্তু বঁধু আমাকে ভালবাসে, আমাকে পাইবার জন্য তাহার মন আকুল হইয়াছে, এই কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে তনু-মন-লজ্জা সব বিগলিত হইল; স্থূল কঠিন যাহা কিছু ছিল, সব যেন তরলীকৃত হইল; বিপুল পুলকে দেহ ভরিয়া গেল। চক্ষুর সম্মুখ হইতে ঘর, সংসার, পুরজন, গুরুজন, সব যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল—'নয়নে না হেরি'। কিন্তু পরক্ষণেই জ্ঞান হইল—সামনে যে গুরুজন আছেন, তাঁহাদের সমক্ষে এ ভাবতরঙ্গ প্রকাশ পাইলে বঁধুয়ার সহিত মিলিত হইবার সকল আশাই বিদূরিত হইবে; তাই রাধা কোন রকমে বসন দিয়া পুলকরোমাঞ্চিত দেহ আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মুখর কবি বিদ্যাপতির যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল। এই পদের ভাবকে অবশ্য মৌলিক বলা যাইতে পারে না। ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে (১০৯৫) দেখা যায়—

গোপয়ন্তী বিরহজনিতং দুঃখমগ্রে গুরূণাং
কিং ত্বং মুগ্ধে নয়নবিসৃতং বাষ্পপূরং রুণৎসি।

অর্থাৎ গুরুজনের অগ্রে বিরহজনিত দুঃখ সকল গোপন করিতে করিতে হে মুগ্ধে, কেন তুমি নয়নবিগলিত বাষ্পপ্রবাহ রোধ করিতেছ?

অন্য একটি পদে (২৩৮) রাধিকা বলিতেছেন—

সামর সুন্দর এঁ বাট আএল
তাঁ মোরি লাগলি আঁখি।
আরতি আঁচর সাজি ন ভেলে
সব সখীজন সাখি॥

নব অনুরাগ ও লোকলজ্জার মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে ; লজ্জা মুহূর্ত্তের তরেও জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল ; তাই শ্রীরাধা 'কঠিন হিরদয় ভেদি ন ভেলে' বলিয়া অনুশোচনা করিলেও পরক্ষণেই বলিতেছেন—

সুরপতি-পাএ লোচন মাগওঁ
গরুড় মাগওঁ পাঁখী।
নন্দেরি নন্দন মৈঁ দেখি আবওঁ
মন মনোরথ রাখী॥

লজ্জাহীনা হইয়া শ্যামল সুন্দরকে দেখিয়াছিলাম, এই তো আমার লজ্জা ; কিন্তু দুই নয়নে দেখিয়া তো তৃপ্তি হইল না। সুরপতি ইন্দ্রের সহস্র নয়ন ; তাঁহার নিকট হইতে যদি ঐ হাজার নয়ন ধার পাই, তবে একবার প্রাণ ভরিয়া প্রিয়তমকে দেখিয়া লই ; কিন্তু তিনি তো এখন সামনে নাই, দেখিব কি করিয়া ? বিষ্ণুর বাহন গরুড় ; তাহার পক্ষ সকলের চেয়ে দ্রুতগামী ; উহা যদি পাওয়া যায়, তবে হয় তো আমার কৃষ্ণদর্শনলালসা পূর্ণ হয়। দয়িতের অদর্শন যে এক মুহূর্ত্তও সহ্য হইতেছে না, তাই গরুড়ের পাখা যদি পাই, তবে এই ক্ষণেই সামরসুন্দরের কাছে যাইয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে ধারকরা সহস্র নয়ন দিয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখি। পূর্ব্বে শরণ কবির শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, মুরারিকে দর্শন করিবার জন্য নায়িকা বিধাতার প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, সে আমার সকল অঙ্গকেই নয়ন করিয়া দিল না কেন ? বিদ্যাপতি ঐ আক্ষেপের উক্তিকে এখানে প্রার্থনারূপে উপস্থিত করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আক্ষেপানুরাগের পদটিতে কিন্তু রাধা কৃষ্ণ, যমুনা বৃন্দাবন প্রভৃতির কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই। সম্ভবতঃ উহা প্রাকৃত নায়িকার প্রেম লইয়া লিখিত—যদিও পদকল্পতরুতে (৯৪৯) স্থান পাওয়ায় এখন বৈষ্ণবেরা উহা শ্রীরাধার উক্তি বলিয়াই গ্রহণ করেন। পদটি এই :

পাসরিতে শরির হোয়ে অবসান।
কহিতে ন লয় অব বুঝই অবধান॥
কহনে ন পারিয়ে সহনে না যায়।
বলহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন বিহি নিরমিল এহ পুন লেহ।
কাহে কুলবতি করি গঢ়ল মোর দেহ॥
কাম করে ধরিয়া সে করায় বাহার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুল-আচার॥
রহই না পারিয়ে চলই না পারি।
ঘন ফিরি যৈছে পিঞ্জর মাহা শারি॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম এ নেহ॥ (প. ত. ৯৪৯)

এ কি বিষম অনুরাগ! কর্ত্তব্যবোধে ইহা ভুলিতে চাহি, কিন্তু 'ভুলিব'—এ কথা ভাবিতে গেলেও যে দেহের অবসান হয়। এ প্রেম কেমন, তাহা বলিতে পারি না; যদি বলিবার মতন ভাষা পাইতাম, তবে হয় তো মনের আগুনে গুমরাইয়া গুমরাইয়া এত কাঁদিতে হইত না; কিন্তু এ যে গুহ্য হৃদয়-রহস্য; ইহা বলাও যায় না, সহাও যায় না। দয়িতের সহিত মিলিত হইবার জন্য মনোভব জোর করিয়া আমাকে বাহিরে ঠেলিয়া দিতেছে, আর কুলধর্ম্ম যেন ঘরে বাঁধিয়া রাখিতেছে। দুই দিক্ হইতেই সমান জোরে টান পড়িতেছে, টানাটানিতে শরীর ছিঁড়িয়া গেল, আর তো সহ্য করিতে পারি না! প্রিয়তমের নিকট ছুটিয়া যাইতে পারিলে বড় ভালো হইত, কিন্তু,—

'রহই না পারিয়ে চলই না পারি'

কেবল মনের চাঞ্চল্যের বশে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঘরের মধ্যে বার বার পায়চারি করিতেছি—

ঘন ফিরি যৈছে পিঞ্জর মাহা শারি॥

পিঞ্জরের মধ্যে সারীকে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে; বাহিরের নীলঘন আকাশ তাহাকে ডাক দিতেছে, তাহার বাহিরে যাইবার উপায় নাই; তাই শুধু খাঁচার মধ্যে বারংবার ঘুরাফিরা করিতেছে। চণ্ডীদাসের নামে

আক্ষেপানুরাগের যে কয়টি পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে, তাহার ভাব অবশ্য ইহা অপেক্ষাও গভীর ও রসঘন।

অভিসারের পদে বিদ্যাপতি অনেক স্থলে আলঙ্কারিক রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ৮৯ সংখ্যক পদে তিনি অভিসারিকার উদগ্র উৎকণ্ঠার পরিচয় না দিয়া, তাহার দেহের শোভা ও প্রতি অঙ্গের সহিত অলঙ্কার-শাস্ত্রে কথিত উপমা লাগাইয়াছেন—

করিবর রাজহংস জিনি গামিনি
চলিলহুঁ সঙ্কেত গেহা।
অমলা তড়িতদণ্ড হেম মঞ্জরি
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥

সুন্দর দেহের কথা মনে উঠিতেই তাহার নখশিখ বর্ণনা আরম্ভ হইল। তাহার কুন্তলের শোভা মেঘ, তিমির ও চামরকে পরাজিত করিয়াছে; অলকা মধুকর ও শৈবালকে: ভ্রূ কন্দর্পের ধনু, মধুকর ও সর্পকে; কপাল অর্দ্ধচন্দ্রকে, চক্ষু কমলিনী, চকোর, সফরী. ভ্রমর, হরিণী ও খঞ্জনকে; নাসা তিলফুল ও গরুড়ের চঞ্চুকে; কর্ণযুগল গৃধিনীকে; মুখ স্বর্ণমুকুর, চন্দ্র এবং কমলকে; অধর বিম্বফল ও প্রবালকে, দন্ত মুক্তা, কুন্দ ও দাড়িম্ববীজকে হারাইয়া দিয়াছে। উপমার আতিশয্যে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। ৯৪ সংখ্যক পদটিতে অভিসারে গমনের জন্য উৎকণ্ঠিতা নায়িকা—

হেরহ পছিম দিস কখন হোয়ত নিস
গুরুজন নয়ন নিহারি।
বিনু কারণ গৃহ করহ গতাগত
মুদি নয়ন অরবিন্দা।
পুলকিত তনু বিহসি অকামিক
জাগি উঠলি সানন্দা॥

নায়িকা একবার গুরুজনের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে—তাঁহারা তাহার ভাবসাব লক্ষ্য করিতেছেন কি না, আবার পশ্চিমের দিকে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে—কখন্ সূর্য্য অস্ত যাইবে, রাত্রি হইবে। বিনা কাজে চোখ বুঁজিয়া পুনঃ পুনঃ ঘর হইতে বাহিরে, বাহির হইতে ঘরে যাতায়াত

করিয়া অন্ধকারে অভিসার করিবার অভ্যাস করিতেছে ; থাকিয়া থাকিয়া দেহ পুলকিত হইতেছে, অকস্মাৎ হাসিয়া যেন জাগিয়া উঠিতেছে।

কবি শুক্লাভিসারের পদ (৯৫) সদুক্তিকর্ণামৃতের 'মলয়জপঙ্কলিপ্ততনবো' ইত্যাদির (২।৬৫।২) অনুকরণে লিখিয়াছেন। দুর্দ্দিনাভিসারিকার ভাব উক্ত গ্রন্থধৃত প্রাচীন শ্লোক হইতে লইলেও, তিনি ইহাতে অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত অভিসারিকার অসীম সাহস ও অপরাজেয় প্রেমের কথা-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার॥ (১০৪)

রজনী এত অন্ধকার যে, মনে হইতেছে—সে তমিস্রা উদ্গিরণ করিতেছে। পথে ভীষণ সর্প, দুর্ব্বার বজ্রধ্বনি হইতেছে, মেঘ যেন রোষে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতেছে। তথাপি নায়িকা আজ অভিসারে বাহির হইবেই। কেন না, সে কথা দিয়াছে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে পারিবে না। পথে যাইতে যাইতে সাপে তাহার চরণ বেড়িয়া ধরিল ; অভিসারিকা ভাবিল—ভালই হইল, পায়ের নূপুর আর শব্দ করিবে না। বিস্মিত হইয়া সখী জিজ্ঞাসা করিল—"ঠিক করিয়া বল তো সুমুখি, তোমার প্রেমের সীমা কত দূর ?"

চরণ বেড়িল ফণি হিত মানলি ধনি
নেপুর ন করএ রোর।
সুমুখি পুছওঁ তোহি সরূপ কহসি মোহি
সিনেহক কত দূর ওর॥ (১০৪)

রাজসভার আবেষ্টনীর বাহিরে বসিয়া কবি অভিসারের দুইটি পদে অকৃত্রিম মধুর রস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উহার একটি পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে—

নব অনুরাগিনি রাধা। কিছু নহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান। পথ বিপথ নহি মান॥
তেজল মণিময় হার। উচ কুচ মানএ ভার॥

কর সঁয় কঙ্কণ মুদরি। পথহি তেজলি সগরি॥
মণিময় মঞ্জির পায়। দূরহি তেজি চলি যায়॥
জামিনি ঘন আঁধিয়ার। মনমথ হিয় উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট। পেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান। ঐছে না হেরিয়ে আন॥

(মিত্র-মজুমদার, ৬৩৬)

মাধবের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় শ্রীরাধা মণিময় হার, কঙ্কণ, অঙ্গুরী, সব কিছু অলঙ্কার ভার মনে করিয়া পথেই ফেলিয়া দিয়া দ্রুতবেগে চলিতেছেন। পায়ের মঞ্জীরে একে শব্দ হয়, আবার তাহাতে মণি থাকায় আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে; তাহার শব্দে ও আলোকে পাছে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে, এই ভয়ে তিনি উহাও ফেলিয়া দিলেন। বাহিরের অন্ধকারে তাঁহার ভয় কি? অন্তরলোক যে মন্মথ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। পথে বিঘ্ন যেন বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু প্রেমের শাণিত অস্ত্রে সব কিছু তিনি কাটিয়া ফেলিতেছেন। প্রেমের বিচিত্র রূপকে ফুটাইয়া তোলাই যাঁহার জীবনের ব্রত, সেই কবিও মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন—এমনটি আর দেখি নাই—"ঐছে না হেরিয়ে আন"।

বিদ্যাপতির আর একটি পদ, যাহা তরৌণির পুথিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং গ্রিয়ার্সন সাহেবও লোকমুখে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্যাপতির মধুর রস আস্বাদনের দুই তিনটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাধব, করিঅ সুমুখি সমধানে।
তুঅ অভিসার কএল জত সুন্দরি
কামিনি করএ কে আনে॥
বরিস পয়োধর, ধরনি বারি ভর
রয়নি মহা ভয় ভীমা।
তইঅও চললি ধনি তুঅ গুণ মনে গুনি
তসু সাহস নহি সীমা॥
দেখি ভবন ভিতি লিখল ভুজগপতি
জসু মনে পরম তরাসে।

সে সুবদনি করে ঝপইত ফণিমণি
বিহসি আইলি তুঅ পাসে॥
নিঅ পহু পরিহরি সঁতরি বিখম নরি
আঁগরি মহাকুল গারী।
তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন গুণল বর নারী॥
ই রস রসিক বিনোদক বিন্দক
সুকবি বিদ্যাপতি গাবে।
কাম পেম দুহু একমত ভএরহু
কখন কী না করাবে॥ (মিত্র-মজুমদার, ৩৩২)

মাধব! সুমুখীর কামনা পূর্ণ করিও, তোমার অভিসারে সুন্দরী যাহা করিল, তাহা কামচালিতা কামিনীই পারে, অন্য আর কাহার সাধ্য? মেঘ বর্ষণ করিতেছে, ধরণী জলে থৈ থৈ করিতেছে, রজনী মহাভয়ে ভীমা। তথাপি তোমার গুণ স্মরণ করিতে করিতে সে চলিয়া আসিল; তাহার সাহসের সীমা নাই। যে সুবদনী ঘরের দেওয়ালে আঁকা সাপের ছবি দেখিলেও ভয়ে আঁতকাইয়া উঠে, সে কি না হাসিতে হাসিতে সাপের মণি হাত দিয়া ঢাকিয়া তোমার নিকট চলিয়া আসিল। তোমার অনুরাগে মত্ত হইয়া সেই নারীশ্রেষ্ঠা নিজের স্বামীকে ছাড়িয়া, সম্মানিত কুলে কলঙ্ক-কালিমা লেপিবার গ্লানি স্বীকার করিয়া, ভীষণ নদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া আসিয়াছে, কোন কিছুই গ্রাহ্য করে নাই। এই যে রস, ইহার জ্ঞাতা, বিনোদক ও রসিক সুকবি বিদ্যাপতি গান করিয়া বলেন—যখন কাম ও প্রেম, দুই-ই একমত হইয়া থাকে, তখন কি না ঘটিতে পারে? এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, কবি ভণিতায় নিজেকে শুধু রসবিন্দক ও রস-বিনোদক বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া রসিক বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩) জাতরতি ভক্তগণকে রসিক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। জয়দেবও গীতগোবিন্দে "সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্" (৯।৯); "জনয়তু রসিকজনেষু মনোরম-রতিরসভাব-বিনোদম্" (১২।৯) প্রভৃতি দ্বারা মধুররসের উপাসকগণকে রসিক বলিয়াছেন। বিদ্যাপতি কাম

ও প্রেম শব্দ একই সাথে ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা কাম, আর দয়িতের প্রীতি ইচ্ছা প্রেম, এই পার্থক্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্বেই তিনি অবগত ছিলেন অনুমিত হয়।

এই অনুমান সত্য কি না, যাচাই করিতে হইলে দেখিতে হইবে, বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া এবং শ্রীরাধাকে পরাশক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কি না। বাংলা দেশে রক্ষিত কোন পদ হইতে ইহার প্রমাণ দিতে গেলে সংশয়বাদীরা, বিশেষতঃ বিদ্যাপতির মৈথিল ভ্রাতারা বলিতে পারেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বিদ্যাপতির পদে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহার ঐ ভাবের কথা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তাই আমরা বাংলা দেশের নাগালের বাহিরে নেপালের পুথি হইতে দুইটি প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। একটি বিরহের পদ, অপরটি ভাবসম্মিলনের পদ। বিরহের পদটি এই—

সেওল সামি সব গুণ আগর
সদয় সুদৃঢ় নেহ।
তহু সবে যবে রতন পাবএ
নিন্দহু মোহি সন্দেহ॥
পুরুষ বচন হো অবধান।
ঐসন নাহি এহি মহিমণ্ডল
জে পরবেদন ন জান॥
নহি হিত মিত কোউ বুঝাবএ
লাখ কোটি তোহে সামী।
সবক আসা তোহে পুরাবহ
হম বিসরহ কাঞী॥ (ঐ, ৫১৫)

সকল গুণেই যে সকলের অগ্রগণ্য, এমন সদয় স্বামীকে আমি সুদৃঢ় স্নেহের সহিত সেবা করিলাম। তাঁহাকে সেবা করিয়া অন্য সকলে পায় রত্ন, আর আমার ভাগ্য এমন যে, আমি পাইলাম শুধু অনিদ্রা। আমার চোখের ঘুম কে কাড়িয়া লইল? এই মহীমণ্ডলে এমন কি কেহ নাই, যে পরের বেদনা বুঝে? আমার কি এমন কুটুম্ব (হিত) বন্ধু (মিত) নাই, যে আমার হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলে যে, তুমি লক্ষ কোটি লোকের প্রভু, সকলের

আশা তুমি পূর্ণ কর, শুধু আমাকে কেন ভুলিয়া থাকিলে? এখানে কবি শ্রীরাধার সহিত নিজেকে মিলাইয়া দিয়া করুণভাবে প্রার্থনা করিতেছেন। এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি পাই সুপ্রসিদ্ধ "মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়" পদের—

তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে তাঁহার প্রেম শিথিল নহে। কিন্তু বিদ্যাপতি শ্রীরাধাকে দিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট দৈন্যভাব প্রকাশ করাইয়াছেন। বিদ্যাপতির অনুভব অনুসারে যুগ যুগ ধরিয়া জপ ও তপস্যা করিয়া, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন।

ভাবসম্মিলনের পদটি এই—

কে মোর জাএত দুরহুক দূর।
সহস সৌতিনি বস মাধুরপুর॥
অপনহি হাথ চললি অছ নীধি।
জুগ দস জপল আজে ভেলি সীধি॥
ভল ভেল মাই হে কুদিবস গেল।
চন্দে কুমুদ দুহু দরসন ভেল॥
কতএ দামোদর দেব বনমালি।
কতএক হমে ধনি গোপ গোআরি॥
আজে অকামিক দুই দিঠি মেলি।
দেব দাহিন ভেল হৃদয় উবেলি॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
কু দিবস রহএ দিবস দুই চারি॥ (ঐ, ৫৬৮)

দূর হইতে দূরান্তরে কোথায় সেই মাধুর পুরে আমার প্রিয়তম ছিলেন; সেখানে কে যাইবে? যাইয়াই বা কি ফল? তিনি যে সেখানে আমার সহস্র সপত্নীদ্বারা বেষ্টিত থাকেন। দশ যুগ ধরিয়া আমি যে জপ করিলাম, আজ তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিলাম; সেই মহানিধি নিজে হইতেই আমার

নিকট চলিয়া আসিলেন। বড় ভাল হইল যে, কু-দিবস কাটিয়া গেল ; কত দিনের বিরহের পর আজ চাঁদের সহিত কুমুদিনীর মিলন হইল। কিন্তু আমি কি তাঁহার যোগ্য ? কোথায় তিনি বনমালী দেব দামোদর, আর কোথায় আমি গ্রাম্যা গোপিনী। আজ আমার দেবতা দাক্ষিণ্য দেখাইলেন ; হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ; অকস্মাৎ নয়নে নয়নে মিলন হইল। বিদ্যাপতি বলেন, হে নারীশ্রেষ্ঠা (তুমি গ্রাম্যা গোয়ালিনী মাত্র নহ), দুর্দ্দিন দুই চারি দিনই থাকে।

যখন শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীরা বিলাপ করিতেছেন—

"অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি লেল॥" ইত্যাদি (ঐ ৭৩৩)

তখন বিদ্যাপতি জোরের সহিত বলিতেছেন—কেন শুধু কাঁদিতেছ ? নন্দনন্দন বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন ? তোমরা তাঁহাকে কেমন ভালবাস, দেখিবার জন্য কৌতুক করিয়া এখানেই লুকাইয়া আছেন—

বিদ্যাপতি কহ কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহুঁ কান॥

বিদ্যাপতির এই দুইটি ভণিতা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অগ্রদূতরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতেই যাউন, আর দ্বারকাতেই যাউন, নিত্যলীলায় তিনি সততই বৃন্দাবনে বিহার করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে রাধাকৃষ্ণের লীলার কিরূপ পটভূমিকা ছিল, তাহার কতকটা প্রমাণ বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি প্রাচীনতর কবিদের রচনা হইতে ইহার কিছুটা পাইয়াছিলেন, আর কিছুটা নিজের কবিপ্রতিভার দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলা অথবা চরিত্র কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁহার রচিত বহু পদে রাধাকৃষ্ণের নামগন্ধ নাই, যমুনা নাই, বৃন্দাবন নাই, এমন কি, গোপ গোপী, কদম্বগাছেরও উল্লেখ নাই। ঐ সকল পদ প্রাকৃত নায়ক নায়িকার ভালবাসা লইয়া লেখা। সুতরাং তাহা হইতে রাধাকৃষ্ণের চরিত্রচিত্রণের প্রমাণ উপস্থিত করা চলিবে

না। আমরা কেবলমাত্র সেই সব পদ হইতে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের কাহিনী ও চরিত্রচিত্রণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিব, যাহাতে স্পষ্টতঃ কাহ্নাই, মাধব, রাই, রাহী, যমুনা এবং মুরলী, কদম্ব প্রভৃতি বৃন্দাবনলীলার উদ্দীপনামূলক বস্তুর উল্লেখ আছে।

বিদ্যাপতির অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণলীলাকে এই ভাবে উপস্থিত করা যায়। কোন দূতী যেন মাধবের নিকট প্রথমে রাধার রূপের বর্ণনা করিতেছেন। মাধব হয় তো শুনিতে বিশেষ উৎসুক নহেন; তাই দূতী বলিতেছেন—

সুন সুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলি রাই॥ (৬১১)

রাধার তখন বয়ঃসন্ধি। এই বয়ঃসন্ধির রূপ বর্ণনা করা সে কালের কবিদের মধ্যে একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছিল। শ্রীধরদাস সদুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গার-প্রবাহবীচির প্রথমেই বয়ঃসন্ধির পাঁচটি ও কিঞ্চিদুপারূঢ়যৌবনার পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ষোলটি শ্লোক আছে শুধু বয়ঃসন্ধি সম্বন্ধে। বিদ্যাপতিতে বয়ঃসন্ধির তেরটি পদ পাওয়া যায় (১৭-১৯; ২২৬, ২২৭, ৬১০-৬১৭)। রাধার শৈশব যাইয়া যৌবন আসিতেছে দেখিয়া কানাইয়ের কোন বন্ধু বোধ হয় তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন একটি বার এই রূপের বর্ণনা শুনিতে—

কন্হা তুরিত সুনসি আএ।
রূপ দেখত নয়ন ভুলল
সরূপ তোরি দোহাএ॥ (২২৭)

অন্য একটি পদেও দেখি, জোর করিয়া কানাইকে রাধার নব যৌবনের কথা শুনানো হইতেছে—

এ কাহ্নু এ কাহ্নু তোরি দোহাই।
অতি অপূরুব দেখলি পাই॥ (২৩২)

রাধিকার দৈহিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মানসিক বিকাশেরও কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

সুনইতে রস-কথা থাপয় চীত।
জইসে কুরঙ্গিনী সুনএ সঙ্গীত॥ (৬১৩)

রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া কানাই মুগ্ধ হইলেন। দূতী রাধার কাছে যাইয়া কানাইয়ের প্রেম জানাইল।

"মাধব, তুঅ লাগি ভেটল রমণী"। (৬১৬)

রাধাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—"সবে পরিহরি তোহি ইছ হরি" (৪২) সকলকে ছাড়িয়া হরি তোমাকেই ইচ্ছা করেন, যেখানে রাইয়ের নাম হয়, সেইখানেই কান পাতেন। কিন্তু রাধা তখনও প্রেম কি, বুঝেন নাই। তাই তিনি মিলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। দূতী যাইয়া মাধবকে বলিলেন—

গগনক চান্দ হাথ ধরি দেয়লুঁ
কত সমুঝায়ল নিতি।
যত কিছু কহল সবহু ঐছন ভেল
চীত পুতলী সম রীতি॥
মাধব, বোধ না মানই রাই।

রাধা পটে আঁকা ছবির মতন বসিয়া রহিলেন।

ইহার পর কিন্তু রাধা একদিন সহসা মাধবকে দেখিতে পাইলেন। রাধা মথুরায় বিক্রয় করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় মধুরিপুর সঙ্গে দেখা হইল। আর প্রথম দর্শনেই তিনি প্রেমে পড়িলেন—

বিকে গেলিহুঁ মাথুর, মধুরিপু ভেটল পথে।
তহি খনে পঞ্চসর লাগল বিধিবসে, কে করু বাধে॥ (২৪১)

পরে আর একদিন রাধা সামরসুন্দরকে পথে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই অনুরাগে এমন বিভ্রান্ত হইলেন যে, গায়ে আঁচল দিতেও ভুলিয়া গেলেন—আর সে ভুল সখীরা দেখিয়া ফেলিল—

আরতি আঁচর সাজি ন ভেলে
সবে সখীজন সাখি॥"

তিনি ব্যাকুল হইয়া সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কহহিঁ মো সখি কহহি মো
কথা তোহেরি বাসা॥ (২৩৮)

তিনি কোথায় থাকেন, বল গো সখি, বল আমাকে॥

বিদ্যাপতি একটি ছোট্ট পদে (২৪০) রাধার পূর্ব্বরাগের পাঁচটি স্তর সুন্দর-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহাকে দেখিবার জন্য অশেষ আকুতি—সন্ধ্যার পূর্ব্বে কমলিনী যেমন করিয়া তাহার নয়নরূপ সকল দলগুলি খুলিয়া সূর্য্যকে দেখিয়া লয়, তেমনি তাহার "দরসনে লোচন দীঘর ধাব"। তার পর তাহার "মদন-বিকাশ" লুকাইবার চেষ্টা। কিন্তু সে চেষ্টা তাহার সফল হয় না। মাধবকে দেখিয়া লজ্জা, নিজের মহিমা ছাড়িয়া পলায়ন করিল; নীবিবন্ধ স্রস্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। পূর্ব্বরাগের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ একটি কথায় কবি বলিয়াছেন—

একসর সব দিস দেখিঅ কাহ্ন। (২৪০)

সব দিকে একমাত্র কানাইকেই দেখি, আর কিছু দেখিতে পাই না। এ দিকে কানাইও প্রেমে ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি কদম্বতলে বসিয়া ধীরে ধীরে মুরলী বাজাইয়া রাধাকে বারংবার ডাকেন। দূতী আসিয়া রাধাকে বলেন—

সামরী, তোরা লাগি
অনুখনে বিকল মুরারি। (২৫৩)

যে সব গোপী যমুনার তীরে দুধ দই বিক্রয় করিতে যান, তাঁদের প্রত্যেকের নিকট বনমালী রাধার কথা জিজ্ঞাসা করেন—

গোরস বিকে নিকে অবইতে যাইতে
জনি জনি পুছ বনবারি॥ (২৫৩)

বিদ্যাপতির ৯৩৩টি পদের মধ্যে মাত্র এই দুইটি পদে (২৪১ ও ২৫৩) রাধার গোরস বিক্রয় করিতে যাওয়ার ইঙ্গিত আছে। অন্যান্য পদে দেখা যায় যে, রাধা যেন সম্ভ্রান্ত ঘরের বিদগ্ধা ও রসনিপুণা মহিলা; শ্রীকৃষ্ণকে তিনি প্রায়শঃই গ্রাম্য 'গমার' গোপ বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন। দূতী পুনরায় মাধবের নিকট হইতে মিলনের প্রস্তাব লইয়া গেলে রাধা বলিতেছেন—

কতএ বা হমে ধনি কতএ গোয়ালা। (৫৪ এবং ৪২০)

দূতী রাধাকে বলিতেছেন—"গোপ ভরমে জনু বোলহ গমার" (৫৫)। মিলনের পরও কৃষ্ণের যখনই কিছু দোষত্রুটি হইয়াছে, তখনই রাধা তাঁহাকে গেঁয়ো গোয়ালা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন—

পসুক সঙ্গহুন জনম গমাওল
সে কি বুঝথি রতিরঙ্গ।
মধু জামিনি মোর আজু বিফল গেলি
গোপ গমারক সঙ্গ॥ (১১৭)

তাঁহার 'কঞ্চনে গঢ়ল পয়োধর সুন্দর' দেখিয়া মাধব উতলা হইলে, তিনি বলিতেছেন—"কিনহি ন পার গমার হে" (৩৪৩)—ইহা গেঁয়ো লোকে কিনিতে পারে না। সখী বা দূতীকে রাধা বলিতেছেন—

গাএ চরাবএ গোকুল বাস।
গোপক সঙ্গম কর পরিহাস॥
অপনহু গোপ গরুঅ কী কাজ।
গুপতহি বোলসি মোহি বড়ি লাজ॥
সাজনি বোলহ কাহ্নু সঞো মেলি।
গোপবধূ সঞো জহ্নিকা কেলি॥
গামক বসলে বোলিঅ গমার।
নগরহু নাগর বোলিঅ অসার॥
বস বথান—পালি দুহ গাএ।
তহ্নি কী বিলসব নাগরি পাএ॥ (৩৪৬)

রাধা নিজেকে নাগরী বলিয়া অহঙ্কার করিতেছেন, আর কৃষ্ণ গ্রামে বাস করেন বলিয়া তিনি হইতেছেন গমার। সে ধেনু চরায়, গোকুলে বাস করে, গোয়ালাদের সঙ্গে হাস্যকৌতুক করে। নিজে গোপ, গোরুর কাজ করে; আমাকে গোপনে ডাকিয়াছে, এ বড় লজ্জার কথা। সজনি, তুমি কানাইয়ের সঙ্গে মিলন করিতে বলিতেছ, কিন্তু গোপবধূদের সঙ্গে তাহার কেলি। লোকে বলে, গ্রামে বাস করিলে গোঁয়ার, আর নগরে বাস করিলে নাগর। যাহার গোয়ালঘরে বসতি, যে গোরু দোহায়, সে নাগরী পাইয়া কি বিলাস করিবে? অন্য একটি পদে আছে যে, রাধা কৃষ্ণকে বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দোষ দিয়া বলিতেছেন—"অলিক বৈলিঅ গোপ গমার"—হে গ্রাম্য গোপ, তুমি মিছা কথা বলিতেছ (৪০৬)। কৃষ্ণ অন্য গোপীর প্রতি অনুরাগ দেখাইলে রাধা বলিতেছেন—

ঐসন মুগুধ থীক মুরারি।
গবউ ভখএ অমিঞ ছারি॥ (৪৫২)

মুরারি এমন বোকা যে, অমৃত ছাড়িয়া গব্য খায়।

দূতীর প্রচেষ্টায় মুকুলিকা কিশোরী রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রথম মিলন হইল। প্রথমে কৃষ্ণকেই রাধার অভিসারে যাইতে হইল—কেন না, দূতী বলিল—

বারি বিলাসিনি আনবি কাঁহা।
তোঁহি কাহ্নবরু জাসি তাঁহা॥
প্রথম নেহ অতি ভিতি রাহী।
কত জতনে কতে মেরাউবি তাহী॥
জা পতি সুরত মনে অসার।
সে কইসে আউতি জমুনা পার॥ (৮৫)

নায়িকা (বিলাসিনী) বালিকা, তাহাকে কোথায় আনিব? তুমি কানাই বরং সেইখানে যাইও। প্রথম প্রেম, রাধা অত্যন্ত ভীরু; কত কষ্টে তাহাকে সেইখানে মিলাইয়া দিব। যাহার কাছে সুরত এখনও অসার মনে হয়, সে কি আর যমুনা পার হইয়া আসিবে? বিদ্যাপতি সে কালের রীতি অনুসরণ করিয়া প্রথম সমাগমের অনেকগুলি পদ লিখিয়াছেন। সদুক্তি-কর্ণামৃতে নবোঢ়া পর্য্যায়ে পাঁচটি ও শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে (৩৬৭২-৩৬৭৮) নববধূ-সুরতারম্ভক্রীড়ায় সাতটি শ্লোক ধৃত হইয়াছে। প্রথম মিলনের সময় বিদ্যাপতির রাধা নিতান্ত ছোট মেয়ে; দূতী বলিতেছেন—"বদর সরিস কুচ পরসব লহু" (২৭৭), তাহার বদরিসদৃশ কুচ আস্তে ছুঁইবে। রাধার তখন "অলপ বুধি" (২৯০); সে "বারি বিলাসিনি কেলি ন জানথি" (৩০০)।

বিদ্যাপতির রাধা কিন্তু বড় হইয়া রীতিমত প্রগল্ভা হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ রাধার ভ্রূভঙ্গ লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া রাধা বলিতেছেন—

কী কহু নিরখহ ভঞ্জক ভঙ্গ।
ধনু হমে সঁপি গেল অপন অনঙ্গ॥
কঞ্চনে কামে গঢ়ল কুচকুম্ভ।
ভঙ্গইতে মনব দেইত পরিরম্ভ॥ (৫২ এবং ৩৪০)

কানাই, আমার ভ্রূভঙ্গিমা কি দেখিতছ? মন্মথ নিজের ধনুক আমাকে দিয়া গিয়াছে। কন্দর্প আমার কুচকুম্ভ স্বর্ণে নির্ম্মাণ করিল; আলিঙ্গন করিবার সময় মনে হইবে, তুমি নিজেই যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে। কৃষ্ণ রাধার মুখের পানে চাহিতেই রাধা বলেন—

হটিএ হলিয় নিঅ নয়ন-চকোর।
পীবি হলত ধসি সসিমুখ মোর॥ (৫৩)

তোমার নয়নচকোর সরাইয়া লও, সে বেগে আসিয়া আমার মুখশশী পান করিবে। রাধা ফুল তুলিতে গেলে কানাই তাঁহার গায়ে হাত দিতে আসিতেছেন, তাহাতে রাধা বলিতেছেন—

গরুবি গরুবি আরতি তোরি।
দিঠি দেখইত দিবস চোরি॥
এ ত কহ্নাই পরধন লোভ।
জে নহি লুবুধ সেহে পএ সোভ॥ (৪৮)

তোমার বড় বেশী আর্ত্তি। দিনের বেলায় চোখের সামনে চুরি করিবে? কানাই, তোমার পরের ধনে এত লোভ! যে লোভ করে না, সেই শোভা পায়। ইহা বলিয়া রাধা যশ অপযশের কথা তুলিয়া বলিলেন যে, উহাই দীর্ঘ দিন থাকে, আর সব দুই চারি দিন মাত্র। এ সব ভাল ভাল কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন—

পীন পয়োধর ভার।
মদন রাএ ভণ্ডার॥
রতনে জড়িলো তাহরি মাথ।
মলিন হোএত ন দেহে হাথ॥ (৪৮)

এ যেন নিষেধ করিতে যাইয়া, বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

রাধা পরের নারী, তাঁহার পরিজন পুরজন আছে, এই কথা বিদ্যাপতির পদের বহু স্থানে আছে। কিন্তু কোথাও তাঁহার স্বামী, শাশুড়ী বা ননদিনীর নাম উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণের মামী-ভাগিনা সম্বন্ধ, এরূপ ইঙ্গিত সমগ্র পদাবলীর মধ্যে কোথাও নাই।

বিদ্যাপতির রাধাকে অভিসারে যাইবার সময় সর্ব্বদাই যমুনা পার হইয়া

যাইতে হয় (৯১, ১০১, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২ প্রভৃতি)। সঙ্কেতস্থান তাহা হইলে যমুনার অপর পারে ছিল। সঙ্কেতের সময় সুচতুরা রাধা অনেক প্রকার ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইয়া দিতেন—যথা, বুকে হাত দিয়া, মাথার চুল বার বার নামাইয়া বোঝান যে, চন্দ্র অস্ত গেলে কানাই যেন অভিসার করেন (৮৭); সিন্দূরবিন্দুর দ্বারা সূর্য্য, চন্দনের দ্বারা চন্দ্র ও তিলকের সংখ্যার দ্বারা তিথি বুঝাইতেন (৮৮); আবার কবরীতে কেয়া ও চাঁপাফুল দিয়া, মৃগমদ কুস্কুমে অঙ্গরাগ করিয়া চতুরা সময় জানাইতেন (৮৮)। বিদ্যাপতি বলেন—রাধার সৌন্দর্য্য, চাতুর্য্য ও রসজ্ঞতা দেখিয়াই মাধব তাঁহার কাছে যেন কেনা হইয়া গিয়াছিলেন—

বড় কৌসলি তুঅ রাধে।
কিনল কহ্নাঈ লোচন আধে॥ (১১২)

কোন কোন দিন অভিসারে আসিয়া রাধা দেখিতে পান যে, মাধব মান করিয়া বসিয়া আছেন। তখন তিনি কি ভাবে অন্ধকার রাত্রিতে কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তাহার বর্ণনা দিতে যাইয়া বলেন—"রতনহুঁ লাগি ন সঞ্চর চোর"—রত্নের লোভে এমন রাতে চোরও ঘর ছাড়িয়া বাহির হয় না। তার পর সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি সঙ্গম প্রার্থনা করেন—

"দেহ অনুমতি হে জুঝও পাঁচবাণ (১২৮)।

কানাইকে রাধা ভাল করিয়াই জানেন; সুতরাং কানাই যখন অন্যত্র রাত্রি কাটাইয়া আসিয়া সকালবেলা নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে চাহিলেন, তখন রাধা বলিলেন—এমন বসন্তকালের রাত্রি, তোমার কামিনী ছাড়া কাটিল কি করিয়া? "কামিনী বিনু কইসে গেলি মধুরাতী" (১১৫)।

নৌকাখণ্ডের চারিটি মাত্র পদ (৪৯, ৫১, ৩৪৪, ৩৫১) বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পদটিতে লোচন-সঙ্কলিত রাগতরঙ্গিণীর পাঠ অনুসারে রাধা কানাইকে বলিতেছেন—আমি আমার কুল, গুণগৌরব, শীল ও স্বভাব, সব লইয়া তোমার নৌকায় চড়িলাম—অর্থাৎ এ সব রক্ষার ভার তোমার সুবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া নৌকায় চড়িলাম। আমি অবলা, আর কত বলিব? মাধব, আমাকে পার করিয়া দাও; পরের উপকার করাই সব চেয়ে বড় কাজ। আমি তোমারই উপর নির্ভর

করিতেছি। এখন এমন কাজ কর, যাহাতে উপহাস না হয়। তুমি পরপুরুষ, আমি পরনারী। তোমার রীতি দেখিয়া হৃদয় কাঁপিতেছে। ভাল মন্দ পরিণাম বিবেচনা করিয়া কাজ কর। যশ অপযশই জগতে রহিয়া যায় (৪৯)। ৫১ সংখ্যক পদে রাধা কৃষ্ণকে উচিতমত পারাণী লইয়া পার করিতে বলিতেছেন। তৃতীয় পদটিতে রাধা কানাইকে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন—তাঁহাকে পার করিয়া দিবার জন্য। তাঁহার সব সখী আগে পার হইয়া গিয়াছে। তিনি কানাইকে অপূর্ব্ব হার পারাণীর মূল্যস্বরূপ দিতে চাহিলেন। (কানাইয়ের ভাবসাব দেখিয়া শেষে তিনি বলিতেছেন), আমি তোমার কাছে যাইব না, ও দিকের আঘাটায় পার হইব। তাহা শুনিয়া বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ওগো নারি, কানাই ভগবান্, তাহাকে ভজনা কর (৩৪৪)। চতুর্থ পদটিতে নৌবিহারের পর বিলাসচিহ্নসমূহ ঢাকিবার চেষ্টায় রাধা সখীকে বলিতেছেন—ছেলেমানুষ কানাই, নদীর স্রোতে নৌকা সামলাইতে পারিল না, তাই যমুনা সাঁতরাইয়া পার হইলাম। তাতেই তো বালা ভাঙ্গিয়া গেল, হারও ছিঁড়িয়া গেল। সখি গো, মন্দ কিছু যেন বলিও না, কঠিন কথায় শুধু ঝগড়া বাধিয়া যায়। যমুনার মাঝখানে কুণ্ডল খসিয়া গেল, তাই খুঁজিতে সন্ধ্যা হইল। অলকা তিলকাও জলে মুছিয়া গিয়াছে, তাই মুখচন্দ্র খালি। নদীর কূলে রাস্তা পাইলাম না, তাই কুচে কঠিন কাঁটা লাগিয়া গিয়াছিল (৩৫১)। এখানে দেখা যায় যে, রাধা প্রকৃত ঘটনা সুকৌশলে গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

খণ্ডিতা রাধাকেও বিদ্যাপতি খুব বাক্‌চতুরারূপে অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি কানাইয়ের অঙ্গে ও বেশভূষায় রতিচিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাকে সংস্কৃত কবিদের রীতি অনুসারে ধিক্কার দিয়াছেন (৩৭১।৩৭২), সঙ্গে সঙ্গে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়া কানাইয়ের রুচির নিন্দা করিয়াছেন। তিনি নিজেকে কমলিনী ও প্রতিদ্বন্দ্বিনী নায়িকাকে কেতকীর সহিত তুলনা করিলেন (৩৭৩)। অন্য পদে তিনি নিজেকে কাঞ্চন ও প্রতিনায়িকাকে কাচ বলিয়াছেন (৩৭৪)।

বিদ্যাপতি মাধবকে অনেকটা বেপরোয়া করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি রাধিকার ধিক্কারের উত্তরে অম্লানবদনে বলিলেন যে, সারারাত্রি ধরিয়া

শিবপূজা করায় তাঁহার চেহারাটা ঐ রকম দেখাইতেছে। তার পর তিনি জয়দেবের (১০।১১) অনুসরণ করিয়া আলিঙ্গনরূপ শাস্তি প্রার্থনা করিলেন। প্রথম হইতেই বিদ্যাপতির মাধব লোকাপেক্ষা না রাখিয়া প্রেম করিয়াছেন। তিনি রাধাকে নৌকায় চড়াইয়া এমন ব্যবহার করিয়াছেন যে, রাধা বলিতেছেন—"কুচনখ লাগত সখি জনি দেখ" এবং "ন হর ন হর হরি হৃদয়ক হার" (৫১)। দূতী রাধাকে মাধবের নিকট লইয়া গেলে মাধব সারারাত্রি তাঁহার সহিত বিহার করিলেন। "চারি পহর রাতি সঙ্গহি গমাওল অবে পহু ভেল ভিনসারা" (৬৪)। ভিনসারা বা প্রত্যূষেও কানাই রাইকে ছাড়িতে চাহেন না; রাধা তাঁহাকে বলিলেন—"জামিনি দূর গেলি, নুকি গেল চন্দ"। এখন যদি না ছাড়, তবে "মঞে জাএব জমুনা জোরি ঝাপ" (৬৩)। "গগন মগন হোঅ তারা। তইঅও ন কাহু তেজয় অভিসারা" (৩৩৬)। দূতীও কানাইকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছে—"বহলি বিভাবরি মনে নাহি লাজা" (৩৩৭)। অন্য একটি পদেও রাধা অনুনয় করিতেছেন—

অরুন কিরণ কিছু অম্বর দেল।
দীপক সিখা মলিন ভএ গেল॥
হঠ তজ মাধব জএবা দেহ।
রাখএ চাহিঅ গুপুত সনেহ॥ (৩৩৮)

৪৮৩ সংখ্যক পদেও সারারাত্রি ধরিয়া বিলাসের কথা আছে।

মাধব বহুজনবল্লভ। সে কথা জানিয়াও রাধা তাঁহার সঙ্গে প্রেম করিয়াছিলেন—কেন না, মাধব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে—

সোলহ সহস গোপি মহ রাণি।
পাট মহাদেবি করবি হে আনি॥
বোলি পঠওলহি জত অতিরেক।
উচিতহু ন রহল তহিক বিবেক॥ (৪১৭)

ষোল হাজার গোপীর মধ্যে আমাকে মহারাণী, পট্টমহাদেবী করিবে বলিয়া কত কথা দিয়াছিল; এখন আর সে সব কথা প্রতিপালন করা উচিত বিবেচনা করে না। দূতীও রাধাকে বলিয়াছিল যে, "সোরহ সহস গোপী-পতি কাহু", কিন্তু সে রাধার জন্য "সোলহ সহস গোপী পরিহার" (১২৪)।

বিরহিণী রাধা মাধবকে বলিয়া পাঠাইলেন—

জুবতি সহস সঙ্গে সুখ বিলসব রঙ্গে
হম জল আজুরি দেবা ॥

হরি সহস্র যুবতীর সঙ্গে সুখে বিলাস করুন; আমার নামে যেন জল অঞ্জলি দেন। এই কথা শুনিয়া হরি বিস্মিত হইলেন এবং তখনই ফিরিয়া যাইবার উপায় করিলেন (১৮৩)।

রাধার সহিত কৃষ্ণের প্রেম কত দিন চলিয়াছিল? বিদ্যাপতি বলেন— অন্ততঃ বার বছর ধরিয়া। "বরস দাদশ তুঅ অনুরাগ" (৪২০); তাহার পর হয় তো প্রেমে ভাটা পড়িয়াছিল। তাই রাধা বলেন—

কেও বোল মাধব কেও বোল কাহ্ন
মঞে অনুমাপল নিছছ পখান ॥ (৪২০)।

মাধবের বিরাগের কারণ খুঁজিতে যাইয়া রাধা ভাবিতেছেন, বোধ হয় তাঁহার যৌবন আর না থাকাতেই মুরারি তাঁহাকে আর আদর করেন না।

জৌবন রতন অছল দিন চারি।
তাবে সে আদর কএল মুরারি ॥
আবে ভেল কাল কুসুম রস ছুছ।
বারি-বিহুন সর কেও নহি পুছ ॥ (৪৫৫)

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে রাধার যৌবনে ভাটা পড়ার কোন ইঙ্গিত কোথাও নাই। বিদ্যাপতির রাধা মথুরাতে কেবল দূতীই পাঠান না, নিজেও সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

মোহন মধুপুর বাস।
হে সখি, হমহুঁ জাএব তনি পাস ॥
রখলহ্নি কুবজাক নেহ।
হে সখি, তেজলহ্নি হমরো সিনেহ ॥ (৫৩৩)।

বিদ্যাপতি মাধবকে বৃন্দাবনে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তাই রাধা উল্লসিত হইয়া বলিতেছেন—

দারুন বসন্ত যত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল ॥

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥ (৭৬১)।

বিদ্যাপতিপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া চণ্ডীদাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বলা প্রয়োজন যে, মৈথিল বিদ্যাপতির জন্মের পূর্ব্বে অন্ততঃ চার জন সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি ছিলেন। অভিনবগুপ্ত তাঁহার ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী ১০১৫ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে এক বিদ্যাপতির শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ বিদ্যাপতি নিশ্চয়ই দশম শতাব্দী বা তাহার পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তৃতীয় ইন্দ্ররাজের সভাকবি ত্রিবিক্রমের পুত্র ভাস্কর ভট্টকে ধারার অধিপতি ভোজ (১০০০—১০৫৫ খৃষ্টাব্দ) বিদ্যাপতি উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন (ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী—পদ্যামৃততরঙ্গিণীর ভূমিকা, পৃঃ ২১২—২১৩)। ত্রিপুরীর কলচুরীবংশের সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি কর্ণের সভাকবিরও নাম ছিল বিদ্যাপতি (বল্লভদেব-সংগৃহীত সুভাষিতাবলী, ১৮৬)। কর্ণ ১০৩৪ হইতে ১০৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রাজ্যাধিরোহণ করেন এবং ১০৭৩ এর কিছু পূর্ব্বে সিংহাসন ত্যাগ করেন। এই বিদ্যাপতির দুইটি কবিতায় কর্ণের প্রশংসা আছে। ঐ কবিতা দুইটি (সদুক্তিকর্ণামৃত, ৩১৩।৪ এবং ৩।৫৪।২) আরও তিনটি কবিতা সহ (ঐ, ৩।৩।২, ৪।৯।৩, ৪।২৮।২) শ্রীধরদাস ১২০৬ খৃষ্টাব্দে সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতেও এক বিদ্যাপতির চারিটি কবিতা (১০৬৫, ১২০২, ৩৫৫৬, এবং ৩৯০১) উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই চারিটি কবিতাও কর্ণের সভাকবি বিদ্যাপতির রচনা। চতুর্থ বিদ্যাপতি দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। জিনপাল তাঁহার "খরতরগচ্ছপট্টাবলী"তে লিখিয়াছেন যে, তৃতীয় পৃথ্বীরাজের (১১৭৮—১১৯২ খৃষ্টাব্দ) সভায় বিদ্যাপতি গৌড় এবং বাগীশ্বর নামক কবিদ্বয় আগমন করিয়াছিলেন। মিথিলার বিদ্যাপতির পরে বাংলাদেশেও একজন বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ৩২টি পদ মিত্র-মজুমদার সংস্করণ 'বিদ্যাপতি'তে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইনি বা অপর কেহ বিদ্যাপতির নামের সঙ্গে 'রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ' ভণিতা দিয়া—

"কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥"

ইত্যাদি খাঁটি বাংলা পদ লিখিয়াছেন। ভণিতার দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া উহাকে আমি মৈথিল বিদ্যাপতির রচনার মধ্যে (১৯০) স্থান দিয়াছি। এই পাঁচ জন কবি বিদ্যাপতি ছাড়া এক জন কবিরাজ বিদ্যাপতিও ছিলেন। তিনি বংশীধরের পুত্র এবং ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি বৈদ্যরহস্যপদ্ধতি নামক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়

চণ্ডীদাস

বিদ্যাপতি নামের চেয়েও চণ্ডীদাস নাম সে কালের কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে বোধ হয় বেশী প্রিয় ছিল। আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেকগুলি কবি চণ্ডীদাসের সন্ধান পাইয়াছি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে উড়িষ্যায় একজন খুব সম্মানিত ও সুপ্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাস ছিলেন। তাঁহার ধ্বনিসিদ্ধান্ত গ্রন্থ ও কাব্যপ্রকাশব্যাখ্যা সুপ্রসিদ্ধ। শেষোক্ত গ্রন্থখানি কাশী সরস্বতীভবন হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার কাব্যার্থ সম্বন্ধীয় মত উদ্ধৃত করিতে যাইয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীর উড়িষ্যার মহাপাত্র সান্ধিবিগ্রহিক চন্দ্রশেখরের পুত্র বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার সাহিত্যদর্পণে (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) লিখিয়াছেন—"তদুক্তমস্মৎসগোত্রকবিপণ্ডিতমুখ্যশ্রীচণ্ডীদাসপাদৈঃ"। আচার্য্য শঙ্কর, আচার্য্য রামানুজ, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে যাইয়া যেমন ভাষা ব্যবহার করার রীতি সে কালে ছিল, সেইরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত বিশ্বনাথ তাঁহার সগোত্রীয় কবি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের নাম করিয়াছেন। কথিত আছে, চণ্ডীদাস বিশ্বনাথের খুল্লপিতামহ। ইনি নিশ্চয়ই বিশ্বনাথের গ্রন্থ লেখার আগেই এমন খ্যাতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়া সাহিত্যদর্পণকার নিজের মত স্থাপন করার প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ স্বগ্রন্থে আলাউদ্দীন খিলজীর নাম করিয়াছেন, আর সাহিত্যদর্পণের একখানি পুথি কাশ্মীরে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে অনুলিপি করা হইয়াছিল। সুতরাং বিশ্বনাথ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ কাশ্মীরের রণবীরসিংহের অভিপ্রায় অনুসারে দুর্গাদত্তের পুত্র চণ্ডীদাস "রঘুনাথগুণোদয়" নামে এক কাব্য লিখিয়াছিলেন (Catalogus Catalogorum, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৫)। আর একজন চণ্ডীদাস ছিলেন রাঘবের পুত্র এবং তিনি কর্ণকুতূহলকাব্যের টীকা লিখিয়াছেন (ঐ)। অন্য এক চণ্ডীদাস রাগানুগাদি ভাবের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া ভাবচন্দ্রিকা

নামে সংস্কৃতে এক গ্রন্থ লেখেন (রাজেন্দ্রলাল মিত্র—Notices of Sanskrit Manuscripts, ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৮৮১ খৃঃ অঃ) পৃঃ ১৯৭)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন চণ্ডীদাসের গীত শুনিয়া আনন্দ পাইতেন—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥ (চৈঃ চঃ ২।১০)

নিত্যানন্দের পত্নী বা পুত্রের নাম বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে নাই। সেই নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র যখন বেশ খ্যাতনামা হইয়াছিলেন, তখন জয়ানন্দ তাঁহার প্রসাদমালা পাইয়া লিখিয়াছিলেন—

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥

(জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ৩)

এই পয়ারের অর্থ অবশ্য ইহা নহে যে, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের জীবনী বা চরিত্র লইয়া ধারাবাহিক কোন কাব্য লিখিয়াছিলেন। জয়দেব বা বিদ্যাপতি যেমন কৃষ্ণের বিষয়ে কতকগুলি গীত লিখিয়াছিলেন, তেমনি প্রাক্‌চৈতন্য যুগের চণ্ডীদাস অনেকগুলি গীত লিখিয়াছিলেন। ঐ গীতগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অজ্ঞাতপরিচয় দীন কানুদাস লিখিয়াছেন—

উজ্জ্বল কবিত্ব, ভাষার লালিত্য, ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে, মুখে ভাষা ফুটে, উভয় অধীন যেন॥
সরল তরল, রচনা প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণেতে ভরা।
যেই পশে কাণে, সেই লাগে প্রাণে, শুনামাত্র আত্মহারা॥

(গৌরপদতরঙ্গিণী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৫৪৭)

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৭০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি "ক্ষণদাগীতচিন্তামণি" নামে ৩০৯টি পদের এক পদাবলী গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহার মধ্যে চণ্ডীদাসের কোন পদ ধৃত না হওয়ায় কোন কোন সমালোচক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ক্ষণদাগীতচিন্তামণি রাধা-কৃষ্ণের কৃষ্ণা প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ক্ষণদা বা রাত্রির লীলা স্মরণের জন্য, সখীভাবে ব্রজলীলার আস্বাদনের জন্য এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রাক্‌চৈতন্যযুগের চণ্ডীদাসের আক্ষেপমূলক পদ ইহাতে স্থান

পাইতে পারে না। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলন করেন এবং উহাতে চণ্ডীদাসের নয়টি পদ সঙ্কলিত হয়। ঐ নয়টি পদের মধ্যে আটটি পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে—যথা ৯৪, ৯৮, ৪০৩, ৫৭৫, ৮৭১, ১৭১৬, ১৯৬৬ এবং ১৯৯৩। নবম পদটি মনোরম হওয়া সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত চণ্ডীদাসপদাবলীতে স্থান পায় নাই। পদটি এই :—

শুন শুন সই কহিনু তোরে।
পিরিতি করিয়া কি হৈল মোরে॥
পিরিতি পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত॥
পিরিতি দুরন্ত কে বলে ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥
অবিরত বহে নয়ানে নীর।
নিলজ পরাণে পা বান্ধে থীর॥
দোসর ধাতা পিরিতি হৈল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল॥
চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি
এই অনুরাগে সকল সিধি॥

(পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি, ১৭৩ পাতা)

পদামৃতসমুদ্রধৃত নয়টি পদের মধ্যে চারিটির ভণিতায় বড়ু চণ্ডিদাস, একটিতে দ্বিজ চণ্ডিদাস ও চারিটিতে শুধু চণ্ডিদাস নাম পাওয়া যায়।

পদকল্পতরুতে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় যে পদকর্ত্তৃসূচী দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, শুধু বড়ু নামে ১টি, আদি চণ্ডীদাস নামে ১টি, বড়ু চণ্ডীদাস নামে ৬টি, দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে ২০টি ও শুধু চণ্ডীদাস নামে ৯০টি পদ, একুনে ১১৮টি পদ ধৃত হইয়াছে। কিন্তু সূচী তৈয়ারীর সময় ৮৯০ সংখ্যক পদটি শুধু চণ্ডীদাসের তালিকায় ধরিতে ভুল হইয়াছিল এবং ৭৯৫ ও ৯১৮ সংখ্যক পদে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতা থাকা সত্ত্বেও এই দুইটি শুধু চণ্ডীদাসের তালিকায় স্থান পাইয়াছে। যাহা হউক, সর্ব্বসমেত পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের ভণিতায়

১১৯টি পদ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ৯২৬ সংখ্যক পদটি রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় পদামৃতসমুদ্রে নরহরি ভণিতায় ধরিয়াছেন। উহা সম্ভবতঃ নরহরি সরকার ঠাকুরের পদ—(বর্ত্তমান সঙ্কলনের ৮০ সংখ্যক পদ)—সাহিত্য-পরিষদের ৯৮২ সংখ্যক পুথিতেও ডাঃ স্থকুমার সেন নরহরি ভণিতায় ঐ পদ পাইয়াছেন। ভণিতার এইরূপ গোলমাল আরও অনেক পদে দেখা যায়। ২০৫ সংখ্যক পদটি "থীর বিজুরি বরণ গোরি" ইত্যাদির পদকল্পতরুধৃত শেষাংশ—

চরণ-কমলে মল্লতোড়ল
সুন্দর সবক-রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে হৃদয়-উল্লাসে
পালটি হইবে দেখা॥

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শ্রীখণ্ডের কবি রামগোপাল দাস ঐ পদের অন্তে লিখিতেছেন—

চরণযুগল মল্লতোড়ল সুরঙ্গ যাবক রেখা।
গোপালদাসে কয় নব পরিচয় পালটি হইবে দেখা॥

এই ভণিতায় ছন্দপতন হইলেও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবু বলেন—"সাধারণতঃ পদটি চণ্ডীদাস ভণিতায় চলিলেও, ইহার রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি—ইহা রসকল্পবল্লী গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীখণ্ডের কবি রামগোপাল দাস বা গোপালদাসের রচিত, উক্ত গ্রন্থে গোপালদাস নিজ ভণিতায় পদটি দিয়াছেন" (চণ্ডীদাস-পদাবলী পৃঃ ১৫৮)। এটি চণ্ডীদাসের রচনা নহে বলায় আমরা হরেকৃষ্ণবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ; কেন না, প্রাক্‌চৈতন্যযুগের চণ্ডীদাসের রাধার "উচ কুচযুগ বসন খসায়ে মুচকি মুচকি হাসি" সম্ভব নহে বলিয়া আমাদের ধারণা। চণ্ডীদাস ভণিতায় প্রচলিত "সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল" ইত্যাদি পদটির শেষে আছে—

মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাসে বলে সব সুলক্ষণ বিহি ভেল অনুকূল॥

আর পীতাম্বরদাস রসমঞ্জরীতে তাঁহার পিতা গোপালদাসের ভণিতা দিয়া পাঠ ধরিয়াছেন—

হাথের বসন খসিঞা পড়িছে দেবে মাথার ফুল।
গোপালদাসে কহে সব সুলখন বিধি ভেল অনুকূল ॥

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবু ঐ পাঠ তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে বলিয়া দিয়াছেন, বসন (=বসেন) দেবে (=দেবের)। ইহাতে পুথি যে বিশুদ্ধ নহে, তাহা বুঝা যায়। তা ছাড়া এখানেও 'গোপালদাসে কহে' বলায় ছন্দপতন ঘটিয়াছে। দুই দুইটি পদের ভণিতায় নামের বেলায় এরূপ ছন্দপতন সত্ত্বেও যখন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবু এ দুটি যে গোপালদাসের রচনা, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, তখন আমরা আর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কি করিব? চণ্ডীদাস নামে প্রচলিত "ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে" (পদকল্পতরু, ৪০৩) পদটিও হরেকৃষ্ণ বাবু রসমঞ্জরীতে গোপালদাসের নামে পাইয়াছেন। ঐ পদের অনুরূপ আর একটি চণ্ডীদাসের পদ (পদকল্পতরু, ৩৯১) সম্বন্ধে কেহ কোন সন্দেহ উঠান নাই। পদের প্রথমে আছে—

আরে মোর আরে মোর সোনার বন্ধুর।
অধরে কাজর দেখি কপালে সিন্দুর ॥

গোপালদাসের নামে আরোপিত পদে—

আই আই পড়িছে রূপ কাজরের সোভা।
ভালে সে সিন্দূর তোমার মুনিমনোলোভা ॥

সুতরাং ৪০৩ সংখ্যক পদটি গোপালদাসের রচনা হইলেও চণ্ডীদাসের গৌরব কিছু ক্ষুণ্ণ হইবে না। রাধামোহন ঠাকুরের ন্যায় সুবিজ্ঞ পদকর্ত্তা ও পদ-সংগ্রাহক এবং বৈষ্ণবদাসের মতন সন্ধানী ও সাবধানী সঙ্কলনকর্ত্তা এই ৪০৩ সংখ্যক পদটির রচয়িতা সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন, ইহা ধারণা করা যেমন কঠিন, তেমনি পীতাম্বর সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের পদ নিজের পিতার রচনা বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা ভাবাও তেমনি কষ্টকর।

ভণিতা লইয়া এইরূপ গোলমালের উদাহরণ আরও কয়েকটি পদে দেখা যায়। পদকল্পতরুর দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় ৭৯৫ সংখ্যক পদের আদিতে আছে—"কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণখানি"। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু উহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭৪৮ পুথিতে "দ্বিজ শ্যামদাস কয়" ভণিতায় পাইয়াছেন (চণ্ডীদাস-পদাবলী, ১৯৫ পৃঃ)। পদকল্পতরুর ৮০৫ সংখ্যক

পদটি হইতেছে সুপ্রসিদ্ধ—

"কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥১
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার পিরিতি ॥২
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর ॥৩
কোন বিধি সিরজিলে সোতের শেহলি।
এমন বেথিত নাই ডাকে রাধা বলি ॥৪
বন্ধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥৫
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয় ॥৬

এই পদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পয়ারের সঙ্গে কিছুটা মেলে রায় রাঘবেন্দ্র ভণিতাযুক্ত এক পদের দুটি পয়ার, যথা—

রাত কৈলাম দিন বন্ধু দিন কৈলাম রাতি।
ভুবন ভরিয়া রহিল তুমার খেআতি ॥
ঘর কৈলাঙ বন বন্ধু বন কৈলাঙ ঘর।
পর কৈলাঙ য়াপুনি আপুনি হলাঙ পর ॥

অন্যান্য পয়ারের কোন মিল নাই। তথাপি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু ও ডাঃ সুকুমার সেন সন্দেহ করেন যে, হয় তো সমস্ত পদটিই রায় রাঘবেন্দ্রের। "বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরিতি"র স্থানে "ভুবন ভরিয়া রহিল তুমার খেআতি" যে একেবারে অসংলগ্ন, ইহাও তাঁহাদের মতন বিচক্ষণ পণ্ডিতদের চোখে পড়ে নাই। হরেকৃষ্ণবাবু ভবানন্দের হরিবংশ হইতেও উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ঘর কৈলু বাহির বাহির কৈলু ঘর।
পর কৈলু আপনা আপনা কৈলু পর ॥
রাত্রি কৈলু দিবস দিবস কৈলু রাতি।
অঙ্কুরে ভাঙ্গিব জানি যোগের পিরীতি ॥

চতুর্থ চরণটির উপরের তিন চরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা কঠিন, অথচ পদকল্পতরুর চণ্ডীদাসের পদে ঐ স্থানে "বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার পিরিতি" গভীর ভাবব্যঞ্জক। ইহা দেখিয়া মনে হয়, রায় রাঘবেন্দ্র, সৈয়দ মর্ত্তুজা ও ভবানন্দ বা তাঁহাদের গানের গায়কেরা চণ্ডীদাসের ঐ সুপ্রসিদ্ধ পদটির দুই একটি চরণ নিজেদের পদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। সে যুগে ছাপাখানাও ছিল না, কপিরাইটও ছিল না; আর তা ছাড়া গায়কেরাও সে কালে এবং এ কালে একের পদের মধ্যে অন্যের পদের দু চার কলি ঢুকাইয়া দিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না বা করেন না এবং গায়কের মুখে শুনিয়া অনেক পুথি লেখা হইয়াছে। পদকল্পতরুর ঐ পদটির ভণিতায় কোন পুথিতে "বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়" আছে, আবার কোন পুথিতে বাশুলী ও দ্বিজ ছাড়া শুধু "চণ্ডীদাস কহে হিয় শুনিতে যুড়ায়" আছে। আবার মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় "চণ্ডীদাস বলে এই বাসুলি কৃপায়" এরূপ পাঠও পাইয়াছেন (দীন চণ্ডীদাস, ২।৫৮৭ পৃঃ)। সুতরাং ভণিতায় দ্বিজ, বড়ু অথবা বাশুলির উল্লেখের উপর জোর দিয়া কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো কঠিন। পদকল্পতরুর ২৩৯৪ সংখ্যক পদের "পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়। আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥" ইত্যাদির ব্যাখ্যায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় টানিয়া বুনিয়া আদিরস অর্থাৎ শৃঙ্গাররস মানে করিলেও বুঝা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে অনেকগুলি চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব জানা ছিল, তাই একজন অতি চালাক চণ্ডীদাস নিজেকে আদি চণ্ডীদাস বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সত্য সত্য যিনি প্রথম চণ্ডীদাস ছিলেন, তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার নামে আরও অনেকে ভবিষ্যতে কবি হইবে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে আদি চণ্ডীদাস শব্দ ব্যবহার করা অসম্ভব। পদকল্পতরুতে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় যে ছয়টি পদ আছে, তাহার একটিতেও বাশুলি নাই। দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় ২২টি পদের মধ্যে চারিটিতে (৮০৫, ৮৫১, ৮৬২ ও ৯২৫) বাশুলি আছে। শুধু চণ্ডীদাস ভণিতার ৮৯টি পদের মধ্যে আটটিতে (২০৬, ২১০, ৩৫৩, ৬৪৪, ৮৭৩, ৮৭৭, ৮৭৯ এবং ৮৮৫) বাশুলির নাম আছে। কিন্তু বাশুলির নামযুক্ত পদগুলিও এক লোকের রচনা নহে। যেমন ২১০ সংখ্যক পদটিতে—

"শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কে ধনি মাজিছে গা।"

এবং "সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥" আছে ; সুতরাং

ইহা প্রাক্‌চৈতন্যযুগের চণ্ডীদাসের লেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই অল্প (গ্রন্থকার-লিখিত "ব্রজের সখা ও সখীদের নামের ঐতিহ্য" প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৬৪ প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ১-১৩)। ১৪৩ সংখ্যক পদে বিশাখার চিত্র আনিয়া দেখাইবার পদ সম্বন্ধেও ঐ মন্তব্য প্রযোজ্য। যে চণ্ডীদাস ২১০ সংখ্যক পদ লিখিয়াছেন, তিনিই ১৯৮, ২০২, ২০৩, ২০৬, লিখিয়াছেন— কেন না, রচনারীতি একই। ১৫৩ সংখ্যক পদটিও ইঁহার রচনা হওয়া সম্ভব ; কেন না, ইহাতে টানিয়া বুনিয়া পদ্য রচনার প্রয়াস দেখা যায় ; যথা—

এ বড় কারিগরে কুন্দিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতি-ধরম ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে॥

শরের দ্বারা কোন কারিগর মূর্ত্তি কুঁদে না ; আর ভুজঙ্গমকে দমন করা হইলেও ধৈর্য্যকে কেহ দমন করিবার জন্য চেষ্টা করে না। এই শ্রেণীর পদগুলি মণীন্দ্রমোহন বসুর দীন চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন মনে হয়। এই কবির দীন উপনামের অন্তরালে কেবলমাত্র বৈষ্ণবীয় দীনতাই নাই। পদকল্পতরুধৃত ১৪১, ৩৯১ প্রভৃতি যে পঁচিশটি পদের কথা পরে বলিতেছি, এই দীন কবির দ্বারা তাহার রচনা হওয়া সম্ভব নহে। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী ১৭০০ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়া মণীন্দ্রবাবু মনে করেন (ঐ, ভূমিকা, পৃঃ ৩৷৵)।

একজন চণ্ডীদাস শুধু বাশুলীর কথা নহে, বিশেষ করিয়া "নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে, বাশুলী আছয়ে যথা" বলিয়া ৮৭৭ সংখ্যক পদের ভণিতা দিয়াছেন। একই সঙ্গে মাঠও হইবে, আবার গ্রামের হাটও হইবে কি করিয়া? মাঠে অবশ্য হাট বসিতে পারে। যাহা হউক, ইঁহার রচনা-শৈলীর সঙ্গে মিলে, এমন একটি পদে (পদকল্পতরু, ৮৭৯)—

চণ্ডীদাস-মন বাশুলী চরণ
আদেশে রজক-নারি।

ভণিতা পাওয়া যায়। পদকল্পতরুধৃত ৬৪০ সংখ্যক পদেও আছে "রজকী-সঙ্গতি চণ্ডীদাসগীতি"। উহা দীন চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াও মণীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন (২।৪০৯ পৃঃ) যে, রজকীর কথা থাকায় "এই পদটি অতিশয় সন্দেহজনক।" কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়া কথিত মুকুন্দ-দাসের সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় নামে একখানি গ্রন্থ আছে। উহার প্রাচীন দুইখানি পুথিতে ছয়টি মাত্র প্রকরণ আছে। কিন্তু রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয় ১৩১২ বঙ্গাব্দে তাঁতিবিরল গ্রামে কৈলাসচন্দ্র ঠাকুরের নিকট এক অষ্টাদশ প্রকরণযুক্ত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় পান। সপ্তম হইতে অষ্টাদশ প্রকরণে সহজিয়া ভজনের ছাপ সুস্পষ্ট, সুতরাং কোন সহজিয়া ঐ কয়টি প্রকরণ জুড়িয়া দিয়াছিলেন মনে হয়। উহারই সপ্তম প্রকরণে অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত অংশে পাওয়া যায় যে—

তারা রজকিনী সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডিদাস।
আস্বাদিলা প্রেমসুখ রসের নির্য্যাস॥ (পৃঃ ১০৪)

আর ঐ তারার সঙ্গে একদিন সঙ্কেত করিয়া তিনি রাত্রিতে তাহার উঠানে বৃষ্টিতে ভিজিতেছিলেন দেখিয়া তারা বলিয়া উঠিল—

"এ ঘোর মেঘের ঘটা কেমনে আইলা।
আমার লাগিয়া তুমি এত দুঃখ পাইলা॥ (পৃঃ ১০৬)
এইমত যত কথা কহিল ধুবিনী।
ঘরে আসি চণ্ডিদাস করিল গাঁথনী॥"

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, বন্ধু কেমনে আইলে বাটে" ইত্যাদি পদকল্প-তরুধৃত ৭১৫ সংখ্যক পদ।

১৩১২ বঙ্গাব্দে দুর্গাদাস লাহিড়ী "বৈষ্ণবপদলহরী"তে চণ্ডীদাসের ভণিতায় সহজ ভজনের কয়েকটি পদ ছাপিয়াছিলেন। তাহার ১৭৮-১৮১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কয়েকটি পদে চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনীর নাম আছে রামী। এই চণ্ডীদাসও বাশুলীর সাধক, কিন্তু তিনি নান্নুরের বাশুলী নন, রসিক-নগরের বাশুলী। যথা—

হাসিয়া বাশুলী কয় শুন চণ্ডী মহাশয়
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রাম-দেবতা আমি ইহা জানে রজকিনী
জিজ্ঞাস গে যতনে তাহারে॥
সে দেশের রজকিনী হয় রসের অধিকারী
রাধিকা স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি ত রমণের গুরু সেহ রসের কল্পতরু
তার সনে দাস অভিমান॥ (বৈষ্ণবপদলহরী,
পৃঃ ১৮১)।

এই কবি "আমি"র সঙ্গে "কিনী"র মিল করেন, আর রজকিনীর সঙ্গে মিলান "অধিকারী"—এমনই ইঁহার কবিত্ব। পদকল্পতরুতে ২৩৯২-২৩৯৩ ও ২৩৯৪ সংখ্যক পদে সহজিয়াভাবের কথা আছে। এই পদগুলি রজকিনী তারা বা রামীর সহচর কোন চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। নান্নুরের চণ্ডীদাসের ৮৭৭ সংখ্যক পদের ধরণেই ৮৭১ হইতে ৮৮৪ অর্থাৎ তেরটি পদ এবং ৮৮৯ হইতে ৮৯৩ পাচটি ও ৮৯৫, ৮৯৬, ৯১৩, ৯৩৩, ৯৫৩ ও ৯৫৬, একুনে ২৪টি পদ পিরিতি লইয়া রচিত।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন, তাঁহার রচনার নমুনা পদকল্পতরু হইতে উদ্ধৃত করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমে প্রদত্ত সংখ্যা পদকল্পতরুর সাহিত্য-পরিষদ্ সংস্করণের সংখ্যা—

৬৭১ আমি যাই যাই বলি বলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল॥

৭১৫ এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা, কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার কোণে, বন্ধুয়া তিতিছে, দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

৭৫৫ তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥

৮১০ তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সোধায় মোরে হেন জন নাই॥

৮১৫ হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলে পিরিতের দায়॥

৮২৭ সজনি লো সই, খানিক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই।
শ্যামের বাঁশীটি, দুপর‍্যা ডাকাতি, সরবস হরি নিল॥

৮৩০ বিষম বাঁশীর কথা কহিল না হয়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥

৮৩৪ ধিক্ রঙ্গ জীবনে যে পরাধীনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হয়ে॥

৮৩৫ যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাইতে সে কানু-পথে ধায় রে॥

৮৪৪ দেখিলে কলঙ্কিনীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥

৮৮৬ ধরম করম গেল গুরু-গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরিত॥

৮৯৪ এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি টুটে॥

পদামৃতসমুদ্রের (পৃঃ ২৫২)—

সই, মরম কহিয়ে তোকে
পিরিতি বলিয়া এ দুটি আখর
কেউ না আনিব মুখে॥ (তরু ৩৮৭১)

দানলীলাপ্রসঙ্গে পদকল্পতরুধৃত ১৩৯৮ সংখ্যক পদটি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া মানিতে হয়। উহাতে রাধার নাম চন্দ্রাবলী আছে, বড়াইয়ের মধ্যস্থতায় কথা কাটাকাটি আছে, "মাকড়ের হাথে নারিকেল" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি টিট্‌কারি দেওয়া আছে এবং ভণিতাতেও "বড়ু কহে বাশুলির বলে" পাওয়া যায়। পদকল্পতরুর এই উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায় যে, ঐ কবি বৈষ্ণবদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হন নাই।

বিশেষণহীন একজন প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস ছিলেন বলিয়াই পরবর্ত্তী কালে বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা

অন্যান্য চণ্ডীদাসকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরা এই বিশেষণহীন চণ্ডীদাসকে আদি ও অকৃত্রিম চণ্ডীদাস বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। তাঁহার ভণিতার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া এবং ভাব ও ভাষা বিচার করিয়া আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিতব্য গ্রন্থে তাঁহার ১১২টি পদ নির্ব্বাচন করিয়াছি। চণ্ডীদাসের কোন্‌টি আসল পদ তাহা নিরূপণ করিতে পারিলে, নরহরি সরকার তাঁহার দ্বারা কি ভাবে কতটা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন, তাহা বুঝা যাইবে।
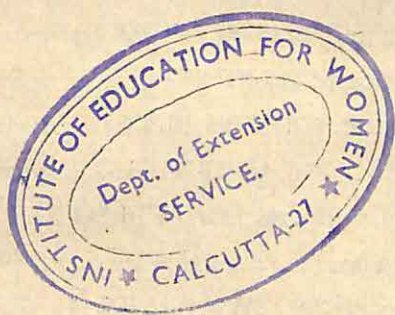
নবম অধ্যায়

কৃষ্ণকীর্ত্তনের স্বরূপ-বিচার

অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসকেই আদি ও অকৃত্রিম কবি চণ্ডীদাসরূপে উপস্থিত করা এখন একটা রীতির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। ঐ কবির রচিত কাব্যের প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় না। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় লিখিয়াছেন—"পুথির আদ্যন্ত-বিহীন খণ্ডিতাংশে কবির পরিচয়, রচনাকাল, লিপিকাল প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় নাই; এমন কি পুথির নামটি পর্য্যন্ত না। দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাস-বিরচিত "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র অস্তিত্বমাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম। এত দিনে তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুথিই "কৃষ্ণকীর্ত্তন" এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দ্দেশ করা হইল ("কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র সম্পাদকীয় বক্তব্য)। আমাদের ধারণা যে, দীন চণ্ডীদাস কৃষ্ণের জন্মাদি লীলাসমূহ লইয়া পালাগানের বই লিখিয়াছিলেন বলিয়া লোকে বলিত—চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া এক বই লিখিয়াছেন। ১২৮০ বঙ্গাব্দে জগদ্বন্ধু ভদ্র "মহাজনপদাবলী"র ভূমিকায় (পৃঃ ৪৬) লিখিয়াছিলেন—"কোন কোন পুস্তকে আভাস পাওয়া যায় যে, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে একখানি গ্রন্থ ছিল।" সম্ভবতঃ ভদ্র মহাশয়ের এই উক্তিকে ভিত্তি করিয়া ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ১৩০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-সংখ্যা নব্যভারতে লিখিয়াছিলেন যে, চণ্ডীদাসের "পূর্ণ গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পাওয়া যায় নাই।" অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের বইয়ের নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বলিলে কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা হয়। কীর্ত্তন শব্দের একটি অর্থ হইতেছে কীর্ত্তি, খ্যাতি বা যশ বিষয়ক স্তুতিগান। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণের চরিত্র যত দূর সম্ভব, মসীলিপ্ত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে প্রেমের কোন সম্বন্ধই নাই; সে শুধু আত্মতৃপ্তি চায়, সে নায়িকাকে শুধু গালাগালিই করে না, ফৌজদারী মোকর্দ্দমার আসামীর মতন সে মায়ের বকুনি খাইয়া নায়িকার নামে তুরপনেয় কুৎসা ঘোষণা করে। তাহার মনে দয়া নাই, মায়া নাই; সে বহু বার নায়িকাকে উপভোগ করিয়াও শুধু তাহার দোষত্রুটীই শেষ পর্য্যন্ত

মনে রাখে এবং সে জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করে। এই কথাগুলি পরে উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিব। বসন্তরঞ্জনবাবুর আবিষ্কৃত খণ্ডিত পুথির নাম রাধাকৃষ্ণের ধামালী বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয়; কেন না, ঐ পুথিতে রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি ধামালী বলিতেছেন, এইরূপ উক্তি দ্বাদশ বার পাওয়া যাইতেছে। যথা (পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রথম সংস্করণের):—

(১) সব গোপী ছাড়ী বনমালী।
মোরে কেহ্নে বোলএ ধামালী॥ পৃঃ ৩৫

(২) নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।
রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী॥ ৫১

(৩) ধামালী সহিত কাহ্নাঞি বোলে তিখ বাণী।
হেন মতে বিগুতিলে সোদর মাউলানী॥ ৫২

তিখ—তীক্ষ্ণ; বিগুতিলে—বিমর্দ্দন করিল বা নাস্তানাবুদ করিল।

(৪) হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসী মরী।
পরার পুরুষ সমেঁ ধামালী না করী॥ ৮৯

(৫) আহ্মে দুখমতী নারী আঠ কপালী।
আসিআঁ পড়িআঁ গেলোঁ কাহ্নের ধামালী॥ ৯৬

(৬) এবে যশোদার পো মরু বনমালী।
ধামালী বোলের পালাউক সলী॥ ১০৮

অর্থাৎ রাধা বলিতেছেন—এখন যশোদার ছেলে বনমালী মরুক, ধামালী-বোলের যে তীর বেঁধার মতন বেদনা, তাহা দূর হউক।

(৭) আপন খাআঁ বোলে ধামালী।
সম্বন্ধ না মানে বনমালী॥ ১১১

(৮) তীন লোক খাআঁ তোহ্মার জরম।
কাহারে বোলসি ধামালী॥ ১২৯

(৯) মতি খাআঁ মোরে তোএঁ করসি ধামালী।
বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ তোরে গালী॥ ১৫২

(১০) কৃষ্ণে দেখিলেঁ বড়ায়ি পাড়িবেক গালী।
অঞ্চলে ধরিব আর বুলিব ধামালী॥ ২২১

(১১) কৃষ্ণের উক্তি ঃ—

বারেক জিঅ তোঁ গোআলী।
আর না বুলিবোঁ ধামালী॥ ২৮৮

(১২) কৃষ্ণ বলিতেছেন—

সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সঙ্গে কেলি।
মোর পানে আল রাধা তেজহ ধামালী॥ ৩৫৭

বিদ্যাপতি "মাতামাতি" অর্থে ধমারি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা— "সাপক সঙ্গে সিবে রচলি ধমারি" অর্থাৎ শিব সাপের সঙ্গে মাতামাতি করে। হিন্দীতে ধামার শব্দের অর্থ হোলির অশ্লীল গান। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস উহার চেয়েও খারাপ অর্থে যে ধামালী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত উদাহরণগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। বসন্তরঞ্জনবাবু ধামালীর মানে লিখিয়াছেন—রঙ্গরস, পরিহাস। কিন্তু কয়েকটি উদাহরণে, যথা তৃতীয় ও দ্বাদশে সঙ্গমকামনা প্রকাশ করা অর্থে ধামালী শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ধামালীর অর্থ করিয়াছেন ধূর্ত্তামি বা নষ্টামি। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যখানি কৃষ্ণের ধূর্ত্ততা ও নষ্টামি দেখাইবার জন্য রচিত হইয়াছে। কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচনের ন্যায় অসার্থক নামকেও যখন লোকাচার হিসাবে মানিয়া লইতে হয়, তখন অগত্যা আমরা বসন্তরঞ্জনবাবুর আবিষ্কৃত পুথিকে কৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া উল্লেখ করিব।

এই বইখানিতে খণ্ডিত পদ কয়েকটি লইয়া ৪১৫টি পদ আছে ; তাহার মধ্যে ৪০৩টির ভণিতা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২৮৯টি পদের সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাস, ১০৭টি পদে শুধু চণ্ডীদাস এবং সাতটি পদে অনন্ত বা আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা দেখা যায়। ইহাতে সন্দেহ হয় যে, বুঝি তিন জন কবির রচনা কৃষ্ণকীর্ত্তনে স্থান পাইয়াছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় ১৩৪২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মত প্রকাশ করেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথির পদ এক কবির নয় (পৃঃ ৪১), অনন্তকে তিনি এক গায়ন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন (পৃঃ ৪৬)। তৃতীয়তঃ তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, "বড়ু নাই, বাসলী নাই, এমন পদও কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রবেশ করিয়াছে"

(পৃঃ ৪৪)। আমরা খুঁজিয়া দেখিয়াছি যে, বড়ু নাই, বাসলী নাই, শুধু চণ্ডীদাস ভণিতা কৃষ্ণকীর্ত্তনে চার বার দেওয়া হইয়াছে। যথা, (১) কালিয়-দমনে বলদেবের স্তবের পর "তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ" (পৃঃ ২৩৫-২৩৬)। ঐ পদটিকে যদি প্রক্ষিপ্ত বলা হয়, তাহা হইলে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার "ত্রিভুবননাথ তোহ্মে হরী" ইত্যাদি কালিয়-পত্নীর স্তব অপ্রাসঙ্গিক হয়।

(২) বাণখণ্ডে রাধার বাণাঘাতের পর বড়াই যখন কানাইকে নানারূপ গালি দিলেন ও ভয় দেখাইলেন, তখন কানাই বলিলেন যে, ফুলের ঘায়ে কি কেউ মারা যায়? যাই হউক—

ছাড়িলেঁা মো দানঘাট আর পরিহাসে।
তোলহ রাধাকে বড়ায়ি গাইল চণ্ডীদাসে॥ (পৃঃ ২৮৩)

এখানে বড়ু নাই, বাশুলি নাই; কিন্তু এটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিলে ঠিক এর পরের "বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে"র ভণিতাযুক্ত পদের বড়াইয়ের উক্তির—

"পরাণে মারিআঁ রাধা পাঁচশর বাণে।
এবেঁ কি বোলহ মো ছাড়িলেঁা সব দানে॥"

সার্থকতা থাকে না।

(৩) বড়াই শেষে বলিলেন যে, রাধাকে বাঁচাইলে সে কানাইয়ের বশ হইবে—

সহজেঁ হৈব তোর চন্দ্রাবলী বসে।
জিআঅ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে॥ (পৃঃ ২৮৬)

ইহার পরের পদে "বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে" ভণিতা আছে এবং উহার প্রথমেই বড়াইয়ের কথা অনুসারে কৃষ্ণ রাধাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন দেখা যায়। সুতরাং এখানেও শুধু চণ্ডীদাসের পদকে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না।

(৪) রাধা বড়াইকে অনুনয় করিতেছে—

"আনি দেহ এবেঁ কাহ্নাঞিঁ গাইল চণ্ডীদাসে"। ঠিক পরের পদে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় দেখি, বড়াই রাধাকে উত্তর দিতেছেন—"কথা পাইব কাহ্নের উদ্দেশে।" ইহা কাহিনীর সঙ্গে ঠিক খাপ খায়। সুতরাং শুধু

চণ্ডীদাস ভণিতা দিয়া অন্য কোন কবি কৃষ্ণকীর্ত্তনে পদ ঢুকাইয়া দেন নাই দেখা গেল।

অনন্ত নামের সাতটি পদ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ প্রাসঙ্গিকতা দেখা যায়। ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—"দানখণ্ডের অন্তর্গত পদ তিনটি স্পষ্টতই প্রক্ষিপ্ত। কারণ, আগের ও পরের পদের ভাবের ব্যতিক্রম এই তিন পদে রহিয়াছে" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস; দ্বিতীয় সং, পৃঃ ১৭৩)। এই উক্তি কতটা বিচারসহ দেখা যাউক। ৫৬ পৃষ্ঠার "অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস"যুক্ত ভণিতার পদটিতে কানাই দানের পরিমাণ গণনা করিতেছেন—"হাথে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ্ন"। ঠিক পরের পদে রাধা বলিতেছেন—"মিছা খড়ি পাড় কাহ্নাঞি কপট নাটে।" আনন্ত নামের পদে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের দান চাওয়া হইয়াছিল; ঠিক পরের বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার পদে রাধা বলিতেছেন—"কথাঁহো নাহিঁ শুনী দেহত বসে দান"। সুতরাং এখানে পারম্পর্য্য ভঙ্গ হয় নাই দেখা যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ ৬০-৬১ পৃষ্ঠার অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের পদে কানাই রাধার রূপের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন—

ছাড়িল রাধা তোর দধির দান
দেহ চুম্ব আলিঙ্গনে।

ইহার উত্তরে অনন্ত ভণিতার পদে রাধা বলিতেছেন—

কেমনে কাহ্নের বোল পালিবোঁ
মোরে পরাণে ডরাওঁ।

তাহার পরে চণ্ডীদাস বাসলীগণ ভণিতায় কৃষ্ণ ফের তাহার রূপের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন—"সরস হাসিআঁ বোল বচন"। এইরূপ বার বার একই ধরণের উক্তি-প্রত্যুক্তি দানখণ্ডের ১১১টি পদের মধ্যে দেখা যায়। তাহার উদাহরণ পরে দিব। পুনরুক্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলিলে সমস্ত দানখণ্ডই প্রক্ষিপ্ত বলিতে হয়। অনন্তের নামের অন্যান্য পদেও বিনা কারণে সংশয় তুলিয়া শেষে সুকুমারবাবু বলিয়াছেন—

রাধাবিরহের প্রথম পদটিতে "আনন্ত ছন্দে বাধে, সুতরাং এখানে এটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়।" কৃষ্ণকীর্ত্তনে ছন্দপতনের বহু দৃষ্টান্ত আছে; সেগুলি সবই কি প্রক্ষিপ্ত? অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন যে,

"অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে" ভণিতার একমাত্র সঙ্গত অর্থ "অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস (চণ্ডীদাসরচিত পালা) গান করিল" (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ৫৯)। কিন্তু তাঁহার বন্ধনীর মধ্যেকার উক্তির সমর্থন কোথায়? কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবির নাম যে অনন্ত ছিল, তিনি তো তাহা নিজেই স্পষ্টভাবায় স্বীকার করিয়াছেন—

অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল
দেবী বাসলীগণে (পৃঃ ২১৩)।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪২, পৃঃ ২০) অনুসরণ করিয়া সুকুমারবাবু ৬৮ এবং ৬৯ পৃষ্ঠার পদ দুইটির মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। কিন্তু মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় উত্তমরূপে দুইটি পদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "প্রথম পদটিতে প্রচলিত প্রথায় রাধার রূপ বর্ণনা করিতে করিতে ইহার শেষ কলিটিতে কবির মনে সমুদ্রমন্থনের উপমার ধারণা উদিত হইয়াছিল, আর তাহাই তিনি দ্বিতীয় পদটিতে বিবৃত করিয়াছেন। অতএব এই দুইটি পদ একই কবির রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।" (বাঙ্গালা সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬)।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্মখণ্ড হইতে বংশীখণ্ড পর্য্যন্ত বার খণ্ড যে একই কবির রচনা, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ভাব, ভাষা এবং ঘটনার পারম্পর্য্য এই বার খণ্ডের মধ্যে এক সংহতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। উহা "খণ্ড" নামে অভিহিত হয় নাই, ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উহার ঘটনা ও ভাষা দেখিয়া মনে হয় যে, উহা স্বতন্ত্র এক কাব্য। সম্ভবতঃ এই কবিরই বৃদ্ধ বয়সের রচনা। এ সম্বন্ধে পরে বিচার করিব।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের কাহিনীর ভিত্তি হইতেছে এই যে, কৃষ্ণের সহিত রাধার মামী সম্বন্ধ সত্ত্বেও প্রথমে কৃষ্ণের আগ্রহে এবং পরে রাধার প্রার্থনায় উভয়ের দৈহিক সম্ভোগ ঘটে। অগম্যাগমনের এই অবৈধ কাহিনীর কথা কবি বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। এক দানখণ্ডেই ১৪ বার উহার উল্লেখ দেখা যায়:—

(১) এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসলি লাজ।
তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুন দেবরাজ॥ ৪৮
(২) লাজ না বাসসি তোএঁ গোকুলকাহ্ন।

সোদর মাউলানীত সাধ মহাদান ॥ ৫০

সোদর মাউলানী=সহোদর মাতুলানী। প্রায় সহোদর শালার মতন।

(৩) নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী। ৫১

(৪) কেহ্নে তোহ্মে মোরে বোল শালী।
সম্বন্ধ না মান ভাগিনা বনমালী ॥ ৫৪

(৫) হেন হএ বড়ার বেভারে।
মাউলানীক পাইল বাণিজারে ॥ ৬৪

(৬) কোন পুরাণে কাহ্ন হেন শুনিলী কাহিনী।
তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মেত মাউলানী ॥ ৭২

(৭) তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মেত মাউলানী। ৭৭

(৮) হেনক বচন, না বোল কাহ্নাঞিঁ, তোর বাপে নাহিঁ লাজ।
সোদর মাউলানীত, ভোলে পড়িলাহা, দেখিআঁ রূপস কাজ ॥ ৯৭

(৯) সোদর ভাগিনা বড়ায়ি মাঙ্গএ সুরতী। ১০০

(১০) কাহ্ন নিলজ মামীক রতি চাহে ॥ ১১০

(১১) সম্বন্ধ না মানে বনমালী। ১১১

(১২) ভাগিনা হইআঁ কৈলী পাপত মতী। ১১২

(১৩) ভাগিনা তোহ্মাক জানী আহ্মে তোর মাউলানী। ১১৭

(১৪) আল ভাগিনা শুন বনমালী। ২৯

নৌকাখণ্ডেও উহার প্রতিধ্বনি—

(১৫) তোহ্মেত ভাগিনা আহ্মে তোহ্মার মাউলানী ॥ ১৫১

(১৬) নিলজ কাহ্নাঞি তোর বাপে নাহিঁ লাজ।
মাউলানীক বোলহ হেন কাজ ॥ ১৫২

যমুনাখণ্ডে—

(১৭) হেন দুরুজন সে কাহ্নাঞি।
মামী মাউসী তার ঠায়ি নাহী ॥ ২৪৭

রাধাবিরহখণ্ডে রাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম প্রার্থনায় অধীরা হইয়াছেন, তখন কৃষ্ণ 'দানখণ্ডের' রাধার পাল্টা জবাব গাহিয়া বলিতেছেন—

(১৮) এবেসি জানিল ভৈল কলি আবতার।
সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহেঁ জার॥ ৩৫৭

(১৯) আহ্মে ত ভাগিনা তোর দেব সমতুলে। ৩৫৭

কবি যেন ঐ অবৈধ সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিতে বেশ আনন্দ পাইতেন। অথচ একমাত্র অর্ব্বাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ছাড়া অন্য কোন পুরাণে রাধাকৃষ্ণের এরূপ সম্বন্ধের কথা নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে (প্রকৃতিখণ্ড, ৪৯ অধ্যায়) আছে যে, রায়ান কৃষ্ণের জননী যশোদার সহোদর এবং গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ। রাধার বয়স যখন বার বৎসর, তখন রায়ানের সহিত তাহার বিবাহ হয়। আর বিবাহের পর চৌদ্দ বৎসর অতীত হইলে কৃষ্ণ গোকুলে শিশুরূপে আসেন। অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে রাধা কৃষ্ণের চেয়ে ছাব্বিশ বৎসরের বড়। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস এই কাহিনী মানিয়া লয়েন নাই। তাঁহার মতে রাধার বয়স যখন এগার (পৃঃ ৩৫), কৃষ্ণের বয়স বার (পৃঃ ৯৩)। ·ন সমুদ্র অনুসারে রাধার পিতার নাম বৃষভানু, এই কবির মতে সাগর [illegible] দ্বিতীয় [illegible]ন্ত বড়ু চণ্ডীদাস কোন লৌকিক কাহিনীতে রাধাকৃষ্ণে[illegible] রচনা নাই, সম্বন্ধ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বহু কবি সংস্কৃতে র[illegible] নিল২৮৬ [illegible] কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু কেহই এইরূপ সম্বন্ধের ইঙ্গিত [illegible] না মম একই বিদ্যাপতির পদ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া কোথাও মামী ভাগিনা [illegible]ন্ধের কোন উল্লেখ পাইলাম না। পদকল্পতরুর তিন হাজার এক শ একটি পদের কোথাও কোন কবি এরূপ কোন কথা বলেন নাই। দীন চণ্ডীদাসের পদেও ইহার কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং কবিকুলের মধ্যে এই অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস এ বিষয়ে অনন্য।

কিন্তু বিশ্বের কবিকুলের মধ্যে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের অনন্যসাধারণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার চিত্রিত প্রেমের আদর্শে। অতি বড় লম্পটও প্রেম করিবার পূর্ব্বেই নায়িকাকে অপদস্থ করিয়া ত্যাগ করিব, এ পরিকল্পনা করে না। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ বলিতেছেন—

বড়ায়ি ল।
কদমের তলে বসী যমুনার তীরে
দান ছলেঁ রাখিবোঁ রাধারে।

বড়ায়ি ল।

লুড়িআঁ (=লুটিয়া) সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার

কাঢ়ী লৈবোঁ সাতেসরী হারে॥

বড়ায়ি ল।

বাটেত সৃজিআঁ দান করি তার আপমান

তোর মোর সাধিব মান॥

বড়ায়ি ল।

ধরিহ মোর যুগতী রাধার হআঁ সংহতী

চলি জাইহ মথুরার হাটে।

আহ্মাক রুষ্ট বচনে তোষিহ রাধার মনে

আহ্মে যবেঁ রোধিব বাটে॥

ছাড়াইবোঁ তার ক্ষীর কাঞ্চুলী কবিবোঁ চীর

হাথ দিবোঁ তাহার তনে।

তোর আনুমতী লআঁ বলে রাধাক ধরিআঁ

লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে॥

পাছেত মদন বাণে হাণিআঁ তাক পরাণে

রহিবোঁ ধরি মুনি বেশে।

বসি তোহ্মে তার পাশে করিহলি উপহাসে

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ পৃঃ ২৮

সমগ্র কাব্যের মূল বক্তব্য বিষয় বা অনুক্রমণিকা এখানে বলা হইয়াছে। সে কালে গ্রন্থের প্রারম্ভে 'বস্তুনির্দ্দেশ' করার রীতি ছিল। সুতরাং এটিকে কোন গায়নের দ্বারা সংযোগ করা হইয়াছে বলা চলে না (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪২।১। পৃঃ ৪৩)। কাব্যের নায়কের সংকল্প এই যে, সে চুরি, রাহাজানি, ধর্ষণ, বলাৎকার প্রভৃতি করিয়া অবশেষে নায়িকাকে ত্যাগ করিয়া লোকসমাজে তাহাকে উপহাস্য করিয়া তুলিবে। ঠিক এই পরিকল্পনা অনুসারেই সে কাজ করিয়াছে। যেমন নায়কের ভালবাসা, তেমনি নায়িকার প্রেমের আতিশয্য। শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় গোপীদের সঙ্গে জলকেলি করিয়া শেষে—

ডুবেঁ পদ্মবন গিআঁ।

গোপী ভাণ্ডী চির রহিলা মুখ তুলিআঁ (২৫৬)

কবির দেশে বড় নদী ছিল না, তিনি পুকুরে পদ্মবন দেখিয়াছেন, সুতরাং যমুনার মধ্যেও পদ্মবন কল্পনা করিয়াছেন। বৃন্দাবনের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোন জ্ঞানই ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মীধর যখন তাঁহার কৃত্যকল্পতরু সঙ্কলন করেন, তখনই বৃন্দাবন তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে। কিন্তু আমাদের অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন যে, বৃন্দাবনে বিস্তর বাঘ ভাল্লুক আছে (পৃঃ ২৯৭)। যাহা হউক, কৃষ্ণ জলে লুকাইলে গোপীরা তাঁহাকে কিছুক্ষণ খুঁজিয়া, পরে সাব্যস্ত করিল যে, তিনি মারা গিয়াছেন—

জীয়ন্ত থাকিত যবেঁ নান্দের নন্দনে।

এতখণে আবসই হৈত দরসনে॥ ২৫৬

নায়িকার সহিত জলকেলি করিতে করিতে নায়ক যদি মারা যায়, তাহা হইলে প্রেমিকা কি করে? বড়াই রাধাকে বলিল যে, এখন তাড়াতাড়ি এখান হইতে সকলে আমরা চলিয়া যাই; তা না হইলে লোকে কানাইয়ের মৃত্যুর জন্য আমাদিগকে দায়ী করিবে—

আ ল রাধা

যাবত কেহো নাহিঁ স্থনে।

তাবত করি ঘর গমনে॥

সখিসব নিষধ যতনে।

কেহো তার না কহিএ মরণে॥

এ বারতা যবেঁ বাহিরাএ।

সভার পরাণ তবেঁ জাএ॥

একইতি মাএর ছাওআল।

সুন্দর বাল গোপাল॥

তোত লাগি যমুনাত মৈল।

এবেঁ তোর মনে সুখ ভৈল॥ (২৫৭)

অনেকগুলি গোপী মেলিয়া একা ছেলেমানুষ কানাইয়ের সঙ্গে যমুনার মধ্যে

কেলি করিয়াছে, সুতরাং কানাইয়ের মৃত্যুর জন্য তাহারাই দায়ী। এই ভয়ে বড়াই রাধাকে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতে বলিতেছে। এখন পলাইয়া প্রাণ বাঁচুক, তার পর কাল সকালে আসিয়া কানাইয়ের লাশ ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেই চলিবে—

কালী সঙ্কে হয়িআঁ একঠায়ি।
ভাল মতেঁ চাহিব কাহ্নাঞিঁ। (২৫৭)

বড়াই না হয় নষ্ট দুষ্ট কপটিনী কুট্টনী। কিন্তু প্রেমিকা রাধা বিনা প্রতিবাদে তাহার এইরূপ প্রস্তাব মানিয়া লইল কিরূপে? অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের এইখানেই বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর কোন কবি এমন প্রেমের ছবি আঁকিতে পারে নাই যে, নায়ক প্রেম করিতে করিতে ডুবিয়া মরিয়াছে আশঙ্কা করিয়া, নায়িকা তখনই চুপি চুপি পলায়ন করে। পরের দিন সকালে সখীদের সঙ্গে লইয়া রাধা যখন কৃষ্ণকে খুঁজিতে আসিলেন, তখন তাঁহার মনের অবস্থা সংস্কৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"অতনুমতনুবাণব্যূহদাহং বহন্তী"

অর্থাৎ, প্রবল কন্দর্পবাণে জর্জ্জরীভূতা। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা প্রেমিক জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, সুতরাং প্রেমিকার তো মদনবাণে জর্জ্জরিত হওয়াই এই কবির মতে স্বাভাবিক! সংস্কৃত শ্লোকগুলি হয় তো পরে অন্য কেহ লিখিয়াছিল, সুতরাং এই প্রসঙ্গ আর বাড়াইব না।

রাধাকৃষ্ণের এই উৎকট প্রেমের কাহিনী রচনা করিতে যাইয়া অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস অনেক স্থলেই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং ঘটনার পারম্পর্য্য ভঙ্গ করিয়াছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। দানখণ্ডের ঘটনার সময় রাধার বয়স এগার ছিল বলিয়া ৩৫, ৪৫ ও ৫৮ পৃষ্ঠায় জানা যাইতেছে। শেষোক্ত স্থানে আছে—"এগার বরিষে কাহ্নাঞি বার নাহিঁ পুরে"। কিন্তু ঐ দিনই ফের রাধা বলিতেছেন—"এ বার বরিষ মোর তের নাহিঁ পূরে" (৭০ পৃঃ)। কিন্তু আবার রাধা নিজমুখেই বলিতেছেন—

"দধি বিকে জাইএ বড়ায়ি বারহ বৎসর।
কোণোহো দানীর পোএঁ না দিল উত্তর॥ (৯৬)

অর্থাৎ, আমি আজ বার বৎসর দধি বেচিতে যাইতেছি, কোন দিন কোন

দানীর বেটা কিছু বলে নাই (আজ এ কি উপদ্রব ?)। রাধা কি তবে জন্মিবার এক বৎসর আগে হইতেই দই বেচা আরম্ভ করিয়াছিল ? এক জায়গায় উত্তেজনার বশে রাধা বেফাঁস কথা বলিয়াছে, ইহা বলিলে চলিবে না। কেন না, ফের ১২৬ পৃষ্ঠায় সে বলিতেছে—

"এহি মথুরা নগরে যাওঁ বারহ বৎসরে''।

কাহিনীর প্রথমে তাম্বুলখণ্ডে বলা হইয়াছে যে, একদিন রাধাকে লইয়া বনপথে মথুরায় যাইতে যাইতে এক পথে বড়াই গেল, অন্য পথে রাধা গেল। বড়াই কৃষ্ণকে রাধার কথা জিজ্ঞাসা করায়, কৃষ্ণ রাধার রূপ বর্ণনা করিতে বলিলেন। ঐ বর্ণনা শুনিয়াই কৃষ্ণ মদনবাণে ব্যথিত হইলেন (১৩) এবং বড়াইকে অনুরোধ করিলেন—

''রাধিকা মানাআঁ বড়ায়ি পুর মোর আশ।" (১৩)।

রাধাকে দুধ দই বিক্রয়ের ছলে বড়াই আনিয়া কানাইয়ের কাছে পৌছাইল। কিন্তু ২৯ পৃষ্ঠায় আছে—

হেন মতে নিতি নিতি মথুরা নগরে।
দধি দুধ বিকনিআঁ রাধা আইসে ঘরে॥

আবার ৩১ পৃষ্ঠায় বড়াই আইহনের মাকে বলিতেছে যে, দেখ, ঘরে দুধ দই নষ্ট হইতেছে,

বোল রাধিকারেঁ সহি বড়ই যতনে।
যেহ্ন জাএ রাধা কালি বড়ই বিহাণে॥

ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, রাধিকা সাধারণতঃ ঘরের বাহির হয় না, ঐ দিন বড়াইয়ের কথায় তাহার শাশুড়ী তাহাকে হাটে যাইতে অনুমতি দিল। রাধা ৬২ পৃষ্ঠায় বলিতেছে—"ঘরত বাহির নহোঁ বড়ায়ি গো স্বামীর বড়ই দুলালী" ; কিন্তু ১৭৫ পৃষ্ঠায় মথুরায় ভার লইয়া যাইবার সময় বেলা হইয়া যাওয়ায় সে বলিতেছে—"জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবোঁ।" তাহা হইলে রাধা কি প্রত্যহই দুধ যোগাইতে মথুরায় যাইত ? কাহারও কাছে দৈনিক দুধ দিবার সর্ত্ত ছিল ? ২৯ পৃষ্ঠাতে "হেন মতে নিতি নিতি মথুরা নগরে'' বলায় তাহাই বুঝায়। তাহা হইলে আর শাশুড়ীকে বলিয়া কহিয়া রাধাকে আনার কৃতিত্ব বড়াইয়ের কোথায় ? কৃষ্ণ যখন রাধার কাছে

দানের জন্য জোর জবরদস্তি আরম্ভ করিয়াছেন, তখন রাধা বলিতেছেন—

এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ নান্দের ঘরে।
চাণ্ডাল কহ্নাঞি এবেঁ বল করে॥ (৫০)

যদি নন্দের বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ এক সঙ্গেই মানুষ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আবার বড়াইয়ের মুখে রাধার রূপবর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণের মদনজ্বালা হওয়া এবং তাহার সহিত মিলিবার আগ্রহ হয় কেন?

কৃষ্ণ প্রথম যখন রাধার কাছে দান চাহিলেন, তখন রাধা বলিলেন যে, মথুরার পথে ঘৃত দুধে আবার দান লাগে, এমন কথা কখনও শুনি নাই (৩৬ এবং ৫৯)। কিন্তু হঠাৎ ৫০ পৃষ্ঠায় রাধা বলিতেছেন—

বারেঁ বারেঁ কাহ্ন মো দধি বিকে জাওঁ।
সমুচিত দান ঘাট তোর না ভাঙ্গাওঁ॥

বসন্তরঞ্জনবাবু ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"পুনঃ পুন এই পথ দিয়া দধি বিক্রয় করিতে যাইতেছি। তোমার দানঘাটের উচিত ব্যবস্থা ত কখনও উল্লঙ্ঘন করি নাই।" (৪৮৩)।

দানখণ্ডের কোথাও বলরামের কথা নাই। কৃষ্ণ যখন বলিলেন যে, তিনিই বেদ উদ্ধার করিয়াছেন, দৈত্য নাশ করিয়াছেন, রাবণ বধ করিয়াছেন, তখন রাধা বলিলেন—

আকাশ প্রমাণ, লঙ্কার গড়, তোহ্মার পরাণে তথাঁ জাই।
গরু রাখোআল, গোঠে থাকহ, মিছা বোলহ দুঈ ভাই॥

মহাকবি এখানে নিছক 'জাই'এর সঙ্গে মিল করিবার জন্যই "ভাই" বলরামকে টানিয়া আনিয়া "দুঈ ভাই"য়ের কথা বলিয়াছেন।

দানখণ্ডে এইরূপ বহু পরস্পরবিরোধী উক্তি আছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের ৯৫ পৃষ্ঠায় "জমল আর্জ্জুন রাধা দুই আসুরে" দেখিয়া, পরে ১৭৫ পৃষ্ঠায় "জমল আর্জ্জুন তরু উপাড়িল আহ্মে" পাইয়া উভয়ের অসঙ্গতি এড়াইবার জন্য অনুমান করিয়াছিলেন যে, যেখানে জমল এবং অর্জ্জুনকে অসুর বলা হইয়াছে, তাহা এক গায়নের রচনা এবং যেখানে গাছের কথা আছে, সেই পদটি কবির রচনা। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪২।১, পৃঃ ৪৪)। কিন্তু উপরে যে অসংখ্য অসামঞ্জস্যের উদাহরণ দিলাম,

তাহার প্রত্যেকটিই কি প্রক্ষিপ্ত? দানখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের কথাকাটাকাটির অসংখ্য পুনরুক্তি ও একঘেয়েমি লক্ষ্য করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "বস্তু জটিল ও বিচিত্র নয়। এক কবির পক্ষে এত পদ রচনা দুষ্কর মনে হয়।...... ...এক এক গায়ন মূল কবির তুল্য পদ রচনা করিতে পারিতেন" (ঐ)। এই কথা স্বীকার করিলে তো লোম বাছিতে কম্বল উজাড় হইয়া যাইবে। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের দানখণ্ডের আমরা ১১১টি মাত্র পদ পাইয়াছি; আর সুরদাস দানলীলা সম্বন্ধে ২৮৯টি পদ লিখিয়াছেন (কাশী নাগরীপ্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত সুরসাগর, প্রথমভাগ, পদসংখ্যা ১৪৬০ হইতে ১৭৪৯ পর্য্যন্ত)। সুরদাস সত্যই মহাকবি বলিয়া তাঁহার রচনায় পরস্পরবিরোধী উক্তি নাই, একই উক্তি, ঘটনা ও উপমার অনন্ত পুনরাবৃত্তিও নাই। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে এই প্রকার পুনরাবৃত্তি দোষ কত প্রবল, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। রাধার উপর অত্যাচার করিয়া দান লইলে কংস কৃষ্ণকে শাস্তি দিবেন, এই কথা রাধা ১৮ বার বলিয়াছেন (পৃঃ ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৭, ৫৬, ৫৮, ৬৫, ৭১, ৭২, ৮৩, ৮৫, ১০২, ১০৫, ১০৭, ১১২, ১১৩, ১২৫, ১২৬)। রাধিকা "অতিশয় বালী," সুতরাং বনমালীর সম্ভোগযোগ্যা নহে, এই কথাটা রাধা তের বার বলিয়াছেন (পৃঃ ৪৫, ৪৬, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৮৪, ৮৭, ৯৭, ৯৮, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২৮)। এক দিকে রাধা নিজেকে বালিকা বলিতেছেন, অন্য দিকে বারংবার নিজের রূপযৌবনকে ধিক্কার দিতেছেন, যথা—

(১) দেহে বৈরি হৈল মোকে এ রূপ যৌবন।
কাহ্নু লজ্জা হরিল দেখিআঁ মোর তন॥ ৫২

(২) . চারি পাস চাহোঁ তেন বনের হরিণী ল
নিজ মাঁসে জগতের বৈরী॥ ৭৮

(৩) কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥ ৮৮

(৪) এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতেঁ না পারী।
আপন গাএর মাঁসে হরিণী বিকলী॥ ১০০

কানাই রাধার উপর জোরজবরদস্তি করিতেছেন, এই কথাটা বহু বার বলা

হইয়াছে। দানখণ্ডের প্রথমেই দেখি, রাধা দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

ঘৃত দধি সব খাইল কাহ্নাঞি
ণাম্বাআঁ মোর পসারা।
কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ তন বিগুতিল
ছিড়িঁ সাতেসরী হারা॥ (৩৮)

কানাই আমার পসরা নামাইয়া ঘি দই সব খাইল ; আমার কাঁচুলি ভাঙ্গিয়া স্তন বিমর্দ্দন করিল, সাতেসরী হার ছিঁড়িয়া ফেলিল। ইহাই যদি হয়, তবে আবার বাকী ৭০।৭৫ পদে রাধাকে অনুনয় করা, ভয় দেখানো, নিজের ভগবত্তা ঘোষণা করার সার্থকতা কোথায়? এত কাণ্ডের পর আবার কানাই বলেন কেন—"বলে ধরি তোকে তবেঁ দিবোঁ আলিঙ্গন" (পৃঃ ৪৪); অথবা "ভাণ্ড ভাঁগিবোঁ রাধা খাইবোঁ দধী" (পৃঃ ৭২)। রাধাই বা বলেন কেন—"দধি খাএ কাহ্নাঞি আর ভাণ্ড ভাঁগে, বলে আলিঙ্গন চাহে" (৮০), অথবা "আলিঙ্গন চাহে কাহ্নাঞি বিরহের জরে" (৮৬)। রাধা ফের বলিতেছেন—"কাঞ্চুলী ভাঁগসি মোর ছিণ্ডসি হার" (পৃঃ ৯৪), পুনরায় "কাঞ্চুলী ছিণ্ডিআঁ মোর বিদারহ তনে" (১০৫), ফের

বাহুর বলয়া লএ কাঢ়ী।
কানের হিরাধর কঢ়ী॥
কাঞ্চুলী টানএ মোর গাএ।
কেহো এথাঁ নাহিকঁ সহাএ॥ (১১২)

দানখণ্ডে মুখ, চোখ, নাক, কান, স্তন, নাভি, উরু, নিতম্ব, জঘন প্রভৃতির বর্ণনা একই ভাষায় একই উপমার সঙ্গে অসংখ্য বার করা হইয়াছে। জয়দেবের "বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূক-চ্ছবি" (১০।১৪) অনুকরণে কবি লিখিয়াছেন—

(১) কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল॥ ৩২
(২) আধর বন্ধুলী গণ্ড মধুক সমানে॥ ৪৮
(৩) আধরে বন্ধুলী রাগ শোভএ সুন্দরী। ৫৭

(৪) বন্ধুলী জিণিআঁ দশন তোরে। ৬৩

(৫) আধর বন্ধুলী তোর বদন কমলে। (৯৯)

রাধার স্তনের কথা এক বার দুই বার নহে, দশ বার উল্লেখ করিয়া কানাই মহাদান চাহিতেছে (পৃঃ ৩৪, ৪৮, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬৩, ৬৮, ৬৯, ১০২)।

দানখণ্ডে দেখি, রাধা ও কৃষ্ণ দুইই গালাগালি দিতে সমান ওস্তাদ। কৃষ্ণ রাধাকে শুধু "নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী'' (৫১) বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; যাহারা রাধাকে এই সম্বন্ধের কথা জানাইয়াছে, তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন—"দুই আখি খাউ পড়ুক তার কন্ধ'' (৫১)। কৃষ্ণ রাধাকে মহাদান দিতে রাজী করাইবার জন্য বলিয়াছেন—

(ক) "যত সতীপণ সব মিছা জান তারে (৬৬)

(খ) কথা না দেখিলী রাধা নারী হএ সতী" (১২৩)।

কৃষ্ণ রাধাকে "পামরী ছেনারি নারী" (৮৩) বলিয়াও গালি দিয়াছেন। রাধাও কৃষ্ণের একেবারে গোত্র তুলিয়া গাল দিতেছেন—

"তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে।
কিসকে বাখানে কাহ্ন মোর দুঈ তনে॥ (৪১)

ফের বাপ তুলিয়া বলিতেছে—

''বান্ধিতেঁ না পারে তোহ্মার বাপে" (৯০)
''আছুক তোহোর কথা হেন করিতেঁ
নারে তোর বাপে''। (১০২)

এই সব গালাগালি গ্রাম্য শ্রোতারা খুব উপভোগ করিত। এই বইয়ে কৃষ্ণের দান চাওয়ার ভঙ্গীর অশ্লীলতা অন্য সব বইয়ের ইতরামিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ঐ বইয়ের সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণে আছে—

মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে (৮৭)

বসন্তরঞ্জনবাবু উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, ''মস্তক সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করিয়া" সুরতি দান চাহিল (পৃঃ ৫১৪)। কিন্তু কানাই সঙ্কেত করার স্তর ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন, উহার পূর্ব্ব চরণেই রাধা বলিতেছেন—

''অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে"।

সুতরাং এ অবস্থায় মাথায় সান দেওয়া বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। ঐ চরণের

প্রকৃত পাঠ আছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯৩ সংখ্যক পুথিতে—"মাগএ শুরতি দান য়স্থানে দেই হাথে" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৪০, পৃঃ ৫০)।

এ যুগের কোন কোন বিজ্ঞ সমালোচক আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলেন যে, এই দানখণ্ডের রসই শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করিতেন এবং সনাতন গোস্বামী ইহাকেই শরৎকাব্যকথার আদর্শরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব।

নখণ্ডের পর নৌকাখণ্ড। দানখণ্ডের পুথির ১৬, ১৭।১ এবং ৪১ পাতা পাওয়া যায় নাই; কিন্তু নৌকাখণ্ড অখণ্ডিত। ইহাতে মাত্র ত্রিশটি পদ আছে। ছোট বলিয়া ইহাতে বেশী পুনরাবৃত্তি নাই। দানখণ্ডের শেষে রাধাকে উপভোগ করিলেও কৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে পাইবার জন্য আকুল হইয়া বড়াইকে বলিলেন, "উনমত ভৈলো বড়ায়ি রাধার বিরহে" (১৩৯)। বড়াই তাঁহাকে মাঝি সাজিয়া নৌকা লইয়া যমুনার ঘাটে থাকিতে উপদেশ দিলেন। কৃষ্ণ একখানি বড় নৌকা বানাইয়া জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখিলেন: আর একখানি ছোট নৌকা ঘাটে রাখিয়া রাধার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বড়াই রাধাকে ফের হাটে যাইতে বলায়, রাধা কানাইয়ের হাতে তাঁহার দুর্দ্দশার কথা আংশিক বলিয়া আপত্তি জানাইলেন। বড়াই বলিলেন যে, এবারে অন্য পথে যেখানে কান্যইয়ের দানঘাট নাই, সেই পথে যমুনা পার করাইয়া মথুরায় লইয়া যাইবেন। আইহনের মা বড়াইয়ের প্রস্তাবে রাজী হইলেন। কেন না, বৌকে হাটে না পাঠাইয়া ঘরে দই দুধ নষ্ট করিলে "হেনক কুমতীএঁ হয়িবেঁ ভিখারী" (১৪৩)। বৌকে হাটে পাঠাইতে হইলেও, আইহন বড় লোক; কেন না,

"সোনার চুপড়ী রাধা রূপার ঘড়ী।
নেতের আঞ্চল তাত দিআঁ ওহাড়ী॥" (১৪৩)

রাধা হাটে চলিলেন। সঙ্গে তাঁহার ষোল শত গোপী মঙ্গলগান গাহিতে গাহিতে চলিলেন। যমুনার তীরে পৌছিয়া সকলে ঘাটের ঘাটিয়ালকে ডাকিতে লাগিলেন। কানাই ছোট নৌকাখানি আনিয়া একে একে সব সখীকে পার করিলেন (১৪৬), অর্থাৎ ষোল শত বার যমুনার এপার ওপার

করিলেন। নৌকায় মাঝি ও একজন ছাড়া আরোহী চড়িতে পারে না; সুতরাং বড়াইও আগে পার হইয়া গেলেন। এইবার কানাই রাধাকে একা পাইয়া মহাদান চাহিলেন। এতক্ষণে রাধার হুঁস হইল যে, ঘাটে যে লোকটি ঘাটোয়াল, সে কানাই, এবং সে মহাদান চায়। তাই আক্ষেপ করিয়া রাধা বলিতেছেন—

মোএঁ যবেঁ জাণো কাহ্নাঞি ঘাটে মহাদানী।
বড়ায়িক ছাড়ী কেহ্নে হৈবোঁ একাকিনী॥ (১৪৭)

ইহার পর আবার অনুশোচনা—"কাল হঞা গেল মোরে যৌবন ভার"। রাধা হাতজোড় করিয়া কানাইকে বলিলেন, তাড়াতাড়ি পার করিয়া দাও। কৃষ্ণ বলিলেন যে, আমি তো বিনা কড়িতে পার করি না; তোমার কথায় তোমার সখীদের পার করিয়াছি; এখন তোমাকে পার করিলে "বন্ধে দেহ সাতেসরী হার" (১৪৮)। কিন্তু তাহাতেও বোধ হয় ধার শোধ হইবে না, তাই তিনি বলেন—

তোহ্মাত মজিল মোর মনে।
ভিড়ি দেহ আলিঙ্গন দানে॥ (১৪৯)

রাধা বলিলেন—ছি ছি, ঘাটের ঘাটোয়াল নাগরালী করে। পুণ্য নদীর কূলে পাপ কথা বলে। কৃষ্ণ বলিলেন—

মদন বাণে, দেহ বিদগধ, কি মোর নদী কূল য়ে।
পাপ পুণ্য রাধা, দুই না মানিআঁ, ধরিবো তোহ্মাক বলে॥

রাধা ফের কৃষ্ণের বাপ তুলিয়া গালি দিলেন "নিলজ বাপ তোহ্মারএ" (১৫০), আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা তিনি বলিয়া বসিলেন যে, তাঁহার কৌমার্য্য এখনও অক্ষত, সুতরাং

মুদিত ভাণ্ডারে কাহ্নাঞিঁ না সাম্বাএ চুরী" (১৫০)

এই কথা দানখণ্ডে তিনি দুই বার বলিয়াছিলেন—"প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার (৫৮); "প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার, তাত না সাম্বাএ চুরী" (৯৮)। কথাটা বিদ্যাপতি হইতে লওয়া—"মোহর মুদল অছি মদন-ভঁড়ার" (৫৯) এবং

মদন ভণ্ডার স্থরত রস আনী।
মোহরে মুন্দল অছ অসময় জানী॥ (২৮১)

মদনভাণ্ডার মোহর দিয়া সিল করা আছে, এই কথাটা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের বড় ভাল লাগিয়াছিল; তাই ১৩৪ পৃষ্ঠায় দানখণ্ডের শেষে একবার বিলাসের পর

মন তোষ ভৈল কাহ্নাঞি ছাড়ে ঘন শ্বাসে।
কাঢ়ী লৈল আভরণ পুন রতী আশে॥ (১৩৪)

ইত্যাদি ঘটনার পরও রাধার মুখ দিয়া কবি মোহর দিয়া সিল করার কথা বলাইয়াছেন। গল্পে শুনিয়াছিলাম, এক বালক "কতিপয়" শব্দটি শিখিয়া, উহার প্রথম প্রয়োগ করিয়াছিল বাপকে চিঠি লিখিবার সময়—"কতিপয় পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু"। রাধার ঐ উক্তি কতকটা সেই রকম। অবশ্য পরের পদেই কবি, কৃষ্ণের উক্তির দ্বারা উহা সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন—

অদভুত লাগে তোর স্থণিআঁ বচন।
কিসের মুদিত রাধা তোহ্মার যৌবন॥
পুরুবে তোহ্মাক আহ্মে পাআঁ বৃন্দাবনে।
রতি উপভোগ কৈল বিসরিলে কেহ্নে॥ (১৫১)

এই উপযুক্ত প্রত্যুক্তি সত্ত্বেও আমাদের অনুমান যে, কথাটা কবির ভাল লাগিয়াছিল বলিয়াই তিনি অস্থানে উহার প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার সমর্থন পাইতেছি—এই নৌকাখণ্ডেই কৃষ্ণ রাধাকে রাজী করাইবার জন্য তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।
তহিত নক্ষত্রগণ গজমুতী হার॥
তাত তিখ নখ রেখ চান্দের আকার। (১৫৫)

জয়দেবের রাধা বিরহবিধুরা হইয়া কল্পনা করিয়াছিলেন যে, ঐ সময়ে মুরারি বোধ হয় কোন এক রমণীর সহিত বিহার করিতেছেন এবং তাহার স্তন-যুগল গগনের তুল্য, উহা মৃগমদরসে বিলেপিত স্থঘন এবং নখের চিহ্নরূপ চন্দ্র দ্বারা বিভূষিত—

ঘটয়তি সুঘনে কুচ-যুগ-গগনে মৃগ-মদ-রুচি-রূষিতে।
মণি-সরমমলং তারক-পটলং নখ-পদ-শশি-ভূষিতে॥

(৭।২৪)

এখানে কৃষ্ণই ঐ রমণীর স্তনে নখচিহ্ন দিয়াছিলেন, এই কল্পনা রাধাকে আরও সন্তপ্ত করিতেছে। কিন্তু অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ যদি উপভোগের পূর্ব্বেই বলেন যে, রাধার কুচযুগে তীক্ষ্ণ নখের রেখা রহিয়াছে, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয় না কি? রাধাকে কে ঐরূপ চিহ্ন করিয়া দিল? নিশ্চয়ই তাহার নপুংসক স্বামী নহে। অনন্ত এখানে "মুদিত ভাণ্ডারের" মতন নিছক অনুকরণস্পৃহায় রাধার বক্ষে নখচিহ্নের কথা লিখিয়াছেন। কোন বড় কবি এরূপ অপ্রাসঙ্গিক অনুকরণ করেন না।

যাহা হউক, কৃষ্ণ রাধাকে পূর্ব্ব সম্ভোগের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার পরও রাধা বলিতেছেন—

পাপ পুণ্যের কাহ্ন করহ বিচার।
কোমণ পুরাণে কাহ্নাঞি আছে পরদার॥ (১৫৫)

অবশেষে বেলা বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া রাধা কৃষ্ণের নৌকায় চড়িলেন। নৌকা যখন মাঝ-যমুনায়, তখন ঝড় উঠিল। তখন রাধা ভয় পাইয়া বলিলেন—

দশনেত তৃন করি বোলেঁা মো তোহ্মারে।
যেই চাহ সেহি দিবোঁ কর মোরে পারে॥ (১৫৭)

এই কথাটি প্রাকৃতপৈঙ্গলে দৃষ্টান্তস্বরূপে বর্ণিত নিম্নলিখিত পদ্যাংশের ভাবানুবাদ—

আরে রে বাহহি কন্হ, ণাব ছোটি ডগমগ কুগতি মা দেহি।
তই ইথি ণই হি সন্তার দেই জো চাহহি সো লেহি॥

অর্থাৎ, ওরে কানু, ছোট নৌকাটি বাহ, টলমল করিয়া (আমাকে) কুগতি দিও না। তুমি এই নদী পার করিয়া যাহা চাহ, তাহাই লইও। প্রাকৃত-পৈঙ্গলকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন (ডাঃ মনোমোহন ঘোষ—বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২০)। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসকে নৌকাবিলাসের আদিকবিরূপে স্থাপন করিবার উৎকট আগ্রহে ডাঃ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রাকৃতপৈঙ্গলকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের রচনা বলিতেছেন।

মাঝ-যমুনায় ঝড় যখন প্রবলভাবে নৌকা দুলাইতেছে, তখন কানাই বলিলেন, এই ঝড়ে নৌকা ঠেকাইতে হইলে গায়ের জোর দরকার; অতএব "অধর আমিআঁ দেহ বল হউ মোরে" (১৫৮)। তখনও রাধা আর এক বার তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার "দীঘল বসন," "হৃদের কাঞ্চুলী" ও দধির পসারা ফেলিয়া নৌকার ভার পাতলা করিতে বলিলেন। রাধা সেই কথা অনুসারে কাজ করিবার পর কানাই ফের নৌকা দুলাইতে লাগিলেন। এবার "ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিকে মাঙ্গে কোল।" কিন্তু রাধার ভয়—লোকজানাজানি হইবে। কৃষ্ণ নৌকা ডুবাইয়া দিয়া জলের মধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন। রাধা কৃষ্ণকে বলিলেন—

সব সখি দেখে মোর কাহ্নাঞিঁ ল
না তুলিহ জলের উপর॥ (১৬১)।

কাঁচা আদিরসের ছড়াছড়ি থাকায় অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের নৌকাখণ্ড যে এক শ্রেণীর শ্রোতা ও পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিছক কাব্য হিসাবে দানখণ্ড অপেক্ষা নৌকাখণ্ড অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ।

ভারখণ্ডে রতিদান করিবেন আশ্বাস দিয়া রাধা কৃষ্ণের দ্বারা ভার বহাইয়া লইলেন। দই দুধের বোঝা বোধ হয় কিছু বেশীই ভারী ছিল; কেন না, কৃষ্ণ রাধার বাপ তুলিয়া বলিতেছেন—

"এ পসার নিতেঁ নারে রাধিকার বাপে" (১৮৩)।

তার পর রাধা নিজের প্রতিশ্রুতি পালন না করিয়া বলিলেন যে—

"ছত্র ধর কাহ্নাঞিঁ দিবোঁ সুরতী" (১৯৩)

কিছু কথাকাটাকাটির পর কানাই রাধার মাথায় ছাতা ধরিয়াছিলেন অনুমান করিতে হয়—কেন না, ছত্রখণ্ডের ১০৪ হইতে ১১১ পাতা নাই। তারপর বৃন্দাবনখণ্ড,—অর্থাৎ বৃন্দাবনের ফুলবনে দিনের বেলায় রাধার সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিলাস। তাহাতে জয়দেবের অনুকরণে রাধার মান, কৃষ্ণের মানভঞ্জন। মানভঞ্জনের প্রথমে দেখি, কৃষ্ণ জয়দেবের "বদসি যদি

কিঞ্চিদপি" গীতের হুবহু অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, যদি কিছু বোল, বোলসি তবেঁ, দশন রুচি তোহ্মারে ইত্যাদি (পৃঃ ১৭)। কিন্তু তাহাতে হয় তো কাজ হইল না, তাই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতন কানাই বলিল—

যত বা ফুল ফল নিল তার দেন্ত কৌড়ী।
নহে বা বান্ধিআঁ রাখিবোঁ দৃঢ় দৌড়ী॥ (২১৯)

দড়ি দিয়া বাঁধার ভয় দেখানোতেও যখন কাজ হইল না, তখন কৃষ্ণ একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া বলিলেন—

যবেঁ তিরী বধে নাহীঁ থাকে ডর।
তবেঁ আজি মারিআ পাঠাওঁ যমঘর॥ (২২৪)

এই রকম ধরণের মারধর করিয়া, ভয় দেখাইয়া প্রেম করার কথা আর অন্য কোন কাব্যে নাই। বৃন্দাবনখণ্ডের শেষে অবশ্য কৃষ্ণ রাধার রূপের প্রশংসা করায় রাধার মন গলিয়া গেল। রাধা বলিতেছেন—

তোহ্মার আহ্মার ঢুঈ মনে। এক করী গাঢ়িল মদনে॥
তার আনুরূপ বৃন্দাবনে। তোর বোল না করিব আনে॥
বিধি কৈল তোর মোর নেহে। একই পরাণ এক দেহে॥
সে নেহ তিঅজ নাহিঁ সহে। সে পুণি আহ্মার দোষ নহে॥ (২২৯)

এই উক্তি রামানন্দ রায়ের সুপ্রসিদ্ধ "পহিলহিঁ রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল" পদ (কবিকর্ণপূরকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে উদ্ধৃত এবং পদকল্পতরু ৫৭৬), "দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি" (রাধামোহন ঠাকুরকৃত ব্যাখ্যা—আবয়োর্ম্মনঃ কন্দর্পেণ পিষ্টং অভেদং কৃতমিত্যহং জানে) এবং

"না খোজলুঁ দূতি না খোজলু আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥"

স্মরণ করাইয়া দেয়। রাধার কথার পর "দুইহো মনের উল্লাসে, করিল বনবিলাসে।" (২৩০)

কালিয়দমনখণ্ডে কালিয়নাগের দমন বৃত্তান্ত আছে। বৈশিষ্ট্য এই যে, সাপের বিষে যখন কৃষ্ণ অচৈতন্য হইলেন, তখন রাধাচন্দ্রাবলী একেবারে প্রকাশ্যভাবে বিলাপ করিতে করিতে কানাইকে "পরাণপতি" বলিলেন (২৩২) এবং জয়দেবের "মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্" (৭১৩)

অনুকরণ করিয়া, বুকে চাপড় মারিয়া কহিলেন—

কি করিব ধনজন জীবন ঘরে।
কাহ্ন তোহ্মা বিনি সব নিফল মোরে॥ (২৩৩)

আর এক বৈশিষ্ট্য, বলদেব বড় ভাই হইয়াও কৃষ্ণকে তাঁহার মহিমা সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য জয়দেবের (১।৫—১৪) সুপ্রসিদ্ধ দশাবতার-স্তোত্রটি "মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলেঁ" ইত্যাদি ভাবে অনুবাদ করিলেন (২৩৫)। কোন বড় কবি এরূপ অনুপযুক্ত স্থানে অপরের পদের অনুকরণ করেন না। সর্পকে দমন করিবার পর রাধিকা—

নিমেষ রহিত বহু সরস নয়নে॥
দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।
সকল লোকের মাঝেঁ তেজি লাজ ভএ॥ (২৩৮)

পূর্ব্বে রাধা যদি 'পরাণপতি' বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে কাকুতি না করিতেন, তাহা হইলে এই নিমেষরহিত কটাক্ষ আরও অধিক ব্যঞ্জনাপূর্ণ হইত।

ইহার পর যমুনাখণ্ড। পূর্ব্বে কবি যেমন যমুনাতে পদ্মবন আছে বলিয়া নিজেকে স্রোতস্বিনী নদীবিহীন দেশের লোক প্রমাণ করিয়াছিলেন, তেমনি এখানেও যমুনাকে পুকুর মনে করিয়া রাধাকে দিয়া বলাইতেছেন—

তোহ্মার বোলে, কেহো কাহ্নাঞিঁ, না বহিব পাণী।
উচিত নিফল, হৈব তোর জল, ভাবি বুঝ চক্রপাণী॥ (২৪৮)

পাড়াগাঁয়ে যদি লোকে কোন পুকুরের জল ব্যবহার না করে, তবে তাহার পুকুর খোঁড়ানো বৃথা হয়। কবি যমুনাখণ্ডে গোপীদিগকে সহসা পর্দ্দানশীনা করিয়া ফেলিয়াছেন। কেন না, কৃষ্ণ ঘাটে আছেন, তাই তাঁহারা জল ভরিতে পারেন না দেখিয়া রাধা বলিলেন, "তুমি একটু সরিয়া যাও, সখীরা জল লউক"—

বুইল কাহ্নাঞিঁরে খানি এক ঘুচ
সখি পাণি নেউ সুখে॥
পরিহাস বসে দেব দামোদর
যেহ্ন নাহিঁ পরিচএ॥ (২৪১)

যেন রাধার সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে অন্ততঃ তিন বার রতিসম্ভোগ (পৃঃ ১৩৩—৩৫; ১৬২; ২২৯—৩০) হয় নাই, এরূপভাবে কৃষ্ণ রাধাকে বলিলেন—

কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী।
কেহ্নে যমুনাত তোলসি পাণী॥ (২৪১)

রাধা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—

বড়ার বহু মো বড়ার ঝী।
আহ্মে পাণি তুলী তোহ্মাত কী॥

এই সব উক্তি-প্রত্যুক্তি, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ-পরিহাস যে খুবই উপভোগ্য, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কাহিনী হিসাবে বইখানি দুর্ব্বল হইলেও কথাকাটাকাটিতে ইহার জুড়ি নাই। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝগড়া দ্বন্দ্বের পর কৃষ্ণের পানে কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া রাধা বলিলেন—পথের মধ্যে কি তোমার বিরহজ্বালা মেটানো যায়—

পথত বারহ মন নান্দের নন্দন।
কি কারণে ঝগড় করহ সবখন॥ (২৫১)

ইহার পর যমুনায় জলকেলি এবং কৃষ্ণকে মৃত মনে করিয়া রাধা, বড়াই ও সব গোপীর তাড়াতাড়ি পলায়ন। পরদিন সকালবেলায় কাপড় ভিজিবার ভয়ে তীরে হার ও বসন ত্যাগ করিয়া সকলের যমুনার মধ্যে কানাইয়ের মৃতদেহ খুঁজিতে প্রবেশ। এ দিকে "হার বসন কাহ্নাঞিঁ লঞাঁ গেল বলে" (২৬১)। কৃষ্ণ বড়াইকে ডাকিয়া বলিলেন—

কেহ্নে রাধা হেন কাম করে।
বিবসিনী নাম্বএ নীরে॥ (২৬২)

হারখণ্ডে ১৪৫ হইতে ১৫১ পাতা পাওয়া যায় নাই। তবে বেশ বুঝা যায় যে, কৃষ্ণ বসন প্রত্যর্পণ করিলেও রাধার 'সাতেশরী হার' ফেরৎ দেন নাই। তাহাতে রাধা একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

এই কাব্যের প্রথম হইতেই দেখি, নায়কের মন গহনা চুরির দিকে, আর নায়িকা গ্রাম্যা নারীর মতন গহনাকে পতি বা উপপতির চেয়েও বেশী ভালবাসে। দানখণ্ডে সম্ভোগের সময় কৃষ্ণ রাধার

প্রথমে কাড়িআঁ নৈল সাতেসরী হার।
কানের কুণ্ডল নিল মুকুট মাথার॥
আঅর কাড়িআঁ নিল গুণিআ গলার। (১৩৪)

বিলাসের পর "আভরণগণ রাধা এড়িল তরাসে" (১৩৫), কিন্তু বড়াইয়ের কাছে যাইয়া নালিশ করিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁহার সব আভরণ কাড়িয়া লইয়াছেন (১৩৬)। নৌকাখণ্ডে জলকেলির পর রাধা যখন মথুরা হইতে বাড়ী ফিরিতেছেন, তখন তিনি মুরারির নিকট ঐ গহনা চাহিলেন—

পুরুবেঁ নিলেঁ মোর আলঙ্কার যত
কিছুই না দেহ মুরারী। (১৬৫)

মুরারির মন তখন খুসী, তাই তিনি রাধার আভরণ সব ফিরাইয়া দিলেন। যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণ "সাতেশরী হার" ফেরৎ না দেওয়ায় রাধা একেবারে যশোদার কাছে যাইয়া, কানাই কেমন করিয়া

আহ্মা বিগুতিল যেহেন কাহ্নে।
তেহ্ন বিগুতিল এ সখিগণে॥ (২৬৩)

বিগুতিল=বিমর্দ্দিত করিল, সে সম্বন্ধে নালিশ করিলেন। সুরদাসের দানলীলাতেও দেখি যে, গোপীগণ যশোদার নিকট কৃষ্ণের অশিষ্টতা সম্বন্ধে নালিশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যশোদা তাঁহার অবিমিশ্র বাৎসল্যভাবে ঐ অভিযোগ বিশ্বাস না করিয়া বলিয়াছিলেন—আমার হরি সবে দশ বছরের বালক, আর তোমরা সব যৌবনমদে উন্মাদিনী—

মেরৌ হরি কহঁ দসহিঁ বরস কৌ, তুমরী জোবন-মদ উমদানী॥
(সুরসাগর, দানলীলা, ১৪৯০)।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু যশোদা কৃষ্ণকে খুব ধমকাইয়া দিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত ভালবাসা ভুলিয়া গিয়া ফৌজদারী মোকর্দ্দমার আসামীর মতন উল্টা নালিশ করিলেন যে, আমি ছেলেমানুষ অথচ "ষোল শত যুবতীঞ আহ্মারে বল করে।" শুধু তাই নয়, "কেলি কৈল রাধা পরপুরুষের সঙ্গে"। পরপুরুষ লইয়াই রাধা সন্তুষ্ট নহেন, সে "মামী মামী বুলিতেঁ আধিকেঁ বল করে" (২৬৫)। ইহার পর আবার দুই জনের মধ্যে যদি ভাব করাইতে হয়, তবে সম্মোহন বাণের প্রয়োজন হয়। তাই পরের খণ্ডের নাম বাণখণ্ড, যদিও প্রথম সংস্করণ ছাপিবার সময় উহা "বালখণ্ড" রূপে ছাপা হইয়াছিল। এই সময় রাধার বয়স চৌদ্দ হইয়াছে (২৭৭); কৃষ্ণ তাঁহাকে বাণ মারিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি বড়াইকে "লাখেকের

মুদড়ী” অর্থাৎ লক্ষ টাকা মূল্যের অঙ্গুরি দিবার প্রলোভন দেখাইয়া বাণ হইতে বাঁচাইতে বলিলেন। কিন্তু কানাই তাঁহাকে বাণ মারিলেন ও রাধা মরিয়া গেলেন। বড়াই খুনের আসামী হিসাবে কানাইকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। অনেক অনুনয় করায় বড়াই বলিলেন, রাধাকে বাঁচাইয়া দিলে তিনি কানাইকে ছাড়িয়া দিবেন। অতএব কৃষ্ণ রাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"বারেক জিঅ রাধা রতি ভুঞ্জ সুখে ল।" (২৮৭)

মরা মানুষকে বাঁচাইয়া তুলিবার আহ্বান বটে! কৃষ্ণের স্পর্শ পাইয়া রাধা বাঁচিয়া উঠিলেন। পরে উভয়ের রতিবিলাস হইল (২৯১)।

বংশীখণ্ডের প্রথমে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধার আক্ষেপ এবং কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন করাইয়া দিবার জন্য বড়াইকে অনুরোধ। বড়াই তখন উল্টা গাহিতে আরম্ভ করিলেন—

তোহ্মাকে জুগত নহে এ সব করম।
দুচারিণী যার মা তার হেন গতী।
সেসি পরপুরুষের বাঞ্ছএ সুরতী॥ (২৯৯)

ইহা বলিয়াই হয় তো বড়াইয়ের মনে পড়িল, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিহার পূর্ব্বেই অনেক বার হইয়া গিয়াছে। তাই তিনি বলিলেন—

"পুরুবে যে কাজ হৈল সে ভৈল গুপতে।" (২৯৯)

বোধ হয় বড়াই বলিতে চাহেন, গুপ্তভাবে মিলনে দোষ নাই; এরূপ যাহারা করে, তাহাদের মা দ্বিচারিণী নহে। রাধার ব্যাকুলতায় বাধ্য হইয়া বড়াই বলিলেন যে

বৃন্দাবনে কাহ্নাঞি আনিবোঁ।
তোর সঙ্গে সুরতী করায়িবোঁ॥ (৩০১)

কিন্তু ইহার পরে আবার বড়াই রাধাকে বলিলেন যে, যখন রাধা কানাইয়ের তাম্বূল পাইয়া অনুকূল হন নাই, কানাইকে দিয়া দধি বহাইয়াছেন, ছাতা ধরাইয়াছেন, নানা ফুল দিয়া বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করাইয়াছেন—"তভোঁ তাক দোষ দেসি তোঞেঁ বারে বারে" (৩০৫)। এখানে অবশ্য দোষ দেওয়ার কোন কথাই উঠে না। বড়াইয়ের এই কথা শুনিয়া মনে হয়, রাধা বুঝি

কখনও কৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে রাজী হন নাই। যাহা হউক, অবশেষে বড়াই বুদ্ধি দিলেন যে, তিনি "নিন্দাউলী মন্ত্রে" কানাইকে ঘুম পাড়াইবেন, তখন রাধা যেন তাঁহার বাঁশী চুরি করিয়া লন। বাঁশী ফেরৎ পাইবার জন্য কৃষ্ণ রাধার আনুগত্য স্বীকার করিবেন। পরিকল্পনা অনুসারে কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করা হইল। রাধা যেমন গহনা না পাইয়া আকুল হইয়াছিলেন, কৃষ্ণ তেমনি বাঁশী হারাইয়া বলিলেন—

"যত আলঙ্কার বহুমূল সার সব রাধা মোর নে।
সুবন্নে জড়িত হিরাঞঁ রচিত, বাঁশী গুটি মোরে দে॥ (৩১৮)

অলঙ্কারগুলির চেয়ে বাঁশীর দাম বেশী—কেন না, "সপ্ত লাখের মোর চুরি করি বাঁশী" (৩১৯)। রাধা যখন বাঁশী দিলেন না, তখন প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কৃষ্ণ বলিলেন—

"সব আভরণ তোর কাঢ়িআঁ লইবোঁ।
বাঁশীত লাগিআঁ তোক বান্ধিআঁ রাখিবোঁ॥ (৩১৯)

ইহাতেও রাধা ভয় না পাওয়ায়, কৃষ্ণ বলিলেন—

"এখণী পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে"। (৩১৯)

সত্যবাদিনী রাধা একেবারে চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী করিয়া বলিলেন, যে তোমার বাঁশী চুরি করিয়াছে, তার দুই চোখ নষ্ট হউক; আমি সতী নারী যদি তোমার বাঁশী চুরি করিয়া থাকি, তবে যেন কালসর্পে আজ রাতেই আমাকে খায়—

চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী।
যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী॥
যবে মো চুরী কৈলোঁ হআঁ নারী সতী।
তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী॥ (৩২২)

কানাই তবুও তাহার কথা বিশ্বাস না করায় প্রেমিকা রাধা, কৃষ্ণকে বলিলেন—

চান্দ সুরুজ মোর আছে দুয়ি সাখী।
আহ্মা মিছা দোষ কাহ্ন খাইবি দুই আখী॥ (৩২২)

আমাকে মিছামিছি দোষ দিতেছ, তোমার দুই চোখ নষ্ট হইয়া যাইবে।

এই আদর্শ প্রেমের চিত্র, রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরের সঙ্গে শ্রীচৈতন্ত আস্বাদন না করিলে আর কে করিবে ? যাহা হউক, কৃষ্ণ অনেক কাঁদাকাটি করায় অবশেষে তিনটি সর্ত্তে রাধা তাঁহাকে বাঁশী ফিরাইয়া দিলেন। প্রথম সর্ত্ত হইতেছে এই যে, কানাই "যোড় হাথ" করিবেন, দ্বিতীয় "কভো না লঙ্ঘিহ মোর বচন," আর তৃতীয়—"কভোঁ কি না দিবে আহ্মাক দুখে" (৩২৯)। কৃষ্ণ উহাতে রাজী হওয়ায়, রাধা বাঁশী ফেরৎ দিয়া বলিলেন—"আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী"। কৃষ্ণও খুসী হইয়া উত্তর দিলেন,—তোমার সব দোষ ক্ষমা করিলাম।

সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী।
আর তোর অহিত না করে বনমালী॥ (৩৩১)

কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলেন। কেন না, পরের পৃষ্ঠাতেই "রাধাবিরহ" আরম্ভ। এই বিরহ কৃষ্ণের মথুরায় চলিয়া যাওয়ায় নহে। কৃষ্ণ গোকুলে থাকিয়াই রাধার সঙ্গে মেলামেশা করেন না, তাই বিরহ। ইহার পূর্ব্বে কাব্যের প্রত্যেক অংশকে খণ্ড বলা হইয়াছে, কিন্তু 'রাধা-বিরহে'র বেলায় উহাকে খণ্ড বলা হয় নাই। খুব সম্ভব এটি একটি স্বতন্ত্র কাব্য। প্রথমতঃ ইহাতে দেখি, রাধা বড়াইকে কৃষ্ণ আনিয়া দিতে বলিলে বড়াই বলিলেন—

কেমনে বেড়াএ কাহ্ন কিবা রূপ ধরে।
একেঁ একেঁ সব কথা কহ তোঁ আহ্মারে॥ (৩৪৫)

যে বড়াই প্রথম হইতে রাধাকৃষ্ণের মিলনে দূতীগিরী করিতেছিলেন, এ বড়াই যেন সে বড়াই নহে। এ বড়াই কৃষ্ণ "কিবা রূপ ধরে," তাহাও জানেন না। স্বভাব-চরিত্রেও দেখি, এ বড়াই রাধার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশালিনী; পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে তিনি কৃষ্ণের কুট্টনী মাত্র। বড়াইয়ের কথায় রাধা কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিলেন (৩৪৬)। দ্বিতীয়তঃ রাধা কৃষ্ণের নিকট পূর্ব্বকৃত সমস্ত দোষ ক্ষমা করিতে বলিয়া বলিলেন—

যেবা কিছু দুখ দিলোঁ পার হৈতেঁ নাএ।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ॥ (৩৫৫)

নৌকা পার হইবার সময় রাধা আর কৃষ্ণকে দুঃখ দিলেন কি ? তিনি তো

শেষ পর্য্যন্ত দেহদান করিয়াছিলেন; সে কথার ইঙ্গিত আভাস "রাধা-বিরহে"র কোথাও নাই। কৃষ্ণও যে সব অভিযোগ করিতেছেন, তাহাতে পূর্ব্বে যে উভয়ের অন্ততঃ পাঁচ বার (দানখণ্ডে পৃঃ ১৩৩—১৩৫; নৌকাখণ্ডে পৃঃ ১৬২; বৃন্দাবনখণ্ডে পৃঃ ২২৯—৩০; যমুনাখণ্ডে পৃঃ ২৫৫; বাণখণ্ডে পৃঃ ২৯১) রতিসম্ভোগ হইয়াছে, সে কথার কোন আভাস পাওয়া যায় না। যথা, কৃষ্ণের উক্তি—

হাসিঞাঁ উত্তর, বুইলো মো রাধা, না দিল সরসবাণী। (৩৬৩)
দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার।
লাজে পিঠ দিআঁ মো বহিলোঁ দধি ভার॥
দুসহ মদন বাণে বড় দুখ পাইল। (৩৬৫)
যবেঁ তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মোর বাপ মাএ দিলেঁ তোহ্মে গালী॥ (৩৬৮)

রাধাও স্বীকার করিতেছেন, "না ধরিলোঁ মতিমোষে তোহ্মার বচন" (৩৬৯)। রাধার উক্তিতেও পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার অন্য বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, যথা—

মো তোলোঁ যমুনাত পাণী।
পরিহাস কৈল চক্রপাণী॥
মতিমোষেঁ যশোদারে কহিলোঁ সে সব কাহিনী। (৩৭৪)

কৃষ্ণের সঙ্গে জলকেলি করার সময়ে রাধাই তো "আড় নয়নে চাহিআঁ কাহ্নের মণে চিআইল মদনে" (২৫৫)। তার পর বস্ত্রহরণ; তাহাতে রাধার বিশেষ দুঃখ নাই; তিনি যশোদার কাছে নালিশ করিলেন— "হরিলেক হার মোর বালগোপালে" (২৬৩)। "রাধা-বিরহে"র বড়াইয়ের কথার ভাবেও মনে হয় যে, রাধার সঙ্গে পূর্ব্বে কখনও কৃষ্ণের বিহার হয় নাই:

কাকুতী করিল কাহ্ন তোরে।
মোক পাঠায়িল বারে বারে॥
তভোঁ তার না কৈলেঁ সমানে (=সম্মান)।
তে কারণে রুষ্ট ভৈল কাহ্নে॥ (৩৭৫)

তৃতীয়তঃ "রাধা-বিরহে"র ভাষা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশের ভাষা অপেক্ষা অনেক

আধুনিক। ইহাতে "রাধিকা কাহ্নাঞি"র সঙ্গে আছে"র (৩৪৪) মতন আধুনিক ভাষাও পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ "রাধা-বিরহে"র আর্থিক পটভূমিকা বিভিন্ন। দানখণ্ডে কড়ির হিসাব চলিতেছিল "নব লক্ষ কড়ী" (৪২); আর "রাধাবিরহে" রাধা সহসা

"শত·পল সোনা বড়ায়ি লওঁা সে মেল।
প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল॥" (৩৩৮)

রাধা বড়াইকে আত্মীয়রূপে না দেখিয়া, নিছক কুট্টনিরূপে দেখিতেছে বলিয়াই এক শত ভরি সোনা বকশিস দিবার কথা বলিতে পারিয়াছে। কোন কোন সমালোচক বলেন যে, "রাধাবিরহ" খুব জনপ্রিয় ছিল বলিয়া, গায়কদের মুখে মুখে গানের সময় ভাষা বদলাইয়া গিয়াছে। "রাধাবিরহে"র সুর অবশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডের চেয়ে অনেক বেশী ভদ্র ও সংযত, ভাবও অনেক বেশী গভীর ও আন্তরিক; কিন্তু ইহার জনপ্রিয়তার প্রমাণ কোথায়? 'রাধাবিরহে'র একখানি ছাড়া দুইখানি পুথি আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনকে মহাকাব্য বলিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছেন—"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাধাবিরহে বংশীখণ্ডের কোনই উল্লেখ নাই।" কিন্তু "রাধাবিরহে" বড়াই বলিতেছে—

তোকে তত্ব বোলেঁা চন্দ্রাবলী।
যোড় হাথ করী বনমালী॥
তাত বড় পাইল আপমান। (৩৪৩)

রাধা, কৃষ্ণকে দিয়া "যোড় হাথ" করাইয়া তবে বাঁশী ফেরৎ দিয়াছিলেন ("এবেঁ করিলেঁ তোহ্মে যোড় হাথ" ৩২৮)। ভাল করিয়া বই না পড়িয়াই কি ইঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনকে মহাকাব্য বলিয়াছেন?

'রাধাবিরহ' স্বতন্ত্র কাব্য হওয়াই বেশী সম্ভব। তবে ইহার ভণিতাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডের মতন। রাধাবিরহে ৬৮টি পদ আছে। তন্মধ্যে "গাইল বডু চণ্ডীদাসে" আছে ২৩টিতে ও "গাইল বডু চণ্ডীদাস" ১টিতে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশে ঐ ভণিতা পাওয়া যায় ৫২ বার। "গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ" আছে ১০ বার, অনুরূপ ভণিতা পূর্ব্বে আছে ৪৭ বার। "গাইল বডু

চণ্ডীদাস বাসলীগণে" আছে ৭ বার, পূর্ব্বের খণ্ডসমূহে আছে ৪২ বার। "বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে" আছে ৭ বার; পূর্ব্বে আছে ৪২ বার। "বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস" আছে ২ বার; পূর্ব্বে আছে ২৭ বার। "বাসলী শিরে বন্দিয়া গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে" আছে ৩ বার; পূর্ব্বে আছে ২১ বার। "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর" আছে ২ বার; পূর্ব্বে আছে ২৫ বার। "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গতি" আছে ২ বার (৩৫৭, ৩৯১); পূর্ব্বে আছে ৫ বার। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডের ভণিতার হিসাব পাওয়া যায় ডাঃ শহীদুল্লার প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩।১, পৃঃ ২৬—২৭)। নিম্নলিখিত ভণিতাগুলি রাধাবিরহে একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে—

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ল। (৩৬০)
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ। (৩৩৭)
গাইল চণ্ডীদাসে। (৩৭৪)
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে। (৩৩৮)
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী। (৩৫৭)
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী চরণে। (৩৮৬)
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে। (৩৩৭)
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে। (৩৪১)

ভণিতাগুলি হইতে, বিশেষতঃ শেষোক্ত দুইটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কবি হইতেছেন চণ্ডীর দাস, তাই তিনি নিজেকে চণ্ডীদাস বলেন, তাঁহার নাম অনন্ত বড়ু। তিনি বাসলীর গণ, অর্থাৎ "বাসলীর গ-ণ (সমূহ, পরিচর-সমূহ) ছিল, কবি সে গণের এক বড়ু ছিলেন" (যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪২।১, পৃঃ ২৫)। সংস্কৃত বটু হইতে বড়ু শব্দের উৎপত্তি। ভাগবতে (১০।৮৮।২৭) কৃষ্ণ বটুক হইয়া বৃকাসুরের কাছে গিয়াছিলেন এবং ঐ গ্রন্থে (১২।৩।৩৩এ) আছে যে, কলিতে "অব্রতা বটবোঽশৌচাঃ" অর্থাৎ বটুরা, ব্রহ্মচারীরা ব্রতবিহীন ও শৌচবিহীন হইবেন। বাশুলীর প্রতি কবির ভক্তি অবিচলা ছিল; বাসলীই তাঁহার গতি, বাসলীই তাঁহার আই বা মা। এই বাশুলী বা বাসলী বিশালাক্ষী নহেন, হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহার ধ্যানমন্ত্র ধর্ম্মপূজাবিধানের পুথিতে পাইয়াছেন। ইনি "প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে" এবং "কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ"। ৺সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় ছাতনার বাশুলীমূর্ত্তির বর্ণনায় বলিয়াছেন—"দ্বিভুজা, দক্ষিণ হস্তে খড়্গা, বামে খর্পর, প্রশান্ত হসিতবদনা, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, নূপুরশোভিত চরণদ্বয়ের বামটি শয়ান এক অসুরের জঙ্ঘায় এবং অন্যটি অসুরের মস্তকোপরি স্থাপিত" (চণ্ডীদাসপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৪)।

অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য উপভোগ করিবার জন্য দুইটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথম হইতেছে—কাব্যখানি গ্রাম্য শ্রোতার জন্য, কৃষ্ণ বা রাধা তাঁহার উপাস্য নহেন। দ্বিতীয়তঃ কবি বৈষ্ণব নহেন, শ্রীচৈতন্যের গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেও বাংলা দেশে বৈষ্ণবের অভাব ছিল না। রাধাকৃষ্ণের লীলা লইয়া তৎপূর্ব্বে শত শত শ্লোক রচিত হইয়াছিল। মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" লিখিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ" (পৃঃ ১, চৈঃ চঃ ২।১৫)। ১৪১৫ শকে বা ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকেলী নগরে বসিয়া ১২৫০ শ্লোকে কবি চতুর্ভুজ "হরিচরিতকাব্যম্" রচনা করিয়াছিলেন (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—Notices of Sanskrit Manuscripts in Nepal Darbar, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৩৩)। কিন্তু সে যুগে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রবল ছিল। কবি অনন্ত বড়ু এই ভেদবুদ্ধি-বশতঃ কৃষ্ণের চরিত্র বিকৃত করিয়া আঁকিয়াছেন কি না বলা যায় না।

কবির কৃষ্ণ কামুক, কপট, মিথ্যাবাদী, অতিশয় দাম্ভিক এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ। কৃষ্ণ নানা ছলনায় রাধাকে সম্ভোগ করিয়া তাঁহার হার চুরি করিয়া রাখিলেন। সেই জন্য রাধা যশোদার নিকট নালিশ করায় কৃষ্ণ রাধার নামে কিরূপ অসতীত্বের অভিযোগ আনিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শুধু তাই নহে, তিনি বড়াইর নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি রাধার মরমে মন্মথবাণ এমন করিয়া মারিবেন যে,

সব লোকেঁ হাসে যেহ্ন দিআঁ করতালী।
তেহ্ন তারে করায়িবোঁ বিকলী॥ (২৭৭)

রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কাহিনীর ইহা অত্যন্ত বিকৃত রূপ। রাধাকে প্রেম-

উন্মাদিনী দেখিয়া লোকে হাততালি দিয়া হাসিবে, আর কৃষ্ণ তাহা বসিয়া বসিয়া দেখিবেন, এ পরিকল্পনাকে ইংরাজী ভাষায় বলিতে হয় diabolical, সয়তানের, ভগবানের নয়। কৃষ্ণ বংশী ফেরৎ লইবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"না লঙ্ঘিব বচন রাধার" এবং সে সময় জোর দিয়া বলিয়াছিলেন—"অবিচল বচন আহ্মার" (৩২৯), কিন্তু এ কথা তিনি একদিনের জন্যও মনে রাখেন নাই। তিনি রাধাবিরহে রাধাকে স্পষ্ট বলিয়া দিলেন—

"ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন।" (৩৫৬)
"আর এবেঁ রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন।" (৩৬৬)
"ছিনারী পাঁমরী, নাগরী রাধা, কিকে পাতসি মায়া।" (৩৭১)

রাধা বারংবার তাঁহাকে দেহদান করিয়াছে, কালিয়দমনের সময়ে সর্ব্বসমক্ষে পতি বলিয়াছে, বংশীখণ্ডের শেষে "আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী" (৩৩১) বলিয়াছে, রাধাবিরহে "তোহ্মে মোর পতি শ্রীনিবাস" (৩৬৫) বলিয়াছে ; তবুও কৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন ; কেন না, "দুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী (৩৯৮)। রাধার সমস্ত প্রণয় ভুলিয়া কবির কৃষ্ণ শুধু তাঁহার কথাকাটাকাটির গালাগালিই মনে রাখিলেন। এই কৃষ্ণ কাম উপভোগ করিতে চাহেন, কিন্তু প্রণয়িনীর কথায় ভার বহিতে লজ্জা বোধ করেন ; যদি বা কামে বিকল হইয়া দধির ভার বহিলেন, তথাপি রৌদ্রে প্রণয়িনীর কষ্ট হইতেছে দেখিয়া তাহার অনুরোধ সত্ত্বেও মাথায় ছাতা ধরিতে চাহেন না। এই কৃষ্ণ বার বার ঘোষণা করিতেছেন যে—

অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আশে (৭৪, ১০৩, ১২৭, ১৮৫, ১৯১)।

অথচ তিনি রাধার প্রণয় আকর্ষণ করিতে চাহেন দম্ভের দ্বারা—

"আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশরে।" (৮২)

রাধা তাহা বিশ্বাস না করায় কৃষ্ণ রাধাকে নিজের রতিসম্ভোগ-ক্ষমতার কথা বলিয়া মুগ্ধ করিতে চাহেন—

কতেক করসি দাপ সহিতেঁ নারিবি চাপ
বিলম্ব করহ কি কারণে ॥

পামরী ছেনারি নারী হআঁ বড় আছিদরী
আসহন বোলহ সকলে। (৮৩)

যাহার প্রণয় চাওয়া হইতেছে, তাহাকে পামরী ও ছেনারি বলা এইরূপ 'মহাকবি'র 'মহাকাব্যে'ই সম্ভব। অবিদগ্ধ ও অবৈষ্ণব গ্রাম্য শ্রোতারা কৃষ্ণের এইরূপ প্রণয়চাতুর্য্য দেখিয়া খুসীতে হাততালি দিত, আর তাহাতেই "বাসলীগতি" কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত।

কবি রাধার চরিত্রচিত্রণে সত্যই অপূর্ব্ব কুশলতা দেখাইয়াছেন। রাধা প্রথমে কৃষ্ণের রতিসম্ভোগের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ ইহা নহে যে, তিনি সতী সাধ্বী। তিনি দূতীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইতেছেন—আবালী রাধা নহোঁ সুরতীযোগে, রাধা অত্যন্ত অল্পবয়সী, অতএব তিনি সুরতির যোগ্যা নহেন, এই কথাই যেন বড়াই কৃষ্ণকে বলেন (২০)। তার পর রাধা বড়াইকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, একটু বড় হইয়াই

জৈসাণে রতি জাণবোঁ।
তেসাণে কাহ্ন আনিবোঁ
সুরতী সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবোঁ॥ (২১)

পুনরায়ঃ

"সুরতী জানিলেঁ বড়ায়ি পাঠাইবোঁ তোরে।
বৃন্দাবন মাঝেঁ আনাইবোঁ দামোদরে॥" (২২)

কাব্যের এই অংশটিকে চাপিয়া যাইয়া, মহাকাব্যের ধুয়াধারীরা রাধাকে "সংসারানভিজ্ঞ" বলিয়াছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণের প্রস্তাবে প্রথমতঃ রাধা সম্মতি জ্ঞাপন করেন নাই। ইহাতেই প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে আমরা প্রাকৃত পরিস্থিতির মধ্যে পাইতেছি। তিনি বিবাহিতা, অতএব ধর্ম্ম, সংস্কার ও সমাজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধা। এই অবস্থায় যদি তিনি কৃষ্ণের প্রস্তাবে সহসা সম্মত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধারণী রমণীর পর্য্যায়ে নামিয়া আসিতে হইত। কবি রাধার প্রত্যাখ্যানের বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে আত্মগরিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন" (বাঙ্গালা সাহিত্য, ১।২১৯ পৃঃ)। দানখণ্ডে কৃষ্ণকে রাধা বারংবার অল্পবয়সের অজুহাত

দেখাইয়াছেন (৩৫, ৫৮, ৫৯, ৮৪, ৮৭, ৯৭, ৯৮, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২৮)। তিনি নিজের অল্প বয়সের সঙ্গে কাঁচা বেলের (৯৮), মল্লিকা কুঁড়ির (১১৭), ডাকর ডালিম (১১৮), অবিকশিত কমলের তুলনা করিয়াছেন। বয়স অল্প হওয়া সত্ত্বেও রাধা সংসারানভিজ্ঞা নহেন। তিনি আত্মদান করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণের কাছে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন—"কভো না লজ্ঘিভেঁ যবেঁ আহ্মার বোল" (১৩৩)। তার পর রতিচিহ্নাদি লুকাইবার জন্য বড়াইকে মিথ্যা কথা বলিলেন। রতিবিহার সম্পূর্ণ গোপন করিয়া বলিলেন যে, কানাই রতি প্রার্থনা করায় তিনি—

একসরী হআঁ দৃঢ় বান্ধিআঁ বসনে।
জীউত উপর উঠী নিবারিলোঁ কাহ্নে ॥
সেহি কোপে কাঢ়ি নিলেঁ সব আভরণে। (১৩৬)

এ উক্তি অনভিজ্ঞা মেয়ের নহে। ফের রাধা বলিতেছে, কানাই অনেক অত্যাচার করিল, অনেক কাকুতি করিল, কিন্তু রাধা

"না দিলোঁ সুরতীর আশে।" (১৩৮)

রাধা অনভিজ্ঞা বালিকা হইলে অন্ততঃ বড়াইকে বলাৎকারের কথা বলিয়া দিত।

কবি রাধার আত্মদানের স্তরগুলি অতিসুন্দরভাবে আঁকিয়াছেন। প্রথমে রাধা প্রচণ্ড আপত্তি জানাইয়াছেন; পরে অনেকখানি নরম হইয়া বলিয়াছেন—"কত মিছা বোলহ সুন্দর বনমালী" (১১৯)—কৃষ্ণকে এই প্রথম মিষ্টকথা বলা। তার পর কৃষ্ণ যখন নিজেকে নারায়ণ ও রাধাকে লক্ষ্মী বলিলেন, তখন রাধা সুর আরও নরম করিয়া উত্তর দিলেন—

পুরুব জরমে কাহ্নাঞিঁ ল
আল আছিলোঁ বা তোর নারী।
ইহ জরমে কেবা পাতিআএ
আপণে বুঝহ মুরারী ॥ (১২৯)

মানিলাম যে, আমি পূর্ব্বজন্মে তোমারই স্ত্রী ছিলাম; কিন্তু এ জন্মে সে কথা কে বিশ্বাস করিবে? তুমি নিজেই বুঝিয়া দেখ মুরারি। তাহাতেও যখন কৃষ্ণ বুঝিলেন না, তখন রাধা বলিলেন—দেখ কানাই, সুরতি জিনিষটা এমন

যে, দুই জনেরই যাহাতে কুশল বা মঙ্গল হয় (কিন্তু আমার বয়স অল্প, আমার কষ্ট হইবে)। কানাই সুরতিরসে সুন্দর, তাহাতে (একজনকে) আর্ত্তি বা কষ্ট দিয়া কোন ফল নাই।

হইবেক তোর মোর সুরতী কাহ্নাঞি ল
আল দুইহাঁর হউক কুশল।
সুরতি রসত সুন্দর কাহ্নাঞি
আরতী কিছু নাহিঁ ফলত (১৩০)॥

কিন্তু কৃষ্ণ বলিলেন, তিনি আর দেরী করিতে বা অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন না। তার পর যখন কানাই তাঁহার "হিআ খণ্ড খণ্ড নখের ঘাএ, হিছোলেঁ লএ পরাণে" (১৩১) করিলেন, তখন "চাহিল রাধা কাহ্নক আড় নয়নে," রাধার এই কটাক্ষপাতের ছবিটি মনোরম।

নৌকাখণ্ডে প্রথমে রাধা নৌকায় চড়িতে কিছু আপত্তি করিলেও শেষে কানাইয়ের কথা মতন "রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ" (১৬০), যদিও নৌকার ভার কমাইবার জন্ম ঘৃত দধি ঘোল তিনি নিজে ফেলিয়া দেন নাই; কানাই "ছল করি টালিলেক রাধার পসার" (১৬১)। এখানেই বুঝা যায় যে, রাধা বেশ বশ মানিয়াছেন। উহা আরও স্পষ্ট হয় জলবিহারের পর বড়াইয়ের নিকট তাঁহার সাফাই গাওয়ায়—কানাই আমাকে আজ বাঁচাইয়াছে

এবার কাহ্নাঞি বড় কৈল উপকার।
জরমেঁ সুঝিঁতে নারোঁ এ গুণ তাহার॥ (১৬৪)

কানাইয়ের এ উপকার আমি জীবনে শোধ দিতে পারিব না।

ভারখণ্ডে ও ছত্রখণ্ডে রাধা বেশ প্রগল্ভা হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি কানাইকে বলেন, ভার কাঁধে করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে মথুরায় চল, ফিরিবার সময় তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব—"আসিতেঁ তোহ্মাক রতি দিবোঁ মো কাহ্নাঞি" (১৮৪)। কৃষ্ণ যে তাঁহার কথায় ওঠা বসা করেন, রাধা তাহা সখীসমাজে দেখাইবার জন্ম ব্যগ্র বলিয়াই তাঁহাকে দিয়া মাথায় ছাতা ধরানো। নৌকাখণ্ডে রাধা বড়াইকে লুকাইয়া বিলাস করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন প্রকাশ্যে তাহাকে বলিতেছেন—

আপণ মাথার ছত্র ধরু মোর মাথে।
তবেঁ মো শৃঙ্গার বড়ায়ি দিবোঁ জগন্নাথে॥ (১৯৬)

বৃন্দাবনখণ্ডে রাধা নিজেই আগাইয়া যাইয়া কৃষ্ণকে প্রলুব্ধ করিতেছেন দেখিতে পাই।

বৃন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে।
আড় নয়নে দেখে কাহ্নাঞিঁক পাশে॥
খসাআঁ বান্ধিল পুনী কুন্তল ভার।
সঘন ছাড়িল রাধা হাম্বী আপার॥
চুম্বন করিল রাধা সখির বদনে।
ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে॥ (২০৮)

রাধার সখীরা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কুঁদুলে পড়োশিনীরা। তাহারা পাছে রাধার নিন্দা করে, তাই তিনি তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য কৃষ্ণকে তাঁহাদের সহিত বিলাস করিতে ইঙ্গিত করিলেন। কানাই তো তাহাতে খুব রাজী; তিনি খুসী হইয়া রাধাকে বলিলেন,

কেহো কাহাকো যেন না করে উপহাস।
তেহ্ন মতেঁ করিব বিলাস॥ (২১১)

কৃষ্ণের কিন্তু প্রথম হইতেই আশঙ্কা ছিল যে, রাধা ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া না পড়েন। রাধার সখীরা কৃষ্ণের সঙ্গে বিলাস করিতে এত ব্যগ্র যে, তাঁহাদের আর একটুও দেরী সহ্য হয় না, তাঁহারা কানাইকে বলিলেন—

বুঝিবারে নারিল তোহ্মারে জগন্নাথ।
পাত পাতিআঁ কেহ্নে নাহিঁ দেহ ভাত॥ (২১৩)

দিনের বেলায় কৃষ্ণ ষোল সহস্র গোপী লইয়া "বৃন্দাবন মাঝে রতি ভুঞ্জিল মুরারী" (২১৪)। মণীন্দ্রবাবু ইহাকেই বলিয়াছেন রাস। রাধার ক্ষোভ হইল। পরে অবশ্য কৃষ্ণ তাঁহার মনোব্যথা দূর করিলেন। যমুনাখণ্ডে দেখি রাধা কৃষ্ণের প্রণয় সম্বন্ধে একেবারে দৃঢ়নিশ্চয়—

বড় দুষ্টমতী সে জে কাহ্ন
আহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জাণে আন। (২৪৭)

এই সব ঘটনার পর হারের জন্য যশোদার নিকট নালিশ করার কথা কহিয়া

কবি রাধাকে একেবারে পাড়াগাঁয়ের নষ্ট মেয়ে করিয়া ফেলিয়াছেন। বাসলি-গতি চণ্ডীর দাসের পক্ষে ইহা বোধ হয় আকস্মিক বা অনিচ্ছাকৃত নহে।

এত দূর পর্য্যন্ত যে রাধার চরিত্র অঙ্কন করা হইল, রাধাবিরহের রাধার চরিত্রের সঙ্গে তাহার মিল খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। যে রাধা কৃষ্ণের প্রত্যেকটি কথার উপযুক্ত জবাব দিয়াছেন, যথেষ্ট তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন, তিনি 'রাধাবিরহে' "যেহ্ন বাদিআর সাপ" (১২১) হইয়াছেন। কৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষায় "ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন" (৩৫৬) এবং "ছিনারী পামরী নাগরী রাধা" বলিয়া গালি দিলেও তিনি কৃষ্ণের জন্য পাগলিনী। একেবারে পাগলিনী না হইলে সোজা ও স্পষ্ট ভাষায় কেহ বলে না—

আল হের বড়ায়ি।
বোল কাহ্নে রাধা মাঙ্গে সুরতী॥ (৩৫২)

এরূপ বস্তুতান্ত্রিক বিরহের সঙ্গে কবিজনবর্ণিত বিরহিণীর আদর্শ খাপ খায় না। তবুও অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস মুখ্যতঃ জয়দেবকে অনুসরণ করিয়া বড়াইয়ের দ্বারা কৃষ্ণকে বলাইয়াছেন—

তনের উপর হারে।
আল মানএ যেহেন ভারে,
অতি হৃদয়ে খিনী রাধা
চলিতেঁ না পারে॥ (৩৭৭)
স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মন্যতে কৃশতনুরিব ভারম্॥ (গীতগোবিন্দ, ৪।১১)
ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশ দিশে ঘনে ঘনে।
নালহীন কৈল যেন
নীল নলিনে॥ (৩৭৮)
দিশি দিশি কিরতি সজল-কণজালং।
নয়ন-নলিনমিব বিদলিতনালম্॥ (৪।১৪)
দেখি পল্লব শয়নে। আঙ্গার রাশি সমানে।
মুদয়ে নয়ন অতি তরাসিত মনে॥ (৩৭৮)

নয়ন-বিষয়মপি কিশলয়-তল্পং। গণয়তি বিহিত-হুতাশ-বিকল্পম্ (৪।১৫)

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।

গরল সমান মানে মলয় পবনে॥ (৩৭৯)

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং

ব্যাল-নিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়-সমীরম্॥ (৪।১)

কিন্তু অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের অনুকরণকে ছাড়াইয়া রাধাকে উন্মাদিনী করিয়াছেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে ২।১০৫ পর্য্যায়ে উন্মাদের যে বর্ণনা আছে, অথবা শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে বিয়োগিপ্রলাপে (৩৪৪৯—৩৪৭২) যাহা দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা এই আলেখ্য ঢের বেশী জীবন্ত—

খনে হাসে খনে রোষে। খনে কাঁপএ তরাসে।

খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে॥ (৩৭৮)

অথবা—

"হাসে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে"। (৩৭৯)

মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের প্রেমোন্মাদ চোখে দেখিয়া লিখিয়াছেন—

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে বাহ্য নাহি জানে।

রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে॥

(ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৯২২)

কৃষ্ণকীর্ত্তনের তিনটি পদ (পৃঃ ১৯৯, ২০২, ২৩৫) এবং বারটি পদাংশ (পৃঃ ৪৮, ৫৫, ৬২, ৭২, ১৫৪, ২১৮, ২২৫, ২৩৩, ৩৪৮, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯) জয়দেবের পূরা অনুবাদ।

অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস যে অনেক স্থানে জয়দেবের হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা তিনটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন (সম্পাদকীয় বক্তব্য, পৃঃ ২৫)। আমরা দেখাইয়াছি যে, জয়দেবের অনুকরণস্পৃহায় এই কবি অনুচিত ক্ষেত্রেও গীতগোবিন্দের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। বসন্তরঞ্জনবাবু ও মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় দুই চারটি স্থলে এই কবির রচনার সহিত বিদ্যাপতির পদের তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির প্রভাব যে এই কবির উপর কত সুদূরপ্রসারী, তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি হইতে প্রতীত হইবে আশা করি। প্রথমে মিত্র-মজুমদার সংস্করণ

হইতে পদসংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া, বি চিহ্নেতে বিদ্যাপতি ও পরে পৃষ্ঠা উল্লেখ করিয়া কৃ চিহ্নেতে কৃষ্ণকীর্ত্তন উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) বি ৪০ পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর, উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল, দুই বহ সুরসরি ধার।

বি ৬২৩ কাম কম্বু ভরি কনক-সম্ভু পরি ঢারত সুরধুনি ধারা।

কৃ ১৩২ কনক কুম্ভ আকারে দুঈ তোর পয়োভারে
তাহাত উপর গজ মুকুতার হারে।
যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে।

(২) বি ২৩ সুন্দর বদন সিন্দুর বিন্দু, সামর চিকুর ভার
জনি রবি সসি সঙ্গহি উগল, পাছু কএ অন্ধকার।

কৃ ১২ কেশ পাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেন উইল নব সূর॥

(৩) বি ৬৮৪ বাঢ়িলে জৌবন তোহে দেব দান।

কৃ ২১ জৈসানো রতি জাণবোঁ, তেসানে কাহ্ন আণিবোঁ।

(৪) বি ৬৭৩ কভু নহি সুনিএ সুরতক বাত।

কৃ ৪৫ রতি কথা সখি মুখে না শুণীলোঁ কাণে।

(৫) বি ১১৮ মালতী মল্লিকা কলিকাত নাহিঁ গন্ধ।

বি ২৮৮ জাবে ন মালতি কর পরগাস। তাবে ন তাহি মধুকর বিলাস॥

বি ৫৮ মুন্দলা মুকুল কতএ মকরন্দ।

কৃ ৪৬ চাঁপা কুঁঢ়ী দেখিতে রূপসে। তাত নাহি গন্ধের পরসে।

কৃ ৪৫ অধিক পীড়এ যবেঁ ভুখিল ভষলে।
তভোঁ নাহিঁ পাএ মধু কমলমুকুলে।

কৃ ১২৮ আহ্মার মুকুলে নাহি পাঁএ মধুভার।

(৬) বি ৩১০ জীবন সার জৌবন জলরঙ্গ।
জৌবন তঞো জঞো সুপুরুষ সঙ্গ।

কৃ ৫৩ আনেক সময় যৌবন যে নারী, আপন শরীরে সাঁচে।
অতি সে আবুধি ভোগ পরিহরি, আপনে আপনা বঞ্চে॥
যাহার যৌবন নর উপভোগে, সেহি সে নাগরী ভালী॥

(৭) বি ৩০ অধর নবপল্লব মনোহর দসন দালিম জোতি।
জনি নিবিল বিক্রমদলেঁ সুধারসে সীচি ধরু গজমোতি॥
কৃ ৫৮ মাণিক জিনিয়াঁ তোর দশনের দ্যুতী।
সিন্দুরে লোটাইল যেহ্ন গজমুতী॥
(৮) বি ৬৯ অধর সুরঙ্গ জনু নিরস পঁড়ার
কোন লুটল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডার॥
কৃ ১৩৫ অধর ছাড়িল তোর তাম্বুলের রাগ।
হেন বুঝোঁ বনে তোর কাহ্ন পাইল লাগ॥
(৯) বি ৬৮৫ সিরিস কুসুম হম কমলিনি নারি।
কৃ ১৩৪ শিরীষ কুসুম সম আহ্মে কোঁঅলী॥
কৃ শিরীষ কুসুম কোঁঅলী অদভুত কনক পুতলি॥
(১০) বি ২৫২ কঞ্চন গঢ়ল হৃদয় হথিসার। তে থির থম্ভ পয়োধর ভার।
লাজ-সিকর ধর দৃঢ় কএ গোএ।
কৃ ২৮১ ময়মত করী লাজ অঙ্কুশে তাক নিবারিতে নারী।
(১১) বি ৭৪১ জনু সে সোনারে, কসি কসটিক, তেজল কনহ রেহা।
বি ৭৪৪ নিকস পাষাণে যেন পাঁচবানে কসিল কনক রেহা।
কৃ ২৯১ হরি দৃঢ় আলিঙ্গন রাধার দেহা। যেহ্ন নিকষত শোভে
কনক রেহ॥

(১২) সম্ভোগের সময় নায়িকার কাকুতি—
বি ৬৮৫ বিদগধ মাধব তোহে পরণাম।
অবলা বলি দএ ন পূজহ কাম॥
কৃ ২৯১ এড় এড় কৃষ্ণ হঅ খানিএক তোহ্মে থীর।
আতিশয় বেগেঁ পাছে বুক লএ চীর॥
(১৩) বি ১৮৪ নিন্দঅ চন্দন পরিহর ভূসণ। চাঁদ মানএ জনি আগী॥
কৃ ৩৭৯ নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমাণ মানে মলয় পবনে॥
বি ৫৬৭ জা লাগি চাঁদন বিখতহ ভেল। চাঁদ অনল জা লাগি রে॥
বি ৭১৪ চাঁদ চন্দন তনু অধিক উতাপএ।

বি ৭৩৮ চন্দন গরল সমান।

বি ৩৬৬ কে বোল পেম অমিঞকে ধার।
অনুভবে বুঝিঅ গরউ অঙ্গার।

কৃ ২৯৭ কে বোলে চন্দন চাঁদ অতি সুশীতল।
আহ্মার মনত ভাএ যেহেন গরল।

(১৪) বি ৫৫০ চাঁদ সুরুজ বিসেখ ন জাণএ। চাননে মানএ সাতী॥

কৃ ২৯৬ চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণো, চন্দন শরীর তাএ।

(১৫) বি ৫১৭খ তিলা এক সুনাহ সমাগম পাওল।
মাস বরখ ভেল সাতি॥

কৃ ৩৪৭ দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ দুগুণ পোড়ণি সারে।

(১৬) বি ১২৫ পুরুষ ভমর সম কুসুমে কুসুমে রম।

বি ১৩৪ পুরুসক চঞ্চল সহজ সভাব। কএ মধুপান দহও দিস ধাব।

কৃ ৩৭৩ পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান।
নানাখান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান॥

(১৭) বি ২৯২ বড়েও ভুখল নহি দুহু কর খাএ।

বি ৬৮০ ভুখিত জন কিয়ে দুই করে খায়।

কৃ ১১৮ ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞি দুই হাথে না খাইএ।

(১৮) বি ১৮৮ সাহর মজর ভ্রমর গুঞ্জর, কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন, নিঠুর কন্ত ন আব॥

কৃ ৩৪২ মুকলিল আম্ব শাহারে। মধুলোভে ভ্রমর গুঁজরে।
ডালে বসি কুয়িলী কাঢ়ে রাএ। যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ॥

কৃ ২৯৬ আম্ব ডালে বসী কুয়িলী কুহলে, লাগে বিষ বাণ ঘাএ॥

(১৯) বি ৭৩১ শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর তোড়হ গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙারে জামুন সলিলে সব
ডার রে॥
সীঁথার সিন্দুর পোছি কর দূর পিয়া যব নৈরাশ রে।

কৃ ৩৪৯ কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি, কি মোর বসতী বাসে।
আন পাণী মোকে একো না ভাএ, কি মোর জীবন আশে॥

কৃ ৩৩৬ এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ সিসের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর॥

উভয়ই জয়দেবের "মম বিফলমিদমমলমপি রূপ-যৌবনম্" এর অনুকরণ।

(২০) বি পাখী জাতি যদি হউ পিয়া পাশে উড়ি যাঁউ
সব দুখ কহোঁ তছু পাশে।

ক ২৯৪ পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
কৃ ৩৯৩ পাখী জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী যাঁও তথা
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসেণ যথাঁ।

(২১) বিদ্যাপতির রাধা নৌ-বিলাসের পর গহনা হারাইবার কৈফিয়ৎ দিতেছেন—

খরি নরি বেগ ভাসলি নাই।
ধরএ ন পারথি বাল কাহ্নাই॥
তেঁ ধসি জমুনা ভেলহু পার।
ফুটল বলআ টুটল হার॥
এ সখি এ সখি ন বোল মন্দ।
বিরহ বচনে বাঢ়এ দন্দ॥
কুণ্ডল খসল জমুন মাঝ।
তাহি জোহইতে পড়লি সাঁঝ॥
অলক তিলক তেঁ বহি গেল।
সুধ সুধাকর বদন ভেল॥
তটিনি তট ন পাইঅ বাট।
তেঁ কুচ গড়েল কঠিন কাঁট॥
ভন বিদ্যাপতি নিঅ অবসাদ।
বচন-কউসলে জিনিঅ বাদ॥ (৩৫১)

অর্থাৎ নদীর খর স্রোতের বেগে নৌকা ভাসিল, বালক কানাই নৌকা সামলাইতে পারিল না। সেই জন্য জলে পড়িয়া যমুনা পার হইলাম, বলয়

ভাঙ্গিল, হার ছিঁড়িল। এ সখি এ সখি, মন্দ বলিও না। বিরহবচনে দ্বন্দ্ব বাড়িয়া যায়। কুণ্ডল যমুনার মধ্যে পড়িয়া গেল, তাহা খুঁজিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেই জন্য অলকা তিলকা ধুইয়া গেল; মুখ শুদ্ধ চন্দ্রের মতন (সাদা) হইল। নদীর তটে পথ পাইলাম না, তাই কুচে কঠিন কাঁটা ফুটিল। বিদ্যাপতি বলেন, নিজ পরাজয় বচনকৌশলে মামলা জিতিল।

ইহার সহিত অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের রাধার নৌবিলাসের পর কৈফিয়ৎ তুলনা করুন—

কথো দূর খেআইলে নাঅ চক্রপাণী।
ঝাঝর নাঅ লৈল চারি পাসে পাণী॥
বড়ায়ি বড় ভয় পাইলোঁ যমুনার জলে।
পার কৈল মোকে ভালে কাহ্নাঞিঁ গোআলে॥
গাতর ভরা রাধা পেলা আভরণে।
পাণি ফুটি মার আহ্মাক কুইল কাহ্নে॥
আচম্বিত খরতর বাহিলেক বাঅ।
মাঝ যমুনাত ডুবিআঁ গেল নাঅ॥

এই কৈফিয়ৎ বিদ্যাপতির রাধার কৈফিয়তের মতন রসঘন নহে। রাধা কেন গাভরা গহনা যমুনায় ফেলিলেন, কৃষ্ণকীর্ত্তনে তাহার কারণ দেখানো নাই। জল ছেঁচিবার জন্য গহনা ফেলার দরকার হয় না।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, বিদ্যাপতি নৌবিহারের দুইটি মাত্র পদ লেখেন নাই; কয়টি লিখিয়াছিলেন, জানা যায় না, তবে তিনটি পদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে (৪৯, ৩৪৪, ৩৫১)।

(২২) বিদ্যাপতির রাধা বিলাসের পর আর একটি কৈফিয়তে বলিয়াছেন যে, ফুল তুলিতে গেলে ভ্রমর অধর দংশন করিল। সেই জন্য যমুনাতীরে চলিয়া আসিলাম (বোধ হয় মুখে জল দিতে), বাতাসে বুকের কাপড় হারাইয়া গেল। সখি, সত্যি বলছি। তুমি অন্য কিছু যেন ভাবিও না। বুকের হার ব্যক্ত হইল, তাহা দেখিতে উজ্জ্বল সাপের মতন। তাই ময়ূর আসিয়া বেগে ঝাঁপ দিল, নখর বিদ্ধ করিল, আমার বুক এখনও কাঁপিতেছে।

কুসুম তোরএ গেলাহু জাহাঁ। ভমর অধর খণ্ডল তাঁহা॥
তেঁ চলি অয়লাহুঁ জমুনা তীর। পবন হরল হৃদয় চীর॥
এ সখি সরুপ কহল তোহি। আনু কিছু জনি বালসি মোহি॥
হার মনোহর বেকত ভেল। উজর উরগ সংসয় গেল॥
তেঁ ধসি মজুরে জোড়ল ঝাঁপ। নখর গাড়ল হৃদয় কাঁপ॥ (৩৫০)

কৃষ্ণকীর্ত্তনের যমুনাখণ্ডে বিহারের পর রাধার অঙ্গে রতিচিহ্নের কৈফিয়ৎ দিতে যাইয়া বড়াই বলিতেছেন—কানাই ছেলেমানুষ, গোরু সামলাইতে পারে না; রাধা গোটা দশেক ঢিল ছুড়িয়াছিল। গোরু ছুটিয়া আসায় ভয় পাইয়া সে কাঁটাবনের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল।

তরাসে পড়িলা রাধা কাঁটী বন মাঝে।
খণ্ড খণ্ড দেহ দেখি ঘর না আইসে লাজে॥
আপণেই দেখ রাধার দেহগতী।
গাছে লাগি ছিড়িল সকল গজমতী॥
তরাসেঁ নিরস ভৈল রাধার আধর।
পরাণ রাখিলোঁ দিআঁ শীতল জল॥ (২৬৬)

বিদ্যাপতির রাধার কৈফিয়তের মধ্যে যথেষ্ট কাব্যরস আছে। তাহার গলার হার দেখিয়া সাপভ্রমে ময়ূর ঝাঁপ দেয় এবং সেই ভয়ে রাধার বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করে। বড়াইয়ের কৈফিয়ৎ নিছক গদ্যগন্ধী।

বিদ্যাপতির সঙ্গে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার সাদৃশ্য ঐ ২২টি স্থানে ছাড়া, আরও অন্ততঃ ১৭টি জায়গায় আছে। ঐ ১৭টি তুলনা খুব ছোটখাটো, যথা—উভয়েরই লোচনের সঙ্গে খঞ্জনের, দাঁতের সঙ্গে মতি বা মাণিক্যের, মুখের সঙ্গে চাঁদের, গমনগতির সঙ্গে গজরাজগতি, কুচের সঙ্গে শিবলিঙ্গের ইত্যাদি—ঐগুলি মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্য" (১।২৫৮—২৬৭) গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। তিনি মৎপ্রদর্শিত ঐ বড় বড় ১৯টি সাদৃশ্য ধরেন নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাবই যে বিদ্যাপতির উপর পতিত হইয়াছে, এই ধারণাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়" এবং বিদ্যাপতি যদি প্রায় ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং বাঙ্গলার গ্রন্থ মিথিলায় প্রচারিত হইতে যদি শতাধিক বৎসর লাগিয়া

থাকে, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই নির্দ্দেশিত করা উচিত। অতএব চণ্ডীদাসকে জয়দেবের বেশী পরে স্থাপন করা যায় না" (পৃঃ ২৬৫)। জয়দেবও চণ্ডীদাসের নিকট ধার করিয়া গীতগোবিন্দ লিখিয়াছেন, এই সিদ্ধান্তে যে কেহ উপনীত হন নাই, ইহা আমাদের সৌভাগ্য। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস যদি জয়দেবের অল্প পরেই, ধরুন ৫০।৬০ বৎসর পরে আবির্ভূত হন, তবে তাঁহার পক্ষে যে "মজুরিয়া" বা কুতঘাটের মতন শব্দ ব্যবহার করা সম্ভব হইত না, এ কথাটি মণীন্দ্রবাবু খেয়াল করেন নাই। আর একটি বিষয়ের প্রতিও কেহ তাদৃশ মনোযোগ দেন নাই। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের পুথি বন-বিষ্ণুপুরের নিকট কাঁকিল্যা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে; উহার কয়েকটি মাত্র পদ সহ আর একখানি তালশিক্ষার পুথিও বিষ্ণুপুরে পাওয়া গিয়াছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় কবির ভাষা ও ভৌগোলিক জ্ঞানের বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উহা সামন্তভূম বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব মানভূম। উহা বিষ্ণুপুরের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বিষ্ণুপুর ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। সুতরাং খাঁটি হিন্দু-রাজ্যে বসিয়া কাব্য লিখিলে উহাতে এত মুসলমানী শব্দ ঢুকিল কি করিয়া?

অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস যে বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিষেধার্থে 'জনি' শব্দের প্রয়োগ হইতে। যথা—

(১) রাজা কংসাসুর অতি দুরুবার, সে জনি এহাক শুনে। (৩৮)
(কংস যেন শুনিতে না পায়।)

(২) লোকে জনি সুণে তোর এ সব কাহিনী। (২৯৯)
(লোকে যেন তোর এ সব কথা শুনিতে না পায়।)

(৩) পাছে জনি লোক উপহাসে। (৩২৭)
(পাছে লোকে যেন উপহাস না করে।)

(৪) পাছে জনি রোষ কর তোহ্মে। (২১১)
(পাছে যেন তুমি রাগ করিও না।)

(৫) বন্ধন ঘুচাহ জুনি দেখে দেবগণে। (২৮৫)
(বাঁধন খুলিয়া দাও, দেবতারা যেন দেখিতে না পান।)

(৬) কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি জুনী জানে। (১৬১১)
(কানাই, আমাকে কোলে কর ; কিন্তু দেখিও, বড়াই যেন জানিতে না পারে।)

'জনি' শব্দ বাংলা নহে ; উহা মৈথিল শব্দ। বিদ্যাপতি উহা অনেক স্থলে নিষেধার্থে ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—

(১) জনি গোপহ আওব বণিজার। (২৬৮)
(যেন গোপন করিও না, সদাগর আসিবে।)

(২) চন্দা জনি উগ আজুক রাতি। (৩১৬)
(চাঁদ যেন আজ রাতে না উঠে।)

ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে বিচার করিয়া ডাঃ স্থকুমার সেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন —"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা বিচার করিলেও ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের বেশী আগে যাওয়া চলে না।" "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা পঞ্চদশ শতকের পরের হইতে পারে না, এমন কথা বলা যায় না। এই পর্য্যন্ত বলা সঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা পুথির সমসাময়িক, অর্থাৎ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী নয়" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১।১৬৫—১৬৬ পৃঃ)।

পুথির কাল সম্বন্ধে অবশ্য স্থকুমারবাবু মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি 'বিচিত্র সাহিত্যে' (১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯) বলিয়াছেন যে, পুথি আনুমানিক ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লেখা হইয়াছিল।

ডাঃ স্থকুমার সেন তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পূর্বার্ধের তৃতীয় সংস্করণে (১৯৫৯) লিখিয়াছেন (পৃঃ ১২৯)— "রাখালদাস অথবা রাধাগোবিন্দবাবু কাগজ ও কালির দিকে মনোযোগ দেন নাই। দিলে কখনই পুথিটিকে প্রাচীন বলিতেন না। কাগজ পাতলা, মাড়ের তৈয়ারী, ঠিক যেন মিলের কাগজ। এ রকম কাগজে লেখা পুথি বা দলিল অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে দেখি নাই, উনবিংশ শতাব্দে যথেষ্ট দেখিয়াছি। কালিতেও প্রাচীন পুথির কালির মত গাঢ় উজ্জ্বলতার চিহ্নমাত্র নাই।"

'রাধাবিরহে' দেখি, রাধা বড়াইকে বলিতেছেন—"প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল।" কোথায় কোথায় কৃষ্ণকে খুঁজিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ

দিতে যাইয়া রাধা—

আগেত যাইহ বড়াই বস্থলের ঘরে।
আবাল চরিত্র কাহ্ন মায়া বড় করে॥
তথাঁ না পাইলেঁ যাইহ যশোদার কোলে। (৩৩৯)

ইত্যাদি বলিয়া, পরে তাঁহাকে যমুনার কূলে, যমুনার ঘাটে, বৃন্দাবনে, নারদ মুনির নিকট, গোপগণের স্থানে, সঙ্কেতস্থানে প্রভৃতিতে খুঁজিতে বলিয়া, পরে কহিতেছেন—

তথাঁহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে।
তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথী কূলে॥
তথাঁহো না পাইলেঁ চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে॥
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে।
তবেঁস পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে॥
তবেঁ স্থধি পাইবেঁ যথাঁ বসে জগন্নাথে।
আদি অন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে॥
তোর বোলেঁ কাহ্ন মোর আসিবেক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ (৩৩৯—৩৪০)

"ভাগীরথী কূলে" সহসা কৃষ্ণকে খুঁজিতে বলা অত্যন্ত বিস্ময়জনক বোধ হওয়ায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (প্রথম খণ্ডে পৃঃ ১৯৩) ডাঃ স্থকুমার সেন একটি বিস্ময়চিহ্ন (!) দিয়াছিলেন। আমি বিশ্বভারতী পত্রিকায় (দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ৩২—৩৫) উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছিলাম—"শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সঙ্গে ভাগীরথীকূলের কোনো সম্বন্ধ নাই। সেই জন্য মনে হয়, উদ্ধৃত অংশের রচয়িতা বলিতে চাহেন—"নিতান্তই যদি ব্রজমণ্ডলের কোথাও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাগীরথীকূলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানে খোঁজ কর। সেখানে না পাওয়া গেলে সাগরের কাছে সন্ধান করিও, কেন না, শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীচৈতন্য সাগরে প্রায়ই যান। আর সেখানেও না পাইলে সকল লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিও, তাহা হইলে

"সুধি পাইবে" সন্ধান বা তত্ত্ব পাইবে—যেখানে জগন্নাথ বাস করেন।" বসন্তরঞ্জনবাবু প্রথম সংস্করণ ও চতুর্থ সংস্করণের মূল পাঠে "ভাগীরথী কূল" ছাপাইয়া, শেষে টীকা লিখিবার সময় উহার রূপ ধরেন 'ভাগীরথীকূল' এবং ব্যাখ্যায় লেখেন "ভগীরথকুলে অর্থাৎ ভগীরথনামা (কোনো) গোপগৃহে, এইরূপ অর্থ হইতে পারে।" আমার প্রবন্ধের আলোচনায় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন (ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ৬০—৬১) —"ভাগীরথী কূল" এখানে পবিত্র স্থানরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের মানসগঙ্গাও হইতে পারে। "সাগরের ঘরে—সাগর গোয়ালার ঘরে" পরিষ্কার লেখা, তাহার অর্থ সমুদ্রতীর কি স্বাভাবিক ব্যাখ্যা? আর কোনও সাধারণ পবিত্র স্থান, যথা হরিদ্বার, ত্রিবেণীসঙ্গম প্রভৃতির উল্লেখ যদি থাকিত, তাহা হইলে "ভাগীরথী কূল"কে সাধারণ পবিত্র স্থান বলিয়া গ্রহণ করা যাইত। আর ভাগীরথী কূল বলিতে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস বৃন্দাবনের নহে, বৃন্দাবন হইতে ২০ মাইল দূরে গোবর্দ্ধনের নিকটস্থ মানস-গঙ্গাকে নিশ্চয়ই ইঙ্গিত করেন নাই—কেন না, তিনি বৃন্দাবনের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে অজ্ঞতার বহু নিদর্শন গ্রন্থমধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে মানসগঙ্গার কথা শুনিয়াছিলেন, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। কবি রাধাচন্দ্রাবলীকে সাগরের কন্যা বলিয়াছেন (পৃঃ ৬)। মেয়ে কি কখনও 'বাপের বাড়ীতে' খোঁজ না বলিয়া 'সাগরের ঘরে' খোঁজ বলে? কবি সাগর ও জগন্নাথ কথা দুইটিকে দ্ব্যর্থবোধক করিয়া (শব্দের উপর punning করিয়া) লিখিয়াছেন বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় আমার মত খণ্ডন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে—"ভাগীরথী-কূলের সঙ্গে কৃষ্ণলীলার সম্বন্ধ ছিল কি না, সে সম্বন্ধে খুবই কম তথ্য পাওয়া যায়।" কেন? ভাগবত, হরিবংশ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি এবং কৃষ্ণবিষয়ক বহু শ্লোকাদি হইতে কি জানা যায় না যে, ভাগীরথী-কূলে কৃষ্ণ কোন লীলা করেন নাই? সহসা এই অজ্ঞেয়বাদের ধুয়া কেন? সুখময়বাবু আরও বলেন—"উপরোক্ত অংশটি যিনি লিখেছেন, তাঁর যদি চৈতন্যলীলা জানা থাকত, তা হলে তিনি এত অস্পষ্টভাবে চৈতন্যলীলার আভাস দিতেন না" (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ৫৩—৫৪)।

অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস যদি বৈষ্ণব হইতেন, তাহা হইলে স্পষ্ট করিয়া চৈতন্যের বন্দনা করিতেন ; কিন্তু যিনি বাসলীগতি, বাসলীর চরণে গান গাহিতেছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে যাইবেন কেন? তিনি শুনিয়াছিলেন যে, অনেক লোকে চৈতন্যকে ভগবান্ বলে, কৃষ্ণের অবতার বলে, তাই কাব্যের মধ্যে চৈতন্যলীলার একটি ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে চৈতন্য-নিত্যানন্দকে "সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ" বলা হইয়াছে। মুকুন্দরামও লিখিয়াছেন যে, চৈতন্য—"কীর্ত্তন সিজ্জন কৈল খোল করতাল" (পৃঃ ৫)। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে কৃষ্ণকীর্ত্তন রচিত হইলে কৃষ্ণ "খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ" (২৯৩) এবং "করেঁ করতাল মধুর বাঁশী বাএ" (৩৩৯) এই বর্ণনা থাকিত না। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই বা তাহার কিছু পরে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণের ধামালী রচিত হয়।

শ্রীচৈতন্য যে কবির পদ আস্বাদন করিতেন, তিনি হইতেছেন পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস, যাঁহার পদের নমুনা পদকল্পতরু ও পদামৃতসমুদ্র হইতে উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিও স্বীকার করিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যের পক্ষে দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের পদ আস্বাদন করা সম্ভব ছিল না। তিনি বলেন—"চৈতন্যদেব কবির পদ শুনিতেন। বোধ হয় রাধাবিরহের পদ" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪২।১, পৃঃ ৩৫)। যদি শ্রীচৈতন্য অনন্ত বড়ুর দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড শোনার অযোগ্য মনে করিতেন, তবে কি বিজ্ঞবর সনাতন গোস্বামী ঐ লেখককে উদ্দেশ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩৩।২৬) বৃহৎ বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় লিখিতেন —"শরৎকাব্যকথাশ্চ সর্ব্বাঃ সিষেবে তত্র কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাঃ তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিতদানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদিপ্রকারকাশ্চ জ্ঞেয়াঃ" (নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সংস্করণ, পৃঃ ১৩৫১)।* তথাকথিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ড কাব্য হিসাবে নিকৃষ্ট ;

* ডাঃ সুকুমার সেন তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে লিখিয়াছেন (পৃঃ ১৬৮)—"এখানে দর্শিত শব্দের সঙ্গে কর্মধারয় সমাস বলা চলে না, দ্বন্দ্বসমাস বলিতে হইবে এবং অর্থ হইবে 'জয়দেব চণ্ডিদাস প্রভৃতি দর্শিত এবং দানখণ্ড নৌকাখণ্ড ইত্যাদি লীলা প্রকার জানিতে হইবে।"......আগে পিছে "জয়দেব" ও "আদি"কে ছাড়িয়া দিয়া শুধু মাঝখানের শাঁস চণ্ডীদাসের উপর দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা কোনও দিক্ দিয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

সুতরাং উহাকে আদর্শরূপে স্থাপন করা সনাতন গোস্বামীর পক্ষে অসম্ভব। সনাতন গোস্বামী বৃহৎভাগবতামৃতে, হরিভক্তিবিলাসের টীকায় ও বৃহৎ-বৈষ্ণবতোষিণীতে অসংখ্য গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি উল্লেখ করিয়াছেন—তাহার মধ্যে একখানিও এমন বই নাই, যাহা সংস্কৃতে লেখা নয়। তিনি নিজে সংস্কৃতে টীকা লিখিতেছেন—যাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যের মত প্রচারিত হয়, তাহাতে বাংলার এক প্রত্যন্তের ভাষায় লেখা কাব্যের দৃষ্টান্ত দিলে বাংলার বাহিরের লোকে কি বুঝিবে? তবে সনাতন গোস্বামীর শ্রীচণ্ডীদাস কে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উনি সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ-উল্লিখিত —"কবিপণ্ডিতমুখ্য শ্রীচণ্ডীদাসপাদ" (সাহিত্যদর্পণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। বিশ্বনাথ উঁহার নামের পূর্ব্বে শ্রী যোগ করিয়াছেন। সনাতনও ঐ চণ্ডীদাসকে শ্রীচণ্ডীদাস বলিয়াছেন। ঐ শ্রী শব্দ সম্মানার্থ প্রযুক্ত। সনাতন গোস্বামীর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে কালিমা লেপনকারী অনন্ত বড়ুকে ঐরূপ সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা অসম্ভব। বিশ্বনাথ কবিরাজের খুল্ল পিতামহ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড লিখিয়া থাকিবেন। অথবা অন্য কোন চণ্ডীদাস সংস্কৃতে উহা লিখিয়াছিলেন। তাহা না হইলে ঐ লীলার কথা গুজরাটের নরসিংহ মেহতা কি করিয়া জানিবেন? তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাঁহার "দানলীলার" উপকরণ পাইলেন কোথায়? বাংলার বিষ্ণুপুর সামন্তভূম অঞ্চলের ভাষায় লেখা বইয়ের কথা কি জুনাগড়ে পৌছিয়াছিল? দানলীলার বই শুধু বাংলা ভাষাতেই নাই। সংস্কৃত ভাষায় রূপ গোস্বামীর 'দানকেলি-কৌমুদী' ও 'দানকেলি-চিন্তামণি' ছাড়া আরও অন্ততঃ তিনখানি দানলীলার বই পাওয়া গিয়াছে। একখানি হইতেছে মহাদেব কবীন্দ্রাচার্য্য সরস্বতী লিখিত দানকেলি-কৌমুদী (Burnellএর Catalogue of Sanskrit Manuscripts ১৮৬ বি, এবং Catalogus Catalogorum পৃঃ ২৪৯); দ্বিতীয়খানি হইতেছে নন্দ পণ্ডিত-লিখিত হরিবংশবিলাসের অন্তর্গত দানকৌতুক (A catalogue of Sanskrit Manuscripts in Private Libraries of N. W. Province, Allahabad 1877-1878, vol.-70.)। খুব সম্ভব, এই হরিবংশবিলাসের অন্তর্গত দানকৌতুক লক্ষ্য

করিয়াই কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে॥ (পৃঃ ১৩৭)

তৃতীয় হইতেছে ১৬২৮ সম্বৎ বা ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে বারীগ্রামে কর্ণাটী ভট্ট শ্রীমাধব-লিখিত "দানলীলাকাব্যম্"। উহা কাব্যমালার তৃতীয় গুচ্ছে প্রকাশিত হইয়াছে। বল্লাভাচার্য্যের শিষ্য কুম্ভনদাস (অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃঃ ১১৬) এবং সুরদাস দানলীলা সম্বন্ধে হিন্দীতে কাব্য লিখিয়াছেন। বিঠ্ঠলনাথের শিষ্য নন্দদাসেরও দানলীলার পদ পাওয়া যায়। দানলীলা সম্বন্ধে এই বিস্তৃত কাব্যধারার উৎস নিশ্চয়ই কোন সংস্কৃত কাব্য ছিল। দানখণ্ড নামটিও অনন্ত বড়ুর একচেটিয়া নহে—Catalogus Catalogorumএর তৃতীয় খণ্ডে ৫৪ পৃষ্ঠায় এক সংস্কৃত "দানখণ্ডে"র বিবরণ পাওয়া যায়।

অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে এই কথা বলা প্রয়োজন মনে করি যে, কবির কাহিনী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলেও তাঁহার কবিত্ব-শক্তি উচ্চশ্রেণীর। তিনি ছোট বড়সি দিয়া রুই মাছ ধরার উপমা 'খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী' (২৪২) অথবা

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী॥ (২৯৪)

এইরূপ গ্রাম্য জীবনের সাধারণ ব্যাপারের উপমা দিয়া মনোরম কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আদিরসের ছড়াছড়ি থাকায় কাব্যখানি প্রায় pornography পর্য্যায়ে পড়িয়াছে এবং সেই জন্য এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে*। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস শক্তিশালী কবি হইলেও, তাঁহার দ্বারা রাধার অন্তর্জীবনের ভাববিশ্লেষণমূলক আক্ষেপানুরাগের পদগুলি

*কবিশেখর কালিদাস রায় লিখিয়াছেন—"সাহিত্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, এইরূপ ভাবে কামের চরিতার্থতায় রসসৃষ্টি হয় না। প্রকৃতি রতি-ভাবকেই রসে উত্তীর্ণ করা চলে, এই ভাবের মধ্যে একজনের এইরূপ আন্তরিক বিরাগ বা বিমুখতা থাকিলে আদিরসের কাব্যও হয় না। বলপ্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ, বর্ব্বরোচিত আচরণের সমাবেশে আলঙ্কারিক বিচারে এই কাব্যে রসাভাস ঘটিয়াছে (প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১২)।

লিখিত হয় নাই। ঐ সব পদের ভাষা একেবারে অলঙ্কারবর্জ্জিত, উহা সুতীক্ষ্ণ শরবৎ পাঠকের মর্ম্মস্থলে যাইয়া পৌঁছে। ঐ ভাষার সঙ্গে অনন্ত বড়ুর ভাষা একেবারেই মেলে না। অবশ্য ঐ ভাষার সঙ্গে দীন চণ্ডীদাসের পঙ্গুভাষারও কোন মিল নাই।

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার লিখিয়াছেন যে, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ যতই আপনার দেবত্বের বড়াই করুক, সে ধূর্ত্ত এক গ্রাম্য লম্পট ছাড়া আর কিছুই নয় (বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, পৃঃ ৫৫)।

শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাশঙ্কর সেন (ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৯৩) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (৩।৫)—

রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্তবিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥

উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"মহাপ্রভু বা স্বরূপ দামোদর কাহারও পক্ষে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে স্বীকৃতিদান করা সম্ভব নহে। উজ্জ্বলনীলমণিপ্রণেতা শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর পক্ষে তো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাই স্বাভাবিক, আর সনাতন গোস্বামী তাঁহার টীকায় চণ্ডীদাসের দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডাদির উল্লেখ করিলেও তিনি যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে প্রমাণাভাব।"

দশম অধ্যায়

রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা

ষোড়শ শতকের পদাবলীতে রূপ ও রস, প্রেম ও আত্মনিবেদন, নিবিড় ভাবানুভূতি ও অতুলনীয় আনন্দের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু এই পদাবলী যে বাঙ্গালীর ভাবসাধনার কত বড় উচ্চ নিদর্শন, তাহা বুঝিতে হইলে সেই যুগের বাংলার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রশক্তির অস্থায়িত্ব, প্রায় অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের নির্য্যাতন বাঙ্গালীর জীবনকে দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার উর্দ্ধে উঠিয়া, চিত্তবৃত্তিসমূহকে যেন নিরোধ করিয়া, বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের অলৌকিক কবি-প্রতিভার প্রভাবে বাঙ্গালী শ্রোতা ও পাঠককে আনন্দের কল্পলোকে উন্নীত করিয়াছেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, দেশে যখন সুখ-শান্তি বিরাজ করিতে থাকে, রাজশক্তি যখন দেশবিদেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করে, তখনই সাহিত্যের পেরিক্লিয়ান যুগ, আগষ্টান্ যুগ, এলিজাবেথীয় যুগ, চতুর্দ্দশ লুইয়ের যুগ প্রভৃতির সূত্রপাত হয়। ষোড়শ শতকের প্রথম ৩২ বৎসরে বাংলা দেশে হুসেনশাহী বংশের শাসনকালে এইরূপ একটি স্বল্পকালস্থায়ী স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর ঐ শতাব্দীর বাকী ৬৮ বৎসর—এমন কি, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম বার বৎসর অর্থাৎ যশোহরের প্রতাপাদিত্যের পতনকাল পর্য্যন্ত লুণ্ঠন, আক্রমণ, যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বাঙ্গালীজীবনের নিত্যসহচর হইয়াছিল।

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। ঐ সময় ইলিয়াসশাহী বংশের শেষ নৃপতি জলাল-উদ্দীন ফথ (১৪৮১—১৪৮৭) গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজে লোক ভাল হইলেও, প্রাসাদের হাব্সী সেনাদলই সে সময়ে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। তাহাদিগকে দমন

করার চেষ্টা করিতে যাইয়া জলালউদ্দীন তাহাদের হাতে নিহত হন। তার পর ছয় বৎসরের মধ্যে চার জন নৃপতি—বরবাক্ শাহ (১৪৮৭), সৈফুদ্দিন ফিরুজ (১৪৮৭—১৪৯০), দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মামুদ (১৪৯০—১৪৯১) ও সামসুদ্দিন মুজাফর (১৪৯১—১৪৯৩)—একে একে পাইকদের হস্তে নিহত হন। আবিসিনিয়ার হাবসীরা এ সময়ে হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতবর্গের প্রতি নিষ্ঠুর নির্য্যাতন চালাইয়াছিল। সাধারণ প্রজারাও তাহাদের দাবী মিটাইতে যাইয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়ের অত্যাচারের চিত্র আঁকিতে যাইয়া জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘরদ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥ (পৃঃ ১১)

গঙ্গাস্নানে বাধা দেওয়ার কথাটা জয়ানন্দের কবিকল্পনা নহে। দিল্লীর সম্রাট্ সিকান্দার লোদী (১৪৮৯—১৫১৭) মথুরায় যমুনার ঘাটে ঘাটে পাহারাদার রাখিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে হিন্দুরা যমুনায় স্নান করিতে না পারে। তীর্থযাত্রীরা যমুনায় স্নান করিবার পূর্ব্বে মস্তকাদি মুণ্ডন করিত। সিকান্দার লোদী নাপিতদিগকে যমুনার তীরে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই খবর দুইটি নিজামুদ্দিনের তবকাৎ, নিয়মতুল্লার মাখজান-ই-আফগান-তারিখ-ই খান জহানী এবং ফেরিস্তা (১।১৮৬, নওলকিশোল প্রেস সং) দিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। তবে সিকান্দার লোদীর কর্ম্মচারীরা এমন ঘুষখোর ছিল যে, সামান্য কিছু ঘুষ দিলেই তাহারা হিন্দুদিগকে যমুনায় স্নান করিতে দিত। আলিগড়ে

রক্ষিত মুজমল-ই-হিন্দী নামক পুথিতে আছে যে, পাহারাদারেরা ঘুষ পাইলে স্নানার্থীকে যেন পাগল বলিয়া যমুনার জলে তাড়া করিয়া লইয়া যাইত (অধ্যাপক এ. হালিম লিখিত Muslim Kings of the 15th century and Bhakti Revival—Proceedings of the Tenth session of the Indian History Congress, Bombay, 1946, পৃঃ ৩০৮, পাদটীকা)। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সিকান্দার লোদীর রাজ্যকালেই ১৫১৫—১৬ খৃষ্টাব্দে মথুরা-বৃন্দাবন দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে হয় তো নিঃস্ব দেখিয়া কেহ কিছু বলে নাই। কিন্তু বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে কয়েকজন পাঠান সৈন্য তাঁহার সঙ্গীদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। মথুরার ব্রজবাসী কৃষ্ণদাস প্রভুর সঙ্গে ছিলেন। তিনি মিছামিছি পাঠানদিগকে বলিলেন—

কৃষ্ণদাস কহে, আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুরুকী আছে দুই শত কামানে॥
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি তবে তোমা সবা মারি॥ (চৈঃ চঃ, ২।১৮)

কৃষ্ণদাসের দম্ভপূর্ণ বাক্যে পাঠানেরা ভয় পাইয়াছিল। ভয় পাউক আর না পাউক, ঐ কথাগুলির মধ্যে সে সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার একটি ছবি পাওয়া যায়। রাজারাজড়া ছাড়া সাধারণ লোকও সৈন্য ও কামান রাখিতে পারিত—রাজশক্তি দুর্ব্বল হইলে প্রত্যেক দেশেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। সাধারণ লোকের হাতে যখন সৈন্যসামন্ত ও গুলিবারুদ থাকে, তখন তাহারা লুঠতরাজ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে না। তাই কৃষ্ণদাস অকাতরে বলিলেন, "ঘোড়া পিড়া লুটি তবে তোমা সবা মারি"—লোকজনকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাদের ঘোড়া ও ধনরত্ন লুঠ করা যেন সে যুগের প্রতিদিনের একটা সাধারণ ঘটনা। ষোড়শ শতাব্দীতে গৃহস্থ ব্যক্তিদের তীর্থযাত্রা করা সহজসাধ্য ছিল না। কৌপীনবন্ত সন্ন্যাসীরা ছিলেন ভাগ্যবন্ত; কেন না, লুঠ করিবার মতন কিছুই তাঁহাদের কাছে থাকিত না। কিন্তু গৃহস্থদিগকে অতি সাবধানে দল বাঁধিয়া চলাফেরা করিতে হইত। সেই জন্য দেখিতে পাই যে, গৌড় হইতে প্রতি বৎসর যাত্রীরা শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে দল বাঁধিয়া পুরী

যাইতেন। সে সময়ে হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহ হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার গড়মন্দারণ পর্য্যন্ত রাজ্য করিতেন। তাঁহারা উদার প্রকৃতির দৃঢ়চেতা সম্রাট্ ছিলেন। সেই জন্য হিন্দু প্রজাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন ; আর মেদিনীপুর জেলা হইতে প্রতাপরুদ্রের রাজ্যসীমা আরম্ভ হইয়াছিল। প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হইয়াছিলেন। এত সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও গৌড়িয়া তীর্থযাত্রীরা একা একা পুরী যাইতে পারিতেন না। এই একটি ঘটনা হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

হুসেন শাহের রাজ্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জয়ানন্দ হিন্দুদের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমর্থন বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত হইতেও পাওয়া যায়। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বম্ভর মিশ্র মহাপ্রকাশের দিন ভাবাবেশে নিজের অধ্যাপক গঙ্গাদাসকে এমন একটি ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দেন, যাহা তাঁহার জানার কথা নহে—অর্থাৎ যাহা তাঁহার পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময় অথবা তাহার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।—তিনি গঙ্গাদাসকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

রাজভয়ে পলাইস্ যবে নিশাভাগে॥
সর্ব্ব পরিবার সনে আসি খেয়াঘাটে।
কোথাহ নাহিক নৌকা পড়িলা সঙ্কটে॥
রাত্রি শেষ হৈল, তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া॥
"মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।"
গাঙ্গে প্রবেশিতে মন হইল তোমার॥
(চৈঃ ভাঃ, ২৷৯৷২২২)

হাব্সিদের রাজ্যকালে নবদ্বীপে রাজভয় ঘটিবার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অত্যাচারী হাব্সিরা হিন্দু মহিলাদের সম্মানহানি করিতে যে পশ্চাৎপদ হইত না, তাহাও উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়। হুসেন শাহ সিংহাসন অধিকার করিয়া প্রথমেই বার হাজার হাব্সির প্রাণদণ্ড দেন।

১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে, শ্রীচৈতন্যের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ নিজনামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ আরব-জাতীয় ছিলেন। শেষ হাব্‌সি নৃপতির তিনি উজীর ছিলেন। সেই সময়েই প্রজারা তাঁহার সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও অপক্ষপাত ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া থাকিবে। তিনি সুলতান হইয়া হাব্‌সিদের অত্যাচার বন্ধ করেন, প্রজারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। তাই তাঁহার রাজ্যাধিরোহণের অল্প পরে ও ১৪৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে বিজয় গুপ্ত তাঁহার মনসামঙ্গলে লিখিয়াছেন—

ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহা নৃপতিতিলক॥
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল রচনার এক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৪৯৫—৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাস তাঁহার মনসামঙ্গলে হুসেন শাহের নাম করিয়াছেন—

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহা গৌড়ের প্রধান॥

হুসেন শাহ রাজ্যাধিরোহণের দুই-তিন বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ-বিহারের অধিকাংশ জয় করিয়া লন। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পাটনার নিকটবর্ত্তী বাঢ়ে সিকান্দার লোদীর সঙ্গে তাঁহার এক সন্ধি হয়। বিহারশরিফ ও মুঙ্গেরে হুসেন শাহের শাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে। উত্তর-বিহারেরও কিয়দংশ তাঁহার অধিকারগত হয়। সরণ জেলায় তাঁহার এক শাসনে ১৫০৩-১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দ তারিখ দেখা যায়। হাজীপুর পাটনার ঠিক অপর পারে, কিন্তু উহা সরণ জেলার অন্তর্ভুক্ত হরিহরক্ষেত্র বা শোণপুরের পাশের গ্রাম। হাজীপুর যে হুসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়। সনাতন গোস্বামী খুব সম্ভব ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করায় সুলতান তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখেন। সুলতানের সহিত একদিকে প্রতাপরুদ্রের, অন্য দিকে ত্রিপুরার হিন্দু রাজা ধন্যমাণিক্যের যুদ্ধ চলিতেছিল। এই অবস্থায় সনাতন গোস্বামী পাছে

সুলতানের মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া হিন্দুরাজাদের সঙ্গে যোগ দেন, এই ভয়ে হুসেন শাহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সনাতনের ছোট ভাই রূপ গোস্বামী দবির-ই-খাস্ বা স্থলতানের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সুলতান বন্দী করেন নাই। ইহাতে মনে হয় যে, অমাত্য হিসাবে রূপের অপেক্ষা সনাতনের গুরুত্ব অনেক বেশী ছিল। যাহা হউক, সনাতন সাড়ে সাত হাজার স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করেন। তিনি পশ্চিমে যাইবার সুপ্রসিদ্ধ পথ তেলিয়াগঢ়িতে না যাইয়া রাজমহল পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত পাতড়া পাহাড় পার হইয়া হাজিপুরে উপস্থিত হন।

সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তাহার নাম।
গোসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তাঁর সনে।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাতশার স্থানে॥ ২।২১।৩৬

হুসেন শাহের কর্ম্মচারী যখন তিন লক্ষ টাকা লইয়া হাজীপুরে ঘোড়া কিনিতে আসিয়াছিলেন, তখন হাজীপুর তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সনাতন গোস্বামীরা কর্ণাটী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকেই হুসেন শাহের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন দেখা যাইতেছে। হাজীপুরে ঘোড়া কিনিতে পাঠানোর খবর হইতে বুঝা যায় যে, ষোড়শ শতকের প্রথম পাদেও হরিহরছত্রের মেলা বসিত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় আরম্ভ হইয়া ঐ মেলায় এখন পর্য্যন্ত এক মাস ধরিয়া বহুসংখ্যক হাতী ও ঘোড়া বিক্রয় হয়। শোণপুরের হরিহরছত্রের মেলায় ঘোড়া কেনা ছাড়া আর হাজীপুরে বা উত্তর-বিহারের কোথাও ভাল ঘোড়া পাওয়া সম্ভব ছিল না। এই অনুমান যদি যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, সনাতন গোস্বামী ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়ে হাজীপুরে আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৩৭ শকে শরৎকালে অর্থাৎ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন। তার পর মাঘ মাসে (চৈঃ চঃ, ২।১৮।১৩৫) অর্থাৎ ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বৃন্দাবন হইতে ফেরার পথে প্রভু

প্রয়াগ হইয়া কাশীতে আসেন। সেইখানে সনাতন গোস্বামীকে তিনি দুই মাস ধরিয়া উপদেশ প্রদান করেন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে হাজীপুরে থাকিলে, সনাতন গোস্বামীর পক্ষে দুই-আড়াই মাস পরে কাশীতে আসিয়া ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসের মাঝামাঝি বা জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে কাশীতে প্রভুর সহিত মিলিত হওয়া স্বাভাবিক। বৈষ্ণব-সাহিত্যের ইতিহাস বুঝিবার জন্য সনাতন গোস্বামী কবে হুসেন শাহের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন, তাহা জানা বিশেষ প্রয়োজন। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রূপ-সনাতন শ্রীবৃন্দাবনে যান নাই। ডাঃ সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন (Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal—পৃঃ ১১০) যে, শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দানকেলিকৌমুদী রচনা করেন। কিন্তু উক্ত ভাণিকার শেষে "রাধাকুণ্ডতটী-কুটীরবসতিস্ত্যক্তান্যকর্ম্মা জনঃ" এবং "নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্ম্মিতা" প্রভৃতি থাকায় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীরূপ ব্রজমণ্ডলে বসিয়া ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ব্রজমণ্ডলে যান নাই ; সুতরাং আমি ১৩৪২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪২।১। পৃঃ ৫১—৫২) "গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমন্বিতে"র পরিবর্ত্তে "গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রশরসমন্বিতে" পাঠ ধরিয়া ১৪৫১ শাকে বা ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থের রচনাকাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। হাজীপুরে শ্রীকান্তর ঘোড়া কেনার ঘটনায় ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে।

হুসেন শাহ বিহার জয় করা ছাড়া, দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের পর ১৫০২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কামরূপ সহর দখল করেন। কিন্তু কয়েক বার চেষ্টা করিয়াও তিনি আসাম অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধের ফলে ত্রিপুরার একাংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। এ দিকে আলফা হুসৈনি নামক এক ধনবান্ আরব বণিক্ চট্টগ্রামবিজয়ে হুসেন শাহকে অর্থ ও জাহাজ দিয়া সাহায্য করেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে এক পর্ত্তুগীজ দূত আরাকান-রাজকে বাংলার সুলতানের সামন্ত বলিয়া বর্ণনা করেন (History of Bengal II, পৃঃ ১৫০)। চট্টগ্রামবিজয়ে হুসেন শাহের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন

পরাগল খাঁ ও তাঁহার পুত্র ছুটিখান বা ছোট খাঁ। ইহাঁদেরই উৎসাহে পরমেশ্বরদাস "পাণ্ডবজিয়" ও শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধপর্ব্ব রচনা করেন। শ্রীকর নন্দী হুসেন শাহের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—

নৃপতি হোসেন শাহা হয় ক্ষিতিপতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥

মনে রাখা প্রয়োজন যে, চট্টগ্রামের সঙ্গে নবদ্বীপের সাংস্কৃতিক যোগ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। মাধবেন্দ্র পুরীর এক শিষ্য যেমন বিশ্বম্ভর মিশ্রের দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরী, তেমনি অন্য শিষ্য হইতেছেন চট্টগ্রামের ধনী সাধক পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, যাঁহার প্রেমভাব দর্শন করিয়া বিশ্বম্ভরের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহার নিকট নবদ্বীপে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্রেরও বাড়ী ছিল চট্টগ্রাম জেলার বেলেটী গ্রামে। শ্রীচৈতন্যের পরমপ্রিয় ভক্ত উদারচরিত্র বাসুদেব দত্তও চট্টগ্রামের লোক। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান।
চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হইল ইঁহা সভার প্রকাশ। (চৈঃ ভাঃ, ১।২)

চট্টগ্রাম যদি হুসেন শাহের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হইত, তাহা হইলে হয় তো পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পক্ষে বারংবার নবদ্বীপ ও নীলাচলে যাতায়াত করা সহজসাধ্য হইত না। তিনি ধনী লোক, সঙ্গে তাঁহার ধনরত্ন লোক-লস্কর থাকিত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে যে, পুণ্ডরীকের—

অনেক সেবক সঙ্গে অনেক সম্ভার।
অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে শিষ্য ভক্ত আর॥
আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম-ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোক দেখে॥ (চৈঃ ভাঃ, ২।৭)

হুসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ-বিগ্রহ বোধ হয় অনেক কাল ধরিয়া চলিয়াছিল—যদিও ফলে কেহই কাহারও রাজ্যের অংশ দখল করিতে পারেন নাই। রামানন্দ রায় তাঁহার জগন্নাথবল্লভ নাটকে প্রতাপরুদ্রের পরাক্রম বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্ধরঃ কন্দরং
স্বংবর্গং কলবর্গভূমিতিলকঃ সাশ্রুং সমুদ্বীক্ষতে।
মেনে গুর্জ্জরভূপতির্জ্জরদিবারণ্যং নিজং পত্তনং
বাতব্যগ্রপয়োধিপোতগমিব স্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ॥

অর্থাৎ যাঁহার নাম শুনিয়াই ভীত হইয়া সেকন্দর শাহ্ কন্দরে প্রবেশ করেন, কলবর্গদেশীয় নরপাল পরিবারবর্গকে অশ্রুপূর্ণনয়নে দেখিতে থাকেন, গুর্জ্জর-নরপতি নিজ রাজ্যকে জীর্ণ অরণ্য সমান মনে করেন এবং গৌড়দেশীয় ক্ষিতিপাল নিজেকে প্রবল বায়ুর বেগে সমুদ্রে ঘূর্ণায়মান পোতের আরোহীর তুল্য মনে করেন। ঐ নাটকে শ্রীচৈতন্যের প্রতি কোন নমস্ক্রিয়া নাই, সুতরাং উহা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে অর্থাৎ রামানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। হুশেন শাহের ১৫০৪-১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা হইতে জানা যায় যে, তিনি প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ যাজপুর জয় করিয়া লইয়াছিলেন। মাদলাপঞ্জীতে আছে যে, ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্রের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী পুরী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া বহু মন্দিরাদি ধ্বংস করেন। কিন্তু প্রতাপরুদ্র ফিরিয়া আসিয়াই গড় মন্দারণ আক্রমণ করেন। তাঁহার অমাত্য গোবিন্দ বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিনি মন্দারণ পুনরধিকার করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। ১৫০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্র যে উড়িষ্যায় ছিলেন না, তাহা বৃন্দাবন দাসও বলিয়াছেন—

যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
যুদ্ধরথে গিয়াছেন বিজয়া নগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলেন সেই বারে॥

(চৈঃ ভাঃ, ৩।৩।৪১২)

তিনি হুসেন শাহ কর্ত্তৃক উড়িষ্যার দেবমন্দিরাদি ভাঙ্গার কথাও লিখিয়াছেন—

যে হুসেন শাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥

হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ এবে না মানয়ে যত অন্ধ॥ (চৈঃ ভাঃ, ৩।৪।৪২৬)

পুনরায়

ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক, কত কত করিল প্রমাদ॥ (ঐ)

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু যখন পুরীতে যাইতেছিলেন, তখন প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে হুসেন শাহের যুদ্ধ চলিতেছিল। তাই বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, শান্তিপুরে প্রভুর ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে পুরীতে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন—

সে রাজ্যে এখন কেহো পথ নাহি বয়॥
দুই রাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ॥
যাবত উৎপাত কিছু উপশম হয়।
তাবত বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়॥ (চৈঃ ভাঃ, ২।২।৩৮১)

শ্রীচৈতন্য অবশ্য এ কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে যখন শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিতেছিলেন, তখনও হুসেন শাহের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ চলিতেছিল। রামানন্দ রায় রেমুণা (বালেশ্বর ষ্টেশনের ছয় মাইল পশ্চিমে) পর্য্যন্ত প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। "তবে ওড্রদেশ সীমা প্রভু চলি আইলা"—সেইখানে উড়িয়া-রাজকর্ম্মচারী প্রভুকে বলিলেন—

মদ্যপ যবনরাজের আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥
দিনকএক রহ সন্ধি করি তাহা সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥
(চৈঃ চঃ, ২।১৬)

পিছলদা খুব সম্ভব তমলুকের অপর পারে রূপনারায়ণের তীরে অবস্থিত।

ডি. ব্যারোজের প্রাচীন মানচিত্রে উহা 'পিছোলটা' নামে অঙ্কিত হইয়াছে। এইবারকার যুদ্ধের সূত্রপাত কয়েক মাস পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। কেন না, আমরা দেখিতে পাই যে, হুসেন শাহ সনাতন গোস্বামীকে তাঁহার সহিত উড়িষ্যা অভিযানে যাইতে বলিতেছেন—

হেন কালে চলিলা রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে॥
তিঁহো কহে তুমি যাবে দেবতা দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গেত যাইতে॥
তবে তারে বান্ধি রাখি করিল গমন।

(চৈঃ চঃ, ২।১৯।২৭-২৯)

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, সনাতন কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়ে হাজিপুরে আসেন ও ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষে কাশীতে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত শ্রীচৈতন্যের চরণ দর্শন করেন।

প্রতাপরুদ্র, পূর্ব্বদিকে হুসেন শাহের ও দক্ষিণ দিকে বিজয়নগরের সম্রাট্ কৃষ্ণদেব রায়ের (১৫০৯-১৫৩০) আক্রমণে বিব্রত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা পদ্মাবতী বিজয়নগরের রাজকন্যা (Journal B. O. Research Society V., ১৪৭-৪৮ পৃঃ) হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণদেব রায় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া প্রায় কটকের সীমানা পর্য্যন্ত অধিকার করেন। নেলোর জেলার উদয়গিরি-লিপিতে লিখিত আছে যে, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় প্রতাপরুদ্রকে পরাজিত ও তাঁহার মাতুল তিরুমল্ল রায়কে বন্দী করেন। প্রতাপরুদ্র নিজের কন্যা তুক্ক দেবীকে কৃষ্ণদেব রায়ের হস্তে সম্প্রদান করিয়া সন্ধি করেন। তুক্ক দেবীর বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই। তিনি একটি সংস্কৃত কবিতায় তাঁহার দুঃখের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (Sources of Vijayanagar History, পৃঃ ১৪৩ এবং Karnataka Darshana, পৃঃ ২৩০)।

আকবর বাদশাহের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে হুসেন শাহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপ তাঁহার অমাত্য

ছিলেন ; তাঁহাদের ছোট ভাই অনুপ বা বল্লভ টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। গোপীনাথ বসু পুরন্দর খান (বোধ হয় ইনি কুলীন গ্রামের বসু ছিলেন) হুসেন শাহের উজীর, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও রঘুনন্দন ঠাকুরের পিতা মুকুন্দ তাঁহার চিকিৎসক, কেশব ছত্রীন্ তাঁহার দেহরক্ষীদের নায়ক এবং গৌর মল্লিক ত্রিপুরা অভিযানের সময় সেনাপতি ছিলেন (History of Bengal, II, পৃ ১৫১-১৫২)। যশোরাজ খান নামে এক কবিও তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার সময়ে কোন কোন হিন্দুর হাতে টাকা-পয়সা বেশ জমিয়াছিল। তাঁহার দবির-ই-খাস শ্রীরূপ রাজকার্য্য ত্যাগ করিবার সময় অন্ততঃ চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার অধিকারী ছিলেন। তিনি

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে।
এক কৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে॥
দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল॥
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদিঘরে॥ (চৈঃ চঃ, ২।১৯)

এই ঐশ্বর্য্য ছাড়াও রূপ-সনাতনের বড় ভাইয়ের বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে জমিদারী ছিল। উহা তাঁহার পৈতৃক জমিদারী। রূপ-সনাতনের পিতা কুমারদেব ঐ জমিদারী স্থাপন করেন। ভক্তিরত্নাকরে (পৃঃ ৪০) লিখিত আছে যে, কুমারের সহিত জ্ঞাতিদের বিরোধ ঘটায় গঙ্গাতীরের নবহট্ট বা নৈহাটী হইতে কুমার

নিজগণ সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা॥
যশোরে ফতয়াবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা করিল আলয়॥

বাক্‌লা হইতেছে বাখরগঞ্জ জেলার একাংশ। হুসেন শাহ যখন সনাতনকে বন্দী করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার॥

জীব পশু মারি সব বাক্‌লা কৈল খাশ।
এথা তুমি কৈলে মাত্র সর্ব্বকার্য্যে নাশ॥ (চৈঃ চঃ, ২।১৯)

শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার লঘু বৈষ্ণবতোষণীর অন্তে যে বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অবৈষ্ণব জ্যেষ্ঠতাতের কথা উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু কুমারের যে অন্য পুত্রও ছিল, তাহা বলিয়াছেন—"তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণ-প্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে।" ঐ তিন জন হইতেছেন—সনাতন, রূপ ও বল্লভ। বল্লভেরই পুত্র শ্রীজীব। সনাতনের বড় ভাই 'বাক্‌লা খাশ করিল' অর্থাৎ রাজকর দিতেন না, তাই হুসেন শাহ তাঁহাকে দস্যু বলিয়াছেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্য ও পিতা গোবর্দ্ধন মজুমদার সপ্তগ্রামের জমিদারী ইজারা লইয়াছিলেন। ইঁহারা "বার লক্ষ দেন রাজায় সাধে বিশ লক্ষ"—(চৈঃ চঃ, ৩।৬)।

হুসেন শাহ বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা, আরাকান ও চট্টগ্রামে যুদ্ধবিগ্রহে প্রায়ই লিপ্ত থাকিতেন বলিয়া জমিদারেরা কখনও কখনও তাঁহাকে কর দেওয়া বন্ধ করিতেন। সনাতনের বড় ভাই ছাড়া অন্য একজন এরূপ জমিদারের নাম আমরা পাই। তিনি হইতেছেন—যশোহর জেলার বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খান। কর বন্ধ করিলে হিন্দু জমিদারদের কিরূপ শাস্তি হইত, তাহা এই রামচন্দ্র খানের দণ্ডকাহিনী হইতে জানা যায়—

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র, রাজায় না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধাইল॥
স্ত্রীপুত্র সহিতে রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া॥
জাতি ধন জন খানের সকল লইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজার হইল॥ (চৈঃ চঃ, ৩।৩)

জমিদারের দোষে গরীব প্রজাদেরও দুর্গতির সীমা থাকিত না। তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি লুঠ হইয়া যাইত এবং জাতি ও মানসম্ভ্রম নষ্ট হইত। ছোঁয়াছুঁত

খুব রেশী রকম থাকায় হিন্দুদের জাতি লওয়া খুব সহজ ছিল। সুবুদ্ধি রায়কে হুসেন শাহ কেবলমাত্র "করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা" (চৈঃ চঃ, ২।২৫।১৪০)। করোয়া মানে বোধ হয় বদ্না। মুসলমানের বদনার জল বাধ্য হইয়া খাওয়ার জন্য কাশীর পণ্ডিতেরা তাঁহাকে "তপ্তঘৃত খাইয়া ছাড় প্রাণ" আদেশ দিয়াছিলেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কাশীতে মহাপ্রভু আসিলে সুবুদ্ধি রায় তাঁহার নিকট প্রায়শ্চিত্তবিধি জিজ্ঞাসা করেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইয়া কৃষ্ণনাম করিতে আদেশ দন—

প্রভু কহে ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার সব দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
(চৈঃ চঃ, ২।২৫।১৪৫-১৪৬)

শ্রীচৈতন্যদেব হিন্দুধর্ম্মকে কতটা উদার ও সহনশীল করিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম প্রমাণ এই কাহিনী হইতে পাওয়া যায়।

সনাতন গোস্বামী তাঁহার আত্মজীবনীর ছায়া লইয়া শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই বৃহদ্ভাগবতামৃত ও তাহার স্বকৃত টীকা দিক্‌দর্শিনী রচনা করেন।* তিনি ঐ গ্রন্থে রূপকচ্ছলে হুসেন শাহের ও প্রতাপরুদ্রের রাজ্যপালনবিধি সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ দিয়াছেন। সনাতন রাজমন্ত্রী ছিলেন। তাই রাজা, মহারাজা ও সার্ব্বভৌম নৃপতির বৈশিষ্ট্য তিনি কয়েক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন (১।১।৪৫-৪৬; ২।১।১)। গ্রামের এক একজন

* জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥—বৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।৩
'এষ' শব্দের টীকায় সনাতন লিখিয়াছেন—"এষ ইতি সাক্ষাদনুভূততাং তদানীং তস্য বর্ত্তমানতাং চ বোধয়তি।" এষঃ শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ অনুভূত এবং তৎকালেও বর্ত্তমান আছেন, বুঝিতে হইবে। মথুরার এক গোপকুমার ঐ গ্রন্থের কাহিনীর নায়ক, গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে শ্রীকৃষ্ণের মহান্ অবতার জয়ন্ত তাঁহার গুরু (২।৩।১২২)। ঐ জয়ন্ত গোপকুমারকে বৃন্দাবনে ও নীলাচলের সমুদ্রতীরে ভজনপ্রণালীর উপদেশ দিয়াছিলেন। গোপকুমার যে স্বয়ং সনাতন ও জয়ন্ত যে শ্রীচৈতন্য, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

অধিকারী থাকিতেন; কতকগুলি গ্রামের উপর এক একজন মণ্ডলেশ্বর থাকিতেন; তাঁহাদের উপর মহারাজা ও সর্ব্বোপরি সার্ব্বভৌম বা রাজচক্রবর্ত্তী। মণ্ডলেশ্বরের উপাধি ছিল রাজা—"এষ গঙ্গাতীরসম্বন্ধী যো দেশো বিষয়স্তস্য রাজা ভূমিপঃ, তস্য তন্মণ্ডলেশ্বরস্যেত্যর্থঃ" (২।১।১৩৮)। গুপ্তযুগে ভুক্তি, বিষয় প্রভৃতি যে সব শাসনসম্বন্ধীয় বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ষোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিতেরাও জানিতেন। মণ্ডলেশ্বর ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় রাজন্যদের মতন পররাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে নিরুদ্বেগে বাস করিতে পারিতেন না। গঙ্গাতীরের ঐ মণ্ডলেশ্বর রাজা

> কদাপি পররাষ্ট্রাত্তীঃ কদাচিচ্চক্রবর্ত্তিনঃ।
> বিবিধাদেশসন্দোহ-পালনেনাস্বতন্ত্রতা॥ ২।১।১৫৫

উহার টীকায় সনাতন লিখিয়াছেন—"পররাষ্ট্রাদিতি বিপক্ষ-রাজতস্তদীয়-লোকতশ্চ ভয়ং স্যাদিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী সর্ব্বমণ্ডলেশ্বরাধিপঃ সম্রাট্, তস্য যে বিবিধা আদেশাঃ 'ইদং ক্রিয়তামিদং ন' ইত্যাদিরূপাস্তেষাং সন্দোহস্য পালনেন সম্পাদনেনাস্বাতন্ত্র্যং স্যাৎ," অর্থাৎ পররাষ্ট্রাদি—বিপক্ষ রাজা বা তদীয় লোকসকল হইতে ভয় হয়। রাজচক্রবর্ত্তী—সর্ব্বমণ্ডলেশ্বরের অধিপ সম্রাটের বিবিধ আদেশ, যথা "ইহা কর" "ইহা করিও না" ইত্যাদিরূপ আদেশ পরিপালন করিতে যাইয়া অনুভব হইত যে, তিনি অস্বতন্ত্র বা পরাধীন। উড়িষ্যার রাজার কথা বলিতে যাইয়া সনাতন লিখিয়াছেন যে, তিনি চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ (২।১।১৮৩) 'যশ্চক্রবর্ত্তী তত্রত্যঃ স প্রভোর্মুখ্যসেবকঃ' যিনি চক্রবর্ত্তী রাজা, তিনিই জগন্নাথের প্রধান সেবক। তিনি রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে যখন পুরীতে আসিতেন, তখন নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ স্বচ্ছন্দে জগন্নাথ দর্শন করিতে পারিতেন না। তাঁহার সঙ্গের লোকলস্করের হাতী ঘোড়া প্রভৃতি সাধুদের ফুলের বাগান ও কুটীর ভাঙ্গিয়া ফেলিত; বহু লোকের সংঘট্টে জলমালিন্যাদি দোষ ঘটিত। অতি অল্প কথায় সনাতন গোস্বামী রাজচক্রবর্ত্তীর আগমনে সাধারণ লোকের দুঃখবৃদ্ধির চিত্র আঁকিয়াছেন।

সুলতানের মন্ত্রিত্ব করায় সনাতন গোস্বামীর মনে রাজসভার আদব-কায়দার স্মৃতি বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই তিনি বৈকুণ্ঠের বর্ণনায় লিখিয়াছেন

যে, বৈকুণ্ঠের অধিপতি ভগবানের নিকট যাইবার অবাধ অধিকার ভক্তদের ছিল না। দ্বারপাল গোপুরে বা প্রধান দ্বারে গোপকুমারকে বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি ক্ষণকাল এই বহির্দ্বারে অবস্থান কর। আমার প্রভুকে তোমার আগমনসংবাদ বিজ্ঞাপিত করি, তার পর তুমি পুরীর ভিতরে প্রবেশ করিও" (২।৪।২০)। টীকায় তিনি এরূপ রীতির সমর্থনের জন্য লিখিয়াছেন—"পরমৈশ্বর্য্যাবিষ্কার-রীত্যনুসারাৎ"—পরমৈশ্বর্য্য আবিষ্কারের রীতি অনুসারে সর্ব্বত্র এই প্রকার ব্যবহার প্রচলিত আছে। গোপুরের দ্বারপাল যে প্রভুর কথা বলিলেন, তিনি তাঁহার উচ্চতন কর্ম্মচারী মাত্র। কেন না, যখন তাঁহার অনুমতি আসিল, তখন—

দ্বারে দ্বারে দ্বারপালাস্তাদৃশা এব মাং গতম্।
প্রবেশয়ন্তি বিজ্ঞাপ্য বিজ্ঞাপ্যৈব নিজাধিপম্॥
প্রতিদ্বারান্তরে গত্বা গত্বা তৎপ্রতিহারিভিঃ।
প্রণম্যমানো যো যো হি তৎপ্রদেশাধিকারবান্॥
(২।৪।৫৮-৫৯)

অর্থাৎ দ্বারে দ্বারে দ্বারপালগণ নিজ নিজ অধ্যক্ষকে বিজ্ঞাপিত করিয়া আমায় প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। দ্বারপালগণ এক দ্বার হইতে অন্য দ্বারে গমন করিয়া সেই সেই প্রদেশাধিকারিগণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। বৈকুণ্ঠেও কর্ম্মচারীদের স্তরবিভাগ (Official hierarchy) এত প্রবল যে, বৈকুণ্ঠেশ্বরের যত নিকটে যে দ্বারপাল থাকেন, তিনি তাহা অপেক্ষা দূরে অবস্থিত দ্বারপালের প্রণম্য। গোপকুমার আরও দেখিলেন যে, যাঁহারা প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহারা কেহই বড় একটা শুধু হাতে যাইতেছেন না—নানারূপ ভেট লইয়া যাইতেছেন (২।৪।৩০)। বৈকুণ্ঠে ভগবান্ যে বসিয়া আছেন, তাহাও সুলতানী কায়দায়—

তদন্তরে রত্নবরাবলীলসৎসুবর্ণসিংহাসনরাজ-মূর্ধনি
সুজাতকান্তামলহংসতুলিকোপরি প্রসন্নাক্শচন্দ্রসুন্দরম্।
মৃদূপধানং নিজবামকক্ষকফোণিনাক্রম্য সুখোপবিষ্টম্
বৈকুণ্ঠনাথং ভগবন্তমারাদপশ্যমগ্রে নবযৌবনেশম্॥
(২।৪।৬৪-৬৫)

অর্থাৎ গোপকুমার দেখিলেন—"তাহার অভ্যন্তরে রত্নখচিত সুন্দর সুবর্ণময় সিংহাসন, তাহার উপর হংসতুলিকা নামক গদি ও নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রতুল্য সুন্দর তাকিয়া সকল রহিয়াছে। আর নবযৌবনেশ ভগবান্ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেই তাকিয়ার উপর নিজের বাম কক্ষ ও কনুই রাখিয়া সুখে বসিয়া আছেন। সনাতন গোস্বামী বৈকুণ্ঠের ভগবানের খাস্ প্রাসাদ বুঝাইতে মুসলমানী মহাল শব্দও টীকায় ব্যবহার করিয়াছেন—শ্রীমতো মহল্লপ্রবরস্য পরমোত্তমান্তঃপুর-বিশেষস্য মধ্যে প্রাসাদমেকং" (২।৪।৬৩ টীকা)।

হুসেন শাহ উড়িষ্যায় দেবমন্দির প্রভৃতি ধ্বংস করিলেও নিজের রাজ্যের মধ্যে হিন্দুদের প্রতি সাধারণতঃ বিনা কারণে অত্যাচার করিতেন না। হাব্‌শিদের রাজ্যকালের হিন্দু-নির্য্যাতনের সঙ্গে হুসেন শাহের উদার ব্যবহারের বৈষম্য (contrast) দেখাইবার জন্য জয়ানন্দ এক আজগুবি স্বপ্নকাহিনীর অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, গৌড়েশ্বরের অত্যাচার দেখিয়া স্বপ্নে তাঁহার নিকট কালী আসিয়া তাঁহাকে মারিতে লাগিলেন। তখন গৌড়েশ্বর বলিলেন—নবদ্বীপে আর কোন অত্যাচার করিব না। "নাকে খত দিল রাজা তবে কালী ছাড়ে" (পৃঃ ১২)। পরদিন গৌড়েন্দ্র আদেশ ঘোষণা করিলেন—

> গৌড়েন্দ্রের আজ্ঞা নবদ্বীপ সুখে বসু।
> রাজকর নাহি সর্ব্বলোক চাষ চষু॥
> আজি হৈতে হাট ঘাট বিরোধ যে করে।
> রাজকরদণ্ডী হয়ে ত্রিশূল সে পরে॥
> দেউল দেহরা ভাঙ্গে অশ্বত্থ যে কাটে।
> ত্রিশূলে চড়াহ তাকে নবদ্বীপের হাটে॥ (পৃঃ ১২)

জমির উপর খাজনা নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই—বোধ হয়, নানা প্রকার আবওয়াব বা উপরি আদায় বন্ধ করা হইয়াছিল বলিয়া জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—"রাজকর নাহি সর্ব্বলোক চাষ চষু।" হুসেন শাহ রাজ্যশাসন ব্যাপারে হিন্দুদের প্রতি যে উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারই নিদর্শন জয়ানন্দের উপরে উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিত সঙ্কীর্ত্তনের রোল উঠাইয়াছিলেন; পাষণ্ডীরা বারংবার ভয়

দেখাইয়াছিল যে, যবনরাজা কীর্ত্তনকারীদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবেন ও "যবনে গ্রাম করিবে কবল" (চৈঃ ভাঃ, ২।৮)—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কোন অত্যাচার হয় নাই (ঐ, ২।২৩)। এমন কি, হুসেন শাহের শাসনের ভয়ে কাজী অপমানিত হইয়াও নিমাই পণ্ডিত বা তাঁহার সঙ্গীদের কাহারও উপর কোন অত্যাচার করেন নাই। শ্রীচৈতন্য প্রথম বার যখন বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলেন যে, হুসেন শাহ আদেশ দেন—

কেহো পাছে উপদ্রব করয়ে তাঁহারে॥
যেখানে তাঁহার ইচ্ছা, থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে॥
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
কি বিরলে থাকুন, যে লয় তাঁর মন॥
কাজী বা কোটাল বা তাঁহাকে কোন জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে॥

হুসেন শাহ তাঁহার সুশাসন ও পরমতসহিষ্ণুতার জন্য হিন্দুদের খুব প্রিয় হইয়াছিলেন বলিয়া যশোরাজ খান তাঁহাকে "জগতভূষণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

শ্রীযুত হুসেন জগতভূবণ সোহ এ রস-জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভনে যশরাজ-খান॥

ঐ পদটি পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে পাইয়া ডাঃ সুকুমার সেন প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি য়শোরাজ খানের লিখিত অন্য কোন পদ পান নাই।

হুসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২) মিথিলার সকল অংশই নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।* মিথিলার সামন্ত নৃপতি

* "Husain's conquests in North Bihar were rounded off by the annexation of the whole of Tirhut over which be placed his brothers-in-law Allauddin and Mukhdum-i-Alam. Hajipur, on the Gandak-Ganges confluence, where the latter established himself, thus became a strategic base and controlled all the river entrances into Bihar."—History of Bengal II, পৃঃ ১৫৩।

লক্ষ্মীনাথ কংসনারায়ণ তাঁহার একটি পদে এই নসরৎ শাহের নাম করিয়াছেন—

স্নমুখি সমাদ সমাদরে সমদল নসিরাসাহ স্নরতানে।
নসিরা ভূপতি সোরম দেই পতি কংসনরাএণ ভাণে॥

(রাগতরঙ্গিণী, পৃঃ ৯৭)

দেবীমাহাত্ম্যের এক পুথির পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে, লক্ষ্মীনাথ কংসনারায়ণ ১৫১১ খৃষ্টাব্দে মিথিলার রাজা ছিলেন। নসরৎ শাহ তাঁহার পিতার জীবনকালেই ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে নিজের নামে মুদ্রা প্রচার করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় পরধর্ম্মসহিষ্ণু ছিলেন বলিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর পক্ষে অবাধে গৌড়ে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করা সম্ভব হইয়াছিল। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে নসরৎ শাহের নিকট হইতে বাবর উত্তর ও দক্ষিণ-বিহারের কিয়দংশ জয় করিয়া লন। ইহার পর নসরৎ আহোমদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আসামের যুদ্ধের ব্যর্থতার ফলে কামরূপের উপর হুসেনশাহী বংশের অধিকার শিথিল হয়।

নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর বাংলা দেশের দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসে। নসরতের পুত্র আলাউদ্দীন ফিরুজ মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করিয়া তাঁহার পিতৃব্যের হস্তে নিহত হন। ঐ পিতৃব্য ঘিয়সউদ্দীন মামুদ উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন (১৫৩৩-১৫৩৮)। কিন্তু তিনি দুর্ব্বল শাসক ছিলেন। এক দিকে হুমায়ুন শাহের আক্রমণের ভীতি, অন্য দিকে শের আফগানের আক্রমণ তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করে। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে রাঢ়ের নিকট স্নরজগড়ের যুদ্ধে তিনি শের আফগানের হস্তে পরাজিত হন। ইহার পর শের খান গৌড় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন। এ দিকে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দেই এক দল পর্ত্তুগীজ চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রার্থনা করে এবং মুসলমানদের জাহাজের উপর অত্যাচার করে। সেই জন্য চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া কয়েক জনকে নিহত করেন ও বাকী সকলকে বন্দী করিয়া গৌড়ে পাঠাইয়া দেন। তাহার পর পর্ত্তুগীজেরা গোয়া হইতে ফের জাহাজ পাঠাইয়া চট্টগ্রাম বন্দর লুঠ করে এবং বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলে। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে স্নলতান মামুদ বন্দী

পর্ত্তুগীজদিগকে মুক্ত করিয়া শের খানের সহিত সংগ্রামে তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পর্ত্তুগীজ বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শের খান চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও দুই লক্ষ পদাতিক লইয়া ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের অভিমুখে অগ্রসর হন। ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁহার 'শের শাহ' গ্রন্থে (পৃঃ ১২০-১২৪) দেখাইয়াছেন যে, শের খান সুপ্রসিদ্ধ তেলিয়াগড়ির পথ দিয়া না আসিয়া, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের ভিতর দিয়া আসিয়া, গোদাগাড়ির নিকটস্থ কোন স্থানে গঙ্গা পার হইয়া গৌড়ে উপস্থিত হন। পর্ত্তুগীজ বিবরণে শের খানের সৈন্যদল হয় তো বেশী করিয়া লেখা হইয়াছে, কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিক আহমদ ইয়াদগর বলেন যে, শের খান নব্বই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসেন এবং প্রত্যেক সৈন্যের সঙ্গে দুইটি করিয়া ঘোড়া ছিল। এত বড় এক সৈন্যদল রাঢ়ের ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় বৈষ্ণবদের উপর অত্যাচার কম হয় নাই। রাঢ়ই ছিল তখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র। সুলতান মামুদ শের খানকে তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু রাজমহলের পশ্চিমের সমস্ত রাজ্য তিনি হারাইলেন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে শের খান গৌড় নগরী অবরোধ করেন এবং ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে উহা অধিকার করিয়া লন। মামুদ পলায়ন করিয়া মানেরের নিকটে হুমায়ুনের শরণাপন্ন হন। কিন্তু আফগানেরা গৌড়ে তাঁহার দুই পুত্রকে নিহত করেন। হুসেনশাহী যুগে গৌড়ের ঐশ্বর্য্য কিরূপ ছিল, তাহার একটু আভাস পাওয়া যায় পর্ত্তুগীজদের এই বিবরণে যে, শের শাহ গৌড় লুঠ করিয়া ছয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত অর্থ তাঁহার পুত্র জলাল খান বন্দীকৃত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও অশ্বতরের পৃষ্ঠে চাপাইয়া শাহাবাদ জেলার রোহিতাশ্ব দুর্গে লইয়া যান। ইহা ছাড়া আরও বহু স্বর্ণমুদ্রা গৌড়ের রাজভাণ্ডারে ছিল। গৌড় ধ্বংসের ১০৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে সিবাষ্টিয়ান্ ম্যানরিক্ গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইয়া শুনিতে পান যে, একটি ফাঁপা দেওয়ালের মধ্যে তিনটি তামার পাত্রে তিন কোটি টাকা মূল্যের সোনার টাকা ও জহরত পাওয়া গিয়াছিল (Memoirs of Gaur and Pandua, পৃঃ ৪৩)। ফাঁপা দেওয়ালের মর্ম্ম

বুঝিতে হইলে জানা প্রয়োজন যে, নসরৎ শাহ ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে যে সোনা-মসজিদ নির্ম্মাণ করান, তাহার দেওয়াল ছিল ৮ ফিট পুরু *। আমরা এখন ২ ফিট পুরু দেওয়ালকে খুব মজবুত দেওয়াল বলিয়া মনে করি। নসরৎ শাহের ভ্রাতা মামুদ গৌড়ের অতুল ঐশ্বর্য্য বিলাসব্যসনে ব্যয় করিতেন। তাঁহার হারেমে দশ হাজার সুন্দরী ছিলেন, এই কথা পর্ত্তুগীজেরা লিখিয়া গিয়াছেন (Campos, History of the Portuguese, পৃঃ ৩১)। মনে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বৎসরেই, ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে এই কামোন্মত্ত সুলতান রাজ্যাধিরোহণ করেন, আর প্রভুর তিরোভাবের পাঁচ বৎসরের মধ্যে শের খান অতুল ঐশ্বর্য্যশালী গৌড় নগরীতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দগ্ধ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরাজেরা যেমন বাংলাদেশের সঞ্চিত অর্থ আত্মসাৎ করিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশ জয় করিতে অগ্রসর হন, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে তেমনি শের খান গৌড়ের ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হন। শের শাহ আদর্শ নৃপতি সন্দেহ নাই। কিন্তু ইলিয়াসশাহী বংশের বা হুসেনশাহী বংশের সুলতানেরা যেমন বাংলার নিজস্ব নরপতি ছিলেন, শের শাহ বা তাঁহার বংশধরেরা সেরূপ ছিলেন না। বাংলাদেশ তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি বিজিত প্রদেশ মাত্র ছিল। সুর-বংশের শের শাহ (১৫৪০-১৫৪৫) ও ইসলাম শাহ (১৫৪৫-১৫৫৩) বাংলাদেশের উপর মাত্র তের বৎসর কাল রাজ্য করিয়াছিলেন। শের শাহ হিন্দুদের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর বিশ বৎসর কাল (১৫৩৩-১৫৫৩) বৈষ্ণবেরা বিনা বাধায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। ঐ বিশ বৎসর কাল বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসে অত্যন্ত মূল্যবান্। ঐ সময়ের মধ্যেই মুরারি গুপ্তের কড়চা, কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য এবং বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হয়। নিত্যানন্দ,

---

* "The Sona Masjid, outside the Port to the north-east, is perhaps the finest memorial left at Gaur. Built by Nusrat Shah in 1526, it was 170 ft. in length by 76 ft. deep, with walls 8 ft. thick, faced inside and out with hornblende." (Imperial Gazetteer II, পৃঃ ১৯২)

অদ্বৈত, নরহরি সরকার, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভৃতি প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহাদের পরিকরদের মধ্যে বেশ কিছু দলাদলিও দেখা দিয়াছিল। তাহার নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যে। এক দল লোক নিত্যানন্দ প্রভুর সদাচারবহির্ভূত (unconventional) ব্যবহার—যথা অলঙ্কার পরিধান, পান খাওয়া, অবধূত হইয়া নিজের শিষ্য গৌরীদাস পণ্ডিতের ভাই-ঝি বসুধা ও জাহ্নবীকে বিবাহ করা প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহাকে মানিতে চাহিতেন না। বৃন্দাবনদাস "তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে" বলিয়া বৈষ্ণবের পদধূলিদানে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভু সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম সহরের ধনী বণিক্‌দিগকে প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সপ্তগ্রামের বণিকেরা এত বেশী ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আর পূর্ব্বের মতন জাহাজ লইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন না। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বস্যে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ১৯৬)

সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম্ম প্রচারের বিবরণ দিতে যাইয়া বৃন্দাবন-দাস বলিয়াছেন—

সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তনে বিহরে॥
বণিক্‌সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥
... ...
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চত্বরে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্ত্তনে বিহরে॥
নিত্যানন্দস্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ॥

যবনের নয়নে দেখিয়ে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণের আপনারে জন্ময়ে ধিক্কার॥ (চৈঃ ভাঃ, ৩।৫)

উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি সপ্তগ্রামের বণিক্‌গণ খুব সম্ভব শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে তাঁহারা বৈষ্ণব হইলে পুরীর যাত্রীদের মধ্যে উদ্ধারণ দত্তের মতন পদস্থ লোকের নাম কোন না কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হইত। হুসেন শাহের রাজ্যকালে হরিদাস বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করায় কাজীরা তাঁহার অশেষ দুর্গতি করিয়াছিল। মুলুকপতি হুসেন শাহ অবশ্য হরিদাসের সাধুতার পরিচয় পাইয়া—

সম্ভ্রমে মুলুকপতি জুড়ি দুই কর।
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয় উত্তর॥
সত্য সত্য জানিলাঙ তুমি মহাপীর।
একজ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির॥

এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে যথেচ্ছ ধর্ম্মাচরণ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন—

আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা।
যে তোমার ইচ্ছা তাহি করহ সর্ব্বথা॥ (চৈঃ ভাঃ, ১।১১)

শের শাহের শাসন-প্রণালী এমন সুন্দর ছিল যে, তাঁহার অধীনস্থ কোন কাজী, ফৌজদার বা কোতোয়াল হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। তাই সপ্তগ্রামের কোন কোন যবন বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের উপর কোন নির্য্যাতন হয় নাই।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বিশ বৎসরের মধ্যে অচ্যুত ছাড়া অদ্বৈতের অন্যান্য পুত্রেরা চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যকে অবতার না বলিয়া তাঁহাদের পিতাকেই ভগবানের অবতার বলিয়া লোকে স্বীকার করুক। এই চেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

অদ্বৈতেরে ভজে গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের তবু তিঁহ গেলা॥ (চৈঃ ভাঃ, ৩।৪।৪৩০)

এই দলের লোকেরা শ্রীচৈতন্যকে নিন্দা করিয়া অদ্বৈতের মহত্ত্ব স্থাপন

করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাই বৃন্দাবনদাস ইহাঁদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

এই মত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈতভক্ত' চৈতন্য নিন্দিয়া॥
(চৈঃ ভাঃ, ২।১০।২৩৪)

শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণববন্দনায় লিখিয়াছেন (৭৭-৮০ শ্লোক) যে, অচ্যুত ছাড়া অদ্বৈতের অন্যান্য পুত্রেরা চৈতন্যহরিকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া মানেন নাই ও তাঁহাকে ভজনা করেন নাই, এই জন্য তিনি তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। মৎকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদানের পরিশিষ্টে শ্রীজীবের বৈষ্ণববন্দনা মুদ্রিত হইয়াছে। অন্যান্য বৈষ্ণববন্দনাতেও অদ্বৈতের অন্যান্য পুত্রের নাম নাই। শ্রীচৈতন্যভক্ত অচ্যুত চিরকুমার ছিলেন, তাঁহার ভাইদের বিবাহ হইয়াছিল, পুত্রকন্যা হইয়াছিল। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল যখন রচিত হয়, তখন অদ্বৈতের পৌত্র হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থাৎ দুই পুরুষ ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও যখন শ্রীচৈতন্যের মহিমা ক্ষুণ্ণ করা গেল না বা অদ্বৈতকে সর্ব্বেশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত করা গেল না, তখন অদ্বৈতের পৌত্র-প্রপৌত্রেরা নিজেদের মত প্রচার করা বন্ধ করিলেন। সেই জন্য অদ্বৈতের অন্যান্য পুত্রের নামও কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তাহাদের মত ছারখারে গেল। যথা—

যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥
অচ্যুতের যেই মত, সেই মত সার।
আর যত মত—সব হইল ছারখার॥ (চৈঃ চঃ, ১।১২।৭১-৭২)

শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ গদাধর গোস্বামীকে কেহ স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া স্থাপন করেন নাই। তবে গৌরগদাধর-মূর্ত্তি পূজা করিয়া গদাধরবংশীয়গণ অদ্বৈতবংশীয়দের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতে থাকেন। তাহার জবাবে অদ্বৈতবংশীয়েরা গদাধরকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—

অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া নিন্দে গদাধর।
সে অধম কভো নহে অদ্বৈতকিঙ্কর॥

(চৈঃ ভাঃ, ২।২৩।৩৪১ ; ২।২৪।৩৪৬)

বৃন্দাবনদাস গৌর-নাগরবাদকে স্বীকার করিতেন না। সেই জন্য ঐ বাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা নরহরি সরকার ঠাকুরের নাম পর্য্যন্ত তিনি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লেখেন নাই। কাজেই প্রতিভাবান্ কবি লোচনের দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করাইয়া, শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় নরহরির সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গতা ঘোষণা করেন।

১৫৩৩ হইতে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিত্যানন্দের দল, অদ্বৈতের দল, গদাধরের দল, নরহরির দল প্রভৃতিতে অল্পবিস্তর লোক ছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ বৈষ্ণবই শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাবপ্রতিপত্তি দেখিয়া অন্যান্য সাধুসন্তের শিষ্যগণ তাঁহাদের গুরুদেবের ফটো পঞ্জিকায় ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।* ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতির ভগবত্তা ঘোষণা দেখিয়া কয়েক জন সুচতুর ব্যক্তি নিজদিগকে ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস এইরূপ কয়েক ব্যক্তির কথা লিখিয়াছেন—

উদরভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি আপনারে কেহো বোলে॥
কোন পাপিসব ছাড়ি কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় কত বা ভূতগণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহাব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায়ে গোপাল।
অতএব তারে সভে বোলেন শিয়াল॥ (১।১০।১০৪-১০৫)

*১৩৬৬ সালের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তপঞ্জিকায় রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র ছাড়া আরও ২১ জন সাধু মহাপুরুষের ছবি ছাপা হইয়াছে। ইঁহাদের অধিকাংশেরই নাম কখনও শুনি নাই।

শের শাহের রাজ্যকালেই হয় তো তাঁহার কর্ম্মচারীরা প্রজাদের উপর অত্যাচার সুরু করিয়াছিল। ডাঃ সুকুমার সেন প্রমাণ করিয়াছেন যে, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ১৪৬৬ শক বা ১৫৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে শিকদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া দেশ ত্যাগ করেন (বিশ্বভারতী ১৩৫৩, পৃঃ ২৫৫)। মুকুন্দরামের দেশত্যাগের এই তারিখ অবশ্য সকলে স্বীকার করেন নাই।

শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর হইতে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২২ বৎসর কাল বাংলার ইতিহাসে মহাদুর্দ্দিন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরই বাংলার শাসনকর্ত্তা মুহম্মদ খান্ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি আরাকান ও জৌনপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই হিমুর হস্তে যুদ্ধে প্রাণ হারান। তাঁহার পুত্র আদিলী-নিযুক্ত শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত করিয়া ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ফের বাংলা অধিকার করিয়া লন। তিনিও জৌনপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু মুঘল সেনাপতির হস্তে পরাজিত হইয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। তিনি ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সময়ে বাংলার জায়গীরদারেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সুলতানের অনেক শক্তিক্ষয় হইয়াছিল। ১৫৬০ হইতে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিন জন আফগান সুলতান হন ; ইতিমধ্যে কররাণীবংশ বাংলা ও বিহারের অনেক জায়গা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ বংশের তাজ খান রাজসিংহাসন অধিকার করেন। তিনি এক বৎসরের বেশী রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সুলেমান কররাণী বাংলা ও বিহারের অধিপতি হইয়া ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। সেই সময় আকবর বাদশাহ দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এলাহাবাদ প্রভৃতি জয় করিয়া শোণ নদীর তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই আফগানগণ রাজ্য ও চাকুরি হারাইয়া দলে দলে বাংলায় আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহায়তায় সুলেমান কররাণী কুচবিহারের রাজা সুখধ্বজকে পরাজিত করিলেন ও বিদ্রোহী জায়গীরদারদিগকে বশে আনিলেন। এ দিকে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর উড়িষ্যায় একের পর এক দুর্ব্বল রাজা সিংহাসনে

বসিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে ১৫৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে হরিচন্দন মুকুন্দদেব রাজা হইলেন। তিনি একবার অভিযানে বাহির হইয়া ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত আসেন ও ত্রিবেণীর গঙ্গায় একটি ঘাট নির্ম্মাণ করেন। ১৫৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে সুলেমান কররাণী বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, সাঁওতাল পরগণা ও ছোট-নাগপুরের ভিতর দিয়া এক বিরাট্ সৈন্যবাহিনী ময়ূরভঞ্জ ও উড়িষ্যার অন্যান্য অংশে প্রেরণ করেন। ঐ সৈন্যবাহিনী ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা জয় করে। যাজপুরের নিকটস্থ এক স্থান হইতে আফগান সৈন্যদলের একাংশ রাজু বা কালাপাহাড়ের অধীনে পুরীর জগন্নাথের মন্দির আক্রমণ করে। কালা-পাহাড় মন্দিরের একাংশ ধ্বংস করে, বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করে, বহু ব্রাহ্মণ-নারীকে দাসী করিয়া লইয়া আসে এবং অসংখ্য ধনরত্ন লুঠ করে। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দেই ঐ কালাপাহাড় আসামের তেজপুর পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া কামাখ্যা ও হাজোর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির ধ্বংস করে। বাংলার দেবদেবীও যে তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা নহে। এই সময় রাঢ়, গৌড় ও বরেন্দ্রভূমির বৈষ্ণবেরা নিশ্চয়ই খুব ভয়ে ভয়ে কাল কাটাইয়াছেন। ঐ সময় তাঁহারা পুরীতে জগন্নাথদর্শনে যাইতে পারিতেন না।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বায়াজিদ রাজা হন, কিন্তু তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই নিহত হন। তাঁহার ছোট ভাই দায়ুদ কররাণী তখন সুলতান হইলেন। কিন্তু আফগানদের মধ্যে তখন প্রবল গৃহবিবাদ সুরু হইয়াছে। আকবর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া দায়ুদ পাটনার দুর্গে আশ্রয় লন। আকবর ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট হাজীপুর অধিকার করিয়া ঐ সহরে আগুন লাগাইয়া দেন। তাহা দেখিয়া দায়ুদ পলায়ন করিয়া তেলিয়াগড়িতে আশ্রয় লন। রাজমহলের আশপাশের হিন্দু জমীদারেরা মুঘল সৈন্যকে সাহায্য করে। ফলে মুঘল সেনাপতি তদানীন্তন বাংলার রাজধানী তাঁড়া অধিকার করিয়া লইলেন। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। তাঁহার "দ্বিতীয় অন্তরাত্মা" শ্রীহরি (প্রতাপাদিত্যের পিতা) যশোহর খুলনায় যাইয়া মহারাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়া এক রাজ্য স্থাপন করিলেন। মুঘল সৈন্যেরা অনতি-বিলম্বে ঘোড়াঘাট সরকার বা বগুড়া-দিনাজপুর, সাতগাঁও, বাকলা

(বরিশাল), সোনারগাঁও (ঢাকা) প্রভৃতি দখল করিয়া লইল। কররাণী-বংশ বাংলার জনসাধারণের এতই বিদ্বেষভাজন হইয়াছিল যে, সমগ্র বাংলা দেশ জয় করিতে মুঘলদের এক মাসের বেশী সময় লাগে নাই (যদুনাথ সরকার, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪২।১, পৃঃ ২)। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ মুঘল সেনাপতি মুনিম খাঁ তুকরোইয়ের যুদ্ধে দাযুদ খাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। বর্ষাকালে নূতন রাজধানী তাঁড়াতে তাঁবুর মধ্যে বাস করা অসুবিধা বলিয়া তিনি দলবল সহ পরিত্যক্ত রাজধানী গৌড়ের প্রাসাদে বাস করিতে আসেন। কিন্তু বহুদিন জনবিহীন হওয়ায় এই শূন্য নগরীর আবহাওয়া খারাপ হইয়া গিয়াছিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের বর্ষা ও শরৎকালে গৌড়নগরীতে এমন ভয়ানক মহামারী হইয়াছিল যে, অনেক মুঘল সৈনিক সেখানে প্রাণ হারায়, বাকী সকলে বিহারে চলিয়া যায়। এই ঘটনার পর মুঘলেরা সহজে বাংলায় আসিতে রাজী হইত না।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে নামে মাত্র মুঘল অধিকার স্থাপিত হয়। কার্য্যতঃ ১৬১২ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের পতন পর্য্যন্ত অশান্তি, বিদ্রোহ, যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। বিশেষ করিয়া ১৫৭৫ হইতে ১৫৯৪ পর্য্যন্ত বিশ বৎসর কাল ঘোরতর অরাজকতা চলিয়াছিল। আচার্য্য যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন যে, ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পর—"That province (Bengal) remained for many years a scene of confusion and anarchy. The Mughal military officers held a few towns in Bihar and fewer still in Bengal but these places were only the head-quarters of sub-divisions (sarkars) and even in them the imperial authority was liable to challenge and expulsion from time to time. Outside these towns lay the vast no man's land, a constant prey to roving bands of dispossessed Afghan soldiery and Akbar's officers out on raid for their private gain. The local landlords utilised the eclipse of regular government to encroach on their neighbours' estates or to satisfy old

grudges" (History of Bengal II, পৃঃ ১৯৩)। এক দিকে আফগানদের, অন্য দিকে মুঘলদের অনবরত খণ্ডযুদ্ধ ও আক্রমণে এবং নবনিযুক্ত শাসকশ্রেণীর হাতে নির্য্যাতনের ফলে বাঙ্গালী প্রজার জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারেরাও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন। তাহাতেও প্রজাদের জীবনে সুখশান্তি তিরোহিত হইত। ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আকবর মানসিংহকে বাঙ্গালায় সুবেদার করিয়া পাঠান। তাঁহাকে ও তাঁহার পরবর্ত্তী শাসকদিগকে অধিকাংশ সময়ই বার ভূঁয়াদের সঙ্গে ও আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কাটাইতে হয়। এই জন্য স্যার যদুনাথ লিখিয়াছেন—"It was only in the reign of Jahangir that Mughal administration really started in Bengal, because Akbar's time and the first eight years after Jahangir's accession were the age of conquering generals, when the province was not yet ready to accept and work a settled civil government (ঐ, পৃঃ ২১৬)। বাংলার জমিদারেরা কি ভাবে নামমাত্র মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ স্বাধীন ব্যবহার করিতেন, তাহা বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা বীর হাম্বীরের কার্য্যপ্রণালী হইতে বুঝা যায়। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে আহত হইলে বীর হাম্বীর তাঁহাকে বিষ্ণুপুরের গড়ে লইয়া যাইয়া আফগানদের হাত হইতে রক্ষা করেন (History of Bengal II, পৃঃ ২০৮)। বাহারিস্তান হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করিলেও, কখনও সুবেদারের দরবারে যান নাই বা তাঁহার কোন প্রকার সেবা করেন নাই। ইসলাম খানের মৃত্যুর পর (History of Bengal II, পৃঃ ২৩৬, ২৪৯) তিনি পুনরায় স্বাধীন হন। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে সুবেদার কাসিম খান্ বীর হাম্বীরকে দমন করিবার জন্য সেখ কামালকে প্রেরণ করেন; কিন্তু তিনি সেখ কামালকে পছন্দ করিতেন না বলিয়া তাঁহাকে খুব অল্পসংখ্যক সৈন্য দেন। ফলে বীর হাম্বীরকে দমন করা সম্ভব হয় নাই (History of Bengal II, পৃঃ ২৯১—২২)।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মপ্রচারের ফলে বাংলার সামাজিক জীবনে বিপ্লব দেখা

দিয়াছিল। হরিদাস ঠাকুরের যবন-সংসর্গ থাকা সত্ত্বেও অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহাকে শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর জাতির সাধকেরা নিঃসঙ্কোচে ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করেন। রঘুনাথ দাস কায়স্থ হইয়াও ছয় গোস্বামীর মধ্যে স্থান পাইলেন। নরোত্তম ঠাকুর বারেন্দ্র কায়স্থ, কিন্তু তাঁহার অসংখ্য ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিবার যে প্রথা প্রচলন করেন, তাহা তাঁহার বংশধরগণ আজও অনুবর্ত্তন করিতেছেন।

গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নিমাই পণ্ডিত যে কীর্ত্তন গান আরম্ভ করিলেন, তাহাতে বিভিন্ন জাতির লোক যোগ দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন ভেদভাব ছিল না। ভক্তির তারতম্যই তাঁহাদের মর্য্যাদা নির্ণয়ের একমাত্র তৌলদণ্ড ছিল। বলরামদাসের একটি পদ নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে (পৃঃ ৯৫৬) উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—

বড় অপরূপ মেন গোরাচাঁদের লীলা।
রাজা হৈয়া কাঁধে করে বৈষ্ণবের দোলা॥
হেন অবতারের উপমা দিতে নারি।
সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি॥
সব লোক ছাড়ে যারে অপরশ বলি।
দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি॥
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।
হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম॥

কুলের বৌয়েরা সংকীর্ত্তনে নাচিয়াছিলেন—এটি কবিসুলভ অতিশয়োক্তি কি না, বলিতে পারি না। তবে শিবানন্দ সেনের স্ত্রী ও পরমেশ্বর মোদকের মায়ের মতন অসংখ্য নারী প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে পুরীতে যাইতেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম-আন্দোলনের ফলে স্ত্রীজাতির অধিকার ও স্বাধীনতা যে ব্যাপক হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবা দেবী খেতুরি মহোৎসবের সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু শিষ্যকে মন্ত্রদান করিয়াছিলেন। অদ্বৈতপত্নী সীতা দেবী যে পুরুষের প্রকৃতি ও বেশ ধারণ

করিয়া সাধনার রীতি প্রবর্ত্তন করেন, তাহা তাঁহার শিষ্য নন্দিনী ও জঙ্গলীর বিবরণ হইতে জানা যায়। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও বহু শিষ্যকে মন্ত্র দান করিয়াছিলেন।

বাংলার বহু পরিবার নিরামিষাশী হইয়াছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র "মীনমাংস ছাড়ি বহুকাল" দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। যাঁহারা মাছ খাইতেন, তাঁহারাও মাঘ ও বৈশাখ মাসে নিরামিষ ভোজন করিতেন (কবিকঙ্কণ চণ্ডী—পৃঃ ৬৮)। প্রায় প্রত্যেক বড় গ্রামেই দুই-চারি জন বৈষ্ণব আখড়া করিয়া বাস করিতেন। তাঁহারা কি ভাবে কীর্ত্তনের ভিতর দিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, তাহা মুকুন্দরাম সুন্দর-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

সদা লয় হরিনাম, ভূমি পাইয়া ইনাম, বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে।
কাঁথা কম্বল লাঠি, গলায় তুলসী কাঠি, সদাই গোঙায় গীতনাটে॥

(পৃঃ ৮৬, বঙ্গবাসী সং)

তৃতীয় ভাগ

প দা ব লী

প্রথম স্তবক

শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবমাধুর্য্য

শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্যভাগবতে সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র পিতরৌ বা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্তব করা হইয়াছে। কীর্ত্তন প্রচারের জন্যই প্রভুর অবতার গ্রহণ—

এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বশক্তি পরচারি॥
সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি-পরচার॥

(চৈঃ ভাঃ, ১।২।১৭৪-১৭৫)

কিন্তু কীর্ত্তনগানের প্রথমে যে গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরাঙ্গের ভাব-আস্বাদনের পদ গান করা হয়, তাহা কেবলমাত্র তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে নহে। রাধাকৃষ্ণের লীলারস শ্রীগৌরাঙ্গ যে ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে চিত্তরূপ দর্পণের মালিন্য দূরীভূত হয় এবং পরম আনন্দের উদ্ভব হয়। প্রভুর ভাবমাধুর্য্য ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্যের উৎস-স্বরূপ। আবার ঐ সাহিত্যের অলৌকিক রসভাণ্ডারের চাবিকাঠিও উহার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে ২৩ বৎসরের তরুণ যুবক শ্রীগৌরাঙ্গ গয়া হইতে ফিরিবার পর ক্রমাগত কয়েক দিন ধরিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ছাড়া তাঁহার মুখ দিয়া আর কিছুই বাহির হয় না। শেষে তিনি অধ্যাপনা করিবার ব্যর্থ চেষ্টা ত্যাগ করিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন—

প্রভু বোলে—'ভাই সব' কহিলা সুসত্য।
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখোঁ তাই ভাই! বোলোঁ সর্ব্বথায়॥

যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখোঁ—গোবিন্দের ধাম॥
তোমা সভাস্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার॥

(চৈঃ ভাঃ, ২।১।৩৬১-৩৬৫)

ইহার পর প্রায় এক বৎসরকাল ধরিয়া প্রভু নবদ্বীপে কীর্ত্তন প্রচার করেন। সেই সময়ে তাঁহার ভাব দেখিয়া নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন, বাসু ঘোষ, বসু রামানন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, বলরাম দাস প্রভৃতি ভক্তগণ যে সব পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্যের অগ্রদূত।

(১)

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনি দেখি পহু যমুনার ভানে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥
পুরুব আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে।
পীত বসন আর সে মুরলী চাহে॥
প্রিয় গদাধরে ধরিয়া নিজ কোলে।
কোথা ছিলা, কোথা ছিলা, গদগদ বোলে॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহয়ে বাম পাশে।
না বুঝয়ে এহ রঙ্গ নরহরি দাসে॥

ক্ষণদা, ২৭।৪১

ভক্তিরত্নাকর পৃঃ ৯২৪
হইতে মূল পাঠ দেওয়া হইল।
পদকল্পতরু ২১২২।

ভক্তিরত্নাকরের সঙ্কলয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তী এই পদটির নীচে লিখিয়াছেন—“শ্রীনরহরিসরকারঠক্কুরস্য গীতমিদং”। তিনি নিজেও একজন

কবি ছিলেন এবং পদকল্পতরুতে সরকার ঠাকুরের কয়েকটি পদের সঙ্গে তাঁহার পদও ধৃত হইয়াছে। উভয়ের রচনাশৈলী সম্পূর্ণ পৃথক্। একটু চেষ্টা করিলেই পার্থক্য ধরা যায়। যাহা হউক, এই পদটি যে নরহরি সরকারের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

টীকা :—পাকে—বিপাকে, বিপদে পড়িলেন। এই পদে দেখা যায় যে, গৌরাঙ্গ কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া রাধাকে স্মরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু গদাধর পণ্ডিতকে রাধা মনে করিয়া প্রভু তাঁহাকেই নিকটে টানিয়া লইলেন। তাঁহার পরিকর গদাধর দুই জন—গদাধর পণ্ডিত, যাঁহার আদিম বাসস্থান চট্টগ্রামে এবং দাস গদাধর—যিনি কলিকাতার নিকটস্থ আড়িয়াদহে (এঁড়েদহ) থাকিতেন।

(২)

হেম দরপণি গৌরাঙ্গ-লাবণি
ধূলায় ধূসর কাঁতি।
অশন বসন তেজিয়া রোদন
ব্রজবিলাসিনী ভাঁতি॥
হরি হরি বলি প্রাণনাথ করি
ধরণী ধরিয়া উঠে।
কোথা না যাইব কাহারে কহিব
পরাণ ফাটিয়া উঠে॥
সহচরগণে করিয়া রোদনে
কহয়ে বদন তুলি।
আমার পরাণ করয়ে যেমন
বেদন কাহারে বলি॥
নরহরি দাসে গদগদ ভাষে
কহয়ে গৌরাঙ্গ মোর।
আন ছলে বুলে উদ্ধারে সকলে
সদা রাধা-প্রেমে ভোর॥ তরু, ৩১৬

পাঠান্তর :—তরুতে 'আসন বসন' পাঠ আছে; মূলে গৃহীত পাঠ বরাহনগর-পুথির। আসন ও বসন ত্যাগ করা অপেক্ষা অশন (খাদ্য) ও বসন ত্যাগ করিয়া রোদন করেন বলিলে অর্থ ভাল হয়।

টীকা :—এই পদে দেখা যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিতেছেন।

হেম দরপণি—১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কাচের আয়নার প্রচলন হয় নাই—১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পরে ভারতবর্ষে উহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের রং সোনার মতন ছিল, তাই উহার সঙ্গে সোনার আয়নার তুলনা করা হইয়াছে। 'আমার পরাণ, করয়ে যেমন, বেদন কাহারে বলি'—এই সামান্য কয়টি শব্দ ব্যবহার করিয়া সরকার ঠাকুর প্রভুর অন্তরের অপরিসীম ব্যথা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

(৩)

সোনার বরণ গৌরাঙ্গ সুন্দর
পাণ্ডুর ভৈ গেল দেহ।
শীত ভিন যেন কাঁপয়ে সঘন
সোঙরি পুরব লেহ॥
কিছু না কহই দীঘ নিশ্বাসই
চিতের পুতলী পারা।
নয়ন যুগল বাহি পড়ে জল
যেন মন্দাকিনী ধারা॥
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
না জানি কেমন তাপে।
কখন সঙ্গীত কখন রোদন
কিবা করে পরলাপে॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি
চাহয়ে রঙ্কের পারা।

হরি হরি বোলে ভুজযুগ তোলে
মমর বুঝিবে কারা ॥

তরু, ১৯০৮

টীকা :—লেহ—নেহ, স্নেহ, প্রেম।

বিরহভাবের বশে প্রভুর দেহে পাণ্ডুরতা বা বৈবর্ণ্য, কম্প, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু, স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক চিহ্ন দেখা গেল। চিতের পুতলী পারা—পটে আঁকা ছবি বা চিত্রে অঙ্কিত পুত্তলিকা যেমন কথা বলিতে পারে না, প্রভুও তেমনি নির্ব্বাক্। অথচ তাঁহার বুক কাঁপিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে।

পরলাপ—প্রলাপ।

রঙ্ক—দরিদ্র।

(৪)

গদাধর অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবনগুণ গান বিভোর হইয়া ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে।
রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি ॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে ॥

ক্ষণদা, ৬।১
ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৯২২
তরু, ২১২১

ক্ষণদায় পাঠ—

গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ নিজ অঙ্গ দিয়া।
গান বৃন্দাবন-গুণ আনন্দিত হইয়া ॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
মুখচাঁদ কি কহিব কহিতে না জানি ॥

নাচেন গৌরাঙ্গচাঁদ গদাধর রসে।
গদাধর নাচে পহুঁ গৌরাঙ্গ বিলাসে॥

শ্রীচৈতন্যের প্রথম চরিতাখ্যায়ক মুরারি গুপ্তের এই পদটি ঐতিহাসিকদের নিকট দুইটি কারণে মূল্যবান্। প্রথমতঃ, ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবময় জীবনের অপূর্ব্ব আলেখ্য অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।—প্রভু রাধাভাবে আকুল হইয়া বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া থাকেন; কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন। দ্বিতীয়তঃ, এই দুই জনের (গৌরাঙ্গ ও গদাধরের) রসে ত্রিভুবন দরবিত অর্থাৎ দ্রবীভূত হইল বলায় গৌর-গদাধর উপাসনার সূত্রপাতের ইঙ্গিত এখানে দেখা যায়।

ভণিতায় পাঠান্তর, ক্ষণদায় ভণিতা—

ত্রিভুবন দরবিত দম্পতি রসে।
মুরারি বঞ্চিত ভেল নিজ মায়া-দোষে॥

(৫)

চৌদিগে গোবিন্দ ধ্বনি শুনি পহু হাসে।
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ আর সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনি ভাসল প্রেমে বাঢ়ল আনন্দ॥
গোবিন্দ মাধব বাসু গায়েন মুকুন্দ।
ভুলিল কীর্ত্তনরসে পায়া নিজবৃন্দ॥
রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সে অমিয়া-রসে ভোর।
বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর॥

ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৯৫২

টীকা :—পহু অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ চারি দিকে গোবিন্দধ্বনি শুনিয়া আনন্দে হাস্য করিতেছেন। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করিতেছেন; আর সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়া মুকুন্দ দত্ত, সুবিখ্যাত কবি-ভ্রাতৃত্রয় গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষের সঙ্গে গান করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই কীর্ত্তনের আনন্দে ঘরদুয়ার ও স্বজনদিগকে ভুলিয়া গেলেন। প্রভুর এই সব রসিক

(রঙ্গিয়া) সঙ্গীরা যেন অমৃতরস পান করিয়া উন্মত্ত (ভোর) হইয়াছেন। কবি রামানন্দ বসু গৌরচন্দ্রের অমিয়া পান করিবার জন্য যেন লুব্ধ চকোরের মতন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

(৬)

ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল।
সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল॥
বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার।
পদতলে তাল উঠে নূপুর ঝঙ্কার॥
ছন্দ বিছন্দে কত জাগে অঙ্গভঙ্গী।
নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙ্গী॥
কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদু গান।
গন্ধর্ব্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ান॥
পঙ্কজ সঙ্কোচ পায় দেখিয়া নয়নে।
হাসিতে বিজুরিছটা পড়য়ে দশনে॥
বাঁধুলি জিনিয়া রাঙা ওঠখানি হাস।
ও রূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস॥

ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৮৩৭

টীকা ঃ—এই পদটিতে 'ও রূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস' থাকায় ইহা যে নিত্যানন্দের অনুগত সঙ্গী বলরামের রচনা, তাহা বুঝা যায়। চোখে না দেখিলে কবি 'বঞ্চিত হইয়া কান্দে' প্রভৃতি শব্দ লিখিতেন। এই পদ হইতে জানা যায় যে, গৌরাঙ্গ নৃত্য ও গীতে সুপটু ছিলেন, তাই তাঁহার মৃদু স্বরে গীত সঙ্গীত হইতে কিন্নরেরা যেন গান করিতে শিখিতেন এবং তাঁহার তাণ্ডব নৃত্য গন্ধর্ব্বগণ মনোনিবেশ সহকারে দেখিতেন। প্রভুকে কমল-লোচন না বলিয়া বলা হইয়াছে যে, তাঁহার নয়ন দেখিয়া কমল যেন সঙ্কোচ-প্রাপ্ত হয়। তাঁহার দাঁতগুলি ঝকমক করে—হাসিতে যেন বিদ্যুৎ ঝলকিয়া যায়। আর তাঁহার রক্তিম বর্ণের ওষ্ঠে হাসি যেন লাগিয়াই আছে।

(৭)

হোলি খেলত গৌর কিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর॥
স্বেদবিন্দু মুখ পুলক শরীর।
ভাবভরে গলতহি লোচনে নীর॥
ব্রজরস গায়ত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে॥
খেনে খেনে মুরুছই পণ্ডিত কোর।
হেরইতে সহচর সুখে ভেল ভোর॥
নিকুঞ্জ মন্দির পহুঁ কয়ল বিথার।
ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার॥
কাঁহা গোবর্দ্ধন যমুনাকো কূল।
কাঁহা মালতী যূথী চম্পক ফুল॥
শিবানন্দ কহে পহুঁ শুনি রসবাণী।
যাহা পহুঁ গদাধর তাহা রস খানি॥

ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৯৪৪

টীকা :—পদটি কবি কর্ণপূরের পিতা শিবানন্দ সেনের রচনা। গৌর-গদাধর লীলার ইহা একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ। এই পদ হইতে জানা যায় যে, নরহরি সরকার গান করিতেও পারিতেন। তিনি ব্রজলীলার পদ গাহিতেন, আর মুকুন্দ দত্ত, মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ প্রভৃতি নৃত্য করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার পরিকরগণ যে প্রভুকে কৃষ্ণরূপে ও গদাধর পণ্ডিতকে রাধারূপে দেখিতেন, তাহা প্রথমসংখ্যক নরহরির পদ ও এই পদটি হইতে বুঝা যায়। প্রভুর এখানে কৃষ্ণভাবের আবেশ; তাই তিনি মুরলীর খোঁজ করিতেছেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর সাধারণতঃ তিনি রাধার ভাবেই বিভোর থাকিতেন দেখা যায়।

(৮)

গৌরাঙ্গ বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে গঙ্গা পুলিন রঙ্গে
হরি হরি বলে নিজবৃন্দে॥
কাঁচা কাঞ্চন মণি গোরারূপ তাহা জিনি
ডগমগি প্রেম-তরঙ্গে।
ও নব-কুসুম-দাম গলে দোলে অনুপাম
হেলন নরহরি-অঙ্গে॥
প্রিয়তম গদাধর ধরিয়া সে বাম কর
নিজগুণ গাওয়ে গোবিন্দে।
ভাবে ভরল তনু পুলক কদম্ব জনু
গরজন যৈছন সিংহে॥
ঈষত হাসিয়া ক্ষণে অরুণ-নয়ন-কোণে
রোয়ত কিবা অভিলাষে।
সোঙরি সে সব খেলা বৃন্দাবন-রসলীলা
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে॥ ক্ষণদা, ২৮।১

টীকা ঃ—শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ সঙ্গী বাসু ঘোষের এই পদ হইতে জানা যায় যে, প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরিকরদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে কি ভাবে বিহার করিতেন। নরহরি সরকার প্রভুর খুব প্রিয় ছিলেন, তাই তিনি নরহরির অঙ্গে হেলান দিয়াছেন। "নিজগুণ গাওয়ে গোবিন্দে"—এই গোবিন্দ হইতেছেন বাসু ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ। তিনি কৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই কৃষ্ণ, এই দৃঢ় বিশ্বাস ১৫০৯ খৃষ্টাব্দেই ভক্তদের মনে জন্মিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন—"নিজগুণ" গোবিন্দ গান করিতে-ছেন। প্রভুর ভাবাবেশের চিত্রটি নরহরির তৃতীয় পদটির অনুরূপ।

(৯)

শ্রীদাম সুবল সঙ্গে সে রস করিনু রঙ্গে
বলি পহুঁ করে উতরোল।

মুরলী মুরলী করি মুরছিত গৌর-হরি
পড়ে পহুঁ গদাধর কোল ॥
রাস রস বৃন্দাবন প্রিয় সখা সখীগণ
উপজয়ে প্রেমার তরঙ্গ।
বাসু ঘোষ রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পহুঁ নরহরি সঙ্গ ॥
রাধার ভাবেতে ভোরা বরণ হইল গোরা
রাধানাম জপে অনুক্ষণ।
ললিতা বিশাখা-বলি পহুঁ যান গড়াগড়ি
কাঁহা মোর গিরি গোবর্দ্ধন ॥
কাঁহা যমুনার তট কাঁহা মোর বংশীবট
বলি পুন হরয়ে চেতন।
এ দীন গোবিন্দ ঘোষে না পায়ল লবলেশে
ধিক্ রহু এ ছার জীবন॥ ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৯১৯

টীকা :—বাসু ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ এই পদে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হইবার কথা বলিতেছেন। রাধার ভাবেতে ভোরা অর্থে এখানে রাধার জন্য উন্মত্ত, তাহা না হইলে 'রাধানাম জপে অনুক্ষণে'র সঙ্গত অর্থ করা যায় না। রাধার কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রভু যেন রাধার মতন গৌরবর্ণ হইয়া গিয়াছেন।

'বলি পুন হরয়ে চেতন' স্থলে জগদ্বন্ধু ভদ্র (পৃঃ ২৮১) 'হরয়ল চেতন' পাঠ পাইয়াছেন। উহাকে 'হারায় চেতন' বলিলে সুন্দর পাঠ হয়।

লব—কণা।

রামানন্দ—এখানে বসু রামানন্দের উল্লেখ; কেন না, রায় রামানন্দের সঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রথম দেখা হয়।

শ্রীবাস—ইঁহারই গৃহে অধিকাংশ দিন প্রভুর নৃত্য-বিলাসাদি হইত।

জগদানন্দ—পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।

লোকে খ্যাত যিঁহো সত্যভামার স্বরূপ ॥
(চৈঃ চঃ, ১।১০।২১)

(১০)

সোনার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাইল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা।
না জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন-গুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরুছিয়া।
শিবানন্দ কান্দে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া॥

গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ২৯৩

টীকা :—শিবানন্দ সেন এখানে প্রভুর কৃষ্ণ-তন্ময়তার বর্ণনা করিতেছেন। তাই তিনি লিখিতেছেন যে, "রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরুছিয়া"। প্রেমে উন্মত্ত হইয়া থাকায় প্রভু বুঝিতে পারেন না—কোথা দিয়া দিন বা রাত্রি চলিয়া যাইতেছে। 'গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া'—সম্ভবতঃ এই গোবিন্দ গোবিন্দ ঘোষ; সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ আচার্য্যও হইতে পারেন। কিন্তু নীলাচল-লীলার সেবক গোবিন্দ কিছুতেই নহেন; কেন না, ঐ গোবিন্দ প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের অনেক পরে মিলিত হন।

(১১)

রসে তনু ঢর ঢর গৌরকিশোর বর
নাম তার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এ সব নিগূঢ় কথা কহিতে অন্তরে বেথা
ভক্ত বিনু নাহি জানে অন্য॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্য নাম
গর্গ-বাক্য ভাগবতে লিখি।
মনে করি অনুমান শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণ-তনু তার সাখী॥

অন্তরেতে শ্যাম তনু বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদভুত চৈতন্যের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জরস বিলাইতে
অনুরাগে গৌর-তনু হৈলা॥
কহিবার কথা নহে কহিলে কি জানি হয়ে
না কহিলে মনে বড় তাপ।
চিত্তে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
নরহরি করয়ে বিলাপ॥

পদক, ২২৫৯

টীকা :—এই পদটি নরহরি সরকারের, নরহরি চক্রবর্ত্তীর নহে। ইহা যদি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্যের পুত্র নরহরি চক্রবর্ত্তী কর্তৃক লিখিত হইত, তাহা হইলে ইহাতে গৌরাঙ্গ যে কৃষ্ণই, এবং তিনি ব্রজের নিগূঢ় নিকুঞ্জ-রস বিতরণের জন্য রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন, এই কথা বলিতে এত সঙ্কোচ দেখা দিত না। কেন না, স্বরূপ দামোদর ঐ কথা ঘোষণা করেন এবং কবিকর্ণপূরের ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় উহা সুপ্রচারিত হয়। এই পদটিতে নরহরি সরকার যেরূপ গুহ্য-কথারূপে তত্ত্বটির কথা বলিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, স্বরূপ দামোদরের পূর্ব্বেই তিনি ইহা লিখিতেছেন।

(১২)

দেখি গোরা নীলাচল-নাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইলা গোপীভাবে।
কহে পহুঁ করিয়া আক্ষেপে॥
আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটি না চাহ তুমি ফিরি॥
করিলা পিরিতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥

এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ॥
ছল ছল অরুণ নয়ান।
রস রস বিরস বয়ান॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস॥

তরু, ৭৯৯

টীকা :—নীলাচল-লীলায় আর প্রভুর কৃষ্ণভাবে ভাবিত হওয়ার কথা দেখা যায় না। এখানে তাঁহার গোপীভাব। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার ন্যায় তিনি যেন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, প্রথমে তো তুমি আমার জন্য আকাশের চাঁদ আনিয়া দিতেও প্রস্তুত ছিলে। এখন তোমার খবর (সন্দেশ) পাওয়াও মুস্কিল, অথবা তুমি সন্দেশের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছ—('এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ'—ঠিক এই ভাষা নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত চণ্ডীদাসের ২৫১ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়)। কয়েকটি চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত পদের প্রাচীনতর রূপ নরহরি-ভণিতায় পাওয়া যায়।

(১৩)

রামানন্দ স্বরূপের সনে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি।
ক্ষণে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতি কুল নাশে॥
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গ-বিলাসে॥

তরু, ৮২০

টীকা ঃ—এটিও নীলাচল-লীলার ভাববর্ণনা ; কেন না, ইহাতে স্বরূপের কথা আছে ; এই স্বরূপ হইতেছেন স্বরূপ দামোদর, নবদ্বীপ-লীলায় গৃহস্থাশ্রমে যাঁহার নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য্য। রামানন্দ এখানে রায় রামানন্দ।

আলি—সখি।

বাঁশীরে দেয় গালি—বংশীর প্রতি আক্ষেপ এই যে, বাঁশীই তাঁহাকে ঘরছাড়া, কুলছাড়া করিল

বধির সমান মোরে কৈল—আমার কানে শুধু বাঁশীর শব্দই বাজে, আর কিছু প্রবেশ করে না।

(১৪)

প্রেম করি কুলবতী সনে।
এত কি শঠতা কানুর মনে॥
বংশীনাদে সঙ্কেত করিল।
ঘরের বাহিরে মুই আইল॥
কহে পুন হইবে মিলন।
তাই মুই আইনু কুঞ্জবন॥
বেশ বানাইনু কত মতে।
আশা করি বঞ্চিনু কুঞ্জেতে॥
কিন্তু কানু বঞ্চিয়া আমারে।
রজনী বঞ্চিল কার ঘরে॥
স্বরূপেরে এত কহি গোরা।
অভিমানে কাঁদে হৈয়া ভোরা॥
নরহরি তা হেরিয়া কাঁদে।
কেমনে কঠিন হিয়া বাঁধে॥

পণ্ডিতবাবাজী মহোদয়ের সংগ্রহ ; মাধুরী, ২।৪৮৩ পৃঃ।

টীকা ঃ—খণ্ডিতা নায়িকার ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীচৈতন্য স্বরূপ দামোদরকে বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ শঠ। কৃষ্ণ সঙ্কেত করিয়া কুঞ্জে ডাকিয়া

আনিয়া অন্যের সঙ্গে রাত্রি কাটাইল। খণ্ডিতার পদ আস্বাদন করিতে হইলে প্রভুর এই ভাবের কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাহা না রাখিলে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কথা মনে উঠিয়া চিত্ত মলিন হইবার আশঙ্কা থাকে।

(১৫)

গৌরাঙ্গচান্দের ভাব কহনে না যায়।
বিরলে বসিয়া পহুঁ করে হায় হায়॥
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে।
কহে মুঞি ঝাঁপ দিব সমুদ্র মাঝারে॥
করিলুঁ দারুণ প্রেম আপনা আপনি।
দু কুলে কলঙ্ক হৈল না যায় পরাণি॥
এত কহি গোরাচান্দ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস।

তরু, ৮৩২

টীকা ঃ—নরহরি সরকারের এই পদেও চণ্ডীদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীদাসের রাধার ন্যায় আক্ষেপ করিয়া প্রভু বলিতেছেন—'দু কুলে কলঙ্ক হৈল না যায় পরাণি'।

পদটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব হইতেছে—শ্রীচৈতন্যের 'ঝাঁপ দিব সমুদ্র মাঝারে' সঙ্কল্পের ভিতর। কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতায় অধীর হইয়া রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীচৈতন্য সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার কথা প্রায়ই ভাবিতেন। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় যে, তিনি একবার অন্ততঃ সত্য সত্যই ঝাঁপ দিয়াছিলেন। পরে এক ধীবর তাঁহাকে জালে তুলিয়া তীরে আনে।

(১৬)

গৌর সুন্দর মোর।
কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে
নয়নে গলয়ে লোর॥

হরি অনুরাগে আকুল অন্তর
গদ গদ মৃদু কহে।
সকল অকাম করে মনসিজ
এত কি পরাণে সহে॥
অবলা শরীর করে জর জর
মনের মাঝারে পশি।
কহিতে ঐছন পুরুব-বচন
অবনত মুখ-শশী॥
প্রলাপের পারা কিবা কহে গোরা
মরম কেহো না জানে।
পুরুব চরিত সদা বিভাবিত
দাস নরহরি ভণে॥

তরু, ৮৫৩

টীকা :—কহিতে ঐছন পুরুব বচন—শ্রীচৈতন্য দ্বাপর-লীলার রাধার ভাবে আকুল হইয়া মদনের প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, কামদেব যে এমন অকাজ করিতেছে, ইহাতে যে অবলার পরাণ যায়, তাহা ভাবিয়া দেখিতেছে না। এই কথা বলিয়া ঠিক মেয়েদের মতনই মুখ নীচু করিয়া প্রভু প্রলাপের মতন উক্তি করিতে লাগিলেন।

(১৭)

নিত্যানন্দ-বন্দনা

শ্রীবাস অঙ্গনে বিনোদ বন্ধানে
নাচে নিত্যানন্দ রায়।
মনুজ দৈবত পুরুষ যোষিত
সবাই দেখিতে ধায়॥
ভকত মণ্ডল গাওত মঙ্গল
বাজে খোল করতাল।

মাঝে উনমত নিতাই নাচত
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার ॥
হেম-স্তম্ভ জিনি বাহু সুবলনি
সিংহ জিনি কটিদেশ।
চন্দ্র বদন কমল নয়ন
মদন-মোহন বেশ ॥
গরজে পুন পুন লম্ফ ঘন ঘন
মল্লবেশ ধরি নাচই।
অরুণ লোচনে প্রেম-বরিখনে
অবনী-মণ্ডল সিঞ্চই ॥
ধরণী-মণ্ডলে প্রেমের বাদর
করল অবধূত-চান্দ।
না জানে নর-নারী ভুবন দশ-চারি
রূপ হেরি হেরি কান্দ ॥
শান্তিপুরনাথ গরজে অবিরত
দেখিয়া প্রেমের বিকার।
ধরিয়া শ্রীচরণ করয়ে রোদন
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার ॥
মুকুন্দ কুতূহলী কান্দয়ে ফুলি ফুলি
ধরি গদাধর-কোর।
নয়নে বহে প্রেম ঠাকুর অভিরাম
সঘনে হরি হরি বোল ॥
না জানে দিবা নিশি প্রেম-রসে ভাসি
সকল সহচর-বৃন্দে।
শঙ্কর ঘোষ দাস করত প্রতিআশ
নিতাই-চরণারবিন্দে ॥

ক্ষণদা, ৩০।২

শ্রীগৌরাঙ্গকে জানিতে ও বুঝিতে হইলে নিত্যানন্দকে জানা ও বুঝা

প্রয়োজন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে প্রতিদিনের কীর্ত্তনের প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা গান করিবার পর নিত্যানন্দ-চন্দ্রিকা কীর্ত্তন করিবার উপযোগী পদ সঙ্কলন করিয়াছেন।

এই পদটিতে 'ভাইয়ার' অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের 'ভাবে মাতোয়ারা' নিত্যানন্দের ভাব সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। নিত্যানন্দকে মল্লবেশধারিরূপে বৃন্দাবনদাস ও জ্ঞানদাসও বর্ণনা করিয়াছেন। অভিরাম ঠাকুর নিত্যানন্দের পরম অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরের সংলগ্ন খানাকুল-কৃষ্ণনগরে (হুগলী জেলা) ইঁহার শ্রীপাট। ষোল জন লোকে তুলিতে পারে, এমন কাষ্ঠখণ্ডকে ইনি যোগবলে অনায়াসে উঠাইয়া বাঁশীর মতন করিয়া হাতে ধরিয়াছিলেন। প্রেমের বিকার—অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক ইত্যাদি।

(১৮)

অদ্বৈত-বন্দনা

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যাঁর হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয়॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর।
যাঁর প্রেমবশে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর॥
যাহারে করুণা করি কৃপাদিঠে চায়।
প্রেমাবেশে সে জন চৈতন্যগুণ গায়॥
তাঁহার চরণে যেবা লইল শরণ।
সে জন পাইল গৌরপ্রেমমহাধন॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিনু।
লোচন বোলে নিজ মাথে বজর পাড়িনু॥

গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ৩১

টীকা ঃ—নরহরি সরকারের অনুগত লোচন গৌরাঙ্গকে নাগর বলিয়া স্তব করিতেছেন, যদিও বৃন্দাবনদাস জোর করিয়া বলিয়াছেন যে, গৌরাঙ্গের

সকল স্তবই সম্ভব—কেবল নাগর স্তব ছাড়া। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য, এই ত্রয়ীকে একত্রে আস্বাদন করা কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে যে, অদ্বৈতের হুঙ্কার গর্জ্জনেই শ্রীকৃষ্ণ শচীগর্ভে উদিত হন।

অদ্বৈত প্রভু শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। অদ্বৈত যখন ভক্ত ও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিমান্ হইয়াছেন, তখন বিশ্বম্ভর মিশ্র দিগম্বর বালক-রূপে তাঁহার বড় ভাই বিশ্বরূপকে ডাকিতে নবদ্বীপস্থিত অদ্বৈতগৃহে আসিতেন। নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে ৯ বৎসরের বড়। প্রবীণ পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য্য এবং নিত্যানন্দ, যিনি সমগ্র ভারতের অজস্র সাধুর সঙ্গ করিয়া ৩২ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে আসেন, ইহাঁরা উভয়েই ২৩ বৎসরের তরুণ যুবক বিশ্বম্ভর মিশ্রকে বিষ্ণুর খট্টায় বসাইয়া বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অভিষেক করেন।

দ্বিতীয় স্তবক

গোষ্ঠলীলা

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলায় মা যশোদার বাৎসল্য ও শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতির সখ্য সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। প্রাক্-চৈতন্য যুগের কোন বাঙ্গালী কবির সখ্য ও বাৎসল্য রসের কোন রচনা পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে যাইবার পথে শ্রীরাধার সঙ্গে তাঁহার নয়নে নয়নে মিলন হইল; দ্বিপ্রহরে তিনি সখাদিগকে ধোঁকা দিয়া, রাধাকুঞ্জে যাইয়া রাধার সঙ্গে বিলাসাদি করিলেন, এরূপ ভাবের বর্ণনা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কোন রচনায় দেখা যায় না। কিন্তু গোবিন্দদাসের যুগের গোষ্ঠলীলায় সখ্য ও বাৎসল্যরসকে গৌণ করিয়া শৃঙ্গার রসকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ঐ ধরণের কোন পদ এই স্তবকে ধৃত হইল না। গোষ্ঠলীলা পূর্ব্বাহ্নে কীর্ত্তন করা বিধি।

(১৯)

আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
ধবলী সাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয় ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ফিরায় পাচনী॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস অভিরাম সভার আনন্দ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে॥

তরু, ১১৮৬

টীকা:—পদটি খুব সম্ভব, ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে আগমনের পরে রচিত হয়। রামাই, সুন্দরানন্দ, গৌরীদাস, অভিরাম প্রভৃতি নিত্যানন্দের অনুচর সখ্যরসের উপাসক ছিলেন। কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় অভিরামকে শ্রীদাম, সুন্দরানন্দকে সুদাম এবং

গৌরীদাস পণ্ডিতকে সুবল তত্ত্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বাসু ঘোষের সঙ্গে নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠতা দেখাইয়াছেন—

মাধব গোবিন্দ বাসুদেব—তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥

চৈঃ ভাঃ, ৩।৫। ৪৫৫ পৃঃ

কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হইয়া নিমাই তাঁহার পরিকরদের লইয়া গোষ্ঠলীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন।

(২০)

গোঠে আমি যাব মা গো, গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা, মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াইয়া রাজপথে॥
পীত ধড়া দে গো মা, গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতি।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি॥
অঙ্গ বিভূষণ কৈল রতন ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখি-পুচ্ছ চূড়ার টালনি॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে॥
বলরামদাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরাণি॥ তরু, ১২১৭

টীকা :—মনের আরতি—এখানে উৎকণ্ঠা।
ধটী—কটিবসন।
টালনি—হেলনা।

(২১)

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতি দূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় জনি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন॥
নিকটে গোধন রাখ্য মা বল্যা শিঙ্গায় ডাক্য
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈল গোপজাতি গোধন পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব॥
বলরামদাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণি
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিল নিশ্চয়॥

তরু, ১২১৮

টীকা ঃ—মা যশোদার বাৎসল্য প্রতি শব্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পদকর্তা বলরামদাস যেন একজন সখা হইয়া মাকে আশ্বাস দিতেছেন যে, বাধা অর্থাৎ খড়ম লইয়া কৃষ্ণের নিকট যোগাইবেন, সুতরাং তাঁহার পায়ে তৃণের অঙ্কুর লাগিবে না।

(২২)

চূড়া বান্ধে মন্ত্র পড়ে নব গুঞ্জা দিঞা।
চন্দনতিলক দিছে রাণী চান্দমুখ চাঞা॥
পীয়ল পাটের ধড়া পরায়ে আটিঞা।
নয়নে কাজর দিছে অনিমিখ হঞা॥

ধড়ায় বান্ধিয়া দিল বিবিধ মিঠাই।
রামের হাথে কানুরে সোপিঞা দিছে মাই॥
রাম পানে চায় রাণী শ্যাম পানে চায়।
কি বল্যা বিদায় দিব মুখে না বার‍্যায়॥
বসু রামানন্দ কহে শুন নন্দরাণি।
সভার জীবন-ধন তোমার নীলমণি॥

সংকীর্ত্তনামৃত, ৮৪

টীকা ঃ—মন্ত্র পড়ে—শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে দৈব বিপাকে না পড়েন, তাহার জন্য মন্ত্র পড়িতেছেন।

চান্দমুখ চাঞা—একবার করিয়া মা চন্দন পরান, তিলক পরান, আর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হন।

পীয়ল—পীতবর্ণ।

পাটের ধড়া—পাট মানে, পট্টবস্ত্র অর্থাৎ রেশমি কাপড়।

ধড়া—পরিধেয় বসন, এখানে চাদর অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

(২৩)

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালপাড়া॥
হাম্বা হাম্বা রব সে উঠিল ঘরে ঘরে।
সাজিয়া কাচিয়া সভে হইলা বাহিরে॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন চালাঞা সভে চলিলা একসাথে॥
চারি দিকে সব শিশু মধ্যে রাম কানু।
কাঁচনী পাঁচনী কারু হাতে শিঙ্গা বেণু।
সভার সমান বেশ বয়স এক ছান্দ।
তারাগণ বেড়িয়া চলিলা শ্যামচান্দ॥
ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥ তরু, ১১৯০

টীকা :—কাচিয়া—বেশ করিয়া। আজকাল যেমন বলি—সাজগোজ করিয়া, সে কালে তেমনি বলিত—সাজিয়া কাচিয়া।

রাম কানু—বলরাম ও কানাই।

কাঁচনী—সজ্জা।

পাঁচনী—গোরু তাড়াইবার ছোট লাঠি।

তারাগণ বেড়িয়া চলিলা শ্যামচান্দ—ব্রজের গগনে যেন শ্যামরূপ চন্দ্রের উদয় হইয়াছে, আর তাঁহার সখাগণ যেন তারকাতুল্য।

বাহুড়ায়—ফেরায়।

(২৪)

নীল কমলদল শ্রীমুখ মণ্ডল
ঈষত মধুর মৃদু হাস।
[১]নব ঘন জিনি কালা গলায় গুঞ্জার মালা
আভীর-বালক চারি পাশ॥
মণিময় ঝুরি মাথে [২]অঙ্গদ বলয়া হাথে
রতন-নূপুর রাঙ্গা পায়।
[৩]হাসিতে খেলিতে যায় গোধূলি ধূসর গায়
বর্হা উড়িছে মন্দ বায়॥
[৪]নবীন রাখাল হরি নটবর বেশ ধরি
শিশু সঙ্গে গরুয়া চরায়।
ভূষণ বনের ফুল কি দিব তাহার তুল
মুকুন্দ আনন্দে গুণ গায়॥

সংকীর্ত্তনামৃত, ১৩৫
তরু, ১৩৪৭

এই পদটি ভণিতাহীন অবস্থায় কিছু পাঠান্তর সহ পদকল্পতরুতে (১৩৪৭) ধৃত হইয়াছে।

(১) নাচিতে নাচিতে যায় গোধূলি লাগ্যাছে গায়
আহীর-বালক চারি পাশ।

(২) কনয়া পাঁচনি হাতে।

(৩) আগে আগে ধেনু ধায় পাছে যায় শ্যামরায়।

(৪) সভার সমান ঝুঁটা কপালে চন্দন-ফোঁটা

রাখাল কোন জন বিনদিয়া।

শ্রীদামের কান্ধে হাত ওই যায় প্রাণনাথ

রাই দিছেন চিনাইয়া চিনাইয়া ॥

পদটি খুব সম্ভব, শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর মুকুন্দ দত্তের রচনা। মুকুন্দ একজন শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। তরুর শেষকলিটি 'রাই দিছেন চিনাইয়া চিনাইয়া' পরবর্ত্তী কালের সংযোজন মনে হয়। প্রথমে পদটি বিশুদ্ধ সখ্য-রসের ছিল ; পরে উহাতে শৃঙ্গাররস প্রক্ষেপ করা হইয়াছে।

(২৫)

লক্ষ লক্ষ শিশুগণ সমবেশ বিভূষণ

শিঙ্গা বেত্র বিষাণ কাছিয়া।

সহস্রেক নাহি টুটি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি

চলে শিশু বৎসগণ লইয়া ॥

কৃষ্ণ বৎস রাখে যত ব্রহ্মায় লেখিব কত

লেখিতে কে পারে তার অন্ত।

বৎস যূথ যূথ করি একত্রে সকল মেলি

বৎস রাখে করিয়া আনন্দ ॥

বিবিধ বালক লীলা বহুবিধ শিশুখেলা

বহু ভাঁতি খেলে শিশুগণ।

প্রবাল কুসুম ফল বনধাতু নব দল

করে শিশু অঙ্গের ভূষণ ॥

কেহ শিঙ্গা করে চুরি কেহ ফেলে দূর করি

পুন দেই হাসিয়া হাসিয়া।

কৃষ্ণ যদি থাকে দূরে ধাঞা ধাঞা শিশু চলে

পুন আইসে কৃষ্ণ পরশিয়া ॥

মুঞি সে সভার আগে পরশিনু তোমা এবে
এইরূপে আনন্দে বিহরে।
কেহ শিঙ্গা বেণু পূরে কেহ ভৃঙ্গরব করে
কোকিল-শবদ কেহ করে॥
কেহ দেখি পাখী ছায়া তার সঙ্গে যায় ধাঞা
হংস দেখি হংসের গমন।
বক দেখি বকবৎ কেহ হয় ধ্যানরত
কেহ ধরে ময়ূর পেখম॥
বানরের পুচ্ছ ধরি কেহ টানাটানি করি
বানরে টানিঞা তুলে গাছে।
বানর-আকৃতি ধরে সেরূপ ভ্রুকুটি করে
লম্ফে লম্ফে·যায় তার পিছে॥
... ...
ভাগবত আচার্য্য কহে শুনিলে দুরিত দহে
পরম মঙ্গল গুণগাথা॥

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
ভাগবত, ১০।১২।২—১০

(২৬)

যবে কৃষ্ণ বেণু বায় সব ধেনু রহি চায়
শ্রুতিযুগ-পুট ধরে তুলি।
মুদিত নয়ন করি হৃদয়ে চিন্তয়ে হরি
দশনে কবল ঘাস ধরি॥
বৎস করে ক্ষীরপান যবে শুনে বেণুগান
ক্ষীর-কবল মুখে ধরি।
শ্রুতিযুগ উভ করি অমনি ধেয়ায় হরি
প্রেমরসে আপনা পাসরি॥

বলভদ্র সহ হরি গোপশিশু সঙ্গে করি
বৃন্দাবনে চরায় গোধন।
দেখিয়া রবির জ্বালে মেঘে আসি ছত্র ধরে
দেবে করে পুষ্প বরিষণ॥
যতেক বালক মেলি রাম সঙ্গে বনমালী
গোধন চরায় যদি বনে।
চরের স্থাবর-ধর্ম্ম স্থাবরের চর-ধর্ম্ম
হেন চিত্র দেখিলা নয়নে॥
... ...
এ সব চরিত্র লীলা কৈলা দেবকীর বালা
ভাগবত আচার্য্য রচনা॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
ভাগবত, ১০।২১।১৩, ১৮

টীকা ঃ—কবল—গ্রাস ; ক্ষীর—দুধ।

রবির জ্বাল—সূর্য্যের তাপ।

চরের স্থাবর-ধর্ম্ম—গোবৎস চর, অর্থাৎ চলাচল করিতে পারে, কিন্তু বেণুগান শুনিয়া সে স্থাবরের মতন স্থির থাকে।

স্থাবরের চর-ধর্ম্ম—মেঘ স্থাবর বা নির্জ্জীব, কিন্তু সে মানুষের মতন শ্রীকৃষ্ণের মাথায় ছাতা ধরে।

(২৭)

আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়।
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে লইয়া যায়॥
শ্রীদাম বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়া
শ্রমজলধারা বহে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানাই সঙ্গে॥

কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তভু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইয়ের কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম ॥
মত্ত বলাই চান্দে কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে
বলরামদাস দেখি কয় ॥

টীকা :—জিতিলে হারয়ে তভু—কানাই জিতিলেও এমন ব্যবহার করেন, যেন তিনি হারিয়া গিয়াছেন।

হারিলে জিতয়ে বলরাম—বলরাম হারিয়া গেলেও গায়ের জোরে জয়ীর প্রাপ্য সুবিধা আদায় করিয়া লন।

গেড়ুয়া—গেণ্ডুক বা গোলক, ভাঁটা।

(২৮)

নটবর নব কিশোর রায়, রহিয়া রহিয়া যায় গো।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে, ধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে
হৈ হৈ হৈ ঘন যে বোলত, মধুর মুরলী বায় গো ॥
নীলকমল বদন চান্দ, ভাঙর ভঙ্গিম মদন ফান্দ
কুটিল অলকা তিলক ভাল, কলিত ললিত তায় গো।
চূড়ে বরিহা গোকুল চন্দ, কিবা পবন বয় মন্দ মন্দ
মধুকর-মন হয়ে বিভোর, নিরখি নিরখি ধায় গো ॥
নয়ানে সঘনে উলটি উলটি হেরি হেরি পালটি পালটি
গোরী গোরী থোরি থোরি আন নাহিক ভায় গো।
বলরামদাস, করতহি আশ, রাখাল সঙ্গে সদাই বাস।
বেত্র মুরলী, লইয়ে খুরলি, সঙ্গে সঙ্গে যায় গো ॥

টীকা :—বায়—বাজায়।

ভাঙ—ভুরু। কলিত—ধৃত।

নয়ানে সঘনে উলটি উলটি ইত্যাদি—শ্রীরাধা পথের কোথাও দাঁড়াইয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া একটু একটু করিয়া গৌরবর্ণা সুন্দরীকে দেখিতে লাগিলেন; অন্য কিছু আর তাঁহার মনে ধরিতেছিল না।

এই পদটির ভণিতার অংশের পরিবর্ত্তে এই দুই কলি এক পুথিতে পাইয়াছি—

অরুণ অধরে ইষত হাস, মধুর মধুর অমিয়া ভাষ
খঞ্জনবর গঞ্জন গতি, বঙ্ক নয়নে চায় গো।
রসের আবেশে অবশ দেহ, মন্থর গতি চলহি সেহ
দাস লোচন দেখয়ে অমনি, হাসিয়া হাসিয়া চায় গো॥

তৃতীয় স্তবক

উত্তর-গোষ্ঠ

খেলাধূলা করিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম সখাদের সঙ্গে অপরাহ্ণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই লীলার নাম উত্তর-গোষ্ঠ বা ফেরৎ গোষ্ঠ। এই লীলা অপরাহ্ণে কীর্ত্তন করা বিধেয়।

(২৯)

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বয়ানে।
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায়॥
নিতাইচাঁদের মুখে শিঙ্গার নিসান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমার আবেশ।
শিরে চূড়া শিখিপাখা নটবর বেশ॥
চরণে নূপুর সাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদন কহে চল গোবর্দ্ধন॥ তরু, ২৫৬৪

টীকা :—শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণের ভাবের আবেশে ধবলী শ্যামলী প্রভৃতি গাভীর নাম ধরিয়া ডাকিতেই, নিত্যানন্দ প্রভু মুখ দিয়া শিঙ্গা বাজাইবার মতন শব্দ করিলেন। তাহা শুনিয়া নিত্যানন্দের প্রিয় পরিকর গৌরীদাস পণ্ডিত, অভিরাম প্রভৃতি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ গোষ্ঠের উপযুক্ত বেশ করিয়া আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবাবেশ কি ভাবে তাঁহার সহচরদিগকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করিত, তাহা এই পদ হইতে বুঝা যায়।

গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট অম্বিকা কালনায়। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয়ের সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ হইয়াছিল।

(৩০)

যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া।
মাথামাথি রণ করে শ্রমযুত হৈয়া॥
প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ॥
আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে।
সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সভারে॥
মলিন হইল কানাই মুখখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সভাকার॥
বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই।
কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই॥

তরু, ১২০৬

(৩১)

ভাল শোভা ময়ূরের পাখে।
চূড়ায় বকুলমালা অলি লাখে লাখে॥
নিবারিতে নারে কেহ নিজকর-শাখে।
শ্রীদাম করে পদসেবা সুবল ধেনু রাখে॥
পত্রে ছত্র করি ধরে ভায়্যা বলরাম।
বসনে বীজন করে প্রিয় বসুদাম॥
কেহো নাচে কেহো গায়ে কানাই বলি ডাকে।
অনিমিখ হঞা কেহো চান্দমুখ দেখে॥
ধবলী শ্যামলী রহে মুখ পানে চাঞা।
মন্দ মন্দ বায়ে কানাইর উড়িছে বরিহা॥
কেহো জল কেহো ফল আনিয়া জোগায়।
বসু রামানন্দ দাস অনুগত চায়॥

সংকীর্ত্তনামৃত, ৩১৫

টীকা :—নিজকর-শাখে—সখারা, নিজেদের হাতে যে ছোট ছোট ডাল

আছে, তাহা দিয়া শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় বকুলমালার গন্ধে আকুল অলিকুলকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

পত্রে ছত্র—পাতাকে ছাতার মতন ধরা হইয়াছে।

(৩২)

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মায় পথ পানে চাইয়া॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরামদাস কহে শুনি কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে দ্রুত রোল॥

তরু, ১২০৭

টীকা:—সঘনে বিষম খাই—মা নাম করিতেছেন বলিয়া বার বার আমরা বিষম খাইতেছি। খাইবার সময় শ্বাসরোধ ও হিক্কাকে বিষম খাওয়া বলে।

(৩৩)

চাঁদমুখে বেণু দিয়া সব ধেনু-নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণু রব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজসুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র হৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে॥

শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘনশ্যাম ॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোক্ষুর রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরামদাস চলু সঙ্গে ॥

তরু, ১২০৮

(৩৪)

চঞ্চল বরিহাপীড় বান্ধল কুসুমে চূড়
নটবরশেখর গোপাল।
দৃঢ়বন্ধ পীত ধটী উজ্জ্বল কিঙ্কিণী কটি
শ্রুতিযুগে শোভে কর্ণিকার ॥
বৈজয়ন্তী মালা দোলে মণি আভরণ ধরে
অধর-সুধায় বেণু পূরে।
নব নব গোপসুত চৌদিগে আনন্দযুত
গায় গুণ, মাঝে যদুবরে ॥
যব-ধ্বজ-পদ্মাঙ্কিত সুললিত পদযুগ
ভূষণ-ভূষিত বৃন্দাবনে।
অমিত গোধন সঙ্গে বিবিধ কৌতুক রঙ্গে
পরবেশ কৈল নারায়ণে ॥
... ...
সুমধুর গোষ্ঠলীলা কৈলা দেবকীর বালা
ভাগবত আচার্য্য রচনা ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ভাগবত, ১০।২১।৫

টীকা :—পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ ও দেবকীনন্দন বলা হয়

নাই। শ্রীরূপ গোস্বামী বিশুদ্ধ মাধুর্য্যরস প্রচার করায় শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন মাত্র—দেবকীনন্দন নহেন। আর তিনি সব সময়েই দ্বিভুজ; কখনও চতুর্ভুজ নারায়ণ নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

(৩৫)

নন্দদুলাল বাছা যশোদাদুলাল।
এত ক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥
রতন-প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
একদিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ দু'খানি॥
নেতের আঁচলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা॥
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে।
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদনকমলে॥

তরু, ১২১০

টীকা:—একদিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ দু'খানি—ইহা স্নেহবশতঃ, ভক্তিভাবে নহে। গোষ্ঠে গোরু চরাইবার সময় কৃষ্ণের কোমল পায়ে কাঁটা বিঁধিয়াছে কি না, কিম্বা কোন চোট লাগিয়াছে কি না, পরীক্ষা করার জন্য।

(৩৬)

কোন্ বনে গিয়াছিলা ওরে রাম কানু।
আজি কেন চান্দমুখের শুনি নাই বেণু॥
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুখাঞাছে হিয়া॥
মলিন হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে।
না জানি ফিরিলা কোন গহন কাননে॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুকিল চরণে।
একদিঠি হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে॥

না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে।
এ দাস বলাই কেনে এ দুখ দেখ্যাছে॥

তরু, ১২১২

টীকা ঃ—ভুকিল—বিঁধিল।

(৩৭)

রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে বসাইয়া রাম
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে॥
ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মনসুখে
নিরখয়ে চাঁদমুখ পানে॥
গোপের রমণী যত চৌদিগে শত শত
মুখ হেরি লহু লহু বোলে॥
মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হুলাহুলি
আরতি করয়ে কুতূহলে॥
জ্বালিয়া রতন-বাতি করে সব আরতি
হরষিত যশোমতী মাই।
কহে বলরাম দাসে আনন্দ সাগরে ভাসে
দোঁহ রূপের বলিহারি যাই॥

তরু, ১২১৪

টীকা ঃ—লহু লহু—মৃদু মৃদু।
হুলাহুলি—উলু উলু ধ্বনি।

(৩৮)

নব নীরদ-নীল সুঠান তনু।
ঝলমল ও মুখচান্দ জনু॥

শিরে কুঞ্চিত কুন্তল-বন্ধ ঝুটা।
ভালে শোভিত গোময় চিত্র ফোঁটা॥
অধরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিম্বু জিনি।
গলে শোভিত মোতিম-হার-মণি॥
ভুজলম্বিত অঙ্গদ মণ্ডনয়া।
নখ-চন্দ্রক গর্ব্ব-বিখণ্ডনয়া॥
হিয়ে হার রুরু-নখ-রত্নজড়া।
কটি কিঙ্কিণি ঘাঁঘর তাহে মোড়া॥
পদ-নূপুর বঙ্করাজ সুশোভে।
থল-পঙ্কজ-বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে॥
ব্রজবালক মাখন লেই করে।
সভে খায়ত দেয়ত শ্যাম-করে॥
বিহরে নন্দ-নন্দন এ ভবনে।
পদসেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥

টীকা ঃ—ঝুটা—চূড়া। বিম্বু—বিম্বফল বা পাকা তেলাকুচা। মণ্ডনয়া—শোভার দ্বারা। বিখণ্ডনয়া—গর্ব্ব দূর করে। রুরু—একপ্রকার হরিণ।

চতুর্থ স্তবক

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা বিশেষ করেন নাই। আবার চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের কবিরা রাধার রূপ খুব কমই বর্ণনা করিয়াছেন—কেন না, তাঁহারা শ্রীরাধার সখীদের অনুগা হইয়া যুগলকিশোরকে উপাসনা করিয়াছেন।

(৩৯)

গোরারূপের কি দিব তুলনা।
তুলনা নহিল রে কষিত বাণ সোনা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপ চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল রূপে কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥
কুম্‌কুম্‌ জিনিয়া অঙ্গ গন্ধ মনোহরা।
কহে বাসু কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥

ভক্তিরত্নাকর, ৯৩৪ পৃঃ, তরু ১১৩৭

টীকা ঃ—কষিত বাণ—কষ্টি পাথরে যাচাই করা।
কেতকীর দল—কেয়াফুলের পাপড়ি।
গোরোচনা—উজ্জ্বল পীতবর্ণের দ্রব্যবিশেষ।

(৪০)

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূরপুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মন-লোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥

মল্লিকা মালতীমালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
হেন মনে অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীল-গিরি-শিখর ঘেরিয়া॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগু রঙ্গিয়া।
রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিল গো
জবা কুসুম তাহে দিয়া॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে॥

পদামৃতমাধুরী, ১৪৪৮ পৃঃ

টীকা :—ভালে সে··· শোভা—শ্রীকৃষ্ণের কপালে ময়ূরের পুচ্ছ দিয়া কে রমণীজনের মনোহরণকারী চূড়াটি উচ্চে বাঁধিয়া দিয়াছে? দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন শ্যামরূপ নবমেঘে ইন্দ্রধনু উঠিয়াছে।

মল্লিকা মালতী মালে···ঘেরিয়া—শুভ্র মল্লিকা ও মালতীর মালায় চূড়াটি ঘেরা রহিয়াছে দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন শ্যামের দেহরূপ নীলগিরির ময়ূরপুচ্ছরূপ চূড়া বেষ্টন করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। গঙ্গার শুভ্র জল মল্লিকা মালতীর শুভ্র কুসুমদামের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে।

কালার কপালে চাঁদ ইত্যাদি—শ্যামের কপালে চন্দন ও ফাগুর ফোঁটা দেখিয়া মনে হয়, যেন রূপার বেলপাতায় কেহ জবাফুল দিয়া যমুনাকে পূজা করিয়াছে। কালার অঙ্গে কে হিঙ্গুল গুলিয়া দিয়াছে; তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কেহ যমুনাকে রক্তকরবী দিয়া পূজা করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম বর্ণের সঙ্গে দুই জায়গাতেই যমুনার কালো জলের তুলনা করা হইয়াছে।

শিশুকাল হইতে তরুণ বয়স পর্য্যন্ত ২০।২৫ বৎসর ধরিয়া দেখিয়াছি যে, আমার মাতামহ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের নিকট হইতে কেহই তিন মাসের কমে এই গানটি শিখিতে পারেন নাই।

(৪১)

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতার খেচনি
বিজুরি চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা
মদন মুরুছা পায়॥
মরোঁ মরোঁ সই, ও রূপ নিছনি লৈয়া।
কি জানি কি খেনে কো বিহি গঢ়ল
কিরূপ মাধুরী দিয়া॥
ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ান নাচনি
চাহনি মদন বাণে।
তেরছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে
মরমে মরমে হানে॥
চন্দন তিলক আধ ঝাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে লোটায়্যা লোটায়্যা
কাতর পরাণ কান্দে॥
আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া ভালে সে ঝুরিয়া
মরে বলরাম দাস॥

কীর্ত্তনানন্দ, পৃঃ ৪২

টীকা :—খেচনি—খচিত, জড়োয়া দেওয়া।

ছি ছি কি অবলা—অবলা নারী তো সহজেই চপলপ্রকৃতির, তাহার কথা দূরে থাকুক, রূপ দেখিয়া স্বয়ং মদনও মূর্চ্ছিত হয়।

তেরছ বন্ধানে—বঙ্কিম কটাক্ষে।

(৪২)

বরণি না হয়ে রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘন পুঞ্জ কিয়ে কুবলয় দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া॥
বিকচ সরোজ ভাণ মুখ মণ্ডল দিঠি
ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরি হাস উগারই
পি পি আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর॥
অঙ্গদ বলয় হার মণি কুণ্ডল চরণ
নূপুর কটি কঙ্কিনি কলনা।
অভরণ বরণ কিরণ কিয়ে ঢর ঢর
কালিন্দীজলে যৈছে চান্দকি চলনা॥
কুঞ্চিত কেশ কুসুমাবলি তছু পর
শোভে শিখিচান্দকি ছান্দে।
অনন্ত দাস পহুঁ অপরূপ লাবণি
সকল যুবতি মন ফান্দে॥ পদামৃতসমুদ্র, ৩২ পৃঃ

টীকা:—বিকচ সরোজ ভাণ—প্রস্ফুটিত কমলের মতন ভাণ বা দীপ্তি যাহার।

মুখমণ্ডল দিঠি—বিকশিত কমলের সঙ্গে তুলনীয় শ্যামের মুখমণ্ডল।

ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর—তাঁহার চোখ দুইটি যেন নৃত্যপরায়ণ খঞ্জনযুগল।

পি পি—পান করিয়া করিয়া।

কালিন্দীজলে যৈছে চান্দকি চলনা—কৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ দেহের সঙ্গে কালিন্দীর কাল জলের এবং স্বর্ণ ও মণিবিভূষিত অলঙ্কারের সঙ্গে চন্দ্রের উপমা।

(৪৩)

কি মোহন নন্দকিশোর।
হেরইতে রূপ মদনমন ভোর॥

অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ-বিথার।
জলদপটল বরিখত রসধার॥
মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়।
বমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায়॥
গলে গজমোতিম মাল।
করিবরকর কিয়ে বাহু বিশাল॥
কুলবতি পরশ না পাই।
অনুখন চঞ্চল থির নহ তাই॥
শুনিতে বচন-সুধা খানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী॥

তরু, ২৪৫৬

টীকা ঃ—হেরইতে রূপ মদনমন ভোর—রূপ দেখিয়া মদনেরও মন ভুলিয়া যায়।

অঙ্গহি অঙ্গ—প্রতি অঙ্গ।

তরঙ্গ বিথার—রূপের তরঙ্গ যেন বিস্তৃত রহিয়াছে।

জলদপটল—মেঘসমূহ।

(৪৪)

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন-
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর-
নিন্দিত সুন্দর ভঙ্গ॥
প্রেম আকুল গোপ গোকুল
কুলজ কামিনী কন্ত।
কুসুম রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল
কুঞ্জ মন্দির সন্ত॥
গণ্ড মণ্ডল বলিত কুণ্ডল
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।

কেলি তাণ্ডব তাল-পণ্ডিত
বাহু-দণ্ডিত দণ্ড ॥
কঞ্জ-লোচন কলুষ মোচন
শ্রবণ-রোচন ভাষ।
অমল কোমল চরণ কিশলয়
নিলয় গোবিন্দদাস ॥

পদামৃতসমুদ্র, ১৩২ পৃঃ
তরু, ২৪১৯

টীকা ঃ—চন্দ চন্দন—চন্দ্র অর্থাৎ কর্পূরযুক্ত চন্দনের গন্ধকে নিন্দা করে, এমন অঙ্গ।

কম্বু—শঙ্খ। কন্ধর—গ্রীবা। কন্ত—কান্ত, দয়িত। মঞ্জু—সুন্দর। বঞ্জুল—বেতগাছ, কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের মতে অশোক।

সন্ত—সজ্জন, এখানে ভাল অর্থে। কঞ্জলোচন—পদ্মের মতন চক্ষু।

শ্রবণরোচন ভাষ—যাঁহার কথা শুনিতে খুব ভাল লাগে।

বাহু-দণ্ডিত দণ্ড—বাহু অর্গলকে দণ্ডিত বা ধিক্কৃত করিয়াছে।

নিলয় গোবিন্দদাস—সেই চরণই গোবিন্দদাসের আশ্রয়স্বরূপ।

(৪৫)

শ্যাম সুধাকর ভুবন মনোহর।
রঙ্গিণী-মোহন ভঙ্গি নটবর ॥
সজল জলদ তনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জিতল কত কোটি কুসুমধনু ॥
থল-কমলদল- অরুণ চরণতল।
নখমণি রঞ্জিত মঞ্জু মঞ্জীর-কল ॥
প্রেমভরে অন্তর গতি অতি মন্থর।
অধর মুরলি ধনি মনমথ-মন্তর ॥
অভিনব নাগর গুণ-মণি-সাগর।
গোবিন্দদাস-চিতে নিতি নিতি জাগর ॥ তরু, ২৪৩০

সজল জলদতনু ঘন রসময় জনু—তাঁহার দেহ জলপূর্ণ মেঘের মতন, দেখিয়া মনে হয়, যেন ঘন রসে পরিপূর্ণ।

রূপে জিতল—সৌন্দর্য্যের দ্বারা যেন কোটি কোটি মদনকে জয় করিল।

মঞ্জীর-কল—নূপুরের শব্দ।

মুরলিধ্বনি মনমথ-মন্তর—মুরলীর শব্দ যেন মন্মথের মন্ত্রস্বরূপ। এই মন্ত্র শুনিলেই লোকে বশ হয়।

(৪৬)

চিকণ কালা গলায় মালা
বাজন-নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥
কালিন্দীর কুলে কি পেখলুঁ সই
ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু যাইতে নারিলুঁ সই
আকুল করিল প্রাণ॥
চাঁদ ঝলমলি ময়ূর পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া মোহন বাঁশী
মধুর মধুর বায়॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা॥
শ্রবণে চঞ্চল মকর কুণ্ডল
পিন্ধন পিয়ল বাস।
রাঙা উতপল চরণ যুগল
নিছনি গোবিন্দদাস॥

তরু, ১৪৯

(৪৭)

ব্রজ-নন্দকি নন্দন নীলমণী। হরিচন্দন-তীলক ভালে বনী॥
শিখি-পুচ্ছকি বন্ধনি বামে টলী। ফুলদাম নেহারিতে কাম ঢলী॥
অতি কুঞ্চিত কুন্তল লম্বি চলী। মুখ নীল-সরোরুহ বেঢ়ি অলী॥
ভুজ-দণ্ডে বিখণ্ডিত হেম মণী। নব বারিদ বিদ্যুত থীর জনী॥
অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটী। কল-কিঙ্কিণি সংযুত পীত কটী॥
পদ নূপুর বাজত পঞ্চশরং। করবাদন নর্ত্তন গীতবরং॥
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চরসে। কিবা বেণু বেয়াপিত দীগ দশে॥
যোগি যোগ ভুলে মুনি ধ্যান টলে। ধায় কামিনি কাননে তেজি কুলে॥
গজ সর্প সঞে গিরিরাজ চলে। সুখরূপ-ভূ-বীরুধ পুষ্প ফলে॥
সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে। পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥

তরু, ১৩২৪

টীকা :—ভুজদণ্ডে বিখণ্ডিত—শ্রীকৃষ্ণের ভুজরূপ দণ্ডের কাছে স্বর্ণ ও মণি পরাজিত হইয়াছে।

নব বারিদ বিদ্যুত থীর জনী—তাঁহার সুনীল অঙ্গ ও পীত ধড়া দেখিয়া মনে হয়, যেন নূতন মেঘ ও স্থির বিদ্যুৎ।

গিরিরাজ—গোবর্দ্ধন (হিমালয় নহে)। ভূ-বীরুধ—ভূমি ও লতা।

পঞ্চম স্তবক

শ্রীরাধার রূপ

(৪৮)

রস-পরিপাটী নট কীর্ত্তন-লম্পট
কত কত রঙ্গী সঙ্গী সব সঙ্গে।
যাহার কটাক্ষে লখিমী লাখে লাখে
বিলসই বিলোল-অপাঙ্গে॥
শুনি বৃন্দাবন-গুণ রসে উনমত মন
দু বাহু তুলিয়া বলে হরি।
ফিরে নাচে নটরায় কত ধারা বসুধায়
দু নয়নে প্রেমের গাগরী॥
পুরুষ প্রকৃতিপর মদন-মনোহর
কেবল লাবণ্য-রসসীমা।
রসের সাগর গৌর বড়ই গভীর ধীর
না রাখিল নাগরী-গরিমা॥
ত্রিভুবন-সুন্দর উন্নত-কন্ধর
সুবলিত বাহু বিশালে।
কুঙ্কুম চন্দন মৃগমদ লেপন
কহে বাসু তছু পদ-তলে॥

ক্ষণদা, ২১।১

(৪৯)

চন্দ্র-বদনি ধনি মৃগনয়নী।
রূপে গুণে অনুপমা রমণি-মণী॥
মধুরিম হাসিনি কমল-বিকাশিনি
মোতিম-হারিণি কম্বু-কণ্ঠিনী।

থির সৌদামিনি গলিত কাঞ্চন জিনি
তনু-রুচি-ধারিণি পিক-বচনী ॥
উরজ-লম্বি-বেণি মেরুপর যেন ফণি
অভরণ বহু মণি গজ-গমনী।
বিণা-পরিবাদিনি চরণে নূপুর ধ্বনি
রতি-রসে পুলকিনি জগ-মোহিনী ॥
সিংহ জিনি মাঝ খিণি তাহে মণি-কিঙ্কিণি
ঝাঁপি ওড়নি তনু পদ অবনী।
বৃষভানু-নন্দিনি জগজন-বন্দিনি
দাস রঘুনাথ-পহুঁ মনহারিণী ॥ তরু, ২৪৬১

টীকা ঃ—ছয় গোস্বামীদের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী রঘুনাথ দাস গোস্বামী দানকেলিচিন্তামণি, মুক্তাচরিত ও স্তবাবলী সংস্কৃতে রচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরুতে তিনটি মাত্র পদ রঘুনাথদাস ভণিতায় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২৩৮৭ সংখ্যক পদ জয়দেব-বন্দনা, ২৮৬৯ সংখ্যক পদটি ব্রজভাষায় আরতির এবং উপরে উদ্ধৃত শ্রীরাধাবন্দনার পদ।

রমণি-মণী—ছন্দের অনুরোধে মণি স্থলে মণী বানান।

কমলবিকাশিনি—শ্রীরাধার হাসিতে যেন কমল ফুটিয়া উঠে।

মোতিম-হারিণি—যাঁহার গলায় মোতির হার।

উরজলম্বি বেণি—তাঁহার বেণী বুকের উপর পড়িয়াছে। মনে হইতেছে, যেন কুচরূপ মেরুর উপর সাপ রহিয়াছে।

ঝাঁপি ওড়নি তনু পদ অবনী—ওড়নাতে দেহ ও পা ভূমি পর্য্যন্ত আবৃত। আজকালও ব্রজমায়ীরা ঐরূপ ওড়না পরেন।

(৫০)

কষিল কনয়া কমল কিয়ে।
থীর বিজুরি নিছনি দিয়ে ॥
কিয়ে সে সোণ চম্পক ফূল।
রাই-বরণে জলদ-তূল ॥

তাহি কিরণ ঝলকে ছটা।
বদনে শরদ-বিধুর ঘটা॥
চাঁচর চিকুর সিঁথায়ে মণি।
দশন কুন্দ-কলিকা জিনি॥
অরুণ অধর বচন মধু।
অমিয়া উগারে বিমল বিধু॥
চিবুকে শোভয়ে কস্তুরি-বিন্দু।
কনক-কমলে বালক ভৃঙ্গ॥
গলায়ে মুকুতা দোস্থতি ঝুরি।
সুরধুনী বেড়ি কনক-গিরি॥
শঙ্খ ঝলমলি দু বাহু দোলা।
কিয়ে সরু সরু শশীর কলা॥
কর কোকনদ নখর মণি।
অঙ্গুলে মুদরি মুকুর জিনি॥
খিন মাঝখানি ভাঙ্গিয়া পড়ে।
বান্ধল কিঙ্কিণি নিতম্ব-ভরে॥
রাম-রম্ভা উরু চরণ-শোভা।
কি হয়ে অরুণ-কিরণ-আভা॥
নখর-মুকুর অঙ্গুলাবলি।
জনু সারি সারি চম্পক-কলি॥
নীল ওঢ়নি ঢাকিল তনু।
সব বিধু রাহু ঝাঁপিল জনু॥
অলপে অলপে তেয়াগে তায়।
যদুনাথ চিতে ঐছন ভায়॥ তরু, ২৪৭০

টীকা :—কষিল—কষ্টিপাথরে যাঁচিয়া লওয়া সোনা।

সোণ—স্বর্ণবর্ণের।

রাইবরণে জলদ-তূল—সোনার মতন রংয়ের চাঁপা ফুল রাধার গায়ের রংয়ের তুলনায় যেন মেঘের মতন কাল বলিয়া মনে হয়।

চিবুকে শোভয়ে—চিবুকের কস্তুরির টিপ দেখিয়া মনে হয়, যেন সোনার কমলে ছোট্ট একটি ভৃঙ্গ বসিয়াছে।

গলায় মুকুতা দোস্থতি ঝুরি—মুকুতা দিয়া নির্ম্মিত দুই-ফেরতা লম্বা হারের মতন অলঙ্কার। কুচযুগের উপর উহা শোভা পাইতেছে, যেন সোনার পাহাড় ঘিরিয়া গঙ্গা রহিয়াছে।

মুদরি—রত্নাঙ্গুরীয়।

অলপে অলপে তেয়াগে তায়—নীল ওড়নায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ; যেন রাহু সকল বিধুকেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ওড়না একটু একটু সরাইয়া রাধা দেখিতেছেন, তাই কবি বলিতেছেন যে, রাহু যেন আস্তে আস্তে চন্দ্রকে গ্রাসমুক্ত করিতেছে।

(৫১)

ধনি কনক-কেশর-কাঁতি।
বনি বদন-বিধুক ভাঁতি॥
জিনি নীল-নলিন বাস।
কিয়ে অমিয়া-মধুর ভাষ॥
তাহে চিকুরে কবরি-ভার।
হিয়ে লম্বিত মাণিক হার॥
কুচ কনক-দাড়িম শোহ।
মন-মোহন-মন মোহ॥
ভুজ হেম-মৃণাল জিনি।
তাহে নীল বলয়া মণি॥
নখ শরদ-পূর্ণিমা-চাঁদ।
তনু হেরি অরুণ কান্দ॥
কটি কেশরি জিনি খীণ।
তিন রেখ ত্রিবলি ভীন॥
স্থল-পঙ্কজ পদ-তল।
মণি-মঞ্জির ঝলমল॥

হেরি তাহে অনন্তদাস।
কর সেবন অভিলাষ॥

তরু, ২৪৬৯

(৫২)

শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-মণ্ডন-খণ্ডন বদন-বিকাশ।
অধরে মিলায়ত শ্যাম-মনোহর-চীত-চোরায়নি হাস॥
আজু নব শ্যাম-বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু-যূথ-শত-সেবিত লাবণি বরণি না যাই॥
কবরি-বকুল-ফুলে আকুল অলিকুল মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ-ঝঙ্কৃতি কিঙ্কিণি রণরণি বোল॥
পদ-পঙ্কজপর মণিময় নূপুর রণঝণ খঞ্জন-ভাষ।
মদন-মুকুর জনু নখ-মণি দরপণ নীছনি গোবিন্দদাস॥ তরু, ২৪৬৩

টীকা :—শরৎকালের চন্দ্রসমূহের শোভাকে পরাজিত করে, রাধার এমন মুখের সৌন্দর্য্য। আর তাঁহার অধরে যে স্মিত হাস্য, যাহা একটু প্রকাশ পাইয়াই মিলাইয়া যাইতেছে, তাহা শ্যামের চিত্তকে হরণ করিতে পারে।

তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গে (তনু তনু) যেন কামদেবেরা শত শত দল বাঁধিয়া সেবা করিতেছে।

(৫৩)

জয়তি জয় বৃষ- ভানু-নন্দিনি
শ্যাম-মোহিনি রাধিকে।
কনয়-শতবান- কান্তি-কলেবর-
কিরণ-জিত-কমলাধিকে॥
ভঙ্গি সহজই বিজুরি কত জিনি
কাম কত শত মোহিতে।
জিনিয়া ফণি বনি বেণি লম্বিত
কবরি মালতি-শোহিতে॥

খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন-অঞ্জন
বদন কত ইন্দু নিন্দিতে।
মন্দ আধ হাসি কুন্দ পরকাশি
বিজুরি কত শত ঝলকিতে॥
রতন-মন্দির মাঝে সুন্দরি
বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
দাস গোবিন্দ প্রেম মাগয়ে
সেই চরণ সমাধিয়া॥

তরু, ২৪৬৬

টীকা ঃ—কনয় শতবান-কান্তি-কলেবর ইত্যাদি—শ্রীরাধার দেহের লাবণ্য শতবার বিশোধিত স্বর্ণের কান্তিকে পরাজিত করিয়াছে। উহা কমলার শোভার চেয়েও অধিক।

সমাধিয়া—ধ্যানমগ্ন হইয়া।

ষষ্ঠ স্তবক

রূপানুরাগ

(৫৪)

গোরাচাঁদ, কিবা তোমার বদন-মণ্ডল
কনক কমল কিয়ে শরদ পূর্ণিমা শশী
নিশি দিশি করে ঝলমল ॥
তোমার বরণখানি জনু হরিতাল জিনি
কিয়ে থির বিজুরী জিনিয়া।
কিয়ে নব গোরোচনা কিয়ে দশবাণ সোনা
মনমথ-মন-মোহনিয়া ॥
খগপতি জিনি নাসা অমিয়া-মধুর ভাষা
তুলনা না হয় ত্রিভুবনে।
আকর্ণ নয়ন বাণ ভুরু-ধনু-সন্ধান
কটাক্ষ হানয়ে নারীমনে ॥
আজানু লম্বিত ভুজ বিলেপিত মলয়জ
অঙ্গুরী বলয়া তাহে সাজে।
সিংহ জিনি মধ্য সরু হেমরম্ভা জিনি উরু
চরণে নূপুর বঙ্ক রাজে ॥
জিনি ময়মত্ত হাতী হংসরাজ জিনি গতি
দেখিয়া এহেন রূপরাশি।
কহয়ে গোবিন্দ ঘোষ মোর মনে সন্তোষ
নিছনি যাইয়ে হেন বাসি ॥

তরু, ১০২৯

টীকা :—শ্রীগৌরাঙ্গের গায়ের রংয়ের উপমা দিতে যাইয়া কবির মনে সোনার কমল, শারদ পূর্ণিমার চন্দ্র, হরিতাল, স্থির বিদ্যুৎ, নব গোরোচনা, ও দশ বার পোড়াইয়া বিশুদ্ধ-করা সোনার কথা মনে হইল। কিন্তু এ সব

কিছুই তাঁহার রংয়ের কাছে লাগে না। তিনি যে মন্মথেরও মনকে মোহিত করেন।

খগপতি—গরুড়।

মলয়জ—চন্দন।

হেমরম্ভা—সোনার কলার গাছ।

ময়মত্ত—মদমত্ত।

(৫৫)

তরুমূলে মেঘ-বরণিয়া কে ?
ও রূপ দেখিঞা কোন কলাবতী
ধরিব আপন দে॥
যমুনার তটে নীপ নিকটে
নিশি দিশি তার থানা।
গোকুল নগরে কুলের কামিনী
আসিতে যাইতে মানা॥
ক্ষেণে বাজায় বাঁশী ক্ষেণে মধুর হাসি
ক্ষেণে ত্রিভঙ্গিম হয়।
নয়নের কোণে মরম সন্ধানে
চাহিঞা পরাণ লয়॥
নবীন কিশোর নব জলধর
রূপে গুণে নাহি ওর।
নাম নাহি জানি মনে অনুমানি
নরহরি-চিত-চোর॥ সংকীর্ত্তনামৃত, ২২৬

টীকা :—মেঘবরণিয়া—মেঘের মত বর্ণ যাহার।

থানা—স্থান।

আসিতে যাইতে মানা—কৃষ্ণকে দেখিলেই কুলবতীরা মোহিত হইয়া যাইবেন ভয়ে তাঁহাদের গুরুজনেরা ঐ পথে তাঁহাদিগকে যাইতে নিষেধ করেন।

নরহরি-চিত-চোর—কবি শ্রীরাধিকার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ভাবিয়া বলিতেছেন, সে নরহরির মনকে চুরি করিয়াছে, ইহাই শুধু জানি।

(৫৬)

আজু যমুনা গিছিলাম সজনি
শ্যামেরে দেখিঞাছি।
সভে দুটি আঁখি দিঞাছে বিধাতা
রূপ নিরখিব কি ॥ ১ ॥
পহিলে মোর মনে নব জলধর
নামিঞাছে তরুমূলে।
দেখিতে দেখিতে হেদে আচম্বিতে
দু আঁখি ভরিল জলে ॥ ২ ॥
ইন্দ্রধনু জিনি চূড়ার টালনি
উড়িছে ভ্রমরাজাল।
আঁখি পালটিঞা না পাল্যাম দেখিতে
ঘোঞটা হইল কাল ॥ ৩ ॥
অঙ্গের সৌরভে নাসিকা মাতল
আভরণ কেবা চিনে।
ঝলমল বই অন্য নাহি সই
সদাই পড়িছে মনে ॥ ৪ ॥
নাহি পরিচয় বংশী সব কয়
এ ত বড় পরমাদ।
ও রাঙ্গা চরণের নূপুর শুনিতে
লোচন দাসের সাধ ॥ ৫ ॥ সংকীর্ত্তনামৃত, ২২৫

টীকা :—১। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দুইটি মাত্র চোখ দিয়া দেখা যায় না—তাই বিদ্যাপতি বলিয়াছেন, সুরপতির নিকট সহস্র লোচন মাগিব—যাহাতে প্রাণ ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিতে পারি।

২। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার প্রথমে মনে হইল, বুঝি গাছের তলায় মেঘ নামিয়াছে, আর সেই মেঘের বর্ষণও হইল রাধার দুই চোখে।—রূপ দেখিয়া আনন্দে তাঁহার চক্ষু সজল হইল।

৩। সে কালে ঘোমটায় মুখ ঢাকা থাকিত, তাই রাধা ফের ভাল করিয়া কৃষ্ণরূপ দেখিতে পারিলেন না।

(৫৭)

মলুঁ মলুঁ শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর মুরতি নব কৈশোর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥
জীতে পাশরিতে নারি বল না কি বুদ্ধি করি
কি শেল রহল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
অন্তর জ্বলয়ে ধিকে ধিকে॥
চরণে চরণ থুঞা অধরে মুরলী লৈয়া
দাঁড়াইয়া তেরছ নয়ানে।
অঙ্গুলি লোলাইয়া শ্যাম কি জানি কি দেখাইল
সে কথা পড়য়ে সদা মনে॥
কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী দিবানিশি নাহি জানি
গোপতে গুমরি মরি মরি॥ তরু, ৭৮৬

টীকা:—জীতে পাশরিতে নারি—যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন ভুলিতে পারিব না।

লোলাইয়া—চঞ্চল করিয়া, হেলাইয়া।

পরতীত—প্রতীত, বিশ্বাস করে।

তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি—এক তিল কালের মধ্যে যেন প্রাণ তিন স্থানে রাখিয়া দিই—অর্থাৎ প্রাণ যেন ছাড়িয়া যায়।

(৫৮)

যত রূপ তত বেশ ভাবিতে পাজর শেষ
পাপ চিতে নিবারিতে নারি।
কিয়ে যশ অপযশ নাহি ভায় গৃহবাস
তিল আধ পাসরিতে নারি॥
মাথায় করি কুল-ডালা ঘুচাব কুলের জ্বালা
তবহুঁ পুরাব মন সাধে।
প্রসন্ন হইবে বিধি সাধিব মনের সিদ্ধি
যবে হবে কানুপরিবাদে॥
কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজ পতি
সে যদি নয়ানের কোণে চায়।
স্বরূপ দঢ়াইলুঁ মন জাতি যৌবন ধন
নিছিয়া ফেলিব শ্যাম-পায়॥
মনে ত করিয়ে সাধ যদি হয় পরিবাদ
যৌবন সফল করি মানি।
জ্ঞানদাসেতে কয় এমতি যাহার হয়
ত্রিভুবন তাহার নিছনি॥

তরু, ২৯৩

টীকা ঃ—শ্রীকৃষ্ণের যেমন অপূর্ব্ব রূপ, তেমনি সুন্দর বেশ। সেই রূপ ও বেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে বুকের পাশের হাড় যেন ক্ষয় হইয়া গেল। আমার এই পাপ চিত্তকে নিবারণ করিতে পারি না। গৃহের বাস আর মনে ভাল লাগে না। যশ, অপযশ, যাহাই হউক, তাহাকে একটু অল্প সময়ের জন্যও ভুলিতে পারি না।

কানুপরিবাদে—কানুর কথা লইয়া কলঙ্ক।

(৫৯)

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব ॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহু পিরিতের সার ॥
গুরুগরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যামপরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
ঘরের যতেক সভে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি ॥

তরু, ৭৪৮

টীকা :—ঝুরে—অশ্রু বর্ষিত হয়।

লহু লহু—লঘু লঘু, মন্দ মন্দ।

লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি—অনুরাগে লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিলাম। কেন না, আমার এই ভালবাসাকে গোপন রাখিতে পারি না।

(৬০)

কি রূপ দেখিনু সই নাগর-শেখর।
আঁখি ঝরে মন কাঁদে নয়ান ফাঁপর ॥
কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি শ্যামরূপখানি ॥
সহজে মূরতিখানি বড়ই মাধুরি।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুরি ॥

আর বা তাহে কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধি ॥
দেখিতে সে চাঁদমুখ জগমন হরে।
আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে॥
কালার কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তেঞি সদা প্রাণ কাঁদে॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের সংগ্রহ,
মাধুরী ১।১৭৭

(৬১)

কপালে চন্দন চাঁদ নাগরি মোহন ফান্দ
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে জাতি কুল নাহি রাখে
মো পুনি ঠেকিনু ও না ফান্দে॥
সই, কি আর কি আর বোল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া ও রূপ নিছনি লৈয়া
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥
দেখিয়া ও মুখ ছান্দ কান্দে পুনমিক চান্দ
লাজঘরে ভেজিয়া আগুনি।
নয়ন কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি॥
আই আই মলুঁ মলুঁ কি রূপ দেখিয়া আইলুঁ
কালা অঙ্গে পড়িছে বিজুরি।
সে রূপ দঢ়াইলু মনে এ রূপ যৌবন সনে
আপনা সাজাইঞা দিলুঁ ডালি॥
কি খনে দেখিলুঁ তারে না জানি কি কৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।

বলরাম দাসে কয় ও রূপ দেখিয়া কোন বা
পামরী রহে ঘরে ॥

পদামৃতসমুদ্র, ৭৮ পৃঃ

টীকা ঃ—চন্দন চাঁদ—চন্দন দিয়া চাঁদ আঁকা।

(৬২)

সই রে, বলি—কি আর কুল ধরমে।
দীঘল নয়ানের বাণ হানিল মরমে ॥
সই রে, বলি—না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাইতে দেখোঁ বাঁশিয়ার বয়ান ॥
সই রে, বলি—তার কি থির সন্ধান।
তাকিয়া মেরাছে বাণ যেখানে পরাণ ॥
সই রে, বলি—কি রূপ দেখিলুঁ।
দেখিয়া মোহন রূপ আপনা নিছিলুঁ ॥
সই রে, বলি—কি রূপ সাজনি।
যাচিয়া যৌবন দিব শ্যামরূপের নিছনি॥
সই রে, বলি—মনে মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে ॥

পদামৃতসমুদ্র, ৭৯ পৃঃ

পদটি শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ "গীতপদ্যকারক" গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা বলিয়া মনে হয়।

তাকিয়া—তাক করিয়া, লক্ষ্য করিয়া।

(৬৩)

যে দিগে পসারি আঁখি দেখি শ্যামময়।
কুলবতী বরত ধৈরজ নাহি রয় ॥
কত না যতনে যদি মুদি দুটি আঁখি।
নবীন ত্রিভঙ্গ রূপ হিয়া মাঝে দেখি ॥

কি হৈল অন্তরে সই কি হৈল অন্তরে।
আজি হৈতে সখি মোর সাধ নাহি ঘরে॥
নিরবধি শ্যাম নাম জপিছে রসনা।
এত দিনে অযতনে পূরিল বাসনা॥
প্রাণের অধিক কানু জানিলু নিশ্চয়।
গোবিন্দ দাসেতে কয় দড়াইলে হয়॥

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, ৩৩ পৃঃ

এটিও সম্ভবত গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা।

(৬৪)

নব জলধর তনু থীর বিজুরি জনু
পীত বসন বনি তায়।
চূড়া শিখি-দল বেড়িয়া মালতী মাল
সৌরভে মধুকর ধায়॥
শ্যামরূপ জাগয়ে মরমে।
পাসরিব মনে করি যতনে ভুলিতে নারি
ঘুচাইল কুলের ধরমে॥
কিবা সেই মুখ-শশী উগারে অমিয়া রাশি
আঁখি মোর মজিল তাহায়।
গুরুজন ভয়ে যদি ধৈরজ ধরিতে চাহি
দ্বিগুণ আগুন উপজায়॥
এ তিন ভুবনে যত রস-সুধানিধি কত
শ্যাম আগে নিছিয়া পেলিয়ে।
এ দাস অনন্তে কয় হেন রূপ রসময়
না দেখিলে পরাণ না জীয়ে॥

তরু, ৭৭৮

টীকা :—শ্যামের দেহ নবীন মেঘের মতন; আর তাঁহার পীতবাস যেন স্থির বিদ্যুৎ।

উপজায়—জন্মে।
নিছিয়া পেলিয়ে—নির্মঞ্ছন করিয়া ফেলি।

(৬৫)

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো
কে না (১)কুন্দিল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাথী॥ ১॥
রতন (২)কাটিয়া কত যতন করিয়া গো
কে না (৩)গড়াইয়া দিল কানে।
মনের সহিত মোর, এ পাঁচ পরাণী গো
যোগী (৪) হৈল উহার ধেয়ানে॥ ২॥
(৫)নাসিকা উপরে শোভে এ গজমুকুতা গো
সোনায় (৬)বান্ধিল তার পাশে।
বিজুরি জড়িত কিবা চান্দের কলিকা গো
মেঘের আড়ালে (৭) রহি হাসে॥ ৩॥
সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো
তাহে শোভে অলকার ভাঁতি।
হিয়ার (৮) ভিতরে মোর ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি॥ ৪॥
মদন ফাঁদ ও না চূড়ার টালনি গো
উহা না (৯) শিখিয়াছে কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুই সে না বোল খানি গো
হাতের উপরে লাগ পাঙ।
তেমন করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গাইয়া ভাঙ্গাইয়া তাহা খাঙ॥ ৫॥
(১০) করিবর-কর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে।

যৌবন-বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
(১১) তাহার পরশ রস মাগে ॥ ৬ ॥
(১২) ঠমকি ঠমকি যায় তেরছ নয়নে চায়,
যেন মত্ত গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস দাসে কয় ও রূপ লখিল নয়
রূপসিন্ধু গড়িল বিধাতা ॥ ৭ ॥

অনুরাগবল্লীতে সপ্তম কলি নাই। পদকল্পতরুতে ১, ২, ৫ ৩, ৬, ৭—এইরূপ ভাবে সজ্জিত আছে।

১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত অনুরাগবল্লী, পৃঃ ৩২।
ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৪৮২। তরু ৭৯০

পাঠান্তর :—
(১) কুন্দিলে—তরু।
(২) রতন কাড়িয়া অতি—তরু।
(৩) গড়িয়া—অনুরাগবল্লী, তরু।
(৪) যোগী হবে। তরুতে দ্বিতীয় কলির পরে আছে—
অমিয়া মধুর বোল সুধা খানি খানি গো
হাতের উপর নাহি পাঙ।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাঙ ॥
(৫) নাসিকার আগে দোলে—তরু।
(৬) জড়িত।
(৭) থাকি। চতুর্থ কলিটি তরুতে নাই।
(৮) মাঝারে—ভক্তিরত্নাকর।
(৯) শিখিয়া আইল কোথা—তরু।
(১০) করভের কর জিনি—তরু।
(১১) উহারি।
(১২) নাটুয়া ঠমকে যায়—তরু।

টীকা :—কুন্দারে—কাঠ কুন্দিয়া যে মিস্ত্রী কাজ করে।

বিজুরি জড়িত ইত্যাদি—সোনা বাঁধানো গজমুক্তাকে বিদ্যুৎমণ্ডিত চাঁদের কলিকার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, আর কৃষ্ণের রং মেঘের মতন বলিয়া উহাকে 'মেঘের আড়ালে থাকি হাসে' বলা হইয়াছে।

বাহিরের সৌন্দর্য্য অন্তরে কি প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করে, পদটিতে তাহা সুন্দররূপে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। ইহার শ্রেষ্ঠ কলি হইতেছে—

যৌবন-বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে।

(৬৬)

নীল রতন কিয়ে নবঘন ঘটা।
লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা॥
কদম্বের তলে সেই শ্যাম চিকণিয়া।
রূপ দেখি আইনু জাতি-কুল মজাইয়া॥
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা।
মদন মহেন্দ্র ধনু কিবা দিল দেখা॥
বদন-কমল কিয়ে পূনমিক চাঁদ।
অধর বাঁধুলি কিয়ে কিশলয় ছাঁদ॥
তাহে অতি সুমধুর মুরলী গানে।
ভুলল আঁখির লাজ সান্তাইল কানে॥
নয়ান যুগল কিয়ে মত্ত অলিরাজ।
অলখিতে দংশয়ে যুবতী হিয়া-মাঝ॥
গোবিন্দ দাস কহে সে না দিঠি বিষে।
না পীলে অধরসুধা কেবা জীয়ে আশে॥

পদামৃতসমুদ্র, ৩৮ পৃঃ

টীকা :—রূপ দেখিয়া প্রশ্ন জাগে, এ কি নীল রতন, না নবীন মেঘের সমাবেশ। সে অঙ্গের ছটা দেখিবার চেষ্টা করিলেও ভাল করিয়া দেখা যায় না।

সান্তাইল কানে—কানে প্রবেশ করিল।

মদন মহেন্দ্র ধনু—ইহা কি ইন্দ্রধনু, না মদনের ধনু? অথবা মদন শব্দকে বিশেষণ করিয়া মনোহর ইন্দ্রধনু।

দিঠি বিষে—সেই দৃষ্টির বিষ।

না পীলে অধরসুধা ইত্যাদি—সেই অধরসুধা পান না করিলে কেহই এই দংশনের বিষ হইতে বাঁচিবার আশা করিতে পারে না।

(৬৭)

এ সখি এ সখি কর অবধান।
পুন কি অনঙ্গ অঙ্গ ভেল নিরমাণ॥
অলকা-আবৃত মুখ মুরলি-সুতান।
রমণি-মোহন চূড়া আনহি বন্ধান।
সুন্দর নাসিকা পুট ভাঙ কামান।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত বরিখয়ে বাণ॥
অধর সুরঙ্গ ফুল বান্ধুলি সমান।
হাসিতে হরয়ে মন পরশে পরাণ॥
তিলেকে হরয়ে কুল-কামিনি মান।
রায় বসন্ত ইছে নিছিতে পরাণ॥

তরু, ২৪৫৩

পুন কি অনঙ্গ অঙ্গ—মহাদেবের কোপে মদন তো অনঙ্গ হইয়াছিল, সে কি আবার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিল?

ভাঙ—ভ্রূ, কামান অর্থাৎ ধনুকের তুল্য।

অপাঙ্গ—কটাক্ষ।

বরিখয়ে বাণ—কটাক্ষরূপ বাণ বর্ষণ করিতেছে।

সুরঙ্গ—সুন্দর লাল রং।

নিছিতে—উৎসর্গ করিতে।

ইছে—ইচ্ছা করে।

(৬৮)

সজনী, কি হেরিলুঁ ও মুখ শোভা।
অতুল কমল সৌরভ শীতল
তরুণী-নয়ন-অলি-লোভা ॥
প্রফুল্লিত ইন্দী- বর-বর সুন্দর
মুকুর-কান্তি মনমোহা।
রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত
কিয়ে নিরমল ছবি-শোহা ॥
বরিহা-বকুলফুল অলিকুল আকুল
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ।
অধর বান্ধুলী ফুল শ্রুতি মণি-কুণ্ডল
প্রিয় অবতংস বনান ॥
হাসিখানি তাহে ভায় অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কিবা গায় শুনি আন নাহি ভায়
জাতি কুল শীল দিলুঁ তায় ॥
না দেখিলে প্রাণ কান্দে দেখিলে না হিয়া বান্ধে
অনুখন মদন-তরঙ্গ।
হেরইতে চাঁদমুখ মরমে পরম সুখ
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ ॥
চরণে নূপুর-মণি সুমধুর ধ্বনি শুনি
রমণিক ধৈরজ ভঙ্গ।
ও রূপ সাগরে রস- হিলোলে নয়ন মন
আটকিল রায় বসন্ত ॥

তরু, ২৪৫২

টীকা :—অতুল কমল ইত্যাদি—মুখের শোভা অনুপম কমলের মত, সেই কমল যেমন সুগন্ধি, তেমনি শীতল ; তাহাতে তরুণীদের নয়নরূপ ভ্রমর লুব্ধ হইয়াছে।

ইন্দীবরবর—শ্রেষ্ঠ কমল।

মুকুর কান্তি—এমন কান্তি বা লাবণ্য যে, তাহাতে যেন মুখ দেখা যায়।

মনমোহা—মনকে মুগ্ধ করে।

থকিত—স্থগিত।

ছবি-শোহা—ছবির মতন শোভা।

বরিহা—বর্হ, ময়ূরপুচ্ছ।

অবতংস—কানের অলঙ্কার।

আটকিল—আটকা পড়িল।

রবীন্দ্রনাথ এই পদটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"শ্যামকে দেখিবামাত্র যেন বন্যার মত এক সৌন্দর্য্যের স্রোত রাধার মনে আসিয়া পড়িয়াছে; রাধার হৃদয়ে সহসা যেন একটা সৌন্দর্য্যের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—একেবারে সহসা অভিভূত হইয়া রাধা বলিয়া উঠিয়াছে—'সজনি কি হেরনু ও মুখশোভা'। আমরা রাধার সেই সহসা উচ্ছ্বসিত ভাব প্রথম ছত্রেই অনুভব করিতে পারিলাম। শ্যামকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রথম মনের ভাব মোহ। প্রথম ছত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার সমস্তটা আপ্লুত করিয়া একটা সৌন্দর্য্যের ভাবমাত্র বিরাজ করিতেছে। রাধা মাঝে মাঝে রূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মনঃপূত না হওয়ায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন—

'রূপ বরণিব কত, ভাবিতে থকিত চিত।'"

সপ্তম স্তবক

পূর্ব্বরাগ

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

উজ্জ্বনীলমণি

দর্শন শ্রবণ আদি সঙ্গমের পূর্ব্বে।
দোঁহার রতি পূর্ব্বরাগ কহে কবি সর্ব্বে॥

উজ্জ্বলচন্দ্রিকা

পূর্ব্বরাগের সঞ্চারি ভাব

ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, সঞ্চারি হয় তার।
শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য আর॥
চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধন, করয়ে বিষাদ।
মোহ, মৃত্যু আদি করি জড়তা উন্মাদ॥

উজ্জ্বলচন্দ্রিকা

পূর্ব্বরাগের দশ দশা

লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, তানব (রোগা হইয়া যাওয়া), জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদন, মোহ ও মৃত্যু।

(৬৯)

অলকা তিলক চান্দ-মুখের পরিপাটী।
রসে ডুবু ডুবু করে রাঙ্গা আঁখি দুটি॥
অধরে ঈষৎ হাসি মধুর কথা কয়।
গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণ কোথা রয়॥
হিয়ার দোলনে দোলে রঙ্গন ফুলের মালা।
কত রসলীলা জানে কত রসকলা॥
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ বিনোদিয়া কোঁচা।
চাঁচর চিকুরে শোভে গন্ধরাজ চাঁপা॥

দেবকীনন্দনে বোলে শুন লো আজুলি।
তুমি কি না জান গোরা নাগর বনমালী॥

ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৯০৭

টীকা :—আজুলি—সরলা।

(৭০)

ধরণী শয়নে ঝরয়ে নয়নে
সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ।
চম্পক বরণ তাপে মলিন
হৃদয় দহ অনঙ্গ॥
(হরি হরি) করুণা কি নহ তুয়া ঠাই।
তোহারি কটাখ- শরে জর জর
অতি ক্ষীণ-তনু রাই॥
এ দিন যামিনী জাগিয়া কামিনী
জপিয়া তোহারি নাম।
না জানিয়ে কিয়ে বেয়াধি হইল
শ্বাস বহে অবিরাম॥
সব সখীগণ করয়ে রোদন
কারণ কিছু না জানি।
গৌরীদাস বিধি রচে মহোষধি
দেবের আবেশ মানি॥

তরু, ১৬১

(৭১)

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী।
পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি॥
শাওন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বাস।

শ্যাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন ॥
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন যাচিয়া বিকাই ॥
চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিলুঁ সেহ নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দু নয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী
কত রঙ্গ ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায় ॥ তরু, ১৪৫

টীকা ঃ—দে—দেয়া, মেঘ।

শ্রাবণ মাসের মেঘলা দিন, রিমিঝিমি করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে ; এই পরিবেশ স্বপ্নের কল্পলোক সৃষ্টির উপযোগী।

নিন্দে—নিদ্রায়।

বলে কিন যাচিয়া বিকাই—বলিল, আমাকে কিনিয়া লও, আমি সাধিয়া নিজেকে বেচিয়া দিতেছি।

সতি—সত্য।

লোর—অশ্রুধারা।

পরতীতি—প্রতীতি, বিশ্বাস।

চিয়াইল—চেতন করাইল, জাগাইল।

(৭২)

মন-চোরার বাঁশি বাজিও ধীরে ধীরে।
আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে ॥

আমরা কুলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই
না বাজিও খলের বদনে।
আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক
না বধিও অবলার প্রাণে ॥
যেবা ছিল কুলাচার সে গেল যমুনার পার
কেবল তোমার এই ডাকে।
যে আছে নিলাজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান
পথে যাইতে থাকে বা না থাকে ॥
তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর
ঠেকিয়াছি গোঙারের হাতে।
কানাই খুঁটিয়া কয় মোর মনে হেন লয়
বাঁশী হৈল অবলা বধিতে ॥

পদরসসার হইতে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্তৃক
অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে (৪৩৪) ধৃত।

টীকা ঃ—তরলে জনম তোর—তরল বাঁশ বা তল্লা বাঁশ নামে ভেতরে ফাঁপা একরকম সরু বাঁশ।

(৭৩)

কিবা সে মোহন বেশ ভুলাইল সব দেশ
না রহে সতীর সতীপনা।
ভরমে দেখিলে তারে জনম ভরিয়া গো
ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা ॥
সই হাম কি করিলুঁ কেন বাসে বাঢ়াইলুঁ
কি শেল হানিল জানি বুকে।
জাতি কুল শীল সই বজর পড়িল গো
কালোরূপ দেখি চোখে চোখে ॥
কিবা সে নয়ান বাণ হিয়ায় হানিল গো
গরল ভরিয়া রৈল বুকে।

কোন বা পামরী নারী আপনা রাখয়ে গো
আগুন জ্বালিয়া দি তার মুখে ॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ দূরে গেল গো
হিয়া ডহ ডহ মন ঝুরে।
উড়ু উড়ু আনছান ধক ধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে ॥
রসের মূরতি সে দেখিলে না রহে দে
বাতাসে পাষাণ হয় পানী।
বলরাম দাসে বোলে সে অঙ্গ পরশ হৈলে
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি ॥ তরু, ৭৯৩

(৭৪)

দেইখা আইলাম তারে সই দেইখা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥
বান্ধ্যাছে বিনোদ চূড়া নবগুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥
গৃহকর্ম্ম করিতে আউলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের নেহ ॥

লহরী, ২০৪ পৃঃ

টীকা ঃ—নেহ—স্নেহ, প্রেম।

(৭৫)

তুমি কি জান সই কাহুর পিরিতি তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি এ জাতি জীবন তাহারে সঁপিয়াছি ॥

প্রাণ সই, কি আর কুল বিচারে।
প্রাণ বন্ধুয়া বিনে তিলেক না জীউ কি মোর সোদর পরে॥
সে রূপ-সাগরে নয়ান ডুবিল সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবিল মন আনিব কি আর দিয়া॥
খাইতে খাইয়ে শুইতে শুইয়ে আছিতে আছিয়ে পুরে।
জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে আগুন ভেজাই ঘরে॥

পদামৃতসমুদ্র, ২৪৯ পৃঃ

(৭৬)

কি ঘর বাহিরে লোকে বলে দিবা রাতি।
জীতে পাসরিতে নারি বন্ধুর পিরিতি॥
(অন্তরে বাহিরে চিতে অবিরত জাগে।
না জানি কি জানি তাহে এত অনুরাগে॥)
বড় পরমাদ সই বড় পরমাদ।
শয়নে সপনে মনে নাহি অবসাদ॥
দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না বলে বয়ান॥
শুনিতে শুনিতে কানে সেই পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥
হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ॥
গৃহকাজ করিতে সব আউলায় দেহ।
জ্ঞানদাস কহে সে বিষম শ্যাম নেহ॥

তরু, ৯২২

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, ৫০ পৃঃ

টীকা ঃ—অবসাদ—বিরাম।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ—কুলধর্ম্ম রক্ষার কথা মনে উঠে না।

(৭৭)

সহজে নুনীক পুতলী গোরী।
জারল বিরহ আনলে তোরি॥
বরণ কাঞ্চন এ দশবাণ।
শ্যামরি সোঙরি তোহারি নাম॥
শুনহ মাধব কহলুঁ তোয়।
সমতি না দেই সতত রোয়॥
অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতূর তুল॥
ফুয়ল কবরী উরহি লোল।
সুমেরু উপরে চামর ডোল॥
গলায় এ গজ-মোতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥
অঙ্গুল অঙ্গুরি বলয়া ভেল।
জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল॥ তরু, ৪১

টীকা :—গোরী—গৌরবর্ণা রাধা।

নুনীক পুতলী—নবনীতের পুত্তলিকা। মাখন যেমন আগুনের তাপে গলিয়া যায়, তেমনি তোমার বিরহ-অনলে সে জ্বলিল।

দশবাণ—দশ বার বিশোধিত স্বর্ণ। কিন্তু তোমার নাম স্মরণ করিতে করিতে সে এখন শ্যামবর্ণা হইয়া গিয়াছে।

সমতি না দেই সতত রোয়—নব অনুরাগিনী রাধা লজ্জায় তোমার সহিত মিলিবার প্রস্তাবে সম্মতি দেয় না; অথচ মিলন বিনা থাকিতে পারে না বলিয়া সব সময়ে কাঁদে।

ফুয়ল কবরী উরহি লোল—তাহার কবরী বা খোঁপা খুলিয়া গিয়া কেশপাশ বুকের উপর পড়িয়াছে; তাহাতে মনে হইতেছে, যেন কুচরূপ সুমেরুর উপরে কাল রংয়ের চামর দুলিতেছে।

বসন বহিতে গুরুয়া ভার—দেহ এমন ক্ষীণ হইয়াছে যে, বস্ত্র বহিতেও গুরুভার বহনতুল্য ক্লেশ হইতেছে।

অঙ্গুল অঙ্গুরি বলয়া ভেল—শরীর এত কৃশ হইয়াছে যে, তাহার আংটী এখন বালার মতন করিয়া পরা যায়।

(৭৮)

পহিলহি রাধামাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি ॥১
অনুনয় করইতে অবনত-বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥২
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই কয়ল পদ আধ পয়ান ॥৩
বিদগধ নাগর অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥৪
করে কর করিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥৫
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥৬
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ॥

তরু, ৫২

টীকা :—প্রথম রাধা-মাধবের মিলন হইতেছে। পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপও দুর্ল্লভ হইল, কেলি-বিলাস তো দূরের কথা। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে অনুনয় করিলে, রাধা মুখ নীচু করিলেন। একবার চকিতে কৃষ্ণের পানে চাহিয়া শঙ্কায় ও দ্বিধায় নখ দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিলেন। চঞ্চল কানাই অঞ্চল স্পর্শ করিতে গেলে শ্রীরাধা একটু সরিয়া গেলেন। বিদগ্ধ (সুরসিক) নাগর তখন রাধার চরণস্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। রাধা তাহাতে বাধা দিতে গেলে পরস্পরের করস্পর্শ ঘটিল ; এই স্পর্শেই সমস্ত বাধা বিদূরিত হইল। উভয়ের মধ্যে প্রেমের উদয় হইল। শ্রীকৃষ্ণ এমন কৃতার্থ হইলেন, যেন মনে হইল, গরীব লোক ঘট ভরিয়া

সোনার মোহর পাইয়াছে। রাধা তাহা দেখিয়া একটু স্মিত হাস্য করিয়া তৎক্ষণাৎ মুখ আবৃত করিল (আগোরলি)—মনে হইল, যেন রত্ন দিয়া ফের চুরি করিয়া লইল।

কবি গোবিন্দদাস যেন সাক্ষাৎ এ লীলা দেখিয়া লিখিতেছেন—

আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস।

পদটি ক্ষণদায় (২০।১০) জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

তৃতীয় পয়ারের পর ক্ষণদায় আছে—

রস-লব-লেশ দেখাওলি গোরী।
পাওল রতন পুন লেওলি চোরী।

ষষ্ঠ পয়ারে আছে—

হাসি দরশি মুখ ঝাঁপই গোই।
বাদরে শশী জনু বেকত না হোই॥

শেষ পয়ারের স্থানে আছে—

নব অনুরাগ বাঢ়ল প্রতি-আশ।
জ্ঞানদাস কহে গুরুয়া পিয়াস॥

পদকল্পতরু, গীতচন্দ্রোদয় (পৃঃ ২৪২), পদামৃতসমুদ্র (পৃঃ ৭০), সংকীর্ত্তনামৃত (৯৯) এবং কীর্ত্তনানন্দে (পৃঃ ১৭০) পদটি গোবিন্দদাসের ভণিতাতেই পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রাচীনতর ক্ষণদার ভণিতা অগ্রাহ্য করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য সঙ্কলনের গোবিন্দদাস ভণিতাই মানা শ্রেয়ঃ।

অষ্টম স্তবক

আক্ষেপানুরাগ

অনুরাগের লক্ষণ হয় চারি প্রকার।
উল্লাস, আক্ষেপ, রূপ, অভিসার আর॥
আক্ষেপ অনুরাগ নানাবিধ হয়।
সংক্ষেপার্থ তাহা কিছু করিয়ে নির্ণয়॥
কৃষ্ণকে, মুরলীকে আক্ষেপ, দূতীকে করায়।
কভু যে আক্ষেপ উক্তি গুরুজনে হয়॥
কুলে, শীলে আক্ষেপ, কখনও বিধাতাকে।
জাতিকে আক্ষেপ কভু, কভু আপনাকে॥
কন্দর্পকে নিন্দা, কভু আক্ষেপ সখীরে।
উল্লাস আক্ষেপ রূপ করিল বিচারে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য নন্দকিশোর দাসের
রসকলিকা, পৃঃ ১৪৭

(৭৯)

আরে মোর গৌরকিশোর।
পুরুব প্রেমরসে ভোর॥
স্বরূপ দামোদর রাম রায়।
করে ধরি করে হায় হায়॥
কহে মৃদু গদগদ ভাষ।
ঘন বহে দীঘ নিশ্বাস॥
মরম না বুঝে কেহো মোর।
কহে পহু হইয়া বিভোর॥
কেনে বা এ প্রেম বাঢ়াইলুঁ।
জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইলু॥

নিঝরে ঝরয়ে দু নয়ান।
নরহরি মলিন বয়ান॥

তরু, ৮৪০

টীকা:—নীলাচল-লীলায় স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায় প্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গেই তিনি লীলাকীর্ত্তনের রস আস্বাদন করিতেন। স্বরূপ দামোদরের গৃহস্থাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। ইনি—

সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥

(চৈঃ চঃ, ২।১০)

গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে॥ (ঐ)

(৮০)

কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে॥
যে না জানে এনা রস সেই আছে ভাল।
মরমে রহল মোর কানু প্রেম শেল॥
নবীন পাউখ মীন মরণ না জানে।
শ্যাম অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে॥
আগমে পিরিতি মোর নিগমের সার।
কহে নরহরি মুঞি পড়িলু পাথার॥

পদামৃতসমুদ্র, ৪২৭ পৃঃ

কীর্ত্তনানন্দে (পৃঃ ২৮৬) এই পদ চণ্ডীদাস ভণিতায় আছে—

নিগূঢ় পিরিতি আগুনের ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর॥

ডাঃ সুকুমার সেন সাহিত্য-পরিষদের ৯৮২ সংখ্যক পুঁথিতে পদটী নরহরি ভণিতায় পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সা-কু এবং ক. বি. ২৯৩ পুথিতে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায়, ঢা-মি ৫ দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় ও ক. বি. ২৯৮ পুথিতে শুধু চণ্ডীদাস ভণিতায় এবং ১৬৬৩ শকের অনুলিখিত ঢাকা মিউজিয়ামের এক পুথিতে জ্ঞানদাস ঠাকুরের নামে পাইয়াছেন।

(৮১)

না জানিয়া না শুনিয়া পিরিতি বাড়ালু গো
পরিণামে পরমাদ দেখি।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়া বরিখয়ে
এমতি ঝরয়ে দুটি আঁখি॥
হের যে আমারে দেখ মানুষ আকার গো
মনের আনলে আমি পুড়ি।
জলন্ত আনলে যেন পুড়িয়া রহিয়াছি গো
পাকানিয়া পাটের ডোরি॥
আঁধুয়া পুখরে যেন দীনহীন মীন রহে
নিশ্বাস ছাড়িতে নাহি ঠাঞি।
বাসুদেব ঘোষ কহে ডাকাতিয়া পিরিতি গো
তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই॥

পদামৃতসমুদ্র, ৪২৬ পৃঃ

টীকা :—হের যে আমারে দেখ ইত্যাদি—বাহির হইতে দেখিলে বুঝা যাইবে না যে, আমার ভিতরে ভিতরে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি মনের আগুনে পুড়িতেছি; পাক দেওয়া পাটের দড়িতে আগুন ধরাইয়া দিলে, আস্তে আস্তে তার সবটাই পুড়িয়া যেমন ছাই হইয়া যায়, আমার শরীরও সেই রকম হইতেছে।

আঁধুয়া পুখর—এঁধো পুকুর।

তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই—প্রতি তিলে (মুহূর্ত্তের খণ্ডাংশে) ভয় হয়, এই বুঝি বন্ধুকে হারাইলাম।

(৮২)

সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তাহে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ন-পুতলী করি লইলুঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরিতি আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরিতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

পদামৃতসমুদ্র, ২৪৭ পৃঃ
তরু, ৭৫১

টীকা ঃ—স্রোত বিথার জলে ইত্যাদি—আমি তো প্রেমে পড়িয়া জীয়ন্তে মরা হইয়াছি ; বিস্তৃত স্রোতজলে আমার দেহ ভাসিয়া যাইতেছে ; দুই কুলের কুকুরেরা উহা টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে ; কিন্তু প্রেমরূপ নদীর বিস্তৃত স্রোতজল এত গভীর যে, উহারা নিকটে আসিতে পারিতেছে না—পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের কুকুরে আমাকে ধরিতে পারিবে না।

পিরিতি এমতি হৈলে, তার গুণ তিন লোকে গায়—প্রেম যদি এইরূপ

লোক ও সমাজের অপেক্ষা না রাখে, নিজের দেহের ও প্রাণের মায়া ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার গুণ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই তিন লোকে গান করে। মুরারি গুপ্ত রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। পরকীয়া-প্রেমের এই পদটী বিশ্বম্ভর মিশ্রের কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

(৮৩)

নয়নে লাগিল রূপ কি আর কহিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥
নবীন পাউখের মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈর্য্য নাহি মানে॥
চিতের আগুন কত চিতে নিভাইব।
না যায় কঠিন প্রাণ কাহে কি বলিব॥
জানিলে যাইতাম না মরমসখী সনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে॥
কি করিতে কি না করি কত উঠে মনে।
নিরবধি পড়ে মনে শয়নে সপনে॥
ঘরে পরে সব জনে করয়ে গঞ্জনা॥
বংশীবদনে কহে না কর ভাবনা॥

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, ১১২ পৃঃ

টীকা :—নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব—যে অনুরাগ নিত্যই নূতন নূতন রূপ ধারণ করে, তাহাই প্রেম। সেই প্রেমের প্রবল বন্যায় ভাসিয়া যাইয়া আমার প্রাণ নষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

পাউখ—পাউস, প্রাবৃষ, বর্ষাকাল।

(৮৪)

সভে বলে সুজন-পিরিতি যেন হেম।
বিষম হইল মোরে কালিয়ার প্রেম॥

এ ঘর বসতি মোরে লাগে যেন শলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলি॥
যতেক পিরিতি পিয়া করিয়াছে মোরে।
আখরে আখরে লেখা হিয়ার ভিতরে॥
হাসিয়া পাঞ্জর-কাটা যে বল্যাছে বাণী।
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি॥
নিরবধি বুকে থুঞা চাহি চৌখে চৌখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে॥
বলরাম দাস বলে না ভাব সুন্দরি।
শ্যামসুন্দরের প্রেম সুধার লহরী॥

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, ৫৭ পৃঃ

(৮৫)

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়া ধারা ঢাকি যদি গায়।
আন ছল ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়িয়া লয় কাল পাটের শাড়ী॥
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদ মুখ॥
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরিতি॥

তরু, ৮১৭

টীকাঃ—জিতে পাসরিতে নারি—জীবন থাকিতে তোমার প্রেম ভুলিতে পারি না।

(৮৬)

আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী।
কোন বিহি সিরজিল ছার কুলনারী॥
কথার দোসর নাই যারে কহোঁ দুখ।
দেখিতে না পাঙ চাঁদ সুরুজের মুখ॥
কহ সখি, কি হবে উপায়।
না জানি কি গুণ কৈল বিদগধরায়॥
ও রূপ দেখিয়া কৈলুঁ মরণ সমাধি।
রাতি দিনে কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি॥
আন কথা কহোঁ যদি গুরুর সমুখে।
ভরমে তখনি মোর শ্যাম আইসে মুখে॥
ভাবে বিভোর তনু গদগদ বাণী।
ধরিতে ধরণে না যায় দুটি চোখের পানি॥
সে রূপে মজিল চিত পাসরিল নয়।
বলরাম দাস বলে না জানি কি হয়॥ তরু, ৮৩৮

(৮৭)

শুন গো মরম সখি কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ানু পরানি॥
শুনিয়া দেখিনু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিভাইতে নাহি পাই পানি।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিভায় হিয়ার আগুনি॥

বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি থির॥
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বীর-চিত শ্রীনিবাস-অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায়॥

কর্ণানন্দ, পৃঃ ১৯
ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৫৮২

টীকা ঃ—শুনিয়া দেখিনু কালা—কৃষ্ণের রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিলাম।

আসিয়া উঠায় তবে—যখন আমি ঘরে বসিয়া থাকি, তখন যেন সে আসিয়া আমাকে জোর করিয়া যমুনাতীরে অভিসারে লইয়া যায়।

গৃহপতি—সে শুধু ঘরেরই মালিক, আমার হৃদয়ের নহে।

(৮৮)

মনের মরম কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কেন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব॥

তরু, ৯২৩

(৮৯)

আলো মুঞি জানো না,
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥
চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদ ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা॥
কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোঁড়া॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হইঞা দুকুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥ তরু, ১২৩

টীকা :—রূপের পাথারে আঁখি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের রূপ যেন অমৃতের পাথার বা সমুদ্র ; সেই রূপ নয়নে লাগিয়া যেন আঁখিকে রসের সাগরে ডুবাইয়া রাখিল। যৌবনের এমন অপরূপ শোভা যে, একবার তাহাতে মন লাগিলে আর উহা ফিরিয়া আসিবার পথ খুঁজিয়া পায় না।

ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান—যে পথে শ্যামসুন্দরের দেখা মিলিয়াছে, সেই পথ ছাড়িয়া ঘরে যাইতে পা চলে না ; সেই পথ যেন ফুরায় না মনে হইতেছে।

কোঁড়া—কুঁড়ি।

(৯০)

গুরুজনার জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন তাহে শ্যামের মুরলী॥

উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লৈয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ-লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশিয়া নাশিয়া সতীকুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত, না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ওই সে বেভার॥

তরু, ৮২৬

টীকা ঃ—উভ হাতে—দুই হাত জোড় করিয়া।

(৯১)

পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥
বারেক দেখিতে নাহি পাই সব দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণবন্ধু জান মোর মন॥
ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
খেনে খেনে জীয়ে প্রাণ খেনে খেনে মরি॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে এই বিষম পিরিতি॥

তরু, ৮০৮

(৯২)

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় অন্য জন
ইহা কি পরাণে সয়॥

সই, কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিন দেখিব আপন নয়ানে
আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ি পেলি বেশ দূর করি
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
বন্ধুর হিয়া এমন করিলে
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ করিছে যেমন
এমনি হউক সে॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মনে না ভাবিহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোহারি প্রাণ॥ তরু, ৯৬১

পদটি সংকীর্ত্তনামৃতে (৩৯১) নরহরি ভণিতায় এবং কীর্ত্তনানন্দে চণ্ডীদাস ভণিতায় পাওয়া যায়। আমার সম্পাদিত "চণ্ডীদাসের পদাবলী" (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) ৬৭—৭২ পৃষ্ঠায় ইহার বিচার দ্রষ্টব্য।

এই পদটির সঙ্গে চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত পদটির অনেক মিল রহিয়াছে—

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমনি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিলু
লোকে অপযশ কয়।

সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরিতি
আর জানি কার হয় ॥
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে ॥
(রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী, হিতবাদী সংস্করণ , ১০৯৭ পৃঃ)

নবম স্তবক

অভিসার

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা॥
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ॥

উজ্জ্বলনীলমণি, পৃঃ ১৯২

অভিসার করায় কান্তে, নিজে অভিসরে।
জ্যোৎস্না তমোযোগ্য বেশ অভিসারে ধরে॥
লজ্জাতে সম্বরি অঙ্গ নিঃশব্দ ভূষণ।
অঙ্গ ঝাপি চলে সঙ্গে সখী একজন॥

উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ৪১

পীতাম্বর দাস রসমঞ্জরীতে আট প্রকার অভিসারের কথা বলিয়াছেন,—

সেই অভিসার হয় পুন আট প্রকার।
জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষা, দিবা-অভিসার॥
কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা, সঞ্চরা।
গীত পদ্য রসশাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা॥

(৯৩)

বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
চলিতে না পারে গোরা চাঁদ গোঁসাই
বলিতে না পারে আধ বোল।

ভাবে অবশ হইয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল ॥
গমন মন্থর অতি জিনি মদমত্ত হাতী
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায় ।
অরুণ বসন ছবি জিনি প্রভাতের রবি
গোরা অঙ্গে লহরী খেলায় ॥
এহেন সম্পদকালে গোরা না ভজিলাম হেলে
তছু পদে না করিলাম আশ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥ তরু ৩২৫

(৯৪)

এক পয়োধর চন্দন লেপিত
আর পয়োধর গোর ।
হিম ধরাধর কনক ভূধর
কোলে মিলল জোর ॥
মাধব, তুয়া দরশন কাজে ।
আধ পদ চালন করত সুন্দরী
বাহির দেহলি মাঝে ॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম ।
নীল ধবল কমল যুগলে
চান্দ পূজল কাম ॥
শ্রীযুত হুসন জগত-ভূষণ
সোই ইহ রস জান ।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান ॥
রসমঞ্জরী পৃঃ ৮

টীকা—শ্রীরাধা প্রসাধন করিতেছিলেন, বুকে চন্দন ও নয়নে কাজল লাগাইতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে, মাধব তাঁহার বাড়ীর সামনে দিয়া যাইবেন। অমনি প্রসাধন করা ছাড়িয়া দিয়া তিনি বাড়ীর দেউড়ীতে আসিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। তিনি এক স্তনে চন্দন দিয়াছিলেন, অন্য স্তন খালিই থাকিল। চন্দনচর্চ্চিত স্তনের সঙ্গে তুষার-মণ্ডিত হিমালয়ের ও অপর স্তনের সহিত স্বর্ণবর্ণের পর্ব্বতের তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন যে, উভয়ে যেন রাধার কোলে মিলিত হইল। রাধার দক্ষিণ চক্ষুতে কাজল পরা হইয়াছিল, অন্য চক্ষু সাদাই রহিল। দুই চক্ষুকে নীল পদ্ম ও শ্বেত পদ্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন যে, কামদেব যেন ঐ দুইটি পদ্ম দিয়া রাধার মুখরূপ চন্দ্রকে পূজা করিল। হুসেন শাহের রাজ্যকাল ১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ।

(৯৫)

রাই সাজে বাঁশী বাজে পড়ি গেল উল।
কি করিতে কিবা করে সব হৈল ভুল॥
মুকুরে আঁচারি রাই বান্ধে কেশভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার॥
করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজপাতা॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা॥
বংশীবদনে কহে যাও বলিহারি।
শ্যাম অনুরাগের বালাই লৈয়া মরি॥

তরু ১০০৯

(৯৬)

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনি ঝলকই।
কুলিশ পাতন- শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি, আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নি- তান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থরথর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন- নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জিবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥ তরু ৯৮৪

(৯৭)

ঝরঝর বরিখে সঘনে জল-ধারা।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা॥
এ সখি কীয়ে করব পরকার।
অব জনি বাধয়ে হরি-অভিসার॥
অন্তরে শ্যাম-চন্দ পরকাশ।
মনহি মনোভব লেই নিজ পাশ॥

কৈছনে সঙ্কেতে বঞ্চয়ে কান।
সোঙরিতে জর জর অথির পরাণ॥
ঝলকই দামিনি দহন সমান।
ঝনঝন শবদ কুলিশ ঝনঝন॥
ঘর মাহা রহইতে রহই না পার।
কি করব এ সব বিঘিনি বিথার॥
চঢ়ব মনোরথে সারথি কাম।
তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম॥
মন মাহা সাখি দেয়ত পুনবার।
কহ শেখর ধনি কর অভিসার॥ তরু ৯৮৫

(৯৮)

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

তরু ১০০৩

শব্দার্থ—মঞ্জীর—নূপুর। চীর—বস্ত্রখণ্ড। দুতর—দুস্তর। করকঙ্কণ পণ—হাতের কঙ্কণ মূল্যস্বরূপ দিয়া। ভুজগ-গুরু—সাপুড়ে।

টীকা—রাধা অন্ধকার রাত্রিকালে সর্প ও কণ্টকপূর্ণ পথে অভিসারে যাওয়ার অভ্যাস করিতেছেন। বাড়ীর উঠানে কাঁটা পুতিয়া দিয়াছেন, আর ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া উঠান পিছল করিয়াছেন। রাত্রিকালে সকলে যখন নিদ্রায় বিভোর, তখন রাধিকা রাত্রি জাগিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উঠানে চলিয়া দুস্তর পথে অভিসারে যাওয়ার অভ্যাস করিতেছেন। আঁধারে চলিতে শিখিবার জন্য বাড়ীতে দুই হাত দিয়া চোখ ঢাকিয়া চলিতেছেন। পথে চলিতে চলিতে সাপের মণি দেখিতে পাইলে, সেই মণির আলোকে পাছে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে, এই ভয়ে কি করিয়া সাপের মুখ বাঁধিতে হয়, তাহা সাপুড়েদের কাছে শিখিতেছেন। সাপুড়েরা বিনা মূল্যে তাহা শিখাইতে রাজী হইবে না, অথচ ঘরের বউ রাধার হাতে নগদ পয়সাকড়ি নাই; তাই তিনি সাপুড়েকে হাতের কঙ্কণ পণ দিয়া সাপের মুখ বাঁধিবার মন্ত্র ও কৌশল শিখিতেছেন। গুরুজনের কথা তাঁহার কানেই পৌছায় না, মনে হয় যেন তিনি কালা হইয়া গিয়াছেন। এক কথা শুনেন, অন্য জবাব দেন। আর পরিজনদের কথায় বোকার মতন কিছু না বুঝিয়াই ম্লানভাবে একটু হাসেন। রাধার যে সত্যই এই ভাব হইয়াছে, তাহার প্রমাণ বা সাক্ষ্য দিতেছেন কবি গোবিন্দদাস।

পদটি যে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত জহ্লনের সূক্তিমুক্তাবলীর নিম্নলিখিত শ্লোকটির ভাব লইয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেখাইয়াছেন—

> মার্গে পঙ্কচিতে ঘনান্ধতমসে নিঃশব্দসঞ্চারণং
> গন্তব্যাঽদ্য ময়া প্রিয়স্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
> আজানূদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
> কৃচ্ছ্রেণাত্তপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি॥

(পৃঃ ২৪৭)

ইহাতে নিজের বাড়ীতে করতলে চোখ ঢাকিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া পথ চলিবার অভ্যাস করার কথা ও নূপুরের যাহাতে শব্দ না হয়, সেই জন্য

উহাকে হাঁটুর উপরে তোলার কথা আছে। কিন্তু রাত্রি জাগিয়া ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া উঠান পিছল করিবার কথা নাই। আর গুরুজনের কথায় বধিরসম হওয়ার ও পরিজনদের কথায় মুগ্ধার মতন (বোকার মতন) হাসিবার কথা নাই। গোবিন্দদাস প্রাচীন কবিতার ভাব লইয়া পদটি লিখিলেও নিজের মৌলিকতা দেখাইয়াছেন।

(৯৯)

মন্দির-বাহির কঠিন কবাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল-নিচোল॥
সুন্দরি, কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহে ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

তরু ৯৮৭

টীকা—সখী শ্রীরাধাকে অভিসার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিতেছেন যে, বাধা অনেক—প্রথমতঃ দরজা শক্ত করিয়া বন্ধ রহিয়াছে, বাহির হওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ পথে কাদা জমিয়াছে, সেই জন্য চলা কঠিন। তৃতীয়তঃ খুব জোরে বৃষ্টি পড়িতেছে, তোমার নীল শাড়ীতে আর কত জল ঠেকাইবে? চতুর্থতঃ হরি মানসগঙ্গার অপর পারে রহিয়াছেন—সে অনেকটা পথ। পঞ্চমতঃ ঘন ঘন বজ্র পড়িতেছে, দশ দিক্ বিদ্যুতের আলোকে ঝলসিয়া

যাইতেছে। এত বাধা সত্ত্বেও যদি তুমি ঘর ছাড়িয়া অভিসারে বাহির হও, তবে প্রেমের জন্য তোমাকে দেহ উপেক্ষা করিতে হইবে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ইহাতে ভাবিবার কি আছে? যে তীর ছোঁড়া হইয়াছে, তাহাকে কি শত চেষ্টা করিলেও ফেরান যায়? মন যে দয়িতের নিকট চলিয়া গিয়াছে; তাহা কি আর ফিরাইয়া আনা যায়?

(১০০)

কুলবতী কঠিন কবাট উদঘাটলু
তাহে কি কণ্টক বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঞে ডারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সজনি, মঝু পরিখন করু দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছু পর
তাহে জলদজল লাগি।
প্রেম দহনদহ থাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজরকি আগি॥
যছু পদতলে হাম জীবন সোপলু
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ॥

তরু ৯৮৮

টীকা—পূর্ব্বোক্ত পদের উত্তরে শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—তুমি আমাকে পথে কণ্টকের ভয় কি দেখাইতেছ? যে কুলবতী হইয়া ঘরের কঠিন কপাট খুলিয়াছে, সে কি কাঁটার ভয় করে? তুমি নদীতে অগাধ জল আছে বলিয়া পার হওয়া যাইবে না বলিতেছ, কিন্তু নিজের কুল-মর্য্যাদাকে যে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার কাছে নদীর জল আর

অগাধ কি ? সখি আমাকে আর পরীক্ষা করিও না। আমি হরিকে সঙ্কেত করিয়াছি, তিনি আমার পথ চাহিয়া রহিয়াছেন ; সেই কথা মনে করিয়া আমার মন কাঁদিতেছে। যাহার উপর মদন কোটি কামবাণ নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার আবার বর্ষার ধারায় কি ভয় ? বজ্র পড়িবে বলিতেছ ? পড়ুক না ; যাহার হৃদয় প্রেমের দহন সহ্য করিতেছে, সে বজ্রকে কি ভয় করিবে ?

পদটি শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাব লইয়া লিখিত—

লজ্জৈবোদ্ঘটিতা কিমত্র কুলিশোদ্বদ্ধা কবাটস্থিতিঃ
মর্য্যাদৈব বিলঙ্ঘিতা সখি পুনঃ কেয়ং কলিন্দাত্মজা।
আক্ষিপ্তা খলদৃষ্টিরেব সহসা ব্যালাবলী কীদৃশী
প্রাণা এব সমর্পিতাঃ সখি চিরং তস্মৈ কিমেষা তনুঃ॥

যখন আমি লজ্জাই উদ্ঘাটিত করিয়াছি, তখন এ স্থানে বদ্ধ কবাট থাকাতে আমার কি হইবে? যখন আমি মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছি, তখন সামান্য যমুনা আমার কি করিবে ? খল জনের দৃষ্টিই যখন অগ্রাহ্য করিয়াছি, তখন সর্পসকল আমার কি করিবে ? যখন আমি তাঁহাকে প্রাণই সমর্পণ করিয়াছি, তখন শরীর সমর্পণ করিব, তাহাতে আর কি কথা ?

(১০১)

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছল মনহি মনোভব সিন্ধু॥
অব জানি সজনি করহ বিচার।
শুভ ক্ষণে ভেল বাদর অভিসার॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহি পহিরায়হ নীল নিচোল॥
কি ফল উচ কুচ কঞ্চুক ভার।

দূর কর সোতিনী মোতিম হার ॥
চলইতে দীগভরম জনি হোয় ।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয় ॥ তরু ৩৪২

শব্দার্থ—অম্বরে—আকাশে। ডম্বর ভরু—গড় গড় করিয়া মেঘ ডাকিতেছে, যেন শিবের ডম্বরু বাজিতেছে। নব মেহ—নূতন মেঘ; ব্যঞ্জনা—যেন নবঘন-শ্যাম ডাকিতেছে। গোয়—গোপনে।

অন্তরে শ্যামরূপ চন্দ্র যেন উদিত হইল। চাঁদ উঠিলে সমুদ্রে জোয়ার আসে, তাই শ্যামচন্দ্রের উদয়ে মনে মদনসমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিল। মৃগমদে দেহ অনুরঞ্জিত করিলে ও নীল শাড়ী পরিলে আঁধারে আমার গৌরবর্ণ ঢাকা পড়িবে; কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না। আমার কাঁচলি দূর কর, উহা তো ভার মাত্র। আর মোতির হার তো সতীন; কেন না, শ্যামবন্ধুর আলিঙ্গন হারের উপর লাগিবে, আমি পাইব না। শ্রীরাধার পাছে আঁধারে দিক্‌ভ্রম হয়, তিনি পথ হারান, এই ভয়ে সখীর অনুগা কবি গোবিন্দদাস গোপনে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন।

(১০২)

পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ।
চৌদিগে হিম হিমকর করু বন্ধ ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥
পরিহরি তৈছন সুখময় সেজ।
উচ-কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই ॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই ॥

গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিনি যাঁহা নূতন নেহ॥

পদামৃতসমুদ্র ১৩৮৯, তরু ৩২৬, কী ২১৮

টীকা :—শীতকালের জ্যোৎস্না-রাত্রিতে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণিত হইতেছে। পৌষ মাসে রাত্রিকালে ধীরে ধীরে হাওয়া বহিতেছে। চারি দিকে তুষারপাত হইতেছে, তাহাতে হিমকর চন্দ্র বা চন্দ্রের কিরণ যেন বন্ধ হইয়াছে। ঘরের ভিতরেই সকলে কাঁপিতেছে। সকলেই শীতের চোটে শুইয়া আছে, চোখ বুঁজিয়া আছে, যেন চোখ খুলিলেই আরও বেশী ঠাণ্ডা লাগিবে। এমন সময়ে রাধা অভিসারে বাহির হইল দেখিয়া আমার মনে চমক লাগিল। সুখময় শয্যা ত্যাগ করিয়া রাধা মনের ভ্রমে উচ্চ কুচের কঞ্চুকও ছাড়িয়া একখানি সাদা কাপড়ে দেহ ঢাকিয়া কুঞ্জাভিমুখে বাহির হইল। সাদা কাপড় পরার উদ্দেশ্য এই যে, জ্যোৎস্নার শুভ্রতার সঙ্গে একীভূত হওয়ায় কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিবে না। রাধা কোমল চরণ দুখানি তুষারের উপর দিলেন না, তিনি কাঁটার উপর দিয়া চলিতে টলিলেন না। যেখানে নূতন অনুরাগ, সেখানে বিঘ্নকে কে গণনা করে?

(১০৩)

রাই কনক-মুকুর-কাঁতি।
শ্যাম বিলাসিতে সুন্দর তনু
সাজয়ে কতেক ভাতি॥
নীল বসন রতন ভূষণ
জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর কেশের বিচিত্র বেণী
দুলিছে হিয়ার মাঝে॥
রসের আবেশে গমন মন্থর
হেলি দুলি চলি যায়।
আধ ওঢ়নি ঈষত হাসিয়া
বঙ্কিম নয়নে চায়॥

সিথায়ে সিন্দুর নয়ানে কাজর
তাহে চন্দনের রেখা।
নব জলধরে অরুণ-কোরে
নবীন চাঁদের দেখা॥
শ্যামানন্দ ভণে নিকুঞ্জ-ভবনে
কলপ-তরুর মূলে।
রসের আবেশে বৈসে বিনোদিনী
শ্যাম নাগরের কোরে॥

তরু ১০২৪, কী ১৯৩

দশম স্তবক

বাসকসজ্জা

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥
উজ্জ্বলনীলমণি, ৫।৬৭

কান্তের সঙ্কেত-স্থানে উপস্থিত হইয়া।
তাম্বূল কর্পূর মালা সব নিয়োজিয়া॥
কৃষ্ণের বিলাস লাগি শয্যাদি করয়।
নানা গন্ধ পুষ্প তার চৌদিকে সাজায়॥
কুঞ্জমধ্যে কুসুমিত শয্যাদি করিয়া।
নানা ভূষা করি রহে কান্তপথ চাইয়া॥ রসকলিকা, পৃঃ ৩৪

(১০৪)

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া।
অবনত বদন করিয়া॥
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
রজনী জাগিল হেন সাখী॥
বিরস বদন কহে বাণী।
আশা দিয়া বঞ্চিল রজনী॥
কান্দিয়া কহয়ে গোরা রায়।
এ দুখ সহনে নাহি যায়॥
কাতরে করে সবিষাদ।
নরহরি মাগে পরসাদ॥ তরু ৪২১

(১০৫)

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনি
কেমনে আয়ব পিয়া।

শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া॥
সই, কি করব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইলুঁ
নব অনুরাগ ভরে॥
এহেন রজনী কেমনে গোঙাব
বঁধুর দরশ বিনে।
বিফল হইল সব মনোরথ
প্রাণ করে উচাটনে॥
দহয়ে দামিনী ঘন ঝনঝনি
পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মিলবি বঁধুর সনে। তরু ৩৪৫

(১০৬)

ভুজগে ভরল পথ কুলিশপাত শত
আর কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতী গৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে কয়লুঁ অভিসার॥
সজনি, কি ফল পাপ পরাণ।
যামিনী আধ অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মিলল কান॥
যতয়ে মনোরথ সব ভেল অনরথ
কানু-পিরীতি অভিলাষে।
না জানিয়ে কোন কলাবতী বান্ধল
ভাঙ ভুজঙ্গিনী পাশে॥
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন গারি।

গোবিন্দদাস কহ এ তুহুঁ সংশয়
নিরসব রসিক মুরারি॥

পদামৃতসমুদ্র ১৬১ পৃঃ, তরু ৩৪৬

শব্দার্থ—ভুজগ—সর্প। কুলিশ—বজ্র। বিঘিনি বিথার—বিঘ্ন বিস্তৃত। যতয়ে মনোরথ—যত কিছু অভিলাষ। অনরথ—অনর্থ।

ভাঙ ভুজঙ্গিনী পাশ—ভ্রূরূপ ভুজঙ্গিনীর পাশের দ্বারা বন্ধন করিল।

টীকা—দারুণ ফুলশর ইত্যাদি···আমি কুঞ্জে আসিলাম, সেখানে মদনের দারুণ ফুলশর। ও দিকে কৃষ্ণ হয় তো গুরুজনের গালির ভয়ে অভিসারে আসিতে পারেন নাই। কবি বলিতেছেন, তোমার উভয় সংশয়ই মিথ্যা; রসিক মুরারি আসিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে, তিনি কোন কলাবতীর কটাক্ষে বাঁধা পড়েন নাই, আর গুরুজনদের গালির ভয়েও পিছপাও হন নাই।

(১০৭)

পবনক পরশহি বিচলিত পল্লব
শবদহিঁ সজল নয়ান।
সচকিতে সঘনে নয়নে ধনি নিরখয়ে
জানল আয়ল কান॥
মাধব, সমুঝল তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে আপন তনু ছাপলি
অব কৈছে রহবি ছাপাই॥
পুনহি বিলম্বে ফিরয়ে সব কাননে
পুন অনুমানয়ে চীতে।
ভূলল পন্থ অন্ত নাহি পায়ল
না বুঝিয়ে নাগর রীতে॥
নূপুর রণিত কলিত নবমাধুরি
শুনইতে শ্রবণ উল্লাস।
আগুসরি রাই কাননে অবলোকই
কহতহি কানুরাম দাস॥ তরু ৩৩২

টীকা—রাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় থাকিবার পর বাতাসে গাছের পাতা নড়ায় মনে করিলেন, কৃষ্ণ বুঝি আসিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া চারি দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বলিতেছেন—"বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি তমাল গাছের পিছনে লুকাইয়াছ; এখন আর কেমন করিয়া লুকাইয়া থাকিবে?" কিন্তু অনেক ক্ষণ বাদেও কৃষ্ণ যখন বাহির হইলেন না, তখন ভাবিতেছেন, তাহা হইলে কি কৃষ্ণের পথ ভুল হইল? আবার মনে হইল, ঐ বুঝি তাঁহার নূপুরের রণঝনি শুনা যাইতেছে। আনন্দিত মনে রাধা কাননের পানে চাহিতে লাগিলেন। জয়দেবের "পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদের ছায়া এই পদে দেখা যায়।

(১০৮)

মন্দির তেজি কানন মাহা পৈঠলুঁ
কানু মিলন-প্রতিআশে।
আভরণ বসন অঙ্গে সব সাজল
তাম্বুল কর্পূর বাসে॥
সজনি, সো মুঝে বিপরিত ভেল।
কানু রহল দূরে মনমথ আসি ফুরে
সো নাহি দরশন দেল॥
ফুলশরে জরজর সকল কলেবর
কাতরে মহি গড়ি যাই।
কোকিল বোলে ডোলে ঘন জীবন
উঠি বসি রজনি গোঙাই॥
শীতল ভবন গরল সমান ভেল
হিমাচল বায়ু হুতাশ।
লোচনে নীর থীর নাহি বান্ধয়ে
কান্দয়ে কানুরাম দাস॥ তরু ৩৩৪

শব্দার্থ—পৈঠলুঁ—প্রবেশ করিলাম।

প্রতিআশে—প্রত্যাশায়। ফুরে—স্ফুরিত হয় বা প্রকাশ পায়।
ডোলে ঘন জীবন—প্রাণ যেন বারংবার (ঘন) দুলিয়া উঠিতেছে।
হিমাচল বায়ু হুতাশ—হিমালয়ের তুষার-শীতল বাতাস আগুনের মতন লাগিতেছে।
কান্দয়ে কানুরাম দাস—কবিও নায়িকার সঙ্গে একাত্ম হইয়া কাঁদিতেছেন।

(১০৯)

রসের হাটেতে আইলাম সাজাইয়া পসার।
গাহক না আয়ল যৌবন ভেল ভার॥
বড় দুখ পাই সখি বড় দুখ পাই।
শ্যাম অনুরাগে নিশি জাগিয়া পোহাই॥
বিষ লাগে হিমকর কিরণে পোড়ায়।
হিমঋতুপবনে মোর হিয়া চমকায়॥
দারুণ কোকিল মোর প্রাণ নিতে চায়।
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীত গায়॥
ফুলশরে জরজর হিয়া চমকায়।
কানুরাম দাসের তনু ধূলায় লোটায়॥ তরু ৩৩৫

টীকা—বিষ লাগে হিমকর কিরণে পোড়ায়—চন্দ্র সাধারণতঃ প্রেমিক-জনকে আনন্দ দেয়। কিন্তু প্রিয়ের আগমন হইল না বলিয়া সেই চন্দ্র আমার কাছে বিষের মতন লাগে, আর তাহার কিরণে দেহ শীতল না হইয়া বরং পুড়িয়া যাইতেছে।

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে (পৃঃ ২৫) গোবিন্দদাস ভণিতায় একটি পদের প্রথমে এই পদের প্রথম দুই চরণ পাওয়া যায়। ঐ দুইটি চরণ ছাড়া অন্য কয়েকটি চরণের সঙ্গেও এই পদের সহিত মিল দেখা যায়; যথা—

বড় দুখ পাই সখি বড় দুখ পাই।
শ্যাম অনুরাগে নিশি কান্দিয়া পুহাই॥

* * *

দারুণ কোকিল প্রাণ নিয়ে চায়।
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীতি গায়॥

শেষ দুই চরণ—

ফুলশরে জরজর হিয়া চমকায়।
গোবিন্দদাসের তনু ধরণী লোটায়॥

(১১০)

কোমলকুসুমাবলিকৃতচয়নং।
অপসারয় লীলা-রতি-শয়নং॥
শ্রীহরিরত্র ন লেভে সময়ে।
হন্ত জনং সখি শরণং কাময়ে॥
বিধৃত-মনোহর-গন্ধ-বিলাসং।
ক্ষিপ যামুন-তট-ভুবি পটবাসং॥
লব্ধমবেহি নিশান্তিমযামং।
মুঞ্চ সনাতন-সঙ্গতিকামং॥

শ্রীরূপের গীতাবলী

সখি! কোমল কুসুমসমূহ তুলিয়া যে রতিবিলাস-শয্যা পাতিয়াছিলাম, তাহা দূর কর। শ্রীহরি আজ সঙ্কেত-সময়ে কুঞ্জে আসিলেন না। হায় সখি! এখন আমি কাহার শরণ লইব? মনোহর সুগন্ধি পটবাস অর্থাৎ চূয়া চূর্ণ প্রভৃতি যমুনাপুলিনভূমিতে নিক্ষেপ কর। রাত্রির শেষ যাম উপস্থিত হইয়াছে দেখ। সনাতন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ আশা ত্যাগ কর। ইহার ভাব লইয়া দ্বিতীয় বলরামদাস লিখিয়াছেন—

তেজ সখি কানু-আগমন আশ
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহি ডারহ যামুন পার॥

তরু ৩৬৭

(১১১)

ধিক্ রহু নারীর যৌবনে।
পিরীতি করয়ে শঠ সনে॥
যার লাগি প্রাণ সদা ঝুরে।
ফিরিয়া না চাহে সেই মোরে॥
কি করিব তারে দোষ দিয়া।
না দেখিয়ে ললাট চিরিয়া॥
আপনা আপনা বাঢ়াইলু।
দুই কুলে কলঙ্ক রাখিনু॥
না করিনু সুপুরুখ সঙ্গ।
সকলি করিলুঁ হাম ভঙ্গ॥
ছিয়ে ছিয়ে পাপ পরাণ।
অবহুঁ নাহিক বাহিরাণ॥
এ পাপ পিরীতি নাহি আশ।
শুনি কহে নরহরি দাস॥

তরু ৮৩৩

(১১২)

বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনি গোঙাব সই
সাধে নিরমিলুঁ আশাঘর।
কোন কুমতিনি মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আসি এ বেশ বনাইলু গো
সকল বিফল ভেল মোয়।
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয়॥
গগন উপরে চান্দ- কিরণ উজোর গো
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।

এমন রজনি আমি কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথি ॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া খপুর পূরিল সই
পিয়া বিনে কার মুখে দিব।
এ নব মালতী মালা বৃথাই গাঁথিলুঁ গো
কেমনে রজনী গোঙাইব ॥
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো
এখন আছয়ে কার আশে।
ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইয়া চলিলুঁ গো
কহি ধায় নরোত্তম দাসে ॥ তরু ৩৬৩

শব্দার্থ :—খপুর—সুপারি, গুয়া—সুপারি।

(১১৩)

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে পুলকিত অঙ্গ।
দূরে গেও রজনিক বিরহ-তরঙ্গ ॥
যৈছে বিরহ-জ্বরে লুঠল রাই।
তৈছন অমিয়া সাগরে অবগাই ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি।
আনন্দে দুহুঁ জন করু নানা কেলি ॥
সুখময় যামিনী চাঁদ উজোর।
কুহরত কোকিল আনন্দ বিভোর ॥
বিকসিত সুকুসুম মলয় সমীর।
ঝলমল ঝলমল কুঞ্জ কুটীর ॥
বিহরয়ে রাধামাধব রঙ্গে।
নরোত্তমদাস হেরি পুলকিত অঙ্গে ॥

টীকা—লুঠল—লোটাইল, পূর্ব্বে যেমন বিরহরূপ জ্বরে ভূমিতে পড়িয়াছিল, এখন তেমনি মিলনের আনন্দে যেন অমৃতসাগরে অবগাহন করিতেছে।

একাদশ স্তবক

খণ্ডিতা

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সাহি খণ্ডিতা ॥

উজ্জ্বল ৫।৮৩

অন্যের সম্ভোগ-চিহ্ন করিয়া ধারণ।
আসে প্রাতে প্রিয় যার—খণ্ডিতা সে জন ॥

রসমঞ্জরী

নিশান্তে নায়িকা অতি ক্রোধান্তরে রয়।
হেন কালে নায়কের আগমন হয় ॥
কান্তের অঙ্গেতে দেখি ভোগচিহ্ন যত।
অধর মলিন রাঙ্গা নয়ন বেকত ॥

রসকলিকা

(১১৪)

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গরায়।
পূরব প্রেমভরে মৃদু চলি যায় ॥
অরুণ নয়ন মুখ বিরস হইয়া।
কোপে কহয়ে পহুঁ গদগদ হিয়া ॥
জানলু তোহারে তোর কপট পিরীতি।
যা সঞে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর নতি ॥
এত কহি গৌরাঙ্গের গরগর মন।
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগরণ ॥
কহে নরহরি রাধা ভাবে হৈল হেন।
পাই আশোয়াস বঞ্চিত হৈল যেন ॥

(১১৫)

চল চল মাধব করহ পয়ান।
জাগিয়া সকল নিশি আইলা বিহান॥
হাম বনচারী বঞ্চি একেশ্বরিয়া।
চাতুরী না কর চলহ শতঘরিয়া॥
মিছাহি শপথি না কর মোর আগে।
কেমনে মিটায়বি ইহ রতি দাগে॥
যাহ চলি চঞ্চল না কর জঞ্জাল।
দগধ পরাণ দগধ কত আর॥
বিমুখ ভেল ধনী না কহই আর।
দাস অনন্ত অব কি কহিতে পার॥ তরু ৪১১

(১১৬)

আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
ভালহি সিন্দুর দহনা।
চন্দন চন্দ মাঝহি লাগল মৃগমদ
তাহে বেকত তিন নয়না॥
মাধব, অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা।
জাগর পুণফলে প্রাতরে ভেটনু
দূরহি দূরে রহু সেবা॥
চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম সম ভেল।
তোহারি দরশনে মঝু মনে মনসিজ
মনোরথ সঞে জরি গেল॥
তবহুঁ বসন ধর কাঁহে দিগম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দদাস কহ ইহ পর অম্বর
গণইতে লেখি না দেখি॥ তরু ৪০৫

টীকা—সকাল বেলায় অন্য নারীকে উপভোগ করিবার চিহ্ন লইয়া কৃষ্ণ রাধার সামনে আসিলে, রাধা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া শঙ্করের সহিত তুলনা করিতেছেন। শিবের মতন তাঁহার চূড়ায় চন্দ্র রহিয়াছে—(ময়ূরের পাখায় অঙ্কিত চাঁদ); কপালে আবার সিন্দূরবিন্দু লাগায় উহা আগুনের মতন দেখাইতেছে। চন্দনের মধ্যে মৃগমদকস্তুরির চিহ্ন লাগিয়া মনে হইতেছে, যেন তৃতীয় নয়ন অঙ্কিত হইয়াছে। সম্ভোগের সময়ে চন্দন রেণুতে পরিণত হইয়াছে; তাই মনে হয়, যেন তুমি ভস্ম মাখিয়াছ। শঙ্কর মন্মথকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, এখন তোমাকে দেখামাত্রই আমার মনের মনসিজ সমস্ত বাসনার সঙ্গে পুড়িয়া গেল। কেবল একটি মাত্র ব্যাপারে তোমার সহিত শিবের পার্থক্য দেখিতেছি। শিব দিগম্বর, কিন্তু তুমি এখনও কাপড় পরিয়া আছ কেন? রাধার এই প্রশ্নের উত্তরে কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ঐ কাপড়কে কাপড় না বলিলেও চলে; কেন না, বসন বদল হওয়ায় উনি পরের কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন। সে কাপড় এত সূক্ষ্ম যে, উহাকে কাপড় বলিয়া না ধরিলেও হয়।

পদটি নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকের ভাব লইয়া যে লিখিত, তাহা ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধুদাস 'সংকীর্ত্তনামৃতে' দেখাইয়াছেন—

চূড়াচন্দ্রকমণ্ডিতালকতটে সিন্দূরমুদ্রা-শিখা
তদ্বচ্চন্দনচন্দ্রমধ্যবিলসৎ কস্তূরিকালোচনং।
তেন ত্র্যম্বকতৈব লোকদহনা দগ্ধঃ স মে মন্মথ-
স্তদ্দূরাৎ প্রণমাম্যমাধবমহো ত্বামপ্যদিগ্‌বাসসম্‌॥

(১১৭)

সহজই গোরি রোখে তিন লোচন
কেশরি জিনি মাঝা খীন।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে
শৈলসুতাকর চীহ্ন॥
সুন্দরি, অব তুহুঁ চণ্ডিবিভঙ্গ।
যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর
দেওবি মোহে আধ অঙ্গ॥

কালী কালিয় ভাউ ভুজঙ্গম
সম্বরু তাকর দন্ত।
পশুপতি দোখে রোখ এত না বুঝিয়ে
ইহাঁ নাহি শুম্ভ নিশুম্ভ॥
দহন মনোভবে তুহুঁ সে জিয়াওবি
ইষত হাস বরদানে।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডব
গোবিন্দদাস পরমাণে॥

তরু ৪০৬

টীকা—রাধা কৃষ্ণকে শঙ্কর বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, এখন কৃষ্ণ রাধাকে গৌরীর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেছেন যে, এখন এস, আমরা হরগৌরীর মতন এক-দেহ হই। তুমি গৌরবর্ণা, আবার খুব রাগিয়াছ বলিয়া যেন তোমার কপালে তৃতীয় নয়ন দেখা যাইতেছে। গৌরী সিংহকে জয় করিয়া বশ করিয়াছেন, তোমার ক্ষীণ কটী সিংহের কটীকে পরাজিত করিয়াছে। তোমার মনটি পাষাণের মতন কঠিন,—গৌরীর পিতা হিমালয় পাষাণ বলিয়া তোমার হৃদয় এত কঠিন। তোমার ভ্রূভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণসর্পের কথা মনে পড়ে। উহাদের আস্ফালন সম্বরণ কর। তুমি এত চটিয়াছ কেন? এখানে তো শুম্ভ নিশুম্ভ নাই যে, তাহাদিগকে বধ করিবে? তুমি বলিতেছ যে, মনসিজ দগ্ধ হইয়াছে, তুমি একটু হাসিয়া আমার প্রতি চাহিলেই আবার সেই মদন পুনর্জ্জীবিত হইবে। গোবিন্দদাস প্রমাণ (সাক্ষ্য) দিতেছেন যে, তোমার কৃপা পাইলে সমস্ত ত্রুটি (বাদ) বিদূরিত (খণ্ডব) হইয়া যায়।

এই পদটিরও মূল নিম্নলিখিত শ্লোকে পাওয়া যায়—

গৌরী কেশরিমধ্যমা ত্রিনয়না রোষাকুলালোকনৈঃ
কাঠিন্যাদ্বিদিতাদ্রিরাজতনয়া কালী ভ্রুবোর্ভঙ্গতঃ।
ত্বং চণ্ডীতি বিলোক্য মানিনি কথং ন স্যামহং শঙ্করঃ
তস্মাৎ কামিনি শঙ্করে পশুপতাবর্দ্ধাঙ্গমঙ্গীকুরু॥

(১১৮)

নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি॥
অধরহি কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
হাম উজাগরি সারা রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম ভাতি॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একহি পরাণ॥
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুহুঁক গদ গদ ভাষ॥
সবে নহে তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরী তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ॥
অতএব চলহুঁ নিজবাস।
কহতহি গোবিন্দদাস॥

পদামৃতসমুদ্র ১৭৪ পৃঃ

তরু ৪২৩

টীকা—শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে অর্দ্ধাঙ্গে ধারণ করিতে চাহিয়াছেন; তাহার উত্তরে রাধা বলিতেছেন, অর্দ্ধাঙ্গ কেন—তুমি আমি তো একই পরাণ। তাহা না হইলে তোমার বুকে নখের দাগ, আর আমার হৃদয়ে জ্বালা কেন? তোমার ঠোঁটে কাজলের দাগ, তাতে আমার মুখ মলিন কেন? আমি তোমার আসার আশায় সারারাত জাগিয়া কাটাইলাম, তাহাতেই তোমার চোখ দুটি লাল দেখাইতেছে। আমার কান্না পাইতেছে, তাই তোমার বচন গদগদ হইয়াছে। দুজনের সবই এক; শুধু আমার রংটি ফর্সা, আর তোমার কাল। সেই জন্য উভয়ের দৈহিক মিলন হইবে না। তাই তুমি এখন নিজের বাড়ী চলিয়া যাও।

এই পদটিরও মূলস্বরূপ নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক দীনবন্ধুদাস সংকীর্ত্তনামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ত্বৎপীনোরসি পাণিজক্ষতমিতো জাজ্বল্যতে মে মনঃ
ত্বদ্‌বিম্বাধরচুম্বিকজ্জলমিতঃ শ্যামায়িতং মে মুখং।
যামিন্যাং মম জাগরাত্তব দৃশৌ শোণায়মানে ততো
দেহার্দ্ধং কিমু যাচসে হি ভগবন্নেকৈব যন্নৌ তনুঃ॥

(১১৯)

কাঁহা নখ-চিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
এহ নব কুঙ্কুম রেহ।
কাজর ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জসি
ঘন মৃগমদরস এহ॥
ভাবিনি, মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি
দিনহি তরুণী দিঠি মন্দ॥
গৈরিক হেরি বৈরি সম মানসি
উর পর যাবক ভাণে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখি নিন্দসি
সিন্দুর করি অনুমানে॥
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

পদামৃতসমুদ্র ১৭৫ পৃঃ
তরু ৪২৪

টীকা—ধৃষ্ট নায়ক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভর্ৎসনায় লজ্জিত না হইয়া তাঁহার দেখার দোষের কথা বলিতেছেন। এই নব কুঙ্কুমে আঁকা রেখাকে তুমি কি না নখের চিহ্ন বলিয়া ভাবিলে? মৃগমদকস্তুরি ঘনভাবে লেপন করিয়াছি, আর তুমি কি না তাহাকে কাজলের দাগ ভাবিলে? হায় হায়, সুন্দরি, এত অল্প বয়সেই তোমার চোখের দৃষ্টি খারাপ হইয়া গেল? রাতকাণাও

তো বলা যায় না ; কেন না, দিনের বেলাতেই যে তুমি এক জিনিষকে অন্য জিনিষ মনে করিতেছ। একটু গৈরিক চিহ্ন বুকে লাগাইয়াছি, আর তুমি তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিনীর আলতার দাগ মনে করিলে? একটু আবীরের বিন্দু লাগাইয়াছি, আর তুমি চাঁদবদনি সুন্দরী মনে ভাবিলে কি না সিন্দূরের দাগ লাগিয়াছে। তোমার খবর পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠায় সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছি বলিয়া চোখ লাল হইয়াছে ; আর তুমিই কি না উল্টা আমাকে দোষ দিতেছ ?

এটিরও মূল হইতেছে এই প্রাচীন শ্লোকটি—

নখাঙ্কা ন শ্যামে ঘনঘুসৃণরেখাততিরিয়ং
ন লাক্ষান্তঃক্র রে পরিচিনু গিরের্গৈরিকমিদং।
ধিয়ং ধৎসে চিত্রং বত মৃগমদেপ্যঞ্জনতয়া
তরুণ্যাস্তে দৃষ্টিঃ কিমিব বিপরীতস্থিতিরভূৎ॥

(১২০)

ভাল ভেল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ।
অব হাম বুঝলুঁ বিদগধরাজ॥
নয়নক কাজর অধরহি শোভা।
বান্ধি রহল অলি অতি মনোলোভা॥
আজু ঝামর অতি শ্যামর অঙ্গ।
যতনে গুপত রহু যামিনী রঙ্গ॥
খনে খনে নয়ন মুদসি আধতারা।
কহইতে বচন রচন আধ হারা॥
যাবক আধক উর পর লাগ।
অনুখন সে ধনী করু অনুরাগ॥
সুরঙ্গ সিন্দুরবিন্দু ললিত কপালে।
ধরল প্রবাল জনু তরুণ তমালে॥
ভাবে পুলকিত তনু রহল সমাধি।
জ্ঞানদাস কহে উপজিল আধি॥ তরু ৩৮৫

টীকা—নয়নক কাজর ইত্যাদি—নায়িকার চোখের কাজল তোমার অধরে শোভা পাইতেছে; দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন তোমার অধররূপ কমলে একটি ভ্রমর বাঁধা পড়িয়াছে, সে দৃশ্য খুব সুন্দর। মনোলোভার পরিবর্ত্তে মধুলোভা পাঠও দেখা যায়। কহইতে বচন রচন আধ হারা—কথা বলিতে বলিতে যেন অর্দ্ধেক পথে ভুলিয়া যাইতেছ।

যাবক অধিক উর ইত্যাদি—তোমার বুকের আধখানা জুড়িয়া তাহার পায়ের আলতার দাগ লাগিয়াছে, সেই লাল চিহ্ন যেন সেই সুন্দরীর অনুরাগের প্রতীক। তোমার সুন্দর কপালে তাহার সিঁথির লালটুকটুকে সিন্দূর লাগিয়াছে, মনে হইতেছে, যেন তরুণ তমালবৃক্ষে (কৃষ্ণের শ্যাম বর্ণ বলিয়া তমালের সঙ্গে তুলনা) রক্তবর্ণ প্রবাল ধরিয়াছে। তাহার অনুরাগের ভাবে তোমার দেহ পুলকিত ও সমাধিমগ্ন হইয়াছে মনে হয়। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, এ যে দেখিতেছি, কৃষ্ণের বিপদ্ উপস্থিত হইল।

(১২১)

সুন্দরি, কাহে কহসি কটুবাণী।
তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥
তুয়া আশোয়াসে জাগি নিশি বঞ্চলু
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ বিন্দু অধরে কৈছে লাগ
তাহে ভেল মলিন বয়ান॥
তোহে বিমুখ দেখি ঝুরয়ে যুগল আঁখি
বিদরে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে মোহে উপেখসি
হাম কাঁহা যাওব আর॥
হামারি মরম তুহুঁ ভাল রীতে জানসি
তব কাহে কহ বিপরীত।

ঐছন বচনে দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে
জ্ঞানদাস চিতে ভীত ॥

তরু ৩৭৫

(১২২)

রাই ! কত পরখসি আর ।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার ॥২
যজ্ঞ দান তপ জপ সব তুমি মোর ।
মোহন মুরলী আর বয়ানেকা বোল ॥৪
বিনোদিনী হাসিয়া বোলাও ।
ফুলশরে জরজর জনেরে জীয়াও ॥৬
কুটিল কুন্তল বেড়ি কুসুমকো জাদ ।
নয়নে কটাক্ষ তোমার বড় পরমাদ ॥৮
সীঁথের সিন্দূর দেখি দিনমণি ঝুরে ।
এত রূপ গুণ যার সে কেন নিঠুরে ॥১০
বিনোদিনি ! চাহ মুখ তুলি ।
(তোমার) নয়ন-নাচনে নাচে পরাণ-পুতলী ॥১২
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে ।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥১৪
হিয়ার মাঝারে উঠে রসের হিলোলি ।
পরশিতে করি সাধ (তোর) পায়ের অঙ্গুলি ॥১৬
যদুনাথ দাস কহে এ নহে যুকতি ।
কানু কাতর বড় রাখহ পিরীতি ॥

ক্ষণদা ১০।৯

দ্বাদশ স্তবক

মান

নায়ক নায়িকা দোঁহে রহে এক স্থানে।
আলিঙ্গন চুম্বনাদি নিবারয় মানে॥

উজ্জ্বলচন্দ্রিকা

এক স্থানে থাকিলেও মানবশতঃ নায়ক নায়িকার মধ্যে আলিঙ্গন চুম্বনাদি ঘটে না।

মান দুই প্রকার—সহেতু ও নির্হেতু। প্রিয় ব্যক্তির মুখে বিপক্ষের বৈশিষ্ট্যের কথা শুনিলে ঈর্ষ্যার জন্য সহেতুক মান হয়।

কভু অকারণে, কভু কারণ-আভাসে।
নির্হেতু জন্ময়ে মান প্রণয়-বিশেষে॥
... ...
নির্হেতু মানের আপনি হয় নাশ।
আপনি আলিঙ্গন দেয় করে মৃদু হাস॥
সকারণ মান যায় উচিত কল্পনে।
'সাম,' 'ভেদক্রিয়া,' 'দান,' 'নতি' উপেক্ষণে॥
রসান্তর হৈলে হয় মানের বিনাশ।
মান নাশে অশ্রু নেত্রে, মুখে মৃদু হাস॥

(১২৩)

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায়॥
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায়॥

ক্ষেণে চমকিত অঙ্গ ধরণে না যায়।
মানভাব গোরাচাঁদের বাসু ঘোষ গায়॥ তরু ৫২৫

(১২৪)

না কহ না কহ সখি, না কহিও আর।
সকল ছাড়িয়া যারে সার করিয়াছি গো
সে ত না হইল আপনার॥
কুল শীল তেয়াগিয়া যার নাম ধেয়াইয়া
জাগি নিশি বসিয়া কাননে।
সে জন আমারে ছাড়ি আনে বিলসয়ে গো
এত কিয়ে সহয়ে পরাণে॥
আমি ত অবলা জাতি আর তাহে কুলবতী
আমরা কি প্রেম-অনুরাগী।
কত প্রেমবতী সনে তাহারি বিলাস গো
সে কেনে মরিবে মোর লাগি॥
শুনিয়া কহয়ে দূতী করযোড়ে করি নতি
ক্ষেম ধনি সব অপরাধ।
কানুরাম দাস কয় মিলন উচিত হয়
প্রেমে পড়িবে পাছে বাদ॥
তরু ২০৪৭

(১২৫)

চল চল ঢিঠ মিঠ-রস-বঞ্চক
চাতুরী রহু তুয়া ঠামে।
কৈতব বচন- রচনে যব ভুলনু
বুঝনু তুয়া পরিণামে॥
মঞ্জুল হাস ভাষ মৃদু বোলনি
দোলনি নয়ন সন্ধান।

প্রেম-প্রণালী তুহুঁ ভালে জানসি
বৈছন অমিয়া-সিনান ॥
করকা-কাঁতিপাঁতি হাম হেরইতে
ধাওলুঁ মাণিক আশে।
পাণিকো পরশে ডালি পয়ে দূরে গেও
রহল লোক উপহাসে ॥
বিষকো কটোর থোর দধি উপর
দেওল দারুণ ধাতা।
কপটহিঁ প্রেম পহিলে হাম না বুঝনু
অনন্ত কহে গুণগাথা। ক্ষণদা ৯।৮

টীকা—যাও, যাও ধৃষ্ট (ঢিঠ), তুমি মিষ্ট রস দিয়া প্রবঞ্চনা কর; তোমার ছলনা তোমার কাছেই থাক। তোমার মতন ছলের কথার ফাঁদে যখন ভুলিয়াছি, তখনই পরিণামে কি হইবে বুঝিতেছি। সুন্দর হাসি, মৃদুস্বরে কথা বলা, নয়ন নাচাইয়া কটাক্ষ করা, এ সব ভালবাসার ঢং তুমি খুব ভালই জান; প্রথমে মনে হয়, যেন অমৃত-সরোবরে স্নান করিতেছি। করকা অর্থাৎ শিলার কান্তিপংক্তি (সমূহ) দেখিয়া মনে হইয়াছিল, উহা বুঝি মণিমাণিক্য, তাই উহা পাইবার আশায় দৌড়াইয়াছিলাম। কিন্তু হাত দিতেই উপহারের পাত্রের উপর হইতে সব চলিয়া গেল; শুধু লোকের উপহাস মাত্রই রহিয়া গেল। যেন নিদারুণ বিধাতা প্রবঞ্চনা করিবার জন্যই বিষের বাটির উপর একটু দধি রাখিয়া দিয়াছেন।

(১২৬)

ধনি তুহুঁ দূতি! ধনি তুয়া কান।
ধনি ধনি সো পিরীতি ধনি পাঁচ-বাণ ॥
বিধি মোহে কতই কুবুধি কিয়ে দেল।
দুহুঁ-কুল-দুরযশ-রব রহি গেল ॥
না কহ না কহ ধনি কানুপরথাব।
ঐছন পিরীতি দ্বিগুণ দুখ লাভ ॥

পহিলে মিলন মধু-মাখন বাণী।
গগনকো চাঁদ হাতে দিল আনি॥
অব অবধারলুঁ বুঝনু নিদান।
কপট পিরীতি কিয়ে রহে পরিণাম॥
মনকো-মনোরথ মনে ভেল দূর।
যদুনাথ দাস কহে আরতি না পূর॥ ক্ষণদা ৯।৪

টীকা—ধনি—ধন্য। দূতি! তুমি ধন্য, তোমার কানুও ধন্য। ধন্য ধন্য সেই প্রেম, আর ধন্য পঞ্চবাণ (কামদেব)। মোহে—আমাকে। বিধাতা আমাকে কি দুষ্টবুদ্ধি দিল যে, তাহার সঙ্গে প্রেম করিলাম! তাহার ফলে শুধু দুই কুলে (পিতৃকুলে ও শ্বশুরকুলে) কলঙ্কধ্বনি রহিয়া গেল।

কানুপরথাব—কানুর প্রস্তাব, কানুর কথা। ঐরূপ ভালবাসায় যতটুকু সুখ পাওয়া যায়, তাহার দুইগুণ হয় দুঃখ। প্রথম মিলনের সময় কত মধুমাখা কথা, যেন আকাশের চাঁদ হাতে আনিয়া দিল। এখন নিশ্চয় করিয়া জানিলাম যে, আমার নিদান বা শেষ অবস্থা নিকট। কপটের ভালবাসা কি কখনও স্থায়ী হয়? মনের অভিলাষ মনের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেল। যদুনাথ দাস বলেন যে, আর্ত্তি পূর্ণ হইল না।

(১২৭)

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি॥২
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥৪
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥৬
তুয়া রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পরচিত-চোর॥৮
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
বিহি নিরমিল তুহে পিরিতি-পুতলী॥১০

এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানে কার মন ॥১২

তরু ৪৪৬।৫১৩

১২২ সংখ্যক পদের ১২ হইতে ১৬ চরণের সঙ্গে এই পদের দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ ও ষষ্ঠ চরণের মিল দেখা যায়।

(১২৮)

মানিনি, দূর কর দারুণ মানে।
তুয়া বিনে মোহন চীত পুতলি সম
তেজল ভোজন পানে॥
কোমল অমল শেজ কুসুম-দল
তুয়া বিনু তেজল শয়ান।
গন্ধ চতুঃসম অঙ্গ-বিলেপন
তেজল তাম্বুল বয়ান॥
কত কত যুবতী যূথ-শত সেবই
তাহে যে বোধ না মানে।
সো তুয়া লাগি অব সতত উতাপিত
মুন্দি রহত দুই নয়ানে॥
এ ধনি রমণি- শিরোমণি মানিনি
কিয়ে তুয়া মানক কাঁতি।
রায় বসন্ত কত তোঁহে বুঝায়ব
নাহ দেখিলুঁ এক ভাতি॥

তরু ৫৫২

টীকা—এটি দূতীর উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ তোমার জন্য অন্ন জল (ভোজন পান) ত্যাগ করিয়াছেন ; তুমি সেই মোহনের চিত্তপুত্তলির তুল্য।

নাহ দেখিলুঁ এক ভাতি—নাথকে এক কৌশলে দেখিয়া আসিলাম। শ্রীরাধার দূতী নিজেকে প্রকাশ না করিয়া, কৌশলে অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা দেখিয়া আসিয়া বলিতেছেন।

(১২৯)

না বোল না বোল কানুর বোল
ও কথা নাহিক মানি।
বিষম কপট তাহার প্রেম
ভালে ভালে হাম জানি॥
নিকুঞ্জ কাননে সঙ্কেত করিয়া
তাহাঁ জাগাইল মোরে।
আন ধনি সনে সে নিশি বঞ্চিয়া
বিহানে মিলল দূরে॥
সিন্দুর কাজর সব অঙ্গ পর
কপটে মিনতি কেল।
ছল করি শির- সিন্দুর কাজর
আমার চরণে দেল॥
শতগুণ হিয়া- আনল জ্বালিল
চলিয়া আইলুঁ বাস।
এহেন শঠের বদন না হের
কহয়ে অনন্তদাস॥

তরু ৫৫৪

(১৩০)

ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি ও সব জঞ্জাল।
তোমার কানুরে মোর শতেক নমস্কার॥
অমল কুলেতে কালি যেমত দিয়াছি গো
তেমতি পাইলুঁ পুরস্কার॥
গুরু-ভয় তেয়াগিলুঁ লাজে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
তেজিলুঁ গৃহের সুখসাধ।
সখি, দোষ দিব কারে এতেকে না পাইলুঁ তারে
বিধাতা সাধিলে তাহে বাদ॥

যত্ন করি রুপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সিঁচি আঁখিজলে।
কেমন বিধাতা সে এমতি করিল গো
অমিয়া-বিরিখে বিষ ফলে॥
বংশীবদন দাস ছাড়ি নিদারুণ আশ
তেজহ দারুণ অভিমান।
তোমা বিনে সেই কানু ক্ষেণে ক্ষেণে ক্ষীণ তনু
দাবানলে দহে যেন প্রাণ॥

পদামৃতসমুদ্র পৃঃ ২০২

(১৩১)

রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরি
মীলল কানুক পাশ।
পন্থক শ্রম-ভরে বচন কহে গদগদ
খরতর বহই নিশাস॥
মাধব ! দুর্জ্জয় মানিনি মানি।
বিপরিত চরিত হেরি ভেল চমকিত
না ফুরয়ে এক আধ বাণী॥
'কা' বোল বোলইতে শুনই না পারই
শ্রবণ মুদয়ে দুই পাণি।
জৈমিনি জৈমিনি পুন পুন ফুকরই
বজর শবদ সম মানি॥
তুয়া গুণ নাম শ্রবণে নাহি শুনয়ে
তুয়া রূপ রিপু-সম জানি।
তুয়া নিজ জন সঞে সম্ভাষ না করয়ে
কৈছে মিলায়ব আনি॥
নীল বসন বর নীল চুড়ি কর
পৌতিক মাল উতারি।

করি-রদ চুড়ি কর মোতি-মাল বর
পহিরণ অরুণিম শাড়ী ॥
অসিত চিত্র এক উরপর আছিল
মিটায়ল চন্দন লাগাই।
মৃগমদ তীলক ধোই দৃগঞ্চল
কুচ-মুখ চন্দনে ছাপাই ॥
চারু চিবুক পর এক তিল আছিল
নিন্দি মধুপ-সুত শ্যামা।
তৃণ অগ্রে করি মলয়জে রঞ্জল
সবহুঁ ছাপায়লি রামা ॥
জলধর হেরি চন্দ্রাতপে ঝাঁপল
শ্যামরি সখি নাহি পাশ।
তমাল তরুগণে চূণে লেপায়ল
শিখি পিক্ দূরে নিবাস ॥
তুয়া গুণ বোলত এক শুক পণ্ডিত
শুনি তহিঁ উঠি রোষই।
পঞ্জর ঝটকি ফটকি কর পটকিতে
ধাই ধরল হাম যাই ॥
মধুকর ডরে ধনি চম্পক তরুতলে
লোচনে জল ভরিপূর।
শ্যাম চিকুর হেরি মুকুর করে পটকল
টুটি ভৈগেল শতচূর ॥
মেরু সম মান কোপ সুমেরু-সম
দেখি ভেল রেণু সমান।
চম্পাতিপতি অব রাই মানাইতে
আপ সিধারহ কান ॥ তরু ৪৮২

টীকা—রাধার নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়া সখী কানুর কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল। সে খুব তাড়াতাড়ি গিয়াছিল বলিয়া তাহার খুব পরিশ্রম হইয়াছিল,

তাহার নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছিল ও তাহার বাক্য গদগদ হইয়াছিল। সে বলিল—মাধব! রাধার মান তো দুর্জ্জয় মনে হইতেছে। তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম—কোন কথা আর বলিতে পারিলাম না। সে তোমার উপর এতই রাগ করিয়াছে যে, কাল নাম দূরে থাকুক—কা শব্দও শুনিতে পারে না। যদি দৈবাৎ কেহ উহা উচ্চারণ করে তো সে দুই কানে হাত দিয়া বন্ধ করে। বজ্রপাত নিবারণের ভয়ে যেমন লোকে জৈমিনি স্মরণ করে, তেমনি কা শব্দকে বজ্র-তুল্য মনে করিয়া সে জৈমিনি জৈমিনি শব্দ বারংবার বলে। তোমার গুণ সে কানে শুনে না; তোমার রূপকে শত্রুর মতন মনে করে। তোমার যাহারা আপন জন, তাহাদের সঙ্গে কথা বলে না। এমন অবস্থায় তাহার সঙ্গে কি করিয়া মিলন ঘটাইব বল? তাহার পরণের নীল শাড়ী, হাতের নীল চুড়ি ও পুঁতির মালা দূরে সরাইয়া দিয়া হাতে হাতীর দাঁতের চুড়ি, গলায় সাদা মোতির মালা ও পরণে লাল শাড়ী লইয়াছে! তাহার বুকের উপর আঁকা এক কাল ছবি ছিল, তাহা চন্দন দিয়া ঢাকিয়া মুছিয়া দিয়াছে। নয়নকোণে ও কুচের মুখে কাল মৃগমদকস্তুরি ছিল, তাহা ধুইয়া চন্দন লাগাইয়াছে। তাহার সুন্দর চিবুকের উপর এক কাল তিল ছিল, যাহা ভ্রমরকেও রূপে পরাজিত করে। কিন্তু তৃণের মাথায় চন্দন দিয়া সেই কাল তিল ঢাকিয়া ফেলিল। আকাশের মেঘের রং তোমার রংয়ের মতন বলিয়া চন্দ্রাতপ খাটাইল, যাহাতে মেঘের দিকে দৃষ্টি না পড়ে। কোন কাল রংয়ের সখীকে কাছে যাইতে দেয় না। তমাল গাছগুলি চুন দিয়া সাদা করিল; কোকিল ও ময়ূরগুলি দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে। একটি পণ্ডিত টিয়াপাখী—তোমার গুণ গান করিত, তাহার উপর রাগ করিয়া তাহার খাঁচা আছড়াইয়া ফেলিতে যাইতেছিল। আমি দৌড়াইয়া যাইয়া ধরিলাম। কাল রূপ দেখিবে না বলিয়া রাধা ভ্রমরের ভয়ে চম্পকতরুর তলায় পলায়ন করে—অথচ ভ্রমর তাহার পিছে পিছে ধাওয়া করে, সেই জন্য তাহার চোখে জল আসে। নিজের কাল চুল দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া দর্পণ আছড়াইয়া টুকরা টুকরা করিল। তাহার মানের চেয়ে এখন ক্রোধই বেশী হইয়াছে। তাই তুমি নিজে যাইয়া চেষ্টা কর, তাহাকে শান্ত করিতে পার কি না।

(১৩২)

প্রেম-আগুনি মনহিঁ গুনি গুনি
এ দিন যামিনী জাগি রে।
মদন-পঞ্জর কুঞ্জে রোয়ই
তোহারি রস-কণ লাগি রে॥
কি ফল মানিনি মান মানসি
কানু জানসি তোরি রে।
তুহুঁ সে জলধর অঙ্গে শোহসি
তুলহ দামিনী গোরী রে॥
নওল-কিশলয়- বলয় মলয়জ-
পঙ্ক পঙ্কজ-পাত রে।
শয়ন ছটফটি লুঠই ভূতলে
তো বিনু দহ দহ গাত রে॥
জানি পুন পুন ও পিয়া পরীখসি
পূজই পহুঁ পাঁচ-বাণ রে।
রায় চম্পতি এ রস গাহক
দাস গোবিন্দ গান রে।

ক্ষণদা ৯।৩

তরু ৫৩৮

তরুর ভণিতা— প্রাত আদিত ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

টীকা—প্রেমরূপ অগ্নির কথা মনে মনে ভাবিয়া ভাবিয়া কৃষ্ণের চোখে নিদ্রা নাই; তিনি দিন রাত্রি জাগিয়া আছেন। তিনি কুঞ্জে বসিয়া তোমার এক বিন্দু প্রেমের জন্য কাঁদিতেছেন—কুঞ্জ যেন মদনের কারাগার (পঞ্জর)স্বরূপ হইয়াছে, তাই তিনি সেখান হইতে বাহির হইতে পারিতেছেন না—সুখস্মৃতি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কানু তোমার ছাড়া আর কাহারও নয়, এ কথা জানিয়াও তুমি কেন মান করিয়া আছ? সেই জলধর শ্যামের অঙ্গে তুমি গৌরী দুর্লভ বিদ্যুতের মতন শোভা পাও।

কৃষ্ণ তোমার বিরহে নব কিশলয় ও পদ্মপত্র বিছাইয়া দেহে চন্দন লেপন করিতেছেন, তথাপি তাঁহার দেহ শীতল হইতেছে না; পুড়িয়া যাইতেছে। তুমি সব জানিয়া বুঝিয়াও সেই প্রিয়তমকে কেন বারংবার পরীক্ষা কর। গোবিন্দদাস গান করিয়া বলিতেছেন যে, রায় চম্পতি এই রসের গ্রাহক।

গোবিন্দদাসের 'তু বিনু সুখময় শেজ তেজল' ইত্যাদি পদের ভণিতাতেও রায় চম্পতির উল্লেখ আছে—

রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

রায় চম্পতি শ্রীরাধার দুর্জ্জয় মানের পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া গোবিন্দদাস এখানে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৩৩)

আলো ধনি, সুন্দরি, কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব॥
তোমার মিল মোরন পুণ্যপুঞ্জ রাশি।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি॥
আনন্দমন্দির তুমি, জ্ঞানশকতি।
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা-মূরতি॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধানাম॥
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥ তরু ২৯৫৫

এই পদটির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিদ্যাপতির কোন পদে প্রকাশ পাইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহার কয়েকটি সম্বোধন চমৎকার। রাধাকে যে কৃষ্ণ বলিতেছেন—তুমি আমার কামনার মূর্ত্তি, আমার মূর্ত্তিমতী কামনা—অর্থাৎ তুমি আমার মনের একটি বাসনা মাত্র, রাধারূপে প্রকাশ পাইতেছ, ইহা কি সুন্দর! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পরিলে আমার শরীর তৃপ্ত হয়; না, তুমি তাহারো

অধিক—তুমি আমার শরীর, আমাতে তোমাতে প্রভেদ আর নাই—না, শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও অধিক, তুমি আমার প্রাণ, সর্ব্বশরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, যাহার আবির্ভাবে শরীর বাঁচিয়া আছে, শরীরে চৈতন্য আছে, তুমি সেই প্রাণ; রায় বসন্ত কহিলেন, না, তুমি তাহারও অধিক, তুমি প্রাণেরও গুরুতর, তুমি বুঝি প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, তুমি আছ বলিয়াই বুঝি প্রাণ আছে। ঐ যে বলা হইয়াছে "মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি", ইহাতে হাসির মাধুর্য্য কি সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে। বসন্তের বাতাসটি গায়ে যেমন করিয়া লাগে, সুদূর বাঁশীর ধ্বনি কানের কাছে যেমন করিয়া মরিয়া যায়, পদ্মমৃণাল কাঁপিয়া সরোবরে একটুখানি তরঙ্গ উঠিলে তাহা যেমন করিয়া তীরের কাছে আসিয়া মিলাইয়া যায়, তেমনি একটুখানি হাসি—অতি মধুর, অতি মৃদু একটি হাসি মরমে আসিয়া লাগিতেছে; বাতাসটি গায়ে লাগিলে যেমন ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া আসে, তেমনিতর বোধ হইতেছে! হাসি কি কেবল দেখাই যায়? হাসি ফুলের গন্ধটির মত প্রাণের মধ্যে আসিয়া লাগে। (রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী, হিতবাদী-সং, পৃঃ ১১০৬—৭)।

(১৩৪)

রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দসিন্ধু॥
ভাঙ্গল মান রোদনহি ভোর।
কানু কমল-করে মোছই লোর॥
মান জনিত দুখ সব দূর গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুহুঁ জন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি বিলাস।
দূরহি নেহারত নরোত্তম দাস।

তরু ৪৬১

ত্রয়োদশ স্তবক

কলহান্তরিতা

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা॥
অস্যাঃ প্রলাপ-সন্তাপ-গ্লানি-নিঃশ্বসিতাদয়ঃ॥

উজ্জ্বলনীলমণি, ৫।৮৭

খণ্ডিতা হইয়া করে পতির তাড়ন।
পশ্চাত হৃদয়ে তাপ পায় অনুক্ষণ॥
প্রলাপ, নিশ্বাস, গ্লানি, সন্তাপিত মন।
কলহান্তরিতা তারে কহে কবিগণ॥

(১৩৫)

কনক চম্পক গোরাচান্দে।
ভূমেতে পড়িয়া কেন কান্দে॥
ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি।
কে করিল আমারে বাউরি॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি॥
কহে ধিক্ বিধির বিধানে।
এমত যোটনা করে কেনে॥
কোন ভাবে কহে গোরারায়।
নরহরি সাধিয়া বেড়ায়॥ তরু ৮০৯

(১৩৬)

আন্ধল প্রেম পহিলে নাহি জানলো[১]
সো বহুবল্লভ কান।

পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুতে পাঠান্তর—(১) হেরলুঁ,

আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জ্বলত পরাণ ॥
সজনি, তোহে কহোঁ[২] মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনী রোখই
সো তাপিনী জগ মাহ ॥
যো হাম মান বহুত করি মানলো
কাহ্নুক পীরিতি[৩] উপেখি ॥
সো মনসিজশরে তনু[৪] মন জারল
তাকর দরশ না দেখি ॥
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন[৫] ভেল সন্দেহ।
গোবিন্দ দাস কহ[৬] সতি ভামিনি
ঐছন কাহ্নুক লেহ ॥

রসকলিকা, পৃ. ৩৭-৩৮

পদামৃতসমুদ্র ১৮৩ পৃঃ, তরু ৪৩৩

টীকা—আন্ধল—অন্ধ হইয়া। প্রেমে অন্ধ হইয়া আমি প্রথমে জানিতে পারি নাই যে, কৃষ্ণ শুধু একার আমার নহে, তিনি বহুবল্লভ। আদর বাড়িবে আশা করিয়া তাঁহার সহিত কলহ করিয়া এখন আমার দিবারাত্র প্রাণ জ্বলিতেছে। সখি! তোমাকে আমার অন্তরের দাহের কথা বলি। কানাইয়ের দোষ দেখিয়া যে সুন্দরী রাগ করে, সে পৃথিবীর মধ্যে সত্যই সন্তপ্তা। আমি কানাইয়ের প্রেম উপেক্ষা করিয়া নিজের মানকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলাম, আর এখন কামদেবের শরে দেহ মন জ্বলিয়া গেল; কেন না, তাহাকে এখন দেখিতে পাইতেছি না। আমার মান তো দূরে গিয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য ও লজ্জাও গিয়াছে। ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না বলিয়াই তোমাকে সব বলিতেছি। এখন আমার জীবনও থাকে কি না সন্দেহ। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, সত্যই সুন্দরি, কানাইয়ের প্রেমের স্বরূপই ঐ।

(২) কহি—তরু, (৩) মিনতি, (৪) ভেল জরজর, (৫) রহত, (৬) কহই।

(১৩৭)

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই
হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই
প্রেম করই জনি মান॥
সজনি, অতয়ে মানিয়ে নিজ দোখ।
মান দগধ জিউ অব নাহি নিকসয়ে
কানু সঞে কি করব রোখ॥
যো মঝু চরণ- পরশ-রস-লালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল।
তাকর দরশন বিনে তনু জর জর
পরশ পরশ সম ভেল॥
সহচরি মোহে লাখ সমুঝায়ল
তাহে না রোপলুঁ কান।
গোবিন্দ দাস সরস বচনামৃত
পুন বাহুড়ায়ব কান॥

পদামৃতসমুদ্র পৃঃ ১৮৬, তরু ৪৩৪

টীকা—কোন কুলবতী রমণী যেন কোন পরপুরুষকে নয়নে দেখে না; যদি দেখেই, তাহা হইলেও কৃষ্ণকে যেন না দেখে। আর কৃষ্ণকেই দেখিয়া ফেলিলেও, তাহার সহিত যেন প্রেম না করে। আর প্রেম যদি করেও, তাহাতে আবার মান যেন না করে। সখি! অতএব আমি নিজের দোষ মানিয়া লইতেছি। আমার মান-সন্তপ্ত প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না। কৃষ্ণের প্রতি কি রাগ করা যায়? যে আমার চরণের স্পর্শ লাভ করিবার জন্য আমাকে লক্ষ মিনতি জানাইল, তাহার দেখা না পাইয়া এখন আমার দেহ জরজর হইল। এখন তাহার স্পর্শলাভ স্পর্শমণির স্পর্শের মতন দুর্লভ হইল দেখিতেছি। সখী আমাকে কত বুঝাইল, সে কথা কানে তুলিলাম না! গোবিন্দদাস সরস বচনামৃত বলিতেছেন—কানাই তোমার আবার ফিরিয়া আসিবে।

(১৩৮)

শুনইতে কানু- মুরলি-রব মাধুরি
শ্রবণে নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলুঁ
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি, তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়বি
জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপ লালসে
কাঁহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাবণি
জিবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম জলদ রস আশে।
সো অব নয়ন- নীর দেই সীচহ
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥

পদামৃতসমুদ্র ১৮৬
তরু ৪৩৫

টীকা—সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—তুমি প্রথম যখন মুরলির মধুর ধ্বনি শুনিলে, তখনি তোমার কান হাত দিয়া ঢাকিয়া দিয়া তোমাকে নিবারণ করিয়াছিলাম। তার পর যখন তুমি কানাইয়ের রূপ দেখিলে, তখনও তোমার চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি মুগ্ধা হইয়া আমাকে বাধা দিলে। সুন্দরি! সেই সময়ই তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, ভ্রমেও তাহার সঙ্গে যদি প্রেম কর, তাহা হইলে সারা জীবন কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে। তাহার গুণ পরীক্ষা না করিয়া কেবল রূপের লালসায় নিজের দেহ সমর্পণ করিলে, এখন প্রতিদিন এই রূপলাবণ্য তোমার ক্ষীণ হইতেছে, প্রাণেও বাঁচ কি না সন্দেহ। তুমি হৃদয়ে যে প্রেমতরু রোপণ করিয়াছিলে, ভাবিয়াছিলে যে, শ্যামরূপ মেঘ উহাকে জল দিয়া বর্দ্ধিত

করিবে, সেই তরুকে এখন চোখের জল দিয়া সিঞ্চন কর—এই কথা গোবিন্দদাস বলেন।

(১৩৯)

চরণে লাগি হরি হার পিন্ধায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাথ।
সো নহি পহিরলুঁ দূরহি ডারলুঁ
মানিনি অবনত মাথ॥
সজনি, কাহে মোহে দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব
রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥
গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটি নেহারি।
হাতক লছিমি চরণ পর ডারলুঁ
অব কি করব পরকারি॥
সো বহু-বল্লভ সহজই দুর্ল্লভ
দরশ লাগি মন ঝূর।
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
তবহিঁ মনোরথ পূর।

তরু ৪৩৬

টীকা—শ্রীকৃষ্ণ অতি যত্নের সহিত নিজের হাতে মালা গাঁথিয়া আমার পায়ে পড়িয়া তাহা পরাইবার জন্য সাধিলেন, আমি তাহা পরিলাম না, দূর করিয়া ফেলিয়া দিলাম, তখন মানিনী হইয়া মাথা নীচু করিয়া ছিলাম। সখি! আমার এমন দুর্বুদ্ধি কেন হইল? আমার পোড়া মানের ফলে বিদগ্ধ (রসিক, অন্য অর্থে তিনিও বিশেষরূপে দগ্ধ হইলেন) মাধব রাগ করিয়া আমার প্রতি বিমুখ হইল। আমার নাথ, যিনি গিরি ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি আমার বাহু ধরিয়া কত সাধিলেন, আমি একবার ফিরিয়া তাকাইলাম না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলাম, এখন কি করি বল।

সেই কৃষ্ণ বহুবল্লভ, সুতরাং সহজেই তিনি দুর্লভ; তাঁহার দেখা পাইবার জন্য আমার মন কাঁদিতেছে। গোবিন্দদাস যখন যত্ন করিয়া উভয়ের মিলন ঘটাইবেন, তখনই তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।

এই পদটিতে গীতাবলীর নিম্নলিখিত পদটির প্রভাব দেখা যায়—

সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্।
যদভজমিহ নহি গোকুলবীরম্॥
নাকর্ণয়মপি সুহৃদুপদেশম্।
মাধবচাটুপটলমপি লেশম্॥
নালোকয়মর্পিতমুরু হারম্।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্॥
হন্ত সনাতনগুণমভিযান্তম্।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তম্॥

—হে সখি! আমার অধীর হৃদয় অবসন্ন হইতেছে। আমি গোকুলবীরকে ভজিলাম না; মাধবের প্রণয়পূর্ণ চাটুবাক্যেও কর্ণপাত করিলাম না। দয়িত আমার গলে বিশাল হার পরাইলেন, বার বার প্রণাম করিলেন, আমি কিন্তু একবার ফিরিয়াও দেখিলাম না। হায় হায়! সনাতন প্রাণকান্ত আসিয়া ফিরিয়া গেলেন, কেন আমি তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলাম না।

(১৪০)

তিল এক শয়নে সপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥
সজনী, সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল
সো সুখ করি বিছুরাই॥
তুহুঁ কাহে বিরস বচনে মোহে মারসি
ডারসি শোককি কূপে।

মুরছিত জনে ঘা- তন নহে সমুচিত
জগজন কহব বিরূপে ॥
ভাঙ্গল মান সবহুঁ জনগঞ্জন
পিরিতি পিরিতি করি বাধা।
রসিক সুনাহ আপনে সুখ পায়ব
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা ॥
সো মুখ-চান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দি-বিষ-হ্রদ-নীরে।
পামরি গোবিন্দ- দাস মরি যায়ব
সাজি আনল তছু তীরে ॥ তরু ৪৪০

এই পদটি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর। কেন না, তিনিই নামের আগে 'পামরি' শব্দের প্রয়োগ করিতেন—গোবিন্দদাস কবিরাজ কোন পদে ঐরূপ বিশেষণ বা 'গোবিন্দদাসিয়া' নাম প্রয়োগ করেন নাই। পদটিতে কৃত্রিমতার চিহ্ন বিদ্যমান। প্রথম কলিটির অর্থ হইবে এই যে—আমার সঙ্গে শয়ন করিয়াও স্বপ্নে আমার সহিত এক তিলের জন্য বিচ্ছেদ হইয়াছে দেখিয়া, জাগিয়া উঠিয়া আমাকে চমকিয়া কোলে করে এবং ঘন ঘন চুম্বন ও নিবিড় আলিঙ্গন দিতে দিতে অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করে।

দ্বিতীয় কলিতে 'সো সুখ করি বিছুরাই' দুইটি ক্রিয়াপদের ব্যবহার কাব্যশক্তির দীনতাজ্ঞাপক—উহার অর্থ 'সেই সুখ ভুলিয়া যাইয়া'।

(১৪১)

কি কহিলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহ।
ঐছন বচন কানু যব শূনব
জিবনে না বান্ধব থেহ ॥
তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী।
অনুচিত মানে দেহ যদি তেজবি
মরমহি বিরহ বিথারি।

কানুক চীত রীত হাম জানত
কবহুঁ নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাহে লাখ গারি দেয়সি
তবহুঁ রহত পথ চাই॥
ঐছন বোল না বোলবি সুন্দরি
কাহে পরমাদসি এহ।
গোবিন্দদাসক শপতি তোহে শত শত
যদি উদবেগ বাঢ়াহ॥ তরু ৪৪১

টীকা—জীবনে না বান্ধব থেহা—জীবনে আর স্থৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিবে না।

তুহুঁ যদি তাহে লাখ গারি···ইত্যাদি—তুমি যদি তাহাকে লাখ গালিও দাও, তাহা হইলেও সে তোমার পথ পানে চাহিয়া থাকে।

পরমাদসি—প্রমাদ ঘটাইতেছ।

(১৪২)

রাইক বিনয়- বচন শুনি সো সখি
চললহি শ্যামক আগে।
দূরহি তাক বদন হেরি মাধব
মানল আপন সোহাগে॥
অপরূপ প্রেমকি রীত।
আদর বিনহিঁ সোই বহু-বল্লভ
দোতি নিয়ড়ে উপনীত॥
দোতি কহত দুহুঁ কৈছন পীরিতি
রীত বুঝই নাহি পারি।
সো যদি মান ভরমে তোহে রোখল
তুহুঁ কাহে আয়লি ছাড়ি॥
আপনক দোষ জানসি যদি মন মাহা
কাহে বাঢ়ায়লি বাত।

গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব
আপ চলহ মঝু সাথ॥

তরু ৪৪৪

টীকা—রাইয়ের অনুনয় শুনিয়া সেই সখী শ্যামের নিকট চলিল। মাধব দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াই নিজের প্রেম নিবেদন সার্থক হইয়াছে জানিলেন। প্রেমের রীতি কি অদ্ভুত! যিনি বহুবল্লভ, তিনিও বিনা আদরে দূতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। দূতী বলিলেন—তোমাদের দুই জনের যে কেমন প্রেম, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে যদি মান করিয়া তোমার প্রতি রোষ প্রকাশ করিল, তুমি তাহাকে ছাড়িয়া আসিলে কেন? নিজের দোষ যদি মনে মনে বুঝিয়া থাক, তো আর কথা বাড়াও কেন? তুমি আমার সঙ্গে চল, গোবিন্দদাস নিজে তোমার জন্য রাধাকে সাধিবেন।

(১৪৩)

শুন শুন সজনি! কি কহব তোয়।
দরশন বিনু তনু ধরণ না হোয়॥
ধীরজ লাজ সবহুঁ গেও মিট।
হিয় মাহা বেধত মনমথ-কীট॥
তনু মন জীবন তাকর সাথ।
এত কহি মাথে ধয়ল সখীহাত॥
তুহুঁ বিনু কোই নাহি ইথে মোর।
বুঝি লেয়লু হাম শরণহি তোর॥
কহ কবি শেখর ধীরজ রহ শ্যাম।
কহি চলি আয়ল রাইক ঠাম॥ গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ৩৯২

(১৪৪)

রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণি লোটাই।

দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব
তবহুঁ বিমুখি ভেল রাই ॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত তুহুঁ ভালে জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি
হাম যায়ব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ ॥
এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহিঁ
তব নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল
রোই চলল তব কান ॥ তরু ৪৩০

টীকা—শ্রীকৃষ্ণ নানারূপ অনুনয় করিয়া রাধার দুই চরণ ধরিলেও, রাধা তাঁহার মুখ দেখিলেন না। তাহাতে গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, মিথ্যাই তিনি কানুকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তাঁহার হইয়া সাধিবেন। কানাই কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

(১৪৫)

কানু উপেখি রাই মহি লেখই মানিনি অবনত মাথ।
নিরুপম নারিবেশ করি সো হরি আয়ল সহচরি সাথ ॥
শুন সজনি, কি ফল মানিনি মানে।
ঢীট কানাই কতহু ভঙ্গি জানত কো করু কত অবধানে ॥
শামরি হেরি রাই সখি পুছত, সো কহু ব্রজনবরামা।
তুয়া সখি হোত যতনে চলি আয়লি, কোরে করহ ইহ শ্যামা ॥
করতহিঁ কোর পরশ সঞে জানল, কানুক কপট বিলাস।
নাসা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত, হেরত গোবিন্দদাস ॥
পদামৃতসমুদ্র, পৃঃ ২০০

টীকা—কানুকে উপেক্ষা করিয়া রাই মানিনীরূপে অবনত মাথায় মাটিতে লিখিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ অতুলনীয় নারীবেশ ধারণ করিয়া সখীর সহিত আসিলেন। সখী বলিলেন—শুন রাধে! আর মান করিয়া কি ফল? ধৃষ্ট কানাই কত ভঙ্গিই জানে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? এ দিকে রাধা শ্যামাকে দেখিয়া সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই নূতন ব্রজরামাটি কে? সখী উত্তর দিলেন—এ তোমার সখী হইবে বলিয়া যত্ন করিয়া আসিয়াছে, এই শ্যামাকে আলিঙ্গন দাও। আলিঙ্গন করিতেই স্পর্শ হইতে রাধা বুঝিলেন, এই কৃষ্ণের কপট বেশ। ইহা বুঝিয়া রাধা এমন জোরে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার ঠোঁট যেন নাসা স্পর্শ করিল, তাঁহার চোখও কুঞ্চিত হইল—ইহা গোবিন্দদাস দেখিতে পাইলেন।

(১৪৬)

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব উপমা।
কুবলয় চান্দ মিলন একু ঠামা॥
শ্যামর নাগর নাগরী গোরী।
নীলমণি কাঞ্চনে লাগল জোরি॥
নিবিড় আলিঙ্গনে পিরীতি রসাল।
কনকলতা যৈছে বেঢ়ল তমাল॥
রাই-পয়োধরে প্রিয়কর সাজ।
কুবলয়ে শম্ভু পূজল কামরাজ॥
রায় শেখর কহে নয়ন উল্লাস।
নব ঘন থির বিজুরী পরকাশ॥

ক্ষণদা ১৭।১২

চতুর্দ্দশ স্তবক

দান

চুঙ্গি বা octroi কর গ্রহণ করার রীতি মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল—এখনও কোন কোন সহরে জিনিষপত্র বেচিবার জন্য আনিলে তাহার উপর কর আদায় করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ দানী অর্থাৎ এই কর সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারী সাজিয়া গোপীদের নিকট হইতে কর চাহিতেছেন—এই লীলা লইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর দানলীলাকৌমুদী ও রঘুনাথ গোস্বামীর দানকেলি-চিন্তামণি রচিত হইয়াছে। দানলীলা সম্বন্ধে প্রাচীন কোষগ্রন্থে, অলঙ্কার শাস্ত্রে বা পুরাণে কিছু পাওয়া যায় না।

(১৪৭)

আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল॥
কি রসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী॥
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরের নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসু ঘোষ গান॥

ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৯৩৫
তরু ১৩৬৮

(১৪৮)

কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চস্বরে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল মথুরায় বেচিবারে॥

সাজাইয়া পসরা রাই দিল দাসীর মাথে।
চলিলা মথুরায় বিকে রঙ্গিয়া বড়াই সাথে॥
পথে যাইতে কহে কথা কানুপরসঙ্গ।
প্রেমে গরগর চিত পুলকিত অঙ্গ॥
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
চঞ্চল হরিণী যেন দীগ নেহারে॥
হের কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে॥
উহার উপরে শোভে নব ইন্দ্রধনু।
বড়াই বলে চিন না নন্দের বেটা কানু॥
মথুরায় বিকে যাইতে আর পথ নাই।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বশ্যাছে কানাই॥
বাসুদেব ঘোষ কহে দধির পসারিণি।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসিয়াছে দানী॥

তরু ১৩৬৯

টীকা—তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নবীন মেঘের মতন, আর তাঁহার পীত বসন যেন বিদ্যুতের মত। তাঁহার মাথায় ময়ূরের চূড়া দেখিয়া মনে হয়, যেন শ্যাম মেঘের উপর ইন্দ্রধনু উঠিয়াছে।

(১৪৯)

কহ লহু লহু জটিলার বহু
তোমারে সভাই জানে।
কহিতে কহিতে অনেক কহিছ
এত না গরব কেনে॥
পসরা লইয়া যাইছ চলিয়া
দানীরে না কর ভয়।
রাজকাজ করি দান সাধি ফিরি
এথা কিবা পরিচয়॥

এ রূপ যৌবনে নানা অভরণে
যাইছ মথুরা বিকে।
বুঝি দান নিব তবে যাইতে দিব
আমি ডরাইব কাকে॥
অমূল্য রতন করিয়া গোপন
রেখেছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ খসাই দেখাহ
ইথে কি আমার লাজে॥
এত কহি হরি দু বাহু পসারি
রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞানদাসে কয় কিবা কর ভয়
যাহ হাত ঠেলা দিয়া॥

তরু ১৩৭৮

টীকা—এথা কিবা পরিচয়—এখানে পরিচয়ের কথা তুলিয়া লাভ নাই; আমি রাজকাজ করি, পরিচিতের নিকটও কর লইতে আমি বাধ্য।

ইথে কি আমার লাজে—আমাকে লজ্জা করিয়া কি করিবে? আমাকে বরং কর্ত্তব্য পালনে সাহায্য কর, বুকের ভিতর কি লুকাইয়া রাখিয়াছ, খুলিয়া দেখাও।

(১৫০)

দানী কহে ফির ফির না শুনয়ে রাই।
বাহু পসারিয়া দানী রাখল তাই॥
কহে কিয়ে পসার বিথার দেখি এথা।
আগে বুঝি নিব দান পাছে কব কথা॥
যত আভরণ গায় বেশভূষা আছে।
সব লেখা করি দান দেহ মোর কাছে॥
নিতি নিতি গতাগতি করি এই ঠাঞি।
এ পথে মদনরাজ কভু শুন নাই॥

কত ভঙ্গে কথা কহ ভয় নাহি বাস।
রাজ অনুগত জনে হেরি পুন হাস॥
কাহার গরবে যাহ দিয়া বাহু নাড়া।
ভূষণ যৌবন ধন সব হবে হারা॥
বংশী কহয়ে বুঝি অরাজক হৈল।
পথে বাটোয়ারি করা নহিবেক ভাল॥ তরু ১৩৮৭

(১৫১)

না যাইও না যাইও রাই বৈস তরুমূলে।
আসিতে পায়্যাছ বেথা চরণ যুগলে॥
মণি মুকুতার দাম অঙ্গ ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি॥
চাঁদর কেশের বেণী দুলিছে কোমরে।
ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে॥
নীল উড়নির মাঝে মুখ শোভা করে।
সোনার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে॥
করিকুম্ভদন্ত জিনি কুচকুম্ভ গিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী॥
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল শোভে।
বিঁধিবেক ব্যাধ হেম হরিণির লোভে॥
সিন্দূরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়।
রবি শশি বলি মুখ রাহু গরাসয়॥
নলিনী দলন রাই তব মুখ করে।
ভ্রমর ছাড়িবে কেনে রস নাহি পিলে॥
তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে।
পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জনি পড়ে॥
বংশীবদন কহে কহিলে সে ভাল।
বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল॥ তরু ১৩৬০

টীকা :—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে নানারকমের বিপদ্ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। প্রথমতঃ রাধার মণিমুক্তা দেখিয়া চোর ডাকাতে সব লুঠ করিয়া লইবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার বেণী ঠিক সাপের মতন দেখাইতেছে ; ময়ূর সর্পভ্রমে উহা গিলিয়া খাইতে পারে। তৃতীয়তঃ তাঁহার মুখকে কমল মনে করিয়া ভ্রমরে দংশন করিতে পারে। চতুর্থতঃ করিকুম্ভের চেয়েও সুন্দর তাঁহার কুচকুম্ভ দেখিয়া সিংহ আক্রমণ করিতে পারে। পঞ্চমতঃ রাধার হরিণ-নয়ন দেখিয়া ব্যাধ হরিণী ভ্রমে শর সন্ধান করিতে পারে। ষষ্ঠতঃ তাঁহার মুখ চন্দ্রের মতন আর কপালের সিন্দূরের বিন্দু সূর্য্যের মতন, তাই রাহু এই রবি-শশীকে গিলিতে পারে। এই সব কারণে রাধার উচিত তরুতলে বসা।

(১৫২)

আজি নহে কালি নহে জানি বাপ পিতামহে
গোকুল নগরে নহে ঘাটী।
ঘৃত নবনীত দধি বেচি নিয়া নিরবধি
আজি তুমি কর মিছা হঠি॥
নিলাজ কানু পথ ছাড়, না কর বিরোধে।
বুঝিল তোমায় তিলেক নাহি বোধে॥
পাটে কংস নরবর অতি বড় খরতর
তারেও তোমার নাহি ডর॥
... ...
কি তোরে করিব ক্রোধ যশোদার অনুরোধ
সহিল সকল কুবচন।
যদি বল আর বার উচিত পাইবে তার
মাধবের স্বরূপ বচন॥

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, পৃঃ ৭২

(১৫৩)

হেন রূপে কেনে যাও মথুরার দিকে।
বিষম রাজার ভয়ে ঠেকিবা বিপাকে ॥
দিনকর-কিরণে মলিন মুখখানি।
হেরিয়া হেরিয়া মোর বিকল পরাণী ॥
বসিয়া তরুর ছায় করহ বিশ্রাম।
শ্রমজল বিন্দু যেন মুকুতার দাম ॥
বংশীবদনে কহে শুন হে নাগর।
বুঝিলাম বট তুমি রসের সাগর ॥

তরু ১৩৫৯

(১৫৪)

রাজা এথা থাকে কোথা কেবা সাধে দান।
কিবা চায় কিবা লয় কেবা করে আন ॥
কুলনারী হেরি হেরি ঠারে কও কথা।
সঙ্গে বুড়ী হাতে নড়ী ঘন নাড়ে মাথা ॥
এখনি যাইয়া কব গোকুল সমাজ।
কোথা যাবে দান সাধা কোথা যাবে সাজ ॥
কোথা পলাইয়া যাবে সুবল রাখাল।
তিলেকে ভাঙ্গিয়া যাবে সব ঠাকুরাল ॥
অতয়ে আমার বোলে হও সাবধান।
কুলবতী দেখি আর না করিও আন ॥
বংশীবদনে কহে কেবা শুনে কথা।
এখনি দেখিয়া লবে যেবা থাকে যথা ॥ তরু ১৩৮৮

(১৫৫)

হেদে হে নিলজ কানাই,
না কর এতেক চাতুরালী।

যে না জানে মানসতা তার আগে কহ কথা
মোর আগে বেকত সকলি ॥
বেড়াইলা গরু লৈয়া সে লাজ ফেলিলা ধুইয়া
এবে হৈলা দানী মহাশয়।
কদম্ব তলায় থানা রাজপথ কর মানা
দিনে দিনে বাড়িল বিষয় ॥
আন্ধার বরণ কাল গা ভূমেতে না পড়ে পা
কুল-বধূ সনে পরিহাস।
এ রূপ নিরখিয়া আপনাকে চাও দেখি
আই আই লাজ নাহি বাস ॥
মা তোমার যশোদা তার মুখে নাহি রা
নন্দ ঘোষ অকলঙ্ক নিধি।
জনমিয়া তার বংশে কাজ কর জিনি কংসে
এ বুদ্ধি তোমারে দিল বিধি ॥
একই নগরে ঘর দেখাশুনা আটপর
তিল আধ নাহি আঁখিলাজ।
রায় শেখরে কয় রাজারে না করে ভয়
এ দেশে বসতি কিবা কাজ ॥ তরু ১৩৭৭

(১৫৬)

সহজই তনু তিরিভঙ্গ।
এমন হইয়া এত রঙ্গ ॥
যবে তুমি সুন্দর হইতা।
তবে নাকি কাহারে থুইতা ॥
আপনা চতুর হেন বাস।
কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাস ॥
চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ।
পরনারী দেখিয়া না কাঁপ ॥

না জানি মরমে কিবা ভাবো।
তেঞি সে বাতাসে রসে ডুবো ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম।
আপনা না ভাব অনুপাম ॥

তরু ১৪০০

টীকা—থুইতা—রাখিতে? সঘনে আঁখি চাপ—কটাক্ষ কর। বাতাসে রসে ডুবো—আমাদের নিকট হইতে কোন ইঙ্গিত না পাইয়াও নিজের মনেই রসে ডুবিতেছ।

(১৫৭)

এই মনে বনে দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজবালা সনে
না জানি কিসের রঙ্গ ॥
গিরি গিয়া যদি আরধনা কর
সেবহ শঙ্কর দেবে।
সতত অরণ্যে শরণ শৈলজা
পূজা কর এক ভাবে ॥
জলধি জাহ্নবী- সঙ্গম নিকটে
সঙ্কটে কামনা কর।
তবু বৃষভানু- নন্দিনী নিচোল
অঞ্চল ছুঁইতে নার ॥
অলপে অলপে সঘনে সঘনে
বচন রচহ মিঠ।
সব আভরণ থাকিতে হিয়ার
হারে বাড়াইছ দিঠ ॥
মদনে আকুল আপন দুকুল
কি লাগি কলঙ্ক কর।

জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত নহিলে
কি লাগি বাহু পসার ॥

লহরী, পৃঃ ২৩৩

পদামৃতসমুদ্রে ও তরুতে (১৩৪১) এই পদের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য-যুক্ত একটি পদ গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। প্রথম দুই চরণের সঙ্গে ঐ পদের অনেক মিল আছে ; কিন্তু তাহার পর

এমন আচর নাহি কর ভর
ঘনাঞা আসিছ কাছে।…ইত্যাদি আছে।

(১৫৮)

বান্ধিয়া চিকণ চূড়া বনফল তাহে বেড়া
গুঞ্জামালা তাহে বল সোনা।
গোঠে থাক ধেনু রাখ আপনা নাহিক দেখ
বড় হেন বাসহ আপনা ॥
অহে কানাই, বিষয় পাইয়া হৈলা ভোরা।
আঁখি মটকিয়া হাস আপনা কেমন বাস
আন হেন নহি যে আমরা ॥
গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজভয় নাহি মান কংস দরবার জান
দেখি কেনে নহ একপাশ ॥
চতুর চাতুরী কত আর কহ অবিরত
কাচে কর কাঞ্চন সমান।
শুনি জ্ঞানদাস কহ হিয়ায় কষিয়া লহ
কাচ নহে কষটি পাষাণ ॥

তরু ১৩৮৯

টীকা—বিষয় পাইয়া হৈলা ভোরা—বিষয় সম্পত্তি পাইয়া মদমত্ত হইয়াছ। আন হেন নহিক আমরা—আমরা অন্য মেয়ের মতন সহজলভ্য নহি।

তৃতীয় ভাগ

(খ)

পঞ্চদশ স্তবক

নৌকাবিলাস

শ্রীকৃষ্ণদাসের "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে" আছে—

"দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে॥"

পৃঃ ১৩৭

প্রচলিত হরিবংশেও দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড নাই। ভবানন্দের হরিবংশে দানলীলা আছে, কিন্তু নৌকাবিলাস নাই। শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে বারটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নৌকাবিলাস বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে চারিটি শ্রীরূপের নিজের রচনা, একটি সঞ্জয় কবিশেখরের, একটি জগদানন্দ রায়ের, একটি সূর্য্যদাসের, দুইটি মনোহরের, একটি মুকুন্দ ভট্টাচার্য্যের এবং দুইটি অজ্ঞাতনামা কবির রচনা। ইঁহারা প্রায় সকলেই শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বেও নৌকাখণ্ডের যে প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রাকৃতপৈঙ্গলের নিম্নলিখিত পদটিতে—

আরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি।
তুহঁ এখনই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি॥

আরে রে কৃষ্ণ! নৌকা বাও। নৌকা ডগমগ (টলমল) করা ছাড়িয়া দাও, আমাদের দুর্গতি করিও না। তুমি এখনই পার করিয়া দাও, (মূল্যস্বরূপ) যাহা চাও, তাহাই লও।

পদ্যাবলীধৃত পদ কয়টির ভাবার্থ দিতেছি।

(১) যমুনা পার কর, পার কর বলিয়া গোপীরা হাত তুলিয়া বারংবার ডাকিতে থাকিলেও, যিনি নৌকার মধ্যে কপট নিদ্রায় দ্বিগুণ আলস্য প্রকাশ করিলেন—সেই হরির জয় হউক।

—সঞ্জয় কবিশেখর

(২) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে তরিতে আরোহণ করিতে বলিলে, শ্রীরাধা তরু শব্দের সপ্তমীতে 'তরৌ' হয় বলিয়া ছল করিয়া বলিলেন—আমি তরুতে আরোহণ করিব কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মুগ্ধে, আমি তরণি বলিয়াছি। শ্রীরাধা এবার ঐ শব্দের সূর্য্য মানে করিয়া বলিলেন. রবিতে আমার রতি হইবে কেন? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি নৌবিষয়ে কথা বলিতেছি, শ্রীরাধা অস্মদ্ শব্দের ষষ্ঠীর দ্বিবচনে নৌ ধরিয়া বলিলেন, আমাদের দুই জনের সঙ্গমার্থে কোন বার্ত্তাই হইতে পারে না। শ্রীরাধার এই কথায় হাস্যবদন, বাক্যরহিত অজিত শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করি।

—শ্রীরূপ

(৩) শ্রীরাধা বলিলেন—যমুনায় ঢেউ নাই, তোমার নৌকাও নূতন বটে, কিন্তু একে তুমি নবীন নাবিক, তাহাতে আবার চঞ্চলস্বভাব, তাই আমার বড় ভয় করিতেছে।

—শ্রীরূপ

(৪) নৌকা জীর্ণ, নদীতে জল গভীর, আমাদের অল্প বয়স, এ সবই অনর্থ ঘটাইতে পারে, কিন্তু মাধব! কৃশোদরী গোপীদের নিস্তারের এই একমাত্র বীজ যে, তুমি সম্প্রতি কর্ণধার হইয়াছ।—জগদানন্দ রায়

(৫) দেবকীনন্দন যমুনার মাঝখানে নৌকা স্থগিত রাখিয়া পারের মূল্য চাহিলে, যাঁহাদের নিকট ঐ মূল্য নাই, সেই সব গোপী কাতর বদনে তাকাইতে লাগিলেন।

—সূর্য্যদাস

(৬) হে যদুনন্দন! তোমার কথা অনুসারে গব্যভার ও হারও সহসা জলে ফেলিয়া দিয়াছি, দুই স্তনের দুকূলও দূরে ফেলিয়াছি (এত হাল্কা করা সত্ত্বেও), কিন্তু নৌকা যমুনার তীরের কাছে তবুও তো যাইতেছে না।

—অজ্ঞাত

(৭) এই নৌকা জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, বায়ুতে ঘূর্ণিত হইয়া গভীর

যমুনাজলে প্রবেশ করিতেছে, হায় এ কি দুর্ঘটনা! কিন্তু হরি মনের আনন্দে বারংবার হাততালি দিতেছেন। —মনোহর

(৮) কৃষ্ণ! হাত দুখানি আর জল সেচন করিতে পারিতেছে না, তথাপি তোমার পরিহাসবাক্য থামিল না! এবারে যদি বাঁচিয়া যাই, আর কখনও তোমার নৌকায় পা দিব না। —মনোহর

(৯) হে সখিগণ! যমুনায় হাঁটুজল হউক অথবা অন্য কোন নাবিক হউক, এই উদ্দেশ্যে ইষ্টদেবকে নমস্কার কর। —মুকুন্দ ভট্টাচার্য্য

(১০) নৌকা টলমল করিতেছে, নদী গভীর, চঞ্চল নন্দনন্দন কর্ণধার, আমি অবলা, সূর্য্যও অস্তাচলে যাইতেছেন। হে সখি! নগরী দূরে আছে, আমি কি করি? —অজ্ঞাত

(১১) সখি! নন্দতনয় স্তুতিকথার অপেক্ষা করেন না, মিনতিতে কর্ণপাত করেন না, নিরন্তর চরণে প্রণাম করিলেও মানেন না। হায়! এখন কি করি! এই চঞ্চল (নাবিক) নদীর মধ্যে নৌকা আনিয়া ঘুরাইতে লাগিল। —শ্রীরূপ

(১২) "যমুনায় এমন ঢেউ যে, তট উল্লঙ্ঘিত হইতেছে, নৌকাও জলে ভরিয়া গিয়াছে, হরিরও কলঙ্কের ভয় নাই!" এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, রাধে! আজ তুমি কাঠিন্য বা বাম্যতা রাখিও না; তুমি প্রসন্না হও; পর্ব্বতগুহায় ক্রীড়োৎসবরূপ পারাণি দাও। —শ্রীরূপ

(১৬১)

না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে।
সুরধুনী-তীরে গেলা সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গে ত করিয়া।
নৌকায় চড়িলা গৌর প্রেমাবেশ হৈয়া॥
আপনে কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সভে পাণি॥
পারিষদগণ সবে হরি হরি বোলে।
পুরব সোঙরি কেহো ভাসে প্রেমজলে॥

গদাধর-মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে।
বাসুদেব ঘোষে কহে মনের উল্লাসে॥ তরু ১৪০৯

(১৬২)

গুরুজন বচনহি গোপ যুবতীগণ
লেই যজ্ঞঘৃত থোর।
রাইক সঙ্গে চলু নব নাগরী
পন্থহি ভাবে বিভোর॥
কৈছনে হেরব নাগর-শেখর
কৈছে মনোরথ পূর।
ঐছন গোবর্দ্ধন বনে আয়ল
জানল নাগর শূর॥
মানস সুরধুনী দু কূল পাথার হেরি
কৈছে হোয়ব ইহ পার।
প্রাবৃট সময়ে গগনে ঘন গরজই
খরতর পবন সঞ্চার॥
দূরহি নেহারত শ্যাম সুধাকর
তরণী লেই মিলুঁ ঠাম।
হেরি উলসিত মতি সবহু কলাবতী
জ্ঞান কহে পূরল কাম॥ মাধুরী, ৩।৩৮০

(১৬৩)

বড়াই, হোর দেখ রূপ চেয়ে।
কোথা হতে আসি দিল দরশন
বিনোদ বরণ নেয়ে॥
ঐ কি ঘাটের নেয়ে?
রজত কাঞ্চনে নাখানি সাজান
বাজত কিঙ্কিণীজাল।

চাপিয়াছে তাতে শোভে রাঙ্গা হাতে
মণি-বাঁধা কেরোয়াল ॥
রজতের ফালি শিরে ঝলমলি
কদম্ব-মঞ্জরী কানে।
জঠর পাটেতে বাঁশীটি গুজেছে
শোভে নানা আভরণে ॥
হাসিয়া হাসিয়া গীত আলাপিয়া
ঘুরাইছে রাঙ্গা আঁখি।
চাপাইয়া নায় না জানি কি চায়
চঞ্চল উহারে দেখি ॥
আমরা কহিও কংসের যোগানি
বুকে না হেলিও কেহু।
জ্ঞানদাস কয় শশী যোলকলা
পেলে কি ছাড়িবে রাহু ॥

মাধুরী ৩।৩৮১ পৃঃ

(১৬৪)

ওহে নবীন নেয়ে হে, তরণী আনহ ঝাট ঘাটে।
আমরা হইব পার বেতন দেয়ব সার
ঘর যাওয়ার বেলা টুটে ॥
গোপিনী পঞ্চম স্বরে ডাক দেই ধীবরে
বলে নৌকা আন ঝাট ঘাটে ॥
গগনে উঠিল মেঘ পবনে করিছে বেগ
নৌকাখানি আন ঝাট ঘাটে।

ওহে, তোমরা কে হে চন্দ্রবদনী ধনি দে হে।
সুন্দর বদনী ধনি পঞ্চম ভাষণি
নবীন যৌবনী তোমরা কে হে ॥

তোমরা ডাকিছ সুখে তরণি পড়েছে পাকে
আপনা সামালি তবে যাই হে।
ওহে চন্দ্রবদনী ধনি দে হে॥
নাবিক রতন মণি তরণী নিকটে আনি
চড় সভে পার করি আমি হে।
শুনি সুবদনী ধনি হরিষে ভরল তনি
তরণিতে চড়ি সখি মেলি হে॥
নৌতুন নাবিক কান নাহি জানে সন্ধান
বেগে কহি লেয়ল তরণী।
টুটি তরণি হেরি কাঁপে সব সুকুমারি
জ্ঞানদাস সিঞ্চয়ে পানি॥ মাধুরী, ৩।৩৮২ পৃঃ

(১৬৫)

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দু কূলে বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নাহি কেউ॥
দেখ সখি, নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চড়িলুঁ কেন নায়?
নায়্যার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারি ধরিতে চায় কোরে॥
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হইল
পরাণ হইল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি থির হইয়া থাক দেখি
এখন না ভাবিহ বিষাদ॥ তরু, ১৪১১

(১৬৬)

ভুবন-মোহন শ্যামচন্দ্র।

ভানুসুতা পানে চায় হাসি হাসি কথা কয়

শুন শুন যুবতীর বৃন্দ॥

জলের ঘুরণি বড় তরণী আমার দড়

অশ্ব গজ কত নর নারী।

দেবতা গন্ধর্ব্ব যত পার করি শত শত

যুবতী যৌবন ইথে ভারি॥

উমড়িয়া শ্যাম মেঘে ফিরি দেখ চারি দিগে

পবনে কাঁপয়ে সব তনু।

ঘন উছলিছে জল নৌকা করে টলমল

তরুণী তরণী ভার দুহু॥

আমার বচন ধর হাতে কেরোয়াল কর

বসন ভূষণ ভার ছাড়।

নাবিকের বেতন দাও সঘনে তরণী বাও

নহে সবে গোবিন্দ সঙর॥

শুনি সুবদনি কয় আগে পার করি দাও

পাছে দিব যে হয় উচিত।

জ্ঞানদাস কহে বাণি আগে দিলে ভালে জানি

পাছে হয় হিতে বিপরীত॥ মাধুরী ৩।৩৮৫

(১৬৭)

চিকণ শ্যামল রূপ নব ঘন ঘটা।

তরণী বহিয়া যায় কিনা অঙ্গের ছটা॥

দু কূল করিয়া আলো নাবিকের রূপে।

জগজনমন ভুলে দেখিয়া স্বরূপে॥

গলে গুঞ্জা বনমালা শিরে শিখিপাখা।

দেখি মেনে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥

ঠেকিলুঁ নেয়ের হাতে কি করি উপায়।
বজর পড়িল সখি কুলের মাথায়॥
মুচকি হাসিয়া নেইয়া যার পানে চায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে সেই জন ধায়॥
বংশীবদনে কহে থির কর হিয়া।
তোমরা এমন হইলে না বাহিত নেইয়া॥

মাধুরী, ৩৷৩৮৮ পৃঃ

(১৬৮)

ঝমকি ঝমকি পড়িছে কেরোয়াল
ব্রজবধূ বায়ত রঙ্গে।
শ্রীহরি কাণ্ডারী ব্রজবধূ দাঁড়ি
সারি গায় তারা রঙ্গে॥
সুন্দরী নাগরী বদন নেহারি
বারে বারে দেখে রঙ্গে।
যমুনা নেহারে আনন্দে উথলে
বহিছে উজান তরঙ্গে॥
দু কূলের লোকে দেখে মনসুখে
আনন্দ সায়রে ভাসে।
কহে বংশীদাস মনের উল্লাস
রহি সখিগণ পাশে॥

মাধুরী, ৩৷৪০৪ পৃঃ

(১৬৯)

রাই কানু যমুনার মাঝে।
ফিরয়ে তরণী জলের ঘুরণী
দূরে গেল কুল লাজে॥
কুম্ভীর মকর মীন উঠত
সঘনে বদন তুলি।

হরিষে যমুনা উথলে দ্বিগুণা
রাই-কানু-রূপে ভুলি ॥
কহয়ে ললিতা হৈয়া সচকিতা
শুন লো মুখরা বুড়ি।
তোহারি কথায় চড়ি ভাঙ্গা নায়
পরাণ সহিতে মরি ॥
মুখরা কহয়ে যে মাগে কাণ্ডারী
তাহাই করহ দান।
এ ভাঙ্গা তরণী পার হবে'খনি
কেন বা যাইবে প্রাণ ॥
এ সব বচন শুনিয়া কাণ্ডারী
কহই ললিতা পাশে।
তোমার সখির পরশ মাগিয়ে
বংশী শুনিয়া হাসে ॥ মাধুরী, ৩।৪০৪ পৃঃ

(১৭০)

না বাও হে না বাও হে নবীন কাণ্ডারী।
ঝলকে উঠিছে জল ভয়ে কাঁপ্যা মরি ॥
ত্বরায় তরণী লইয়া তীরে আইলে শ্যাম।
সফল করিল বিধি পূরল মনকাম ॥
ক্ষীর সর মাখন সহচরী দেল।
নাবিক সো সব কিছু নাহি লেল ॥
রাইক আঁচর ছোড়ি নাহি যায়।
সব সখিগণ তবে করল উপায় ॥
নাবিক কহয়ে দেহ বেতন মোর।
তবে হাম ছোড়ব আঁচর তোর ॥
কহি কহি চুম্বই রাই-বয়ান।
পূরয়ে মনোরথ নাগর কান ॥

পূরল মনোরথ আনন্দ ওর।
বৃষভানু-কুমারী নন্দকিশোর॥
নিজ নিজ মন্দির সভে চলি গেল।
বংশীবদন চিতে আনন্দ ভেল॥

মাধুরী, ৩।৪০৮পৃঃ

তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কল লোলনি।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল ডোলনি॥
শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণি লোলনি॥
ততহিঁ বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুলচন্দ
গোবিন্দদাস বোলনি॥

পদামৃতসমুদ্র, ২২১পৃঃ
তরু, ১২৫৫

টীকা :—প্রেম রোপি—প্রেমের বীজ রোপণ করিয়া। আপন সোঁপি—আত্মসমর্পণ করিয়া। বিসরি গেহ—ঘর ভুলিয়া। এক নয়নে কাজররেহ ইত্যাদি—ভাগবতের ১০।২৯।৭র 'ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণা'র ভাব লইয়া লেখা।

(১৭৪)

বিপিনে মিলল গোপ-নারি
হেরি হসত মুরলিধারি
নিরখি বয়ন পুছত বাত
প্রেমসিন্ধু-গাহনি।
পুছত সবক গমনখেম
কহত কীয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি॥

হেরি ঐছন রজনি ঘোর
তেজি তরুণি পতিক কোর
কৈছে পাওলি কানন ওর
থোর নহত কাহিনি।
গলিত ললিত কবরিবন্ধ
কাহে ধাওত যুবতিবৃন্দ
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দন্দ
বেড়ল বিশিখ-বাহিনি ॥
কিয়ে শরদ চান্দনি রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুমপাতি
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি
বুঝি আওলি সাহনি।
এতহুঁ কহত না কহ কোই
রাখত কাহে মনহি গোই
ইহহি আন নহই কোই
গোবিন্দদাস গাহনি ॥ তরু, ১২৫৬

টীকা :—শ্রীকৃষ্ণ মুরলীধ্বনি করিয়া গোপীদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা আসিলে তিনি ভাল মানুষ সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তোমাদের জন্য আমি কি করিতে পারি? ব্রজের সব কুশল তো? এই যে প্রশ্ন ও তাহার সঙ্গে গোপীদের মুখের পানে চাওয়া, ইহা যেন 'প্রেমসিন্ধু গাহনি'—গোপীদের প্রেমসিন্ধু কতটা গভীর, তাহা দেখিবার জন্য যেন তাহাতে অবগাহন। এরূপ কুশলপ্রশ্ন শুনিয়া তোমাদের চাহনি অমন কুটিল হইল কেন? এরূপ ঘোর রজনীতে তোমরা তরুণীরা পতির শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ—তাহা হইলে ব্যাপার তো সহজ নহে। এমন বেশবাসে বেসামাল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছ! ঘরে কি ঝগড়া হইয়াছে, না তীরন্দাজের দল (দস্যুর দল; মুদ্রিত তরুর পাঠ "বিপথবাহিনী" তাহার কোন সঙ্গত অর্থ হয় না; প্রাচীন পুথিসমূহে 'বিশিখবাহিনী' পাঠ আছে) ঘর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে? অথবা তোমরা এই শরৎচন্দ্রে উজ্জ্বল রাত্রির শোভা দেখিতে

আসিয়াছ? এত প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলিতেছ না—"রাখত কাহে মনহি গোই," মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিতেছ কেন? "ইহহি আন নহই কোই"—বলই না গো, এখানে তো অন্য লোক কেউ নাই, সবই আমরা আপন লোক, বলিয়াই ফেল।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের অনুবাদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া যাহা বলাইয়াছেন, তাহা তুলনীয়ঃ—

১০।২৯।১৮—

আইস আইস গোপি! কহ কুশল কল্যাণ।
কি করিব আমি তোমা কহ বিদ্যমান॥
গোকুলের কি হয় সঙ্কট উতপাতে
তে কারণে আইলে কি আমার সাক্ষাতে?
আগমন কারণ কহিবে ব্রজনারি!
বনেতে প্রবেশ কৈলে কি ভরসা করি?

১০।২৯।১৯—

ঘোর নিশি, এথাতে বিপিন ঘোরতর।
এই বনে নানা জন্তু বৈসে নিরন্তর॥
কেমন সাহসে গোপি! কৈলে হেন কাজ।
জনমে জনমে থুইলে গুরুকুলে লাজ॥

১০।২৯।২০—

পতি পুত্র বন্ধুগণ তোমা না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি বুলে ব্যাকুল হইয়া॥
কুলবতী নারী হৈয়া কর হেন কাজ।
দুই কুল ভরি গোপি থুইলে বড় লাজ॥

১০।২৯।২১—

যদি বল দেখিতে আইলাঙ বৃন্দাবন।
চাহিয়া নেহার গোপি! কুসুম কানন॥
শরৎ যামিনী, চন্দ্র ঝলমল জ্যোতি।
যমুনা লহরি, বাত বহে মন্দ গতি॥

মধুর সৌরভ, বহু বিহগ-সুনাদ।
এ বনে উপজে গোপি কাম-উনমাদ॥
যাবত হৃদয়ে নাহি মনমথ উঠে।
তাবত প্রমাদ নাহি, চলি যাহ ঝাটে॥

(১৭৫)

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজরমণীগণ সজল নয়ান॥
টূটল সবহুঁ মনোরথ-করনি।
অবনত-আনন নখে লিখু ধরণি॥
আকুল অন্তর গদগদ কহই।
অকরুণ-বচন-বিশিখ নহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর-চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ॥
ভাঙ্গলি কুল-শিল মুরলিক সানে।
কিঙ্করিগণ জনু কেশ ধরি আনে॥
অব কহ কপটে ধরমযুত বোল।
ধার্ম্মিক হরয়ে কুমারি-নিচোল॥
তোহে সোঁপিত জিউ তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব॥
এতহুঁ কহল ব্রজ যৌবত মেল।
শুনি নন্দ-নন্দন হরষিত ভেল॥
করি পরসাদ তহিঁ করয়ে বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস॥ তরু, ১২৫৭

টীকা ঃ—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের আস্বাদন তুলনীয়—
১০।২৯।২৮—

কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাণী শুনি ব্রজরামা।
বিষাদে মোহিতা গোপী হৈলা হতকামা॥

১০।২৯।২৯—

ত্যাগ-ভয়ে শোক-শ্বাসে শুখাইল অধর।
হেঁট মাথে, পদনখে লেখে ক্ষিতিতল॥
নয়নে গলয়ে জল, তনু বাঞা পড়ে।
কাজল-মলিন কুচকুঙ্কুম পাখালে॥
নিশবদ রহে গোপী পাঞা দুঃখ ভার।
এক পদ হৈতে পদ না তুলিল আর॥
বহু ক্ষণ ব্রজনারী রহে সেই মনে।
বিমরিষ হঞা দিলা চিত্ত-সমাধানে॥

১০।২৯।৩৪—

গৃহধর্ম্ম, নারীধর্ম্ম কৈলে উপদেশ।
কহিব তাহার কথা, শুনহ বিশেষ॥
গৃহধর্ম্ম কেমতে করিব ব্রজনারী।
তুমি সে হরিলে চিত্ত, ধরিতে না পারি॥
করে কর্ম্ম না করে, না চলে দুই পাও।
কেমতে বা চলিব, ধরিতে নারি গাও॥
কোথা বা চলিব, কিবা করিব উপায়।
সকল হরিয়া তুমি নিলে যদুরায়॥

১০।২৯।৩৫—

মন্দ হাস, মন্দ গীত, মধুর বচনে।
হৃদয়ে জ্বলয়ে কানু কাম হুতাশনে॥
অধর-অমিঞারসে করহ সেচন।
মদন-আনলে দহে, না রহে জীবন॥

(১৭৬)

আরে দেখ শ্যামচন্দ ইন্দুবদন রাধিকে।
বিবিধ ছন্দ যুবতীবৃন্দ গাওয়ে রাগমালিকে॥
মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন কুসুমগন্ধমাধুরী।

মদনরাজ রভসমাঝ ভ্রমরা ভ্রমরী চাতুরী ॥
তরল তাল গতি দুলাল নাচে নটিনী নটন স্থর।
প্রাণনাথ করত হাত রাই তাহে অধিক পূর ॥
অঙ্গে অঙ্গে পরশ ভোর কেহু রহত কান্থ কোর।
জ্ঞানদাস কহত রাগ যৈছন জলদে বিজুরি ॥ কীর্ত্তনানন্দ, ৪১৯

(১৭৭)

যারে না দেখিলে রহিতে নারি।
ছাড়্যা গেল বংশীধারী ॥
শুন হে কদম্ব তরু।
দেখিলে মদন-গুরু ॥
সারি সারি আছ পথে।
দেখিঞাছ গোবিন্দ যাইতে ॥
মল্লিকা মালতী যূথী।
গোবিন্দ দেখ্যাছ কতি ॥
শুন তরু দয়া কর কহি তুয়া ঠাঞি।
এ পথে দেখ্যাছ যাইতে হলধরের ভাই ॥
পীতাম্বর মনোহর নারী-মনোচোরা।
এহি পথে তারে যাইতে দেখ্যাছ তোমরা ॥
শঠ বড় কথা দড় কত ভঙ্গি জানে।
নারীগণে ঘোর বনে চুলে ধরি আনে ॥
মুখে হাসি হাতে বাঁশী কঠিন অন্তরে।
নারী বধে কিছু তাথে ভয় নাহি করে ॥
কৃষ্ণদাসকৃত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, পৃঃ ১৯১

(১৭৮)

যত নারীকুল বিরহে আকুল
ধৈরজ ধরিতে নারে।

রসিক নাগর বুঝিয়া অন্তর
দাঁড়াইল যমুনা ধারে ॥
কদম্বের তলে বসি কোন ছলে
মৃদু মৃদু বায়ে বাঁশী।
শুনিতে শ্রবণে ব্রজ-বধূগণে
তাহাই মিলল আসি ॥
মরণ শরীরে পরাণ পাইল
ঐছন সবহুঁ ভেলি।
বন-দাবানলে পুড়িয়া যেমন
অমিয়া-সায়রে কেলি ॥
চাতকিনীগণ হেরি নব ঘন
মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি শশধর বদন সুন্দর
চকোরিণী চারি পাশে ॥
বিরহে তাপিত ভেল তিরপিত
বরিখে অমিয়া রাশি।
জ্ঞানদাস কহে শ্যামের বদনে
আধ ঈষত হাসি ॥ তরু ১২৬৫

(১৭৯)

নাগর নাচত নাগরি সঙ্গ।
বিবিধ যন্ত্র কত শবদ-তরঙ্গ ॥
দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি বাজে মৃদঙ্গ।
ডম্ফ রবাব বিণ মুরলি উপাঙ্গ ॥
বলয় নূপুর মণি-কিঙ্কিণি কলনে।
ঘুঙ্ঘুরু রুনু ঝুনু বাজত চরণে ॥
আনন্দে অঙ্গ অঙ্গ অবলম্ব।
রসভরে গিরত মিলত পরিরম্ভ ॥

কমলে মোতি কিয়ে মুখে শ্রমবারি।
রসিক কলাগুরু কহে বলিহারি॥
বিহসি বিলোকই দুহুঁ চিতচোরি।
রায় বসন্তপহুঁ রহুঁ হিয় জোরি॥

তরু ২৯২৯

টীকা ঃ—গিরত—পড়িয়া যাইতেছে।

মিলত পরিরম্ভ—আলিঙ্গনে মিলিত হইতেছে। কমলে মোতি কিয়ে—শ্রমবারি বা ঘর্ম্ম বদনমণ্ডলে দেখা দিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে, যেন মুখকমলে কেহ মতি বসাইয়া দিয়াছে।

(১৮০)

কিঙ্কণ-কিঙ্কিণী নূপুরের ঝনঝনি।
অঙ্গ-আভরণ শব্দে পূরিল মেদিনী॥
অতুল শবদ হৈল এ রাস-মণ্ডলে।
রমণীর মাঝে মাঝে কৃষ্ণ শোভে ভালে॥
হেম মণি মাঝে যেন ইন্দ্রনীলমণি।
বিনি সুতে হার যেন বিচিত্র গাঁথুনি॥
দুই দুই গোপী মাঝে দেবকীনন্দন।
কত গোপী, কত কৃষ্ণ না যায় গণন॥
পদ আরোপণ, ভুজ যুগল কম্পিত।
কটাক্ষ বিলাস দৃগঞ্চল বিরচিত॥
ক্ষীণ কটিভঙ্গ, কুচ আলোলিত বাস।
গণ্ডযুগে তরলিত কুণ্ডল বিলাস॥
ধীরশিরোমণি শ্রীল গদাধর যান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥

ভাঃ ১০।৩৩।৫-৭র অনুবাদ
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

টীকা ঃ—ভণিতা অংশ ঃ—ধীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীল গদাধর যাঁহাদের, তাঁহাদের নিকট ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান।

(১৮১)

কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিবা রূপ লাবণি বৈদগধি-খনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্রকরে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু করে ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক অঙ্গে ভরে॥
মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে রাই-মুখইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে॥
কুসুমিত বৃন্দাবন কলপতরুর গণ
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতন রচিত হেম মঞ্জির শিঞ্জিত
নরোত্তম মনোরথ পুর॥

পদামৃতসমুদ্র ২৩১ পৃঃ, তরু.১০৭৪, কীর্ত্তনানন্দ ৩০০

কীর্ত্তনানন্দে শেষ দুই চরণের পাঠ—

হাসবিলাস রসকলা মধুর ভাষ লোচন
মোহন লীলা ধরু।
দুহু রূপ লাবণি হেম মরকতমণি
নরোত্তম মনোরথ ভরু॥
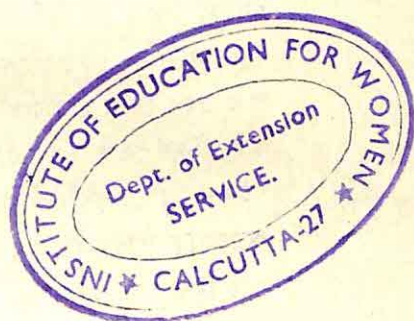
সপ্তদশ স্তবক

কুঞ্জভঙ্গ

রাত্রির বিলাসের পর উষার পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণকে জাগাইয়া স্বগৃহে প্রেরণের নাম কুঞ্জভঙ্গ।

(১৮২)

উঠ উঠ গোরাচান্দ নিশি পোহাইল।
নগরের লোক সব উঠিয়া বসিল॥
ময়ূর ময়ূরী রব কোকিলের ধ্বনি।
কত সুখে নিদ্রা হায় যায় গোরামণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
তেজল মধুকর কুমুদিনী পাশ॥
করজোড় করি বোলে বাসুদেব ঘোষে।
কত নিন্দ যায় গোরা প্রেমের আলসে॥

পদামৃতসমুদ্র, ৪০১ পৃঃ

(১৮৩)

কুসুমিত কুঞ্জ কুটির মনমোহন কুসুম সেজে দুহু নয়ল কিশোর।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গাবই বন বৃন্দাবন আনন্দ হিলোল॥
বলি বলি জাগুয়ে ললিতা অলি।
শ্যাম গোরী মুখমণ্ডল ঝলকর ছবি উঠত অতি ভালি॥
রজনীক শেষ জানি শ্যামসুন্দরী বৈঠলি সখিগণ সঙ্গ।
শ্যাম বয়ন ধনি করহি আগোরল কহইতে রজনীক রঙ্গ॥
হেরি ললিতা তব, মৃদু মৃদু হাসত পুলকে রহল তনু ভোরি।
পীত বসনে ঝাপি মুখ সুন্দরী লাজে রহল মুখ মোড়ি॥

মুখহি মোড়ি রহল যব সুন্দরী কানু করত তব কোর।
আনন্দ লোচনে দাস নরোত্তম হেরত যুগল কিশোর॥

পদামৃতসমুদ্র পৃঃ ২৩৭
(প্রথম দুই চরণ নাই)
কীর্ত্তনানন্দ ৪৩৮

(১৮৪)

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালা মাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে।
অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
শারী বোলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন শারি আমরা পশু পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥
বংশীবদন বলে চাঁদ গেল নিজ ঠাঞি।
অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই॥

তরু ৬৫৮

(১৮৫)

প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিন্দূর॥
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিমলোচন॥
তোমার পীতবাস আমারে দাও পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলায়্যা কবরী॥

তোমার গলের বনমালা দাও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কৈয় শুধাইলে গোকুলে॥
বসু রামানন্দ ভণে এমন পিরিতি।
ব্যাঘ্র-হরিণে যেন তোমার বসতি॥ তরু ৬৫৯

টীকা ঃ—মোর প্রিয় সখা কৈয়—রাধা পুরুষের মতন করিয়া নিজেকে সাজাইতে বলিতেছেন; আর শ্রীকৃষ্ণকে শিখাইতেছেন যে, কেউ যদি গোকুলের পথে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে যেন তিনি বলেন,—'এ আমার এক প্রিয় সখা।'

ব্যাঘ্র-হরিণে যেন তোমার বসতি—হরিণ যেমন বাঘের মধ্যে ভয়ে ভয়ে প্রাণ হাতে করিয়া বাস করে, তেমনি তুমি শাশুড়ী ননদিনীরূপ বাঘদের মধ্যে বাস কর।

(১৮৬)

প্রাতহিঁ জাগল রাধামাধব মন্দির গমন বিধানে।
করহ বিদায় অবশেষ রজনি ভেল অব পরণাম তুয়া চরণে॥
দুঃসহ বচন শ্রবণে কানু কাতর জল পূরল দুয় নয়নে।
হিয় দগদগি কছু কহই না পারই হেরি রহু রাইক বয়নে॥
না তেজই কাছ পাছু অনুসারই আগোরহি গহি বাহু বসনে।
পুন ধরি যতনে রাই সমুঝায়ই কুল শীল গেল অভিমানে॥
লাজ ডুবল হঠ না কর ঐছন যৈছনে লোকে না জানে।
রায় বসন্ত কহ হঠ ছোড়ি গমন কর না দেখহ ভৈ গেল বিহানে॥
তরু ২৯০৫

(১৮৭)

শুন মাধব কি কহিব আন।
আমার কে আছে আর তোমার সমান॥
যেখানে না দেখি আমি তোমার চাঁদমুখ।
পরাণের সনে পুড়ি বড় পাই দুখ॥

আমি কি রহিতে পারি না দেখিয়ে তোমা।
বুক বিদরিয়া মরি নাহি হয় ক্ষেমা ॥
অনুমতি দেহ পুন মিলিব সকালে।
রায় বসন্তপহুঁ পরশিল ভালে ॥

তরু ২৯৫২

টীকা :—পরশিল ভালে—কপালে হাত দিয়া কৃষ্ণ বুঝাইলেন যে, এই দুঃসহ বিচ্ছেদ কপালের লিখন।

(১৮৮)

নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুন পুন
দুহুঁ দুহাঁ বদন নেহারি।
অন্তরে উয়ল প্রেম পয়োনিধি
নয়নে গলয়ে ঘন বারি ॥
মাধব, হামারি বিদায় পায়ে তোয়।
তোহারি প্রেম সঞে পুন চলি আয়ব
অব দরশন নাহি মোয় ॥
কাতর নয়নে নেহারিতে দুঁহু দুহাঁ
উথলল প্রেম তরঙ্গ।
মুরুছল রাই মুরুছি পড়ু মাধব
কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥
ললিতা সুমুখি সুমুখি করি ফুকরত
ঢরকত লোচন লোর।
কতি গেও অরুণ কিরণ ভয় দারুণ
কতি গেও লোকক ভীত।
মাধব ঘোষ অবহু নহি সমুঝল
উদভট মুগধ চরীত ॥

তরু ৬৬০

অষ্টাদশ স্তবক

মাথুর বিরহ

(১৮৯)

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনি পোহায়॥
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে রোয়ত খেনে কাঁপ॥
খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে।
কোই না রহু পহু পাশে॥
খেনে কান্দে তুলি দুই হাথ।
কোথায় আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাইপ্রেমে হইলা বিভোরা॥

তরু ১৬৪৩

(১৯০)

কে মোরে মিলায়া দিবে সো চান্দবয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে, জুড়াবে পরাণ॥
কাল রাতি না পোহায়, কত জাগিব বসিয়া।
গুণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ, ছার নারী জাতি॥
ধনজন যৌবন সোদর বন্ধু জন।
পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥
কেহো ত না বোলে রে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥

কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
সম্বাদ লেই চলু বলরাম দাস ॥

পদামৃতসমুদ্র ২৯৯ পৃঃ, তরু ১৬৪৫

(১৯১)

পুন নাহি হেরব সো চান্দবয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ ॥
আর কত পিয়াগুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হৈল পিয়া না দেখিয়া ॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি ॥
সো সুখ-সম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পরাণ-পুতলী মোর কে হরিয়া নিল ॥
আর না যাইব সোই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে ॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া ॥

তরু ১৬৪৭

(১৯২)

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি ॥
এ সখি সো সব প্রেম কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরহ জনি ॥
না খোজলুঁ দূতি না খোজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥

অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধনরুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৮, পদামৃতসমুদ্র ২০১ পৃঃ,
তরু ৫৭৬

এই পদটির সাদাসিধা অর্থ হইতেছে—প্রথমে নয়নভঙ্গীর দ্বারা অনুরাগ জন্মিল অর্থাৎ পরস্পরের নয়নে নয়নে সাভিলাষ দৃষ্টি-বিনিময়ের দ্বারা প্রেম হইল; সেই অনুরাগ দিন দিন বাড়িতে লাগিল, তাহার বৃদ্ধির কোন সীমা রহিল না। (তাঁহার সঙ্গে আমার লৌকিক ধর্ম্মবন্ধনের সম্বন্ধ নহে) তিনি পতি নহেন, আমিও তাঁহার পত্নী নহি; কিন্তু মদন উভয়ের মন পেষণ করিয়া অভিন্ন করিয়াছিল। হে সখি! তুমি এই সব প্রেমের কাহিনী কানুর কাছে বলিও, বলিতে ভুলিও না যেন। (তখন) আমাদের দূতীকে কিম্বা অন্য কাহাকেও খুঁজিতে হয় নাই; দুই জনের মিলনে পঞ্চবাণ মদনই মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। এখন আমাতে তাঁহার বিরাগ জন্মিয়াছে, তাই তোমাকে দূতী করিয়া পাঠাইতে হইতেছে। সুপুরুষের প্রেমের এইরূপই রীতি বটে। প্রতাপরুদ্র মহারাজ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিতমান কবি রামানন্দ ইহা বলিতেছেন।

'বর্দ্ধনরুদ্র-নরাধিপমান' এই বাক্যের একটি অর্থ রাধামোহন ঠাকুর ধরিয়াছেন—"বর্দ্ধনঃ বর্দ্ধিষ্ণুঃ রুদ্রগুণেন নরাধিপস্যেব মান ইতি গীতকর্ত্রানুমিতম্।" অর্থাৎ গীতকর্ত্তা অনুমান করিতেছেন যে, "রুদ্রগুণের দ্বারা শ্রীরাধার মান বর্দ্ধন অর্থাৎ বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে।" কিন্তু শ্রীরাধার মান-ভাব যে বৃদ্ধি পায় নাই, বরঞ্চ কম হইয়াছে, তাহা রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন—"অত্রাবহিত্থ কিঞ্চিন্মানবিরামাদেব বোধ্যা।" কিন্তু শ্রীরাধার মানের পদই যদি এটি হইবে, তবে আর তিনি দূতী পাঠাইবেন কেন? এটিকে কলহান্তরিতার পদ বলিয়া কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু শ্রীরাধা স্পষ্টতঃ অভিযোগ করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এখন শ্রীরাধার প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন, তাই দূতী পাঠাইয়া তাঁহাকে প্রেম সম্বন্ধে সজাগ করিয়া

দিতে হইতেছে—"অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতি।" বিরাগ শব্দের এরূপ সুস্পষ্ট প্রয়োগ সত্ত্বেও কেন যে রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় এটিকে মানের পদ বলিলেন বা বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে মান পর্য্যায়ে এই পদটি সন্নিবিষ্ট করিলেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিলাম না। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর বলিয়া কথিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকাতে এই পদটিকে —"মথুরাবিরহবত্যাঃ শ্রীরাধায়া উক্তিরিয়ং" বলা হইয়াছে। এই জন্য আমরা এই সুপ্রসিদ্ধ পদটিকে মাথুর পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের সপ্তম অঙ্কে এই পদটির ভাবানুবাদ দিয়াছেন—

> সখি ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে।
> প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥

অথবা—

> অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূ-
> ন্মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা।
> ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি-
> স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরং॥

এই পদটির একটি গুহ্য অর্থও আছে। আমার মাতাঠাকুরাণী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী, যিনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নিত্যধামে গমন করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পদাবলী-সাহিত্য আলোচনার খাতায় লিখিয়াছেন—

"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল"—সেই রাগ আমাদের উভয়ের স্বভাবজনিত। রমণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং রমণীস্বরূপ আমি সেই রাগ উৎপন্নের কারণ নহি। পরস্পর দর্শনে যে রাগ উদয় হইয়াছিল, তাহাই মদন হইয়া আমাদের উভয়ের মনকে পেষণ করিয়া একত্র করিয়াছিল। তাৎপর্য্য এই, সম্ভোগকালে রাগ অনঙ্গরূপে মধ্যস্থ; বিপ্রলম্ভকালে সেইরূপ অধিরূঢ়-ভাবাপন্না দূতী হইয়া প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে সম্ভোগস্ফূর্ত্তি কার্য্যে দূতীস্বরূপ হইলে, তাহাকে শ্রীমতী সখী সম্বোধনপূর্ব্বক এই কথা কয়টি বলিতেছেন। মূল তাৎপর্য্য এই, প্রেমবিলাস সম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্রলম্ভেও সেইরূপ, বিশেষতঃ অধিরূঢ় মহাভাবরূপ সর্পে রজ্জুভ্রমের

ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রমজনিত বিবর্ত্তভাবাপন্ন একরূপ সম্ভোগ উদয় হয়।"

(১৯৩)

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারি।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখি নও ইহা গেল জানা॥
দাবদগধি ধিক্ ছটফটি এহ।
এ ছার নিলাজ প্রাণ না ছাড়এ দেহ॥
কানু বিনু নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঙাব আমি এ দিন সকল॥
এ বড় শেল আমার হৃদয়ে রহিল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল॥
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙরি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাঙ মরি॥
নরোত্তম যাই তথা জানুক তাঁর সতি।
শ্যামসুধা না মিলিলে সভার সেই গতি॥ পদামৃতসমুদ্র, পৃঃ ৩৭

টীকা :—দাবদগধি—আমি যেন দাবানলে পুড়িয়া মরিতেছি। চারি দিক্ বেড়া আগুন, তাহার মধ্যে ছটফট করিতেছি ; যে দিকে যাই, সেই দিকেই আগুনের জ্বালা।

জানুক তাঁর সতি—সত্য সত্যই তিনি আমাকে ভুলিয়াছেন কি না।

শ্যামসুধা না মিলিলে ইত্যাদি—শ্যামচাঁদের সুধা না পাইলে শ্রীরাধার মতন সকলকেই দাবানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়।

(১৯৪)

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥

এইবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দু'খানি।
হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরাণি ॥
মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া ॥
মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তল ভার ॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ।
নরোত্তম দাস কহে পিরিতের ফান্দ ॥

পদামৃতসমুদ্র ৩৭২ পৃঃ, তরু ১৬৫৯

(১৯৫)

নবঘনশ্যাম অহে প্রাণ !
আমি তোমা পাসরিতে নারি।
তোমার বদন-শশী অমিয়া মধুর হাসি
তিল আধ না দেখিলে মরি ॥
তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতুঁ যদি
তবে তোমা দেখিতুঁ সদাই।
এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি
এবে তোমা দেখিতে না পাই ॥
এমন বেথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয়
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিলুঁ তোরে পরাণ কেমন করে
কি কহিব কহন না যায় ॥
এবে সে বুঝিলুঁ সখি পরাণ সংশয় দেখি
মনে মোর কিছু নাহি ভায়।
যে কিছু মনের সাধ বিধাতা করিলে বাদ
নরোত্তম জীবন অপায় ॥

পদামৃতসমুদ্র ২৯৫ পৃঃ, তরু ১৬৫৪

টীকা ঃ—তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতুঁ যদি—প্রথমেই যদি তোমার নাম বুকে অঙ্কন করিতাম, তাহা হইলে সব সময় তোমাকে দেখিতে পাইতাম।

(১৯৬)

সুহই—ছোট দশকুশী

ব্রজেন্দ্র কুল দুগ্ধসিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু
জন্মি কৈল জগত উজোর।
যার কান্ত্যমৃত পিয়ে নিরন্তর পিয়া জিয়ে
ব্রজজন নয়ন-চকোর ॥
সখি হে, কোথা কৃষ্ণ করাও দরশন।
তিলেক যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥
এই ব্রজ রমণী কামার্ক-তপ্ত কুমুদিনী
নিজ করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই কাহা মোর চন্দ্র সেই
দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ ॥
কাঁহা সে চূড়ার ঠাম শিখি পুচ্ছের উড়ান
নব মেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্‌দ্যুতি মুক্তামালা বকপাঁতি
নবাম্বুদ জিনি শ্যাম তনু ॥
একবার যার নয়নে লাগে সদা তার হৃদয়ে জাগে
কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা।
নারীর মনে পৈশে যায় যত্নে না বাহিরায়
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা ॥
জিনিয়া তমাল দ্যুতি ইন্দ্রনীল সম কাঁতি
যে কান্তিতে জগত মাতায়।
শৃঙ্গার রস ছানি তাহে চন্দ্রজ্যোৎস্না আনি
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥

কাঁহা সে মুরলী ধ্বনি নবাভ্র গর্জ্জন জিনি
জগতাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন তৃষিত চাতকগণ
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার॥
মোর সেই কলানিধি প্রাণ রক্ষা মহৌষধি
সখি, মোর তেঁহো সুহৃত্তম।
যেই জীয়ে তাহা বিনে ধিক্ সেই জীবনে
বিধি করে এত বিড়ম্বন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।১৯

টীকা ঃ—ব্রজেন্দ্রকুল দুগ্ধসিন্ধু ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদ্ভব হইয়াছে ব্রজের শ্রেষ্ঠ কুলরূপ দুগ্ধসমুদ্রে। তিনি জন্মিয়া জগৎ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার কান্তিরূপ অমৃত সর্ব্বদা পান করিয়া তাঁহার প্রেয়সীরা জীবন ধারণ করেন ; ব্রজজনের নয়ন তাঁহার রূপসুধা পান করিবার জন্য চকোরের ন্যায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে।

কামার্ক-তপ্ত কুমুদিনী—শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রস্বরূপ, আর গোপীরা কুমুদিনীতুল্য। দিনের বেলায় সূর্য্যের তাপে কুমুদিনী যেমন ম্লান হইয়া থাকে, তেমনি কামরূপ সূর্য্যের তাপে গোপীরূপ কুমুদিনীরা মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, কৃষ্ণ-রূপ চন্দ্রের কিরণ পাইলে তাঁহারা বাঁচিবেন।

পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন যেন বিদ্যুৎ ; আর তাঁহার দেহ যেন নূতন মেঘ ; তাঁহার গলার মুক্তার মালা দেখিয়া মনে হয়, যেন শুভ্র বলাকাশ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে।

তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা—তনু অর্থাৎ কৃশ বা ছোট নহে, সেয়াকুল একরকম কাঁটার লতা—সেহাকুল বা সংস্কৃতে শৃগালকোলিকা।

নবাভ্র গর্জ্জন জিনি—নূতন মেঘের মৃদুমন্দ গর্জ্জনকে হারাইয়া দিয়াছে যে মুরলীর ধ্বনি।

কান্ত্যমৃত—কান্তিরূপ অমৃত।

(১৯৭)

শকতি খীন অতি উঠই না পারই কাতরে সখিমুখ চাই।
পরশি ললাট করহিঁ মুখ ঝাঁপল পদুমিনি হিমকর ধাই॥
মাধব! করুণা কি লব তোহে নাই।
এক বেরি বিরহ-বেয়াধি নিবারহ এ দুহুঁ পদ দরশাই॥
রাই উপেখি ধরণি পর লুঠই কত কত সারঙ্গ-নয়নী।
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত জিবইতে সংশয় জানি॥
এত দিনে নবমি দশা পরিপূরল শ্বাস বহই উধ মন্দ।
মাধব ঘোষ কহ কালিদহে পৈঠব বুঝি ও ব্যাধিক অন্ত॥

পদামৃতসমুদ্র ৩৫৭ পৃঃ, তরু ১৯২৮

টীকা:—পদুমিনি হিমকর ধাই—যথা পদ্মিনী চন্দ্রং ধাবতীত্যন্নভূতেপি ময়া মোহদশায়ামপি সৌন্দর্য্যমস্তীতি সূচিতং—রাধামোহন ঠাকুর। সূর্য্য অস্ত গেলে ও চন্দ্র উঠিলে পদ্মফুলের সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায়, তেমনি তাহার সৌন্দর্য্য ম্লান হইলেও অন্তর্হিত হয় নাই।

রাই উপেখি ধরণি ইত্যাদি—রাধা চাহেন না যে, কৃষ্ণের কাছে তাঁহার মরণাপন্ন দশার খবর পাঠানো হউক, কিন্তু তাঁহার নিষেধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার হরিণনয়না বহু সখী—মথুরায় যাইবে, এমন পথিকের চরণে পড়িয়া অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন কৃষ্ণকে রাধার জীবনসংশয় হইয়াছে, এই কথা জানান।

শ্বাস বহই উধ মন্দ—অল্প অল্প উর্দ্ধশ্বাস বহিতেছে।

(১৯৮)

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
না দেখিয়া চাঁদমুখ কান্দে উভরায়॥
কাঁহা দিব্যাঞ্জন মোর নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু-শীতল কাঁহা নবঘনশ্যাম॥
অমৃতের সার কাঁহা সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়াকর্ষ কাঁহা মুরলী-বদন॥

দূরেতে তমাল তরু করি দরশন।
উনমতি হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশু পাখি করয়ে বিষাদ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
নরোত্তম দাসক দুখ নাহি ওর॥

পদামৃতসমুদ্র ৩৬৪পৃঃ
তরু ১৯৪৫

টীকা—উভরায়—উচ্চশব্দে। উনমতি—উন্মত্ত হইয়া। ভোর—মত্ততা বা ভুল হওয়া।

(১৯৯)

রাইর বিপতি শুনি বিদগধ শিরোমণি
পুছই গদগদ ভাষা।
নিজ মন্দির তেজি চলু বরনাগর
পুন পুন পরশই নাসা॥
বিছুরল চরণ- রণিত মণিমঞ্জীর
বিছুরল মুরলীকো রন্ধ্রে।
বিছুরল বেশ ভূষণ ভেল বিগলিত
বিগলিত শিখি-পুচ্ছচন্দ্রে॥
মলয়জ পরিমলে দশ দিশ আমোদিত
যামিনী বহে অতি পুঞ্জে।
লালস দরশ পরশে দুহুঁ আকুল
চিরদিনে মিলল কুঞ্জে॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে অথির ভেল দুহুঁ তনু
পরশিতে ভুজে ভুজে কাঁপ।
নরহরি হৃদি মাঝে অপরূপ জাগল
জলধরে বিধুবর ঝাঁপ॥ ক্ষনদা ১৪।৬

টীকা—রাধার বিপত্তির কথা শুনিয়া রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ গদগদ হইয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেই শ্রেষ্ঠ নাগর নিজের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলেন; যাইতে যাইতে বারংবার নাসা স্পর্শ করিতে লাগিলেন—খুব দ্রুতবেগে যাইবার জন্য নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। তিনি চরণের মণিনূপুর ভুলিলেন, মুরলীর রন্ধ্র ভুলিলেন, বেশ ভুলিলেন, অলঙ্কার খুলিয়া পড়িতে লাগিল, মাথার চূড়াও খুলিয়া যাইতে লাগিল।

সেই সময়ে চন্দনের গন্ধে দশ দিক্ আমোদিত হইল; রাত্রি তখন গভীর। দুই জনেই দুই জনকে দেখিবার ও স্পর্শ করিবার জন্য আকুল। বহুদিন পরে উভয়ের কুঞ্জে মিলন হইল। উভয়ে উভয়ের মুখ দেখিতে অস্থিরদেহ হইলেন। বাহুতে বাহুতে স্পর্শ হইতেই কম্পন উপস্থিত হইল। নরহরির হৃদয়ের মাঝে এক অপরূপ চিত্র জাগিল—যেন মেঘ (শ্যামমেঘ) চন্দ্রকে (রাধাকে) ঝাঁপিল।

(২০০)

দূতিমুখ শুনইতে ঐছন ভাষ।
ঝর ঝর লোচন ঘন ঘন শ্বাস॥
পরিহরি মাথুর করল পয়ান।
লোরহি পন্থ বিপথ নাহি জান॥
দূতি-অনুসারে চললি অনুসারি।
ছুটল কুঞ্জর গতি অনিবারি॥
কর ধরি দূতি মিলাওল কুঞ্জে।
চিরদিনে পাওল আনন্দ পুঞ্জে॥
হেরি সখি জয় জয় মঙ্গল দেল।
শিবানন্দ সহচরি জীবন ভেল॥

তরু ১৮৫১

টীকা—শ্রীকৃষ্ণ দূতীর মুখে শ্রীরাধার অবস্থার বর্ণনা শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন—তাঁহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, আর ঘন

ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল। তিনি মথুরা ত্যাগ করিয়া চলিলেন—চোখের জলে পথ বিপথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শুধু দূতীকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন—হাতী যখন ছোটে, তখন যেমন কেহ তাহাকে রুখিতে পারে না, তেমনি তিনি অনিবার গতিতে চলিলেন। দূতী হাতে ধরিয়া তাঁহাকে রাধার সহিত কুঞ্জে মিলিত করিলেন। বহুদিন পরে আনন্দরাশি পাইলেন। সখীরা দেখিয়া মঙ্গলসূচক জয় জয় ধ্বনি করিলেন অথবা হুলুধ্বনি করিলেন। তাহাতে সহচরীরূপী শিবানন্দ জীবন পাইলেন।

উনবিংশ স্তবক

যদুনাথ দাসের ভ্রমরগীত

এই ভ্রমরগীত শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমরগীতার অনুবাদ নহে—ভাবানুবাদও নহে। ইহা কবির স্বাধীন রচনা। ইহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, গোপীদের বিরহ-দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে নন্দ যশোদার অপরিসীম ক্লেশের কথাও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতের সঙ্গে ইহার এইটুকু মাত্র মিল যে, গোপীরা একটি ভ্রমরকে নূতন নূতন ফুলের প্রতি তাহার অনুরাগ দেখিয়া কৃষ্ণস্মৃতিতে নিজেদের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন।

(২০১)

খল রে ভ্রমর তুমি নিবেদন করি আমি
হেন দিন কবে হবে আর।
মধুপুর তুচ্ছ করি পিয়া হবে আগুসরি
সভে মিলি দিব জোকার॥
গোবিন্দ আসিব দেশে চরণ মোছাব কেশে
আলিপন দিব উপহার।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করি অধর সমুখে ধরি
কত ঘট করিব কুচভার॥
নব নব সখি সঙ্গে গুণ যশ যাঁর রঙ্গে
ঘন ঘন দিব হুলাহুলি।
দেখি পিয়ার চাঁদ মুখ পাসরিব সব দুখ
আলিঙ্গন দিব ভুজ তুলি॥
নয়নের নীর দিয়া অভিষেক করাইয়া
নিজ দেহ করিব নিছনি।
বসি পিয়ার বাম পাশে করিব কটাক্ষ হাসে
রসাবেশ হবে গুণমণি॥

দুই কর জোড় করি বসন গলায় ধরি
মিনতি করিব পিয়া আগে।
মনে যত দুখ আছে কহিব পিয়ার কাছে
শুনি তাহা বিয়াজে না হয়॥
হিয়ার মাঝারে করি বান্ধিয়া রাখিব হরি
যাইতে না দিব পুনর্ব্বার।
তবে যদি যাবে হরি যমুনা প্রবেশ করি
ত্যজিব দেহ আপনার॥

(২০২)

বৃন্দাবনে তরু লতা শুখাইল সন্তপিতা
দাবানলে পোড়ে যেন গাও।
পশু পক্ষী দুঃখ পায় এণ জল নাহি খায়
নাহি বহে সুশীতল বাও॥
মূর্চ্ছিত সকল জন কান্দে হইয়া অচেতন
দিবা নিশি নাহি জানে আর।
সূর্য্য লুকাইল ডরে পাছে গোপীগণ মরে
কৃষ্ণ বিনে দিন অন্ধকার॥
অকালত বজ্র পড়ি প্রাণনাথ গেল ছাড়ি
কেমনে রহিব আর ঘরে।
সদায় আকুল প্রাণ অন্তরে জাগয়ে শ্যাম
এ দুঃখ বলিব কার তরে॥
কৃষ্ণের সঙ্গিয়া তুমি এহা নিবেদিয়ে আমি
কৃপা করি করহ আরতি।
এ দুঃখ বোলহ যাইয়া শ্যামের মথুরা ধাইয়া
বনবাসী হৈল কুলবতী॥
তার সঙ্গে প্রীত করি এ গোপ আহিরী নারী
কুল শীল সকলি তেজিয়া।

শুধাইবে যত্ন করি কিসে ছাড়িল হরি
দেখা দেহ বারেক আসিয়া ॥
যেখানে যে কৈল লীলা বালকের সঙ্গে খেলা
তাহা দেখি ফেরে গোপীগণ।
যেই তারে পড়ে মনে চিত্তে ধৈর্য্য নাহি মানে
হেন বুঝি হারাব জীবন ॥
না আইসে শরত শশী যথা তথা রহে বসি
পিয়া বিনে অন্য নাহি মনে।
দারুণ পিরিতি করি বধিলা আহীর নারী
অপযশ হবে ত্রিভুবনে ॥
মলিন বদন-শশী কিবা দিবা কিবা নিশি
ফেরে সবে আকুল হইয়া।
কেনে নিদারুণ হৈলে গোপীগণ পাসরিলে
সুখে আছে মথুরা যাইয়া ॥
পিরিতে ছাড়িলাঞ ঘর তনু হৈল জরজর
গুমরি গুমরি উঠে মনে।
বিধি কৈল অবলা তাহে সে এতেক জ্বালা
দাস যদুনাথ গুণ গানে।

(২০৩)

শুন শুন মধুকর গোপীর করুণা।
প্রাণনাথ বিনে শূন্য হইল যমুনা ॥
কোথা হনে ব্রজে আইল দারুণ অক্রূর।
ছাড়ি গেল প্রাণনাথ নিদয়া নিঠুর ॥
আরে আরে বিধাতা তুমি ভালে দেবরাজ।
কি করিলে নষ্ট কৈলে দেবের সমাজ ॥
এক তিল যারে না দেখিলে প্রাণ যায়।
কি মতে বিচ্ছেদ তার সহিব হৃদয় ॥

বিধি নিদারুণ বড় দয়া নাহি তারে।
সজীব থাকিতে প্রাণ দহিল আমারে॥
কি কারণে লোকে তারে কহে যুবরাজ।
কৃষ্ণচক্ষু হরিলে, চক্ষুর কিবা কাজ॥
আরে রে অক্রূর তুমি ক্রূর দুরাচার।
হরি লৈলা প্রাণ, এহি তোর ব্যবহার॥
কংসরাজ তোমার বুঝয়ে ভাল মর্ম্ম।
নিষ্ঠুর দেখিয়া নিয়োজিল দূতকর্ম্ম॥
মথুরানাগরীগণের হইল সুমঙ্গল।
কৃষ্ণের দেখিবে তারা বদনমণ্ডল॥
কিবা পুণ্য কৈল মধুপুরবাসী লোকে।
গোকুলনিবাসী লোক মরিবেক শোকে॥
বিধাতা নিঠুর কিবা লিখিল কপালে।
কিবা অপরাধে আমা ছাড়িল গোপালে॥
এহি মতে গোপীগণ করয়ে ক্রন্দন।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে কান্দে যত পুরজন॥

(২০৪)

গোপীর ক্রন্দন শুনি কান্দে নন্দরাণী।
পুত্রশোকে টলমল লোটায় ধরণী॥
আহা রাম কৃষ্ণ বাপু আমাকে ছাড়িলে।
নিশ্চিন্ত হইয়া পুত্র মথুরা রহিলে॥
মা বলিয়া কে ডাকিবে কে মাঙ্গিবে ননী।
কে আর সমুখে রৈয়া বলিবে জননী॥
মুরলীর ধ্বনি আর কর্ণে না শুনিব।
আইস রাম কৃষ্ণ বলি কাহারে ডাকিব॥
কাহারে বলিব আর রাখ গিয়া ধেনু।
কি দোষে ছাড়িয়া মোরে গেল রাম কানু॥

পূর্ণিমার চন্দ্র মুখ না দেখিব আর।
সুন্দর চন্দ্রিকা সখি গলে গুঞ্জাহার॥
শূন্য হইল রতনমন্দির শয্যাঘর।
আজ হৈতে শূন্য হৈল গোকুল নগর॥
নগরের লোকে বলে কৃষ্ণ বড় চোর।
কেহ বোলে কৃষ্ণ ঘরে সান্ধাইল মোর॥
সকলের পরিবাদ গেল আজি হৈতে।
কংসের আদেশে পুত্র গেল মথুরাতে॥

(২০৫)

ওরে রে মদন তুমি বিজয়ী সংসারে।
তোমার বিষম বাণ কে সহিতে পারে॥
আমাকে মারিয়া কৃষ্ণ গেল মধুপুরী।
মরাকে মারিয়া তোর কিসের চাতুরি॥
দন্তে তৃণ ধরিয়া করিয়ে নিবেদন।
না মার মদন অনাথিনী গোপীগণ॥
এতেক বলিয়া হৈল কৃষ্ণ-উন্মাদ।
ভূমিতে পড়িয়া গোপী করয়ে বিষাদ॥
অতি সুশীতল বহে মলয় পবন।
তাহার পরশে পুন পাইল চেতন॥
চৈতন্য পাইয়া অতি কুপিত হইয়া।
পবনের তরে কিছু বলেন গর্জ্জিয়া॥
শুন রে পবন তুমি পরম চঞ্চল।
তুমি কি করিতে পার আমাকে শীতল॥
আমারে ছাড়িয়া কৃষ্ণ গেল মধুপুরে।
বিরহব্যথায় প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
তাহাতে আমার শত্রু হইল মদন।
কৃষ্ণ বিনে তাহারে কে করিবে নিবারণ॥

কেহ হেন থাকে কৃষ্ণ আনিয়া মিলায়।
তবে আমা সকলের দুঃখ দূর যায়॥
কোথা গেলে পাব আর নন্দের নন্দন।
তবে জুড়াইবে অনাথিনী গোপীগণ॥
এতেক বলিতে হৃদে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।
হা হা কৃষ্ণ বলি গোপী ভূমিতে পড়িল॥
সে হেন সুন্দর রূপ না দেখিব আর।
সখা সখী সঙ্গে কেবা করিবে বিহার॥
কুঞ্জমধ্যে আর না করিব বিলাসন।
পুলিনে যাইয়া না দেখিব বৃন্দাবন॥
বিরহে ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণগুণ গায়।
গুরুজন গঞ্জন মনেতে নাহি ভায়॥
... ...
শ্রীরাধা-গোবিন্দ-পদ মনে করি আশ।
মাথুর বর্ণন কহে যদুনাথ দাস॥

বিংশ স্তবক

দিব্যোন্মাদ

দয়িতের সুদূর প্রবাসজনিত বিপ্রলম্ভে মোহন ভাব অদ্ভুত ভ্রমময়ী বৈচিত্রী দশা লাভ করিলে দিব্যোন্মাদ হয়।

উজ্জ্বলনীলমণিতে (১৪।১৯০-১৯৩) দিব্যোন্মাদের বিবিধ ভেদ বর্ণিত হইয়াছে—তন্মধ্যে উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রধান। চিত্রজল্পের আবার দশটি ভেদ—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প। এগুলির লক্ষণ পদের টীকায় দিব।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের ছাত্র নন্দকিশোর দাস (গোস্বামী) রসকলিকায় লিখিয়াছেন—

উদ্‌ঘূর্ণা দশাতে চিত্তে নানা ভ্রম হয়।
নানা ভাব চেষ্টা ভ্রমে আসি প্রকটয়॥
অশেষ নায়িকাবস্থ চেষ্টা অদ্ভুতা।
দেখি কৃষ্ণে কহে সখী অতি যে দুঃখিতা॥
বিচ্ছেদের ভরে রাধা অতি যে মোহিতা।
নানা ভ্রমময়ী দিব্যোন্মাদ—ঘূর্ণিতা॥
কভু কুঞ্জগৃহে বাসকসজ্জিতা যে হয়ে।
বিলাস বিভ্রমে শয্যার রচনা করয়ে॥
কভু দরশন আশে হয়ে উৎকণ্ঠিতা।
বিলাপ করয়ে নানা ভ্রমময় কথা॥
অরুণ-মিলিত নীল ঘন যে গগনে।
হেরিয়া খণ্ডিতা দশা করিঞা ধারণে॥
তোহারি ভরমে তাহে করিয়া তর্জন।
বচন না কহে রহে ফিরিয়া বয়ান॥
ক্ষণেক অন্তরে সেই দশা যবে যায়।
অনুতাপ করি প্রেমে করে হায় হায়॥

ক্ষণে কহে অঙ্গবেশ করহ রচনে।
মূরুছিত হঞা পড়ে তুয়া অদর্শনে॥
কখন অতি যে অন্ধকার নিদারুণে।
অভিসার-ভ্রমবতী ঘুরয়ে অঙ্গনে॥
কভু প্রলাপয়ে প্রাণনাথ গেলা কতি।
ক্ষণে বিলাপয়ে সুকরুণ স্বরে অতি॥
কাঁহা ব্রজরাজ-কুলচান্দ সুশোভন।
কামার্ক-প্রতপ্ত কুমুদিনীর জীবন॥
কাঁহা সে সুঠাম শিখি-চন্দ্রক-ভূষণ।
হাহা কাঁহা প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাঁহা ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি মনোহর।
কাঁহা নবঘন-তনু পীতবাসধর॥
কাঁহা রাসবিলাসী নাগর সুমোহন।
কাঁহা সে অপূর্ব্ব গতি মদনমোহন॥
কাঁহা রসসুধা-নিধি না পাঙ দর্শন।
ধিক্ রহু বিধিরে যে করে বিড়ম্বন॥
রজনী সময়ে ভ্রমে হয়ে দিবা জ্ঞান।
দিবস-ভিতরে কভু রজনী-বিজ্ঞান॥
এই মত নানা ভ্রমদশা-প্রকটন।
সংক্ষেপে কহিল সব না যায় বর্ণন॥

(২০৬)

একদিন গোপীভাবে জগত ঈশ্বর।
'বৃন্দাবনে গোপী গোপী' বোলে নিরন্তর॥
কোনো যোগে তহিঁ এক পড়ুয়া আছিল।
ভাবমর্ম্ম না জানিঞা সে উত্তর দিল॥
"গোপী গোপী" কেনে বোল নিমাঞি পণ্ডিত।
"গোপী গোপী" ছাড়ি কৃষ্ণ বোলহ ত্বরিত॥

কি পুণ্য জন্মিব 'গোপী গোপী' নাম লৈলে।
কৃষ্ণনাম লইলে সে পুণ্য বেদে বোলে॥
ভিন্ন ভাব প্রভুর সে, অজ্ঞে নাহি বুঝে।
প্রভু বোলে 'দস্যু কৃষ্ণ, কোন জনে ভজে॥
কৃতঘ্ন হইয়া বলি মারে দোষ বিনে।
স্ত্রী জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কাণে॥
সর্ব্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে।
কি হইব আমার তাহার নাম লৈলে'॥
এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত ২।২৬।৩৫৫ পৃঃ

টীকা—নবদ্বীপে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে নিমাই পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভ্রমর-গীতার দিব্যোন্মাদের প্রভাবে এই লীলা করিয়াছিলেন।

স্তম্ভ হাথে লৈয়া—প্রভুর মাটির ঘর, বাঁশের খুঁটি ছিল; সেই খুঁটি একখানি লইয়া ছাত্রকে মারিতে গেলেন।

ভণিতার অর্থ—জান=যান=যাঁহাদের। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ যাঁহাদের (আপন জন), তাঁহাদের পদযুগে বৃন্দাবনদাসের গান।

(২০৭)

উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কাজ
পরনারী-বধে সাবধান॥
সখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত হৈল দুঃখ বিপরীত
এবে যায়, না রহে পরাণ॥

কুটিল প্রেম অগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণডোর হাতে গলে বান্ধি মোর
রাখিয়াছে নারি উকাসিতে॥
অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে॥
এতেক বিলাপ করি বিষাদে শ্রীগৌরহরি
উঘাড়িয়া দুঃখের কবাট।
ভাবের তরঙ্গ বলে নানারূপে মন চলে
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২

(২০৮)

তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ
নীল গগনে হেরি।
তোহারি ভরমে তা সঞে রোখই
মানিনী বদন ফেরি॥
প্রাণ সহচরি চরণে সাধই
কানু মানায়বি তোই।
মুদিত নয়নে কহত মাধব
কাঁহে না মিলল সোই॥
কানু হে, রাইক ঐছন কাজ।
আট পহরে তো বিনু সাজই
আটহু নায়িকা সাজ॥
হংস গুঞ্জিতে উমতি ধাবই
তোঁহারি নূপুর মানি।

হাসি আভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই
শেজ বিছাঅই আনি ॥
নীল নিচোল সঘনে মাগই
নিবিড় তিমির হেরি।
ঘুমল তো সঞে কহই ঐছন
বেশ বনাঅহ মোরি ॥
কোকিল রবে চমকি উঠই
নিয়ড়ে না হেরি ভোরি।
সোঙরি মথুরা গমন তোহারি
ঘুরই পড়লি গোরি ॥
নিঝর নয়নে সব সখীগণে
খোঁজত বহে না শ্বাস।
তোঁহারি চরণে এ সব কহিতে
ধাওত গোবিন্দদাস ॥

রসকলিকার (পৃঃ ১১৯) পাঠ দেওয়া হইল
পদামৃতসমুদ্র ৩৭৪ পৃ ;
তরু ১৯৬৩

টীকা—দূতী মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার উদ্‌ঘূর্ণা দশা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীরাধা আট প্রহরে আট প্রকার নায়িকার ভাব প্রকাশ করিতেছেন। খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জা, অভিসারিকা, স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোষিতভর্তৃকা—এই আটপ্রকার নায়িকার ভাব একই দিনে শ্রীরাধিকার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। ভোরবেলায় নীল গগনে সিন্দূরবর্ণের তরুণ অরুণ উঠিতেছে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে হয় যে, নীল আকাশ যেন শ্যামসুন্দর, আর তরুণ অরুণ যেন তাঁহার কপালে প্রতিনায়িকার সিন্দূর-বিন্দুর ছাপ। তাহা দেখিয়া তিনি খণ্ডিতা নায়িকার ন্যায় তোমার উপর যেন ক্রোধ প্রকাশ করেন, মানে মুখ ফিরাইয়া থাকেন। একটু পরেই কলহান্তরিতার ভাবে প্রিয় সখীকে পায়ে ধরিয়া সাধেন যে, কানুকে কোন রকমে বুঝাইয়া সুঝাইয়া আনিয়া দাও। আবার উৎকণ্ঠিতা হইয়া চোখ

বন্ধ করিয়া বলেন, "সখি! বল তো, মাধব কেন আসিল না?" হংসধ্বনি শুনিয়া তিনি ভাবেন, বুঝি তোমার নূপুরের শব্দ শোনা গেল, অমনি পাগলিনীর মতন ছুটেন। তার পর হাসিয়া অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক শয্যা বিছাইয়া বাসকসজ্জায় প্রতীক্ষা করেন। আঁধার রাত্রিতে সহসা নীল শাড়ী চাহিয়া লইয়া অভিসারে বাহির হন। আবার তোমার সাথে যেন নিদ্রিত হইয়া সহসা স্বাধীনভর্ত্তৃকার ভাবে (দয়িত যাহার অধীন, স্ব—নিজ অধীন ভর্ত্তৃক যাহার, তাহাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা বলে) বলেন, আমার বেশভূষা পরাইয়া দাও। আবার কোকিলের শব্দে বিরহাকুল হইয়া পড়েন; যখন তোমাকে নিকটে না দেখেন, তখন পাগলিনীর মতন হন। তার পর তুমি মথুরায় চলিয়া গিয়াছ স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহার সখীরা অঝোর নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে দেখিতে থাকে, তাঁহার শ্বাস বহিতেছে কি না। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কবি গোবিন্দদাস তোমার চরণে শ্রীরাধার অবস্থা নিবেদন করিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিয়াছে।

(২০৯)

যোই নিকুঞ্জে রাই পরলাপয়ে
সোই নিকুঞ্জ সমাজ।
সুমধুর গঞ্জনে সব মন রঞ্জনে
মিলল মধুকররাজ॥
রাইক চরণ নিয়ড়ে উড়ি যাওত
হেরইতে বিরহিণী রাই।
সখী অবলম্বনে সচকিত লোচনে
বৈঠল চেতন পাই॥
অলি হে, না পরশ চরণ হামারি।
কানু অনুরূপ বরণ গুণ যৈছন
ঐছন তবহুঁ তোহারি॥
পুররঙ্গিণী কুচ- কুঙ্কুম-রঞ্জিত
কানু-কণ্ঠে বনমাল।

তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল ॥

লহরী পৃঃ ২৫৬

টীকা—যে নিকুঞ্জে বসিয়া রাই প্রলাপ বলিতেছেন, সেই নিকুঞ্জের সখী-গণের মধ্যে এক ভ্রমর সর্ব্বজনমনোরঞ্জনকারী সুমধুর শব্দ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে রাধার চরণের নিকট উড়িয়া যাইতেছে, তাহা দেখিতে পাইয়া বিরহিণী রাধা চেতনা পাইয়া সখীর কাঁধে ভর দিয়া বসিলেন ও বলিতে লাগিলেন—হে ভ্রমর, তুমি আমার চরণ ছুঁইও না; কেন না, কানুর মতই তোমার বর্ণ এবং গুণও (নানা ফুলে মধু খাও)। কানাইয়ের গলায় এখন যে বনমালা রহিয়াছে, তাহা মথুরাপুরীর নাগরীদের কুচকুঙ্কুমের দ্বারা রঞ্জিত এবং সেই কুঙ্কুম আবার তোমারও মুখে লাগিয়াছে। তাহা দেখিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে কবি জ্ঞানদাসেরও মুখ কালো হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪৭।১২ শ্লোকের ভাব লইয়া এই পদ লিখিত হইয়াছে—

মধুপ! কিতববন্ধো! মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ ॥

শচীনন্দন বিদ্যানিধিকৃত অনুবাদ—

ভ্রমর! ভণ্ডের মিতা, চরণে না দিও মাথা
সপত্নীকুচের যে মালা।
তাহার কুঙ্কুম লয়া নিজ শ্মশ্রু রাঙ্গাইয়া
তুমি কেন ব্রজপুরে এলা ॥
যার দূত তুমি হেন জন।
মানিনী মথুরা নারী তার প্রসাদকর হরি
যদু-সভায় পাবে বিড়ম্বন ॥

উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা পৃঃ ১৫৫

(২১০)

ওরে কাল ভ্রমরা, তোমার মুখে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী যথা নিদারুণ হরি
আমার মন্দিরে কিবা কাজ॥
ব্রজবাসিগণ দেখি নিবারিতে নারি আঁখি
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।
বিরহ অনল একে তনু ক্ষীণ শ্যাম-শোকে
নিভান আগুনি দিলা জ্বালি॥
মথুরায় কর বাস থাকহ শ্যামের পাশ
চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি এথা কেনে দুঃখ দিতে মোর প্রাণে
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও॥
সে সুখ সম্পদ মোর তুমি জান মধুকর
এবে সে আমার দুঃখ দেখ।
কহিও কানুর ঠাম ইহ বিরহিণী নাম
জ্ঞানদাস কহে না উপেখ॥ লহরী ২৫৬ পৃঃ

উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪৭।১২ শ্লোকটি প্রজল্পের উদাহরণ-স্বরূপ ধৃত হইয়াছে। প্রজল্পে অসূয়া, ঈর্ষ্যা ও মদযুক্ত অবজ্ঞা প্রভৃতির অকৌশল উক্তি থাকে। এখানে "কাল ভ্রমরা তোর মুখে নাহি লাজ" বাক্যে অসূয়া, পূর্ব্বের পদে "পুর-রঙ্গিণী কুচকুঙ্কুম" শব্দে অকৌশল ও ঈর্ষ্যা এবং এই পদে "আমার মন্দিরে কিবা কাজ" বাক্যে মদ প্রকাশ পাইয়াছে।

(২১১)

সকৃৎ অধরমধু করাইয়া পান।
তেজি গেলা কৃষ্ণ যেন তুহারি সমান॥
কিরূপে কমলা দেবী সেবে পদযুগে।
এমত বঞ্চকে না বাড়াই অনুরাগে॥

হেন বুঝি তাহার উত্তম যশ শুনি।
ভুলিলা কমলাদেবী তত্ত্ব নাহি জানি॥

ভাঃ ১০।৪৭।১৩র অনুবাদ
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

দয়িতের নিষ্ঠুরতা, শঠতা ও চাপল্য দেখাইয়া যাহাতে নিজের বিচক্ষণতা প্রমাণ করা হয়, তাহাকে শ্রীরূপ গোস্বামী পরিজল্প নাম দিয়াছেন। একবার মাত্র অধরসুধা পান করানোতে শ্রীকৃষ্ণের শঠতা, তাহার পরই ত্যাগ করায় নিষ্ঠুরতা।

"তুহারি সমান"—ভ্রমরের মতন বলায় শ্রীকৃষ্ণের চাপল্য এবং কমলা সরলা বলিয়া তোমার "উত্তমযশঃ" বিশেষণ শুনিয়াই ভুলিয়াছেন, আমরা বিচক্ষণ—উহাতে ভুলি না।

(২১২)

বনচরী আমি সব, নাহি গৃহ-পুরী।
তার গুণ কেন বা গাইস উচ্চ করি?
সুরপতিকথা পুরনারী আগে কহ।
তার ঠাঞি যে তোমার বাঞ্ছিত, তা লহ॥
অর্জ্জুনের প্রিয় কৃষ্ণ নপুংসক-সখা।
আমা বিগ্যমানে তার না কহিও কথা॥
ভ্রমর বলহ যদি এত দোষ জান।
তবে কেন ভজিলে? তাহার কথা শোন॥

ভাঃ ১০।৪৭।১৪
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।

এটি বিজল্পের উদাহরণ।

ব্যক্ত অসূয়া যাথে গূঢ় মান ধরে।
বিজল্পেতে কৃষ্ণচন্দ্রে কটাক্ষোক্তি করে॥

(২১৩)

স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালে এমত নারী বৈসে।
তাহার কপট-হাস-কটাক্ষ-বিলাসে॥
সে রূপ দেখিয়া যে নহিব বিমোহিতা।
কি দোষ আমার, যার কমলা বনিতা॥
পায়ে না পড়িহ ভৃঙ্গ! না ধর চরণে।
বিনয়ে পণ্ডিত, সে কপট ভাল জানে॥
তুঞি সে তাহার দূত, জানিস্ চাতুরী।
তাহার কপট গোপী ভাঙিতে না পারি॥
পতি সুত গৃহ কুল তাহা লাগি তেজি।
সে কেন তেজিয়া যায়, মর্ম্ম নাহি বুঝি॥
এতেক জানিলুঁ তোর মূর্খ-ব্যবহার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু তার নাহিক বিচার॥

প্রথম চারি চরণ ভাঃ ১০।৪৭।১৫
ও শেষের আট চরণ ১০।৪৭।১৬র ভাব লইয়া লেখা
—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

প্রথম চারি চরণে উজ্জল্প ও শেষ আট চরণে সংজল্প—উজ্জল্পে গর্ব্বগর্ভ ঈর্ষ্যাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য কীর্ত্তন ও আক্ষেপ থাকে।

সোল্লুণ্ঠ গভীর ক্ষেপ বাক্য কহে বাম।
কৃষ্ণে অকৃতজ্ঞ উক্তি, সংজল্প তার নাম॥

(২১৪)

বিনা অপরাধে বলি বিন্ধি কেন মারে?
সূর্য্যবংশে জন্মিঞা ব্যাধের কর্ম্ম করে॥
স্ত্রীর লাগি বনে বনে বেড়ায় ভ্রমিয়া।
শূর্পণখার নাক-কাণ ফেলায় কাটিয়া॥
বলি রাজা ত্রিভুবনের আছিলা ঈশ্বর।
তার পূজা লঞা তার হরয়ে সকল॥

পাতালে বান্ধিয়া তারে থুইলা নাগপাশে।
কাকে যেন বলি খাঞা সেই যজ্ঞ নাশে॥
নামে কালা, রূপে কালা, কালিয়া অন্তরে।
তার সঙ্গে পীরিতি বা কোন জনা করে?
তবু তার কথাখানি ছাড়ন না যায়।
না দেখিলুঁ আমি সব তাহার উপায়॥
যদি বল তার কথা না কহিও আর।
নারী হঞা কেমতে পারিব ছাড়িবার॥

ভাঃ ১০।৪৭।১৭

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

এটি অবজল্পের উদাহরণ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য, ধূর্ত্ততা, ঈর্ষ্যা, ভয় ও আসক্তির অযোগ্যতা প্রকাশ করা হয়।

(২১৫)

সকৃৎ যাঁহার গুণ শুনি ধীরগণে।
সুত দার দুঃখিত তেজয়ে সেই ক্ষণে॥
পক্ষী যেন ভ্রমি ভ্রমি ভিক্ষা মাগি খায়।
নারী জাতি আমি সব, কি আছে উপায়?
কুটিলের বচন মানিলুঁ সত্য করি।
কুলিকের গীতে যেন মৃগ মরে ভুলি॥
একবার তার কথা ছাড়ি আন কথা কহ।
কিছু যদি চাহ তুমি, তাহা মাগি লহ॥

প্রথম চারি চরণ ভাঃ ১০।৪৭।১৮ ও পরে ১০।৪৭।১৯র ভাব লইয়া লেখা।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

তাঁহাকে ত্যাগ করাই উচিত, এরূপ ভঙ্গীতে অনুতাপের নাম অভিজল্প। প্রথম চারি চরণে এই ভাব আছে। পরে আজল্প—

কৌটিল্যেতে কহে হরি মোরে পীড়া দিব।
অন্য কথায় সুখ হয়, তাহাই শুনিব॥

(২১৬)

সত্য কি আসিবে হেথা সে নন্দ-নন্দন ?
কিবা তথা লঞা যাবে এই গোপীগণ ?
কিবা মধুপুরে হরি আছেন কুশলে ।
পিতামাতা-বন্ধুগণ কভু কি সঙরে ?
কিঙ্করীগণের কথা শুনিলে কহিতে ?
শ্রীভুজ তুলিয়া আর কবে দিবে মাথে ?
ভৃঙ্গ লক্ষ্য করি গোপী উদ্ধবের তরে ।
এইরূপে নানা বাণী বলে নানা ছলে ॥
উদ্ধব দেখিয়া ভক্তিরসমহোদয় ।
গোপীগণে শান্তিয়া কি বলে মহাশয় ॥
আসিবে গোবিন্দ, গোপি, চিত্ত স্থির কর ।
নিকটে দেখিবে হরি, খেদ পরিহর ॥
অহো ধন্যা গোপি ! তুমি জগতে পূজিতা ।
সাধিলে সকল সিদ্ধি ত্রৈলোক্য-বন্দিতা ॥
গোবিন্দে এরূপ যার চিত্ত-আরোপণ ।
কি তার কহিব ভাগ্য সফল জীবন ॥

ভাঃ ১০।৪৭।২০-২৩

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

প্রথম দুই চরণে প্রতিজল্প—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকে দুস্ত্যজ অথচ তাঁহার সঙ্গে মিলন অনুচিত বলা হয়। পরের চারি চরণ (১০।৪৭।২১) সুজল্প—

ঋজুতা, গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, সোৎকণ্ঠা, চপল ।
'সুজল্প' জিজ্ঞাসা করে সম্বাদ সকল ॥
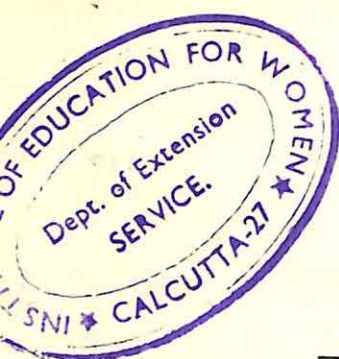
একবিংশ স্তবক

ভাবোল্লাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য

বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার দ্বাদশ পল্লবের নাম ভাবোল্লাস লিখিয়াছেন। উহাতে শ্রীকৃষ্ণ যেন মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং তাহাতে ব্রজজনের উল্লাস হইয়াছে, এই ভাবের পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভাবোল্লাস শব্দ ঐ অর্থে ব্যবহার করিলাম, কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৫।৭৫) ও উজ্জলনীলমণিতে (১৩।১০৪) সখীদের শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা যে অধিক স্নেহ, তাহাকে ভাবোল্লাস বলিয়াছেন।

প্রিয়তমের কাছে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ যে বিরহ-ব্যাকুলতা —কাছে থাকিয়াও দূরে মনে হওয়া—তাহাকেই শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জল-নীলমণিতে (১৫।১৪৭) প্রেমবৈচিত্ত্য বলিয়াছেন। এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ না জানিয়া অনেকে ইহা প্রেমবৈচিত্র্যের সঙ্গে সমান অর্থক মনে করেন।

(২১৭)

আসিবে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর
নদীয়া নগর মাঝ।
দূরেতে দেখিয়া সচকিত হৈয়া
করব মঙ্গল-কাজ॥
জলঘট ভরি আম-শাখা ধরি
রাখি সারি সারি করি।
কদলী আনিয়া রোপণ করিয়া
ফুল-মালা তাহে ধরি॥
আওল শুনিয়া নদীয়া-নাগরী
ধাওব দেখিবার তরে।

হরি হরি ধ্বনি জয় জয় বাণী
উঠিবে সকল ঘরে ॥
শুনিয়া জননী ধাইবে অমনি
করিবে আপন কোরে।
নয়নের জলে ধোই কলেবরে
তুরিতে লইবে ঘরে ॥
যতেক ভকত দেখি হরষিত
হইবে প্রেম-আনন্দ।
যদুনাথ যাঞা পড়ি লোটাইয়া
লইবে চরণারবিন্দ ॥

তরু ১৯৭৬

(২১৮)

রাজপুরাদ্ গোকুলমুপযাতম্।
প্রমদোন্মাদিত-জননী-তাতম্ ॥
স্বপ্নে সখি পুনরদ্য মুকুন্দম্।
আলোকয়মবতংসিত-কুন্দম্ ॥
পরম-মহোৎসবঘূর্ণিত-ঘোষম্।
নয়নেঙ্গিত-কৃত-মৎপরিতোষম্ ॥
নব-গুঞ্জাবলি-কৃতপরভাগম্।
প্রবল-সনাতন-সুহৃদনুরাগম্ ॥

গীতাবলী

সখি ! আমি আজ আবার মুকুন্দকে স্বপ্নে দেখিলাম। তাঁহার কর্ণে কুন্দফুলের অলঙ্কার। তিনি রাজপুরী মথুরা হইতে যেন গোকুলে আসিয়াছেন। তাঁহার পিতামাতা আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। গোপগণ মহোৎসবে নাচিতেছেন। তিনি তখন অপাঙ্গদৃষ্টির দ্বারা আমার সন্তোষ বিধান করিলেন। তাঁহার প্রবল সনাতন বন্ধুবাৎসল্য দেখিলাম বা সনাতনের প্রতি তাঁহার প্রবল স্নেহ দেখিলাম।

(২১৯)

বাম ভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে
হৃদয়ে উঠিছে সুখ।
প্রভাতে স্বপন প্রতীত বচন
দেখিব পিয়ার মুখ॥
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে
দু জনার একই কথা।
বন্ধু আসিবার ঠিকন সোধাইতে
নাগিনী নাচায় মাথা॥
ভ্রমরা কোকিল শবদ করয়ে
শুনিতে সাধয়ে চিত।
রুরু মৃগগণে করয়ে মিলনে
যৈছন পূরব নিত॥
খঞ্জন আসিয়া কমলে বৈসয়ে
সারী শুক করে গান।
বংশী কহয়ে এ সব লক্ষণ
কভু না হইবে আন॥

তরু ১৯৭৯

(২২০)

অচিরে পূরব আশ।
বন্ধুয়া মিলিবে পাশ॥
হিয়া জুড়াইবে মোর।
করিবে আপন কোর॥
অধর অমৃত দিয়া।
প্রাণদান দিবে পিয়া॥
পুলকে পুরব অঙ্গ।
পাইয়া তাহার সঙ্গ॥

ছল ছল দু নয়ানে।
চাহিব বদন পানে॥
কিছু গদগদ স্বরে।
এ দুখ কহিব তারে॥
শুনিয়া দুখের কথা।
মরমে পাইবে বেথা॥
করিবে পিরীতি যত।
জ্ঞান তা কহিবে কত॥

মাধুরী ৪।২৯৩

(২২১)

শুন হে পরাণ পিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি
আর না দিব ছাড়িয়া॥
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভাল সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার করমের দুখ
সকলি করিনু ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
আর কি কাহাকে ডর॥
এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
পড়িলা শ্যামের কোরে।

জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
ভাসিল নয়ন লোরে॥

মাধুরী ৪।৩৯৬ পৃঃ

(২২২)

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাহাঁ গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানলুঁ রে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরি নাহি জান॥
মুরছলি নাগর মুরছলি রাই।
বিরহে বেয়াকুল কূল না পাই॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরি চিত্র-পুতলি সম চায়॥
ঐছন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দদাস-চীত সচকিত॥

তরু ৭৬৬

টীকা—রাধা শ্যামের কোলে থাকিয়াই কাঁদিতেছেন—হরি হরি, আমার প্রাণনাথ কোথায় গেল। হে সখি! বুঝিলাম, প্রেম জ্ঞান লোপ করিয়া দেয়, তাই নাগরের কোলে থাকিয়াও নাগরী জানিতে পারেন না। নাগর মূর্চ্ছিত হইলেন, রাধাও মূর্চ্ছিত হইলেন। উভয়ে বিরহে ব্যাকুল, সেই ব্যাকুলতার সমুদ্রে যেন কূল পাইতেছেন না। দারুণ বিরহ বোধে তাঁহারা তাকাইয়া পর্য্যন্ত দেখিতেছেন না। সখী তাঁহাদের এই ভাব দেখিয়া পটে আঁকা ছবির মতন তাকাইয়া থাকিলেন। রাধার প্রেমের ঐরূপ ধরণ দেখিয়া গোবিন্দদাসের চিত্ত সচকিত হইল।

(২২৩)

সজনী, প্রেমক কো কহ বিশেষ।
কানুক কোরে কলাবতি কাতর
কহত কানু পরদেশ॥

চাঁদক হেরি সুরজ করি ভাখয়ে
দিনহি রজনি করি মান।
বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর
বিরহ পিয়ক করি ভান॥
কব আওব হরি হরি সঞে পূছই
হসই রোয়ই খেনে ভোরি।
সো গুণ গাই শ্বাস খেনে কাঢ়ই
ঘনহি ঘনহি তনু মোড়ি॥
বিধুমুখি-বদন কানু যব পোঁছল
নিজ পরিচয় কত ভাতি।
অনুভবি মদন কান্ত কিয়ে কামিনি
বল্লভদাস সুখে মাতি॥

তরু ৭৭০

টীকা—সখি! এই প্রেমের বৈশিষ্ট্য কি বলিব! কানুর কোলে থাকিয়াই কলাবতী রাধা কাতর হইয়া বলিতেছে যে, কানু প্রবাসে রহিল! বিরহের জ্বালা এমন প্রবল যে, চাঁদ অঙ্গ শীতল করা দূরে থাকুক, সূর্য্যের মতন যেন সন্তপ্ত করিতেছে, এরূপ বলে (ভাখয়ে)। দিনকে রাত্রি মনে করিতেছে। প্রিয়ের বিরহে যেন হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে, এমন ভাবে বিলাপ করে। শ্রীকৃষ্ণকেই জিজ্ঞাসা করে যে, শ্রীকৃষ্ণ কবে আসিবে। কখন হাসে, কখন পাগলিনীর ন্যায় কাঁদে। প্রিয়ের গুণগান করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আবার গা মোড়ামুড়ি দেয়।

কানু যখন চন্দ্রবদনীর মুখ মুছাইয়া দিয়া নানারূপে নিজের পরিচয় দিলেন, তখন কামিনী মদন অনুভব করিয়া কান্তের সহিত সুখে মাতিলেন। কবি বল্লভদাসও আনন্দিত হইলেন।
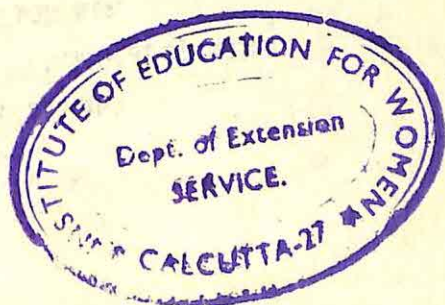
প্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ

(২২৪)

শ্রীচৈতন্যদেবের রচনা—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ। পদ্যাবলী ৩৩৭

আমি কৃষ্ণপদদাসী তিঁহো রস-সুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দর্শন জারে আমার তনু মন
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে কিম্বা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয়॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বশ তনু মন
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া আমা সনে করে ক্রীড়া
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥
কিবা তিঁহো লম্পট শঠ ধৃষ্ট সুকপট
অন্য নারীগণ করি সাত।
মোরে দিতে মনঃপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥
না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তার সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ তাঁর হয় মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।২০

নির্ঘণ্ট

———

পদসূচী

———

পদকর্ত্তাদের সূচী

	পদসংখ্যা	মোট
২০। বল্লভদাস	২২৩	১
২১। বসন্তরায়	৬৭, ৬৮, ১২৮, ১৩৩, ১৭৯, ১৮৬, ১৮৭	৭
২২। বাসুঘোষ	৮, ১৯, ৩৯, ৪৮, ৮১, ১২৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৬১, ১৮২	১০
২৩। বীর হাম্বীর	৮৭	১
২৪। বৃন্দাবনদাস	৯৩, ২০৬	২
২৫। বংশীবদন	২৯, ৮৩, ৯৫, ১৩০, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৮৪, ২১৯	১৪
২৬। মাধব আচার্য	১৫২	১
২৭। মাধব ঘোষ	১৮৮, ১৯৭	২
২৮। মুকুন্দ	২৪	১
২৯। মুরারি গুপ্ত	৪, ৮২	২
৩০। যদুনাথ দাস	৫০, ১২২, ১২৬, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২১৭	৯
৩১। যশোরাজ খান্	৯৪	১
৩২। রঘুনাথ দাস	৪৯	১
৩৩। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য	২৫, ২৬, ৩৪, ১৮০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬	১০
৩৪। রামানন্দ বসু	৫, ২২, ৩১, ৫৭, ৭১, ১৮৫	৬
৩৫। রামানন্দ রায়	১৯১	১
৩৬। রায় শেখর	৯৬, ৯৭, ১৪৩, ১৪৬, ১৫৫	৫
৩৭। রূপ গোস্বামী	১১০, ২১৮	২
৩৮। লোচন	১৮, ৫৬ (সম্ভবতঃ ২৮ সংখ্যকপদও লোচনের রচনা)	২
৩৯। শঙ্কর ঘোষ	১৭	১
৪০। শিবানন্দ	৭, ১০, ২০০	৩
৪১। শ্যামানন্দ	১০৩	১
৪২। শ্রীনিবাস	৬৫	১

———

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থাবলী

তারকা চিহ্নিত বইগুলি এম, এ, পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত

সাহিত্য

* বিদ্যাপতি (বাংলা ও হিন্দি : অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র -সহযোগে)
  মহামানবের জয়যাত্রা
  রামের মুরলী (যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত ছোট গল্প)
* চণ্ডীদাসের পদাবলী (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ : সটীক সংস্করণ)
* রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান (বুকল্যাণ্ড)
* গোবিন্দদাসের পদাবলী ও যুগ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

রাষ্ট্র বিজ্ঞান

* History of Political thought from Rammohan to Dayananda (C. U.)
  Civic Life in Bihar
* Problems of Public Administration in India (Edited)
  The State in Gandhian Philosophy (Edited)
  নাগরিক-শাস্ত্র-প্রবেশিকা (হিন্দি)
  Principles of Political Science and Government

ধন বিজ্ঞান

দারিদ্র্যমোচন
Socio-Economic Life in Bihar
Economic Life in Bihar
Economic History of England
Economic Geography (with Dr. S. C. Chatterjee)
সম্পত্তি অউর সমাজ (ডঃ এইচ. লাল ও অধ্যাপক কে. এন. প্রসাদ সহযোগে)

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থাবলী

ইতিহাস

History of Religious Reformation in India in the Nineteenth Century

* শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

Rise and Development of the English Constutation (Book-Land)

Modern Europe

History of England

পৌরাণিক ভারত

বৌদ্ধ ভারত

তুর্কী ভারত

আফ্রিকা

———